গৃহদাহ

সম্পাদনায়

ড· প্রসূন মুখোপাধ্যায়, এম. এ , পি-এইচ. ডি.

রীডার, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া

রত্নাবলী / ৫৯এ, বেচু চ্যাটাজী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

কলেজ স্ট্রীটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

●

জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ৩২-৬৫০৪

মুদ্রক
স্টার এণ্টার প্রাইজ
৫৯এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

গৃহদাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ। একসঙ্গে এফ. এ. পাস করার পর সুরেশ গিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুরাতন সিটি কলেজেই টিকিয়া রহিল।

সুরেশ অভিমান-ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, মহিম, আমি বার বার বলছি, বি. এ., এম. এ. পাস করে কোন লাভ হবে না। এখনও সময় আছে, তোমারও মেডিক্যাল কলেজেই ভর্তি হওয়া উচিত।

মহিম সহাস্যে কহিল, হওয়া ত উচিত, কিন্তু খরচের কথাটাও ত ভাবা উচিত।

খরচ এমনই কি বেশী যে, তুমি দিতে পার না? তা ছাড়া তোমার স্কলারশিপও আছে।

মহিম হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ অধীর হইয়া কহিল, না না—হাসি নয় মহিম, আর দেরি করলে চলবে না, তোমাকে এরই মধ্যে এ্যাডমিশন নিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি। খরচপত্রের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে।

মহিম কহিল, আচ্ছা।

সুরেশ বলিল, দেখ মহিম, কোন্‌টা যে তোমার সত্যকারের আচ্ছা, আর কোন্‌টা নয়—তা আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। কিন্তু পথের মধ্যে তোমাকে সত্য করিয়ে নিতে পারলুম না, কারণ, আমার কলেজের দেরি হচ্ছে। কিন্তু কাল-পরশুর মধ্যে এর যা-হোক একটা কিনারা না করে আমি ছাড়ব না। কাল সকালে বাসায় থেক, আমি যাব। বলিয়া সুরেশ তাহার কলেজের পথে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দিন-পনের কাটিয়া গিয়াছে। কোথায় বা মহিম, আর কোথায় বা তাহার মেডিক্যাল কলেজে এ্যাডমিশন লওয়া! একদিন রবিবারের দুপুরবেলা সুরেশ বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, সুমুখের একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝের উপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কুশাসন পাতিয়া ছয়-সাতজন আহারে বসিয়াছে। মহিম মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া কহিল, হঠাৎ বাসা বদলাতে হল বলে তোমাকে সংবাদ দিতে পারিনি; সন্ধান করলে কি করে?

সুরেশ তাহার কোন উত্তর না দিয়া ধপ্‌ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল এবং একদৃষ্টে ছেলেদের আহার্যের প্রতি চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত মোটা চালের অন্ন; জলের মত কি একটা দাল, শাক. ডাঁটা এবং কচু দিয়া একটা তরকারি এবং তাহারই পাশে দু'টুকরা পোড়া পোড়া কুমড়া ভাজা। দধি নাই, দুগ্ধ নাই, কোনপ্রকার মিষ্ট নাই; একটুকরা মাছ পর্যন্ত কাহারও পাতে পড়িল না।

সকলের সঙ্গে মহিম অম্লান মুখে, নিরতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত এইগুলি ভোজন করিতে লাগিল। কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া সুরেশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে কোনমতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সামান্য কারণেই সুরেশের চোখে জল আসিয়া পড়িত।

আহারান্তে মহিম তাহার ক্ষুদ্র শয্যার উপর আনিয়া বন্ধুকে যখন বসাইল তখন সুরেশ রুদ্ধস্বরে কহিল, বার বার তোমার অত্যাচার সহ্য করতে পারি না মহিম।

মহিম নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

সুরেশ কহিল, তার মানে—এমন কদর্য বাড়ি যে শহরের মধ্যে থাকতে পারে, এমন ভয়ানক বিশ্রী খাওয়াও যে কোন মানুষ মুখে দিতে পারে, চোখে না দেখলে আমি কোনমতে বিশ্বাস করতে পারতুম না। তা যাই হোক, এ জায়গার তুমি সন্ধান পেলেই বা

কিরূপে, আর তোমার সাবেক বাসা—তা সে যত মন্দই হোক, এর সঙ্গে তুলনাই হয় না—তাই বা পরিত্যাগ করলে কেন?

বন্ধু-স্নেহ বন্ধুর বুকে আঘাত করিল। মহিম আর তাহার নির্বিকার গাম্ভীর্য বজায় রাখিতে পারিল না, আর্দ্রস্বরে কহিল, সুরেশ, তুমি আমার গ্রামের বাড়ি দেখনি; তা হলে বুঝতে, এ বাসায় আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হতে পারে না। আর থাওয়া—আরও পাঁচজন ভদ্রসন্তান যা স্বচ্ছন্দে খেতে পারে, আমি পারব না কেন?

সুরেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, এ কেনর কথা নয়। ভালমন্দ জিনিস সংসারে অবশ্যই আছে। ভাল ভালই লাগে, মন্দ যে মন্দ লাগে, তাতে আর সংশয় নেই। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার এত দুঃখ করবার প্রয়োজন কি হয়েছে?

মহিম চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল—কথা কহিল না।

সুরেশ কহিল, তোমার প্রয়োজন তোমার থাক, আমি জানতে চাই না। কিন্তু আমার প্রয়োজন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। আমি গাড়ি ডেকে তোমার জিনিসপত্র এখনই আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। এখানে তোমাকে ফেলে রেখে যদি যাই, চোখে আমার ঘুম আসবে না, মুখে অন্ন রুচবে না। তোমাদের বাসার চাকরকে ডাক, একটা গাড়ি নিয়ে আসুক। এই বলিয়া সুরেশ মহিমকে টানিয়া তুলিয়া স্বহস্তে তাহার বিছানা গুটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মহিম বাধা দিয়া টানা-হেঁচড়া বাধাইয়া দিল না। কিন্তু শান্ত গম্ভীরস্বরে বলিল, পাগলামি করো না সুরেশ।

সুরেশ চোখ তুলিয়া কহিল, পাগলামি কিসের? তুমি যাবে না?

না।

কেন যাবে না? আমি কি তোমার কেউ নই? আমার বাড়ি যাওয়ায় কি তোমার অপমান হবে?

না।

তবে?

মহিম কহিল, সুরেশ, তুমি আমার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই; সংসারে এমন আর কয়জনের আছে, তাও জানি না। এতকাল পরে এ বস্তু আমি একটুখানি দেহের আরামের জন্য খুইয়ে বসব, আমাকে কি তুমি এত বড়ই নির্বোধ পেয়েছ!

সুরেশ কহিল, বন্ধুত্ব জিনিসটি তোমার ত একার নয় মহিম। আমারও ত তাতে একটা ভাগ আছে। খোয়া যদি যায়, সে ক্ষতি যে কত বড়, সে বোঝবার সাধ্য আমার নেই—আমি কি এতই বোকা? আর এত সতর্ক-সাবধান, এত হিসাবপত্র করে না চললেই এ বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় ত যাক না মহিম! এমনই কি তার মূল্য যে, সেজন্য শরীরের আরামটাকে উপেক্ষা করতে হবে?

মহিম হাসিয়া বলিল, না, এবার হেরেছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে নিশ্চয় জানাচ্ছি সুরেশ। তুমি মনে করেছ—শখ করে দুঃখ সইতে আমি এখানে এসেছি, তা সত্য নয়।

সুরেশ কহিল, বেশ ত, সত্য নাই হল। আমি কারণ জানতেও চাই না—কিন্তু যদি টাকা বাঁচানই তোমার উদ্দেশ্য হয়, আমাদের বাড়িতে এসে থাক না, তাতে ত তোমার উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যাবে না।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, এখন থাক সুরেশ। কষ্ট যদি সত্যই হয়, তোমাকে জানাব।

সুরেশ জানিত, মহিমকে তাহার সংকল্প হইতে টলান অসাধ্য। সে আর জিদ না করিয়া একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু বন্ধুর এই থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থাটা চোখে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল।

সুরেশ ধনীর সন্তান, এবং মহিমকে সে অকপটে ভালবাসিত। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, কোনমতে সে বন্ধুর একটা কাজে লাগে। কিন্তু মহিমকে সে কোনদিন সাহায্য লইতেই স্বীকার করাইতে পারে নাই—আজও পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বছর-পাঁচেক পরে দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।

তোমার উপর আমার যে কত বড় শ্রদ্ধা ছিল মহিম, তা বলতে পারি না।

বলবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করচি না সুরেশ।

সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না।

না থাকলে তোমাকে দন্ড দেবো, এমন ভয় ত কখনও দেখাই নি।

তোমাকে কপটতা দোষ দিতে তোমার অতি-বড় শত্রুও কখনও পারত না।

শত্রু পারত না বলে কাজটা যে মিত্রও পারবে না, দর্শন-শাস্ত্রের এমন অনুশাসন ত নেই!

ছি ছি, শেষকালে কিনা একটা ব্রাহ্মমেয়ের কাছে ধরা দিলে? কি আছে ওদের? ঐ শুকনো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ করে করে গায়ে কোথাও একফোঁটা রক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়ছে বলে ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্যন্ত এমনি চিঁচিঁ করে যে শুনলে ঘৃণা হয়।

তা হয় সত্য।

দেখ মহিম ঠাট্টা কর গে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে, যে ব্রাহ্মমেয়ে কখনো চোখে দেখেনি; মেয়েমানুষ ইংরাজীতে ঠিকানা লিখতে পারে শুনলে যারা আশ্চর্য অবাক হয়ে যায়—তিনি চলে গেলে যাবা সসম্ভ্রমে দূরে সবে দাঁড়ায়। বিস্ময়ে অভিভূত করে দাও গে তোমার গ্রামের লোককে, যারা এঁকে দেব-দেবী মনে করে মাথা লুটিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের বাড়ি ত পাড়াগাঁয়ে নয়—আমাদের ত অত সহজে ভুলানো যায় না।

আমি তোমাকে শপথ করে বলচি সুরেশ, তোমাদের শহরের লোককে ভুলোবার আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। আমি তাঁকে আমাদের পাড়াগাঁয়ে নিয়েই রাখব। তাতে ত তোমার আপত্তি নাই?

সুরেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, আপত্তি নেই? শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি আপত্তি আছে। তুমি সমস্ত জগতের বরেণ্য পুজনীয় হিন্দুর সন্তান হয়ে কিনা একটা রমণীর মোহে জাত দেবে? মোহ! একবার তার জুতো-মোজা শৌখীন পোশাক ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রাঙ্গা শাড়িখানি পরিয়ে দেখ দেখি, মোহ কাটে কি না! তখন ঐ নির্জীব কাঠের পুতুলটার রূপ দেখে তোমার ভুল ভাঙ্গে কি না! কি আছে তার? কি পারে সে? বেশ ত, তোমার যদি সেলাই আর পশমের কাজই এত দরকার, কলকাতা শহরে দরজীব ত অভাব নেই। একখানা চিঠির ঠিকানা লেখবার জন্য ত তোমাকে ব্রাহ্মমেয়েব স্বাবস্থ হতে হবে না। তোমার অসময়ে সে কি বাটনা বেটে, কুটনো কুটে তোমাকে একমুঠো ভাত রেঁধে দেবে? রোগে তোমার কি সেবা কববে? সে শিক্ষা কি তাদের আছে? ভগবান না করুন, কিন্তু সে দুঃসময়ে সে যদি না তোমাকে ছেড়ে চলে আসে ত আমার সুরেশ নামের বদলে যা ইচ্ছে বলে ডেক, আমি দুঃখ কবব না।

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ পুনরায় কহিতে লাগিল মহিম, তুমি ত জান আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনো ভুলেও অমঙ্গল কামনা করতে পারিনে। আমি অনেক ব্রাহ্ম মহিলা দেখেছি। দু একটি ভালও যে দেখিনি, তা নয়; কিন্তু আমাদের হিন্দুঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁদের তুলনাই হয় না। তোমার বিবাহই যদি প্রার্থিত হয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আচ্ছা, যা হবার হয়েছে, আর তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই। আমি কথা দিচ্ছি, এক মাসের মধ্যে তোমাকে এমন কন্যা দেখে দেব যে জীবনে কখনো দুঃখ পেতে হবে না, যদি না পারি, তখন না হয় তোমার যা ইচ্ছা করো—এর শ্রীচরণেই মাথা মুড়িও, আমি বাধা দেব না; কিন্তু এই একটা মাস তোমাকে ধৈর্য ধরে আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হবে। বল রাখবে?

মহিম পূর্ববৎ মৌন হইয়া রহিল—হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না। কিন্তু বন্ধু যে বন্ধুর শুভকামনায় কিরূপ মর্মান্তিক বিচলিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিল।

সুরেশ কহিল, মনে করে দেখ দেখি মহিম, ব্রাহ্ম না হয়েও তুমি যখন প্রথম ব্রাহ্ম-

মন্দিরে যাতায়াত শুরু করলে, তখন কি তোমাকে বারংবার নিষেধ করিনি? তোমার জন্যে এত বড় এই কলকাতা শহরের মধ্যে কি একটাও হিন্দু-মন্দির ছিল না যে, এই কপটতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল? এমনিভাবে একটা-না-একটা বিড়ম্বনার ভেতরে যে অবশেষে জড়িয়ে পড়বে, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম।

মহিম এবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, তা যেন করেছিলে, কিন্তু আমি ত তা করি নাই যে, আমার যাওয়ার মধ্যে কপটতা ছিল। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরেশ, তুমি ত নিজে ভগবান পর্যন্ত মান না, যে হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা মানবে! আমি ব্রাহ্মের মন্দিরেই যাই, আর হিন্দুর মন্দিরেই যাই তাতে তোমার কি আসে যায়?

সুরেশ দৃপ্তস্বরে কহিল, যা নেই, তা আমি মানিনে। ভগবান নেই, ঠাকুর-দেবতা মিছে কথা। কিন্তু যা আছে, তাদের ত অস্বীকার করিনে। সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, মানুষকে পূজা করি। আমি জানি, মানুষের সেবা করাই মনুষ্যজন্মের চরম সার্থকতা। যখন হিন্দুর বংশে জন্মেছি, তখন হিন্দুসমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ। আমি প্রাণান্তে তোমাকে ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করে ব্রাহ্মের দল-পুষ্টি করতে দেব না। কেদার মুখুয্যের মেয়েকে বিবাহ করবে বলে কি কথা দিয়েছ?

না, কথা যাকে বলে, তা এখনও দিইনি।

দাওনি ত! বেশ! তবে চুপ করে বসে থাক গে, আমি এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

আমি বিবাহের জন্য পাগল হয়ে উঠেছি তোমায় কে বললে? তুমিও চুপ করে বসে থাক গে, আর কোথাও বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? কি করেছ? এই স্ত্রীলোকটাকে ভালবেসেছ?

আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বল সুরেশ।

সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে আমি জানি, আমাকে শেখাতে হবে না। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বয়স কত জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

জানি না।

জান না? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা আরও বেশী—কিছুই জান না?

না।

তোমার চেয়ে ছোট, না বড়—তাও বোধ করি জান না?

না।

যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলেছেন, তখন নিতান্ত কচি হবেন না—অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কি বল?

না। তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার এখন একটু কাজ আছে সুরেশ, একবার বাইরে যেতে চাই।

সুরেশ কহিল, বেশ ত মহিম, আমারও এখন কিছু কাজ নেই,—চল, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।

দুই বন্ধুই পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলার পর সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, তোমাকে আজ যে ইচ্ছে করেই ব্যথা দিলাম, এ কথা বোধ করি বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই?

মহিম কহিল, না।

সুরেশ তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন দিলাম মহিম?

মহিম হাসিল। কহিল, পূর্বেরটা যদি না বুঝালেও বুঝে থাকি, আশা করি, এটাও তোমাকে বুঝাতে হবে না।

তাহার একটা হাত সুরেশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। সুরেশ আর্দ্রচিত্তে তাহাতে ঈষৎ একটু চাপ দিয়া বলিল, না মহিম, তোমাকে বুঝাতে চাই না। সংসারে সবাই ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তবুও আজ আমি তোমার মুখের উপরেই বলচি, তোমাকে আমি যত ভালবেসেছি, তুমি তার অর্ধেকও পারনি। তুমি গ্রাহ্য কর না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু ক্লেশও আমি কোনদিন সইতে পারি না।

ছেলেবেলায় এই নিয়ে কত ঝগড়া হয়ে গেছে, একবার মনে করে দেখ। এখন এতকাল পরে যাঁর জন্য আমাকেও পরিত্যাগ করছ মহিম, তাঁকে নিয়েই জীবনে সুখী হবে যদি নিশ্চয় জানতাম, আমার সমস্ত দুঃখ আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারতাম, কখনও একটা কথা কইতাম না।

মহিম কহিল, তাঁকে নিয়ে সুখী না হতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করব কেমন করে জানলে?

তুমি কর বা না কর, আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

কেন? আমি ত তোমার ব্রাহ্মবন্ধু হতেও পারতাম!

না, কোনমতেই না। ব্রাহ্মদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—আমার ব্রাহ্মবন্ধু একটিও নেই।

তাদের দেখতে পার না কেন?

অনেক কারণ আছে। একটা এই যে, যারা আমাদের সমাজকে মন্দ বলে ফেলে গেছে, তাদের ভাল বলে আমি কোনমতেই কাছে টানতে পারি না। তুমি ত জান, আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থাক, আমার তারা শত্রু।

মহিম মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; কহিল, এখন কি করতে বল তুমি?

সুরেশ কহিল, তাই ত এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত বলচি।

আচ্ছা, আরও একবার বল।

এই যুবতীটির মোহ তোমাকে যেমন করে হোক কাটাতে হবে। অন্ততঃ একটা মাস দেখা করতে পারবে না।

কিন্তু তাতেও যদি না কাটে? যদি মোহের বড় আরও কিছু থাকে?

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, ও-সব আমি বুঝি না মহিম। আমি বুঝি, তোমাকে ভালবাসি; এবং আরও কত বেশী ভালবাসি আমার আপনার সমাজকে। তবে একটিবার ভেবে দেখ, তোমার ছেলেবেলার সেই বসন্তের কথাটা, আর মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকা ডুবে যখন দুজনেই মরতে বসেছিলাম। বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিলাম বলে আমাকে মাপ করো মহিম। আমার আর কিছু বলবার নেই, আমি চললাম। বলিয়া সুরেশ অকস্মাৎ দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটা ছিল তেমনি কোমল, তেমনি স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় কখনো একটা মশামাছি পর্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মারোয়াড়ীদের দেখাদেখি কতদিন সে পকেট ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া, স্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায় গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার যে মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য কি করিয়া যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। অথচ তাহার গায়ের জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান—এই-সব দেখিয়াই সে তাহার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এমনি বাড়িয়া ওঠে যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। মহিম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, এই চারিটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসে এবং স্বগ্রামস্থ একজন মুদীর দোকানে থাকিয়া স্কুলে ভর্তি হয়। এই সময় হইতেই সুরেশ অনেকপ্রকারে বন্ধুকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; কিছুতেই তাহাকে রাজী করাইতে পারে নাই। এইখানে

থাকিয়াই মহিম কোনদিন আধপেটা খাইয়া, কোনদিন উপবাস করিয়া এণ্ট্রান্স পাস করে। ইহার পরের ঘটনা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে সপ্তাহমধ্যে সুরেশ মহিমের দেখা না পাইয়া, তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কি একটা পর্ব উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বাসায় আসিয়া শুনিল, মহিম সেই যে সকালে বাহির হইয়াছে, এখনো ফিরে নাই। সে যে পটলডাঙ্গার কেদার মুখুয্যের বাটীতেই ছুটির দিনটা কাটাইতে গিয়াছে, সুরেশের তাহাতে সংশয়মাত্র রহিল না।

যে নির্লজ্জ বন্ধু তাহার আশৈশব সখ্যের সমস্ত মর্যাদা সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মোহে বিসর্জন দিয়া সাতটা দিনও ধৈর্য ধরিতে পারিল না—ছুটিয়া গেল, মুহূর্তের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের বহ্নি সুরেশের বুকের মধ্যে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিচার না করিয়াই, গাড়িতে উঠিয়া সোজা পটলডাঙ্গার দিকে হাঁকাইতে কোচম্যানকে হুকুম করিয়া দিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "ওরে বেহায়া! ওরে অকৃতজ্ঞ! তোর যে প্রাণটা আজ এই স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে ধন্য হয়েছিস, সে প্রাণটা তোর থাকত কোথায়? নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দুই-দুইবার কে তোকে ফিরিয়ে দিয়েছে? তার কি এতটুকু সম্মানও রাখতে নাই রে!"

কেদার মুখুয্যের বাড়ির গলিটা সুরেশের জানা ছিল, সামান্য দুই-একটা জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা গাড়ি ঠিক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতরণ করিয়া সুরেশ বেহারাকে প্রশ্ন করিয়া সোজা উপরে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নীচে ঢালা বিছানার উপর একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সুরেশ নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিল—আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমি মহিমের বাল্যবন্ধু।

বৃদ্ধ প্রতি-নমস্কার করিয়া চশমাটি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, বসুন।

সুরেশ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, মহিমের বাসায় এসে শুনলাম, সে এখানেই আছে; তাই মনে করলাম, এই সুযোগে মহাশয়ের সঙ্গেও একবার পরিচিত হয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য—আপনি এসেছেন। কিন্তু মহিমও এদিকে দশ-বার দিন আসেন নি। আমরা আজ সকালে ভাবছিলুম, কি জানি, তিনি কেমন আছেন।

সুরেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, কিন্তু তার বাসার লোক যে বললে—

বৃদ্ধ কহিলেন, আর কোথাও গেছেন বোধ হয়। যা হোক, ভাল আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলেম।

পথে আসিতে আসিতে সুরেশ যে-সকল উদ্ধত সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাদের ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার শান্তমুখে ধীর-মৃদু কথাগুলি তাহার ভিতরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে শীতল করিয়া দিল। তথাপি সে নিজের কর্তব্যও বিস্মৃত হইল না। সে মনে মনে এই বলিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ইনি যত ভালই হোন, ব্রাহ্ম ত বটে! সুতরাং ইঁহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম। ইঁহারা এমনি করিয়াই নির্বোধ ভুলাইয়া নিজেদের কাজ আদায় করিয়া লন। অতএব এই-সমস্ত শিকারী প্রাণীদের সম্মুখে কোনমতেই আত্মবিস্মৃত হইয়া কাজ ভুলিলে চলিবে না—যেমন করিয়াই হোক, ইঁহাদের গ্রাস হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিতে হইবে। সে কাজের কথা পাড়িল; কহিল, মহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নেই। যদি অনুমতি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথার আলোচনা করি।

বৃদ্ধ একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আপনার নাম আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

সুরেশ কহিল, মহিমের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

বৃদ্ধ কহিলেন, হাঁ, সে একরকম স্থির বৈ কি।

সুরেশ কহিল, কিন্তু মহিম ত আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত নয়। তবুও বিবাহ দেবেন?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা সে কথা এখন থাক। কিন্তু তার কিরূপ সঙ্গতি, স্ত্রী-পুত্র

প্রতিপালন করবার যোগ্যতা আছে কি না, পাড়াগাঁয়ে বিরুদ্ধ হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গা মেটেবাড়ির মধ্যে আপনার কন্যা বাস করতে পারবেন কিনা, না পারলে তখন মহিম কি উপায় করবে, এই-সকল চিন্তা করে দেখেছেন কি?

বৃদ্ধ কেদার মুখুয্যে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কৈ, এ-সকল ব্যাপার ত আমি শুনিনি। মহিম কোন দিন ত এ-সব কথা বলেন নি?

সুরেশ কহিল, কিন্তু আমি এ-সকল চিন্তা ক'রে দেখেছি, মহিমকে বলেছি এবং আজ এই-সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্যেই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনার কন্যার বিষয় আপনি চিন্তা করবেন; কিন্তু আমার পরম বন্ধু যে এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অসহ্য ভারে চিরদিন জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন, সে ত আমি কোনমতেই ঘটতে দিতে পারিনে।

কেদারবাবু পাংশুমুখে কহিলেন, আপনি বলেন কি সুরেশবাবু?

বাবা! —একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

কে, অচলা? এস মা, বস। লজ্জা কি মা; ইনি আমাদের মহিমের পরম বন্ধু।

মেয়েটি একটুখানি অগ্রসর হইয়া হাত তুলিয়া সুরেশকে নমস্কার করিল। সুরেশ দেখিল, মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে পাতলা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত মুখের ডৌলটিই অতিশয় সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ-দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির-বুদ্ধির আভা। নমস্কার করিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল। সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, মহিমের ব্যাপারটা শুনেছ মা? আমরা ভেবে মরছিলাম, সে আসে না কেন? ঐ শোন! ইনি পরম বন্ধু বলেই ত কষ্ট করে জানাতে এসেছিলেন, নইলে কি হত বল ত? কে জানত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী। তার পাড়াগাঁয়ে শুধু একটা মেটে ভাঙ্গা-বাড়ি। তোমাকে খাওয়াবে কি—তার নিজেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান নেই। উঃ—কি ভয়ানক! এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল, আঁ!

কথা শুনিয়া অচলার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, কিন্তু সুরেশের মুখের উপরেও কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সে নির্বাক কাঠের পুতুলের মত মেয়েটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেশের একবার মনে হইল, তাহার নিষ্ঠুর সত্য অচলার বুকের ভিতর গিয়া যেন গভীর হইয়া বিঁধিল, কিন্তু পিতা সেদিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। বরঞ্চ কন্যাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, সুরেশবাবু, আপনি যে প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য করতে এসেছেন, এ কথা আমরা কেউ যেন ভ্রমেও না অবিশ্বাস করি। হোক না অপ্রিয়, হোক না কঠোর, কিন্তু তবুও এই যথার্থ ভালবাসা। মা যখন তাঁর পীড়িত শিশুকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে কি তাঁর কঠোর ঠেকে না? কিন্তু তবুও ত সে কাজ তাঁকে করতে হয়! সত্য বলচি সুরেশবাবু! মহিম যে আমাদের প্রতি এত বড় অন্যায় করতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বছর-দুই পূর্বে সমাজে যখন তাঁর কথায় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ডেকে এনে অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সে কি এমনি করেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ—এত বড় প্রবঞ্চনা 'আমার জীবনে দেখিনি! বলিয়া কেদারবাবু ভিতরের আবেগে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সুরেশ এবং অচলা উভয়েই নীরবে এবং অধোমুখে বসিয়া রহিল। কেদারবাবু হঠাৎ একসময়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা অচলা, এ চলবে না। কোনমতেই না। সুরেশবাবু, আপনি যেমন কর্তব্য সকলের উপরে রেখে বন্ধুর কাজ করতে এসেছেন, আমিও সেই কর্তব্যকেই সুমুখে রেখে পিতার কাজ করব। অচলার সঙ্গে

মহিমের সম্বন্ধটা যতদূর অগ্রসর হয়েচে, তাতে যদি বিনা প্রমাণে আমার বাড়ির দরজা তার মুখের উপর বন্ধ করে দিই, ঠিক হবে না। সেইজন্য একটা প্রমাণ চাই। আপনি মনে করবেন না সুরেশবাবু, আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু এটাও আমার কর্তব্য। কি, মা অচলা! একটা প্রমাণ নেওয়া আমাদের উচিত কি না?

উভয়েই তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল, উচিত অনুচিত কোন মন্তব্যই কেহ প্রকাশ করিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, কিন্তু এ প্রমাণের ভার আপনারই উপর, সুরেশবাবু। মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা, কোন্ গ্রামে যে তার বাড়ি তাই আমরা জানিনে।

বেহারা আসিয়া জানাইল, নীচে বিকাশবাবু অপেক্ষা করিতেছেন।

সংবাদ শুনিয়া কেদারবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ ত তাঁর আসবার কথা ছিল না। আচ্ছা, বল গে আমি যাচ্চি। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আমাকে মিনিট-পাঁচেক মাপ করতে হবে—লোকটাকে বিদায় করে আসি। যখন এসেছে, তখন দেখা না করে ত নড়বে না। মা অচলা, সুরেশবাবুকে আমাদের পরম বন্ধু বলে মনে করবে। যা তোমার জানবার প্রয়োজন, এ'র কাছে জেনে নাও—আমি এলাম বলে। বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

তখন মুহূর্তকালের জন্য চোখাচোখি করিয়া উভয়েই মাথা হেঁট করিল। সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমরা উভয়ে আশৈশব বন্ধু। কিন্তু তার ব্যবহারে আপনাদের কাছে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

অচলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, তার জন্যে আপনার কোন লজ্জার কারণ নেই।

সুরেশ কহিল, আপনি বলেন কি! তার এই কপট আচরণে, এই পাষণ্ডের মত ব্যবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই ত আর কে পাবে বলুন দেখি? কিন্তু তখনই ত আমার বোঝা উচিত ছিল যে, সে যখনই আমাকেই আগাগোড়া গোপন করে গেছে, তখন ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছেই।

অচলা কহিল, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের। কিন্তু আপনি এ-সমাজের কোন লোকের কোন সংস্রবে থাকতে চান না বলেই বোধ করি তিনি আমাদের উল্লেখ আপনার কাছে করেন নি।

কথাটা সুরেশের ভাল লাগিল না। অচলা যে তাহারই মুখের উপর মহিমের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এ খবর আপনি মহিমের কাছে শুনেচেন আশা করি।

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তিনিই একদিন বলেছিলেন।

সুরেশ বলিল, আমার দোষের কথা সে বলতে ভোলেনি দেখচি।

অচলা ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ আর দোষের কথা কি? সকল মানুষের প্রবৃত্তি একরকমের নয়। যারা আপনাদের সংস্রব ছেড়ে চলে গেছে, তাদের যদি আপনাদের ভাল না লাগে ত আমি দোষের মনে করতে পারিনে।

এই উত্তরটা যদিচ সুরেশের মনের মত, এবং আর কোথাও শুনিলে হয়ত সে লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু এই সংযতবাদিনী তরুণী ব্রাহ্মমহিলার মুখ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাহার একান্ত বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়া আজ তাহার কিছুমাত্র আনন্দোদয় হইল না। বস্তুতঃ, এই-সব দলাদলির মীমাংসা শুনিতে সে কথাটা বলেও নাই। বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে ইহাও জানিতে চাহিয়াছিল, মহিমের মুখ হইতে তাহার আর কোন সদ্গুণের বিবরণ তাঁহার কানে গিয়াছে কিনা. অচলা বোধ করি এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অনুমান করিতে পারিল না। তাই প্রশ্নটার সোজা জবাব দিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনাদের প্রতি আমার সামাজিক বিদ্বেষ আছে কি না, সে আলোচনা মহিম করুক; কিন্তু তার ওপর আমার যে লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই, এ কথাটা আপনি আমার মুখ থেকেও অবিশ্বাস করবেন না। তবুও হয়ত আমি তার সাংসারিক প্রসঙ্গ এখানে তুলতে আসতাম না—যদি না সে আমার কাছে সেদিন সত্য কথাটা অস্বীকার করত।

অচলা সুরেশের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অবিচলিত-স্বরে কহিল, কিন্তু তিনি ত কখনই মিথ্যা বলেন না।

এইবার সুরেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মুখ দিয়া যে এমন শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বাহির হইতে পারে, ক্ষণকাল ইহা যেন ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তকালের জন্য। জীবনে সে সংযম শিক্ষা করে নাই, তাই পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রূক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চেয়ে তাকে আমি কম জানিনে। এখানে নিজেকে আবদ্ধ করে স্পষ্ট অস্বীকার করাটাকে আমি সত্যবাদিতা বলতে পারিনে।

অচলা তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তিনি ত এখানে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি।

সুরেশ কহিল, আপনার বাবা ত তাই বললেন। তা ছাড়া নিজের হীন অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন করাটাকেও ঠিক সত্যপ্রিয়তা বলা চলে না। স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করবার অক্ষমতা অপরের কাছে না হোক, অতঃপর আপনার কাছেও ত তার অকপটে প্রকাশ করা উচিত ছিল।

অচলা নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, আপনি যে এত করে তার দোষ ঢাকচেন, আপনিই বলুন দেখি, সমস্ত কথা পূর্বাহ্নে জানতে পারলে কি তাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে পারতেন?

অচলা তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার কাছে কোনপ্রকার জবাব না পাইয়া সুরেশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে, এই কলকাতা শহরে আপনাকে প্রতিপালন করবার তার সাধ্যও নেই, সংকল্পও নেই। তার সেই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গ্রামে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হিন্দুসমাজের মধ্যে সে যে আপনাকে একখানা অসচ্ছল ভাঙ্গা মেটে-বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে কথা কি আপনাকে তার বলা কর্তব্য নয়? এত দুঃখ আপনি সহ্য করতে প্রস্তুত কিনা, এও কি জিজ্ঞাসা করা সে আবশ্যক বিবেচনা করে না? বলিয়া উত্তরের জন্য চোখ তুলিয়া দেখিল, অচলা চিন্তিত, অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। জবাব না পাইলেও সুরেশ বুঝিল, তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। কহিল, দেখুন, আপনার কাছে এখন আমি সত্য কথাই বলব। আজ আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবার সংকল্প করেই শুধু এসেছিলুম—সে বিপদে না পড়ে, এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন দেখছি, তাকে বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে বাঁচানো আমার ঢের বেশী কর্তব্য। কারণ, তার বিপদ ইচ্ছাকৃত, কিন্তু আপনি ঝাঁপ দিচ্ছেন অন্ধকারে। এইমাত্র আপনার বাবা যখন আমাকেই প্রমাণ করবার ভার দিলেন, তখন মনে হয়েছিল, বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ভার আমি গ্রহণ করব না; কিন্তু এখন দেখচি, এ কাজ আমাকে করতেই হবে—না করলে অন্যায় হবে।

অচলা কহিল, কিন্তু তিনি শুনলে কি দুঃখিত হবেন না?

সুরেশ কহিল, উপায় নেই! যে লোক পাষণ্ডের মত আপনাকে এত বড় প্রবঞ্চনা করেচে, বন্ধু হলেও তার সুখ-দুঃখ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করিনে। কিন্তু বিপদ হয়েচে এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানিনে। কোন উপায়ে আজ যদি সেইটে মাত্র জানতে পাই, কাল সকালেই নিজে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব এবং সমস্ত প্রমাণ টেনে এনে আপনার বাবার সম্মুখে উপস্থিত করে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

অচলা কহিল, কিন্তু আপনি কেন এত কষ্ট করবেন? বাবাকে বলুন না, তিনি তাঁর বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে সমস্ত সংবাদ জেনে নিন। চব্বিশ পরগনার রাজপুর গ্রাম ত বেশী দূর নয়।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, রাজপুর! তা হলে গ্রামের নামটা যে আপনি জানেন দেখচি! আর কিছু জানেন?

অচলা সহজভাবে কহিল, আপনি যা বললেন, আমিও ঐটুকু জানি। রাজপুরের উত্তরপাড়ায় একখানি মেটে-বাড়ি আছে। ভিতরে দুটি-তিনেক ঘর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ—তাতে গ্রামের পাঠশালা বসে।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের সাংসারিক অবস্থা?

অচলা কহিল, সে বিষয়েও আপনি যা বললেন তাই। সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাতে কোনমতে দুঃখ-কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র।

সুরেশ কহিল, আপনি ত তা হলে সমস্তই জানেন দেখচি।

অচলা কহিল, এইটুকু জানি, কারণ এইটুকুই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আর আপনি ত জানেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

সুরেশ সমস্ত মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিল, যখন সমস্তই জানেন, তখন আপনাদের সতর্ক করতে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা বাহুল্য কাজ হয়েচে। দেখচি, আপনাকে সে ঠকাতে চায়নি।

অচলা কহিল, আমি কিছু কিছু জানি বটে, কিন্তু আপনি ত আমাকে জানাতে আসেন নি; আপনি যাঁকে জানাতে এসেছিলেন, তিনি এখনো জানেন না। তবে যদি বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাবাকে জানাতে পারি।

সুরেশ উদাসকণ্ঠে কহিল, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে গিয়ে মহিমকে সমস্ত কথা জানিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে আমি স্থির হতে পারব।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তার কি কিছু আবশ্যক আছে?

সুরেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, আবশ্যক নেই? না জেনে তার ওপর যে-সকল মিথ্যা দোষারোপ আজ করেচি, সে অপরাধ আমার কত বড়, আপনি কি মনে মনে তা বোঝেন নি? তাকে জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী কিছু বলতেই বাকী রাখিনি—এ-সকল কথা তার কাছে স্বীকার না করে কেমন করে আমি পরিত্রাণ পাব?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বরঞ্চ আমি বলি, এ-সবের কিছুই দরকার নেই সুরেশবাবু! মনে মনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যে চাওয়াই যে সকল সময়ে সবচেয়ে বড় জিনিস এ আমি স্বীকার করিনে। তিনি শুনতে পেলেই যখন ব্যথা পাবেন, তখন কাজ কি তাঁকে শুনিয়ে? আমি বাবাকেও বরঞ্চ নিষেধ করে দেব, যেন আপনার কথা তাঁকে না বলেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা। তার পরে অচলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেচি যে, মহিম কোন কারণেই এতটুকু ব্যথা না পায়, এই আপনার একমাত্র চেষ্টা। বেশ তাই হোক, আমি তাকে কোন কথাই বলব না। আজ তার সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠচে, তাও বলতে চাইনে, কিন্তু আপনাকে একটা কথা না বলে কিছুতেই বিদায় হতে পারচি নে।

অচলা স্নিগ্ধ চক্ষু-দুটি তুলিয়া কহিল, বেশ, বলুন।

সুরেশ কহিল, তার কাছে ক্ষমা চাইতে পেলুম না, কিন্তু আপনার কাছে চাইচি, আমায় মাপ করুন। বলিয়া সে হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিল।

ছি ছি, ও কি করেন! বলিয়া অচলা চক্ষের নিমিষে হাত-দুটি ধরিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, এ কি বিষম অন্যায় বলুন ত! বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

সুরেশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য স্পর্শ, সলজ্জ মুখের অপরূপ রক্তিম দীপ্তি চক্ষের পলকে তাহাকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। সে অচলার অবনত মুখের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, না, আমি কোন অন্যায় করিনি। বরঞ্চ আমার সহস্র-কোটি অন্যায়ের মধ্যে যদি কোন ঠিক কাজ হয়ে থাকে ত সে এই। আপনি ক্ষমা করলেই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যাবে।

অচলা কাতর হইয়া কহিল, আপনি অমন কথা কিছু বলবেন না। যাঁকে দু-দুবার মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেচেন—

তাও শুনেচেন?

শুনেচি। আপনার মত সুহৃৎ তাঁর আর কে আছে?

না, বোধ হয়, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সংবাদে আমরা দুজন—

অচলার মুখের উপর আবার একটুখানি রাঙা আভা দেখা দিল। সে কহিল, হাঁ,

বন্ধু। আপনি তাকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোন কাজই আমি অন্যায় বলে ভাবতে পারিনে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জা আপনি রাখবেন না—ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ করলে আপনার যদি তৃপ্তি হয়, আমি তাও বলতে রাজী ছিলুম, যদি না আমার মুখে বাধত।

আচ্ছা, কাজ নেই। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। মহিমের সঙ্গে হয়ত আবার কোনদিন আসতেও পারি। নমস্কার।

অচলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, নমস্কার। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই যে আসতে হবে, এর ত কোন মানে নেই।

সত্যি বলচেন?

সত্যি বলচি।

আমার পরম সৌভাগ্য। বলিয়া সুরেশ আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ-মন টলিতে লাগিল। আকাশের খর রৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। সে গাড়ি ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল; ইচ্ছা, কলিকাতার জনাকীর্ণ কোলাহলময় রাজপথের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়।

অচলার মুখ, অবয়ব, ভাষা, ব্যবহার—সমস্তই তাহার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ মনে পড়িয়া নিজেকে যেন ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে মুখে সৌন্দর্যের অলৌকিকত্ব ছিল না, কথায়, ব্যবহারে, জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির অপরূপত্ব কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই; তথাপি কেমন করিয়া যেন কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহা এতদিন কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই। পথে চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি অনুক্ষণ এই প্রশ্নই করিতে লাগিল—এ বিস্ময় কিসের জন্য? কিসে তাহাকে আজ এতখানি অভিভূত করিয়া দিয়াছে?

এই তরুণীর মধ্যে এমন কোন্ জিনিস আজ সে দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে আপনাকে আপনি দীন মনে করিয়াও তাহার সমস্ত অন্তরটা কি এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে! ঐ মেয়েটির সত্যকার কোন পরিচয়ই এখনো তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু সে যে বড়, অনেক বড়, তাহাকে লাভ করা যে-কোন পুরুষের পক্ষেই যে দুর্ভাগ্য নয়, এ সংশয় একটিবারও তাহার মনে উদয় হয় না কেন? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ এক সময়ে তাহার চিন্তার ধারা ঠিক জায়গাটিতে আঘাত করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, এই যে মেয়েটি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বয়সে, হয়ত সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও এই দণ্ড-কয়েকের আলাপেই তাহাকে এমন করিয়া পরাজিত করিয়া ফেলিল, সে শুধু তাহার অসাধারণ সংযমের বলে। তাই সে এত শান্ত হইয়াও এত দৃঢ়, এত জানিয়াও এমন নির্বাক। মহিমের সম্বন্ধে সে নিজে যখন প্রগল্‌ভের মত অবিশ্রাম বকিয়া গিয়াছে, তখন এই মেয়েটি অধোমুখে শুনিয়াছে, সহিয়াছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও চঞ্চল হইয়া তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, আপনাকে লঘু করে নাই। সর্বক্ষণই আপনাকে দমন করিয়াছে, গোপন করিয়াছে, অথচ কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। মহিমকে সে যে কতখানি ভালবাসে, তাহা জানিতে দিল না সত্য, কিন্তু তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা যে কিছুতেই তিলার্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে কথা কতই না সহজে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

এ বিদ্যা যে মহিমের কাছেই শেখা এবং ভাল করিয়াই শেখা, এ কথা সে সহস্রবার আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল; এবং তাহার নিজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই সংযম জিনিসটার একান্ত অভাব ছিল বলিয়া, ইহারই এতখানি প্রাচুর্য আর একজনের মধ্যে

দেখিতে পাইয়া তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ আপনা-আপনিই এই গৌরবময়ীর পদতলে মাথা নত করিয়া ধন্য বোধ করিল।

অনেক রাস্তা গলি ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, সুরেশ সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিল, মহিম চোখের উপর হাত চাপা দিয়া একটা কোচের উপর পড়িয়া আছে, উঠিয়া বসিয়া কহিল, এস সুরেশ।

এই যে! বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল।

মহিম কালেভদ্রে আসে। সুতরাং সে আসিলেই সুরেশের অভ্যর্থনা কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। মহিম মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, বাসায় ফিরে এসে শুনি, তুমি গিয়েছিলে। তাই মনে করলুম—

দয়া করে একবার দেখা দিয়ে আসি। না হে! কতদিন পরে এলে, মনে করতে পার?

মহিম হাসিয়া কহিল, পারি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি যে। বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গ্যাসের আলোকে সুরেশের মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান এবং কঠিন দেখাইতেছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্নিগ্ধস্বরে পুনরায় কহিল, তোমার রাগ হতে পারে, এ আমি হাজার বার স্বীকার করি সুরেশ। কিন্তু বাস্তবিক সময় পাইনে। আজকাল পড়াশুনার চাপও একটু আছে, তা ছাড়া সকালে-বিকালে গোটা-দুই টিউসনি—

আবার টিউসনি নেওয়া হয়েছে?

মহিম তাহার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে খুঁজেছিলে, বিশেষ কিছু দরকার ছিল কি?

সুরেশ কহিল, হুঁ। তুমি আজ না এলে আমাকে আবার কাল সকালে যেতে হত।

মহিম কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। সুরেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে তাহার পায়ের জুতাজোড়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি এর মধ্যে বোধ করি কেদারবাবুর বাড়িতে আর যাওনি?

মহিম কহিল, না।

কেন যাওনি, আমার জন্যে ত? আচ্ছা, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। তোমার ইচ্ছামত সেখানে যেতে পার।

মহিম হাসিল; যাব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেম বলে ত আমার মনে হয় না!

সুরেশ বলিল, না হয় ভালই, তবুও আমার তরফ থেকে যদি কোন বাধা থাকে ত সে আমি তুলে নিলুম।

এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ, সুরেশ?

তোমার কি মনে হয় মহিম?

চিরকাল যা মনে হয়, তাই।

সুরেশ কহিল, তার মানে আমার খামখেয়াল! এই না? তা বেশ, তোমার যা ইচ্ছে মনে করতে পাব, আমার আপত্তি নেই। শুধু যে বাধাটা আমি দিয়েছিলুম, সেইটেই আজ সরিয়ে দিলুম।

কিন্তু তার কারণ জিজ্ঞাসা কবতে পারি কি?

খেয়ালের কি কারণ থাকে যে, তুমি জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে বলতে হবে!

মহিম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিন্তু সুরেশ, তোমার খেয়ালের বশেই যে সমস্ত সংসার বাধা পড়বে, আব উঠে যাবে, এ হলে হয়ত ভালই হয়; কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে তা হয় না। তোমাব যেখানে বাধা নেই, আমার সেখানে বাধা থাকতে পারে।

তার মানে?

তার মানে, তুমি সেদিন ব্রাহ্মমহিলাদের সম্বন্ধে যত কথা বলেছিলে, আমি তা ভেবে দেখেচি। ভাল কথা, সেদিন বলেছিলে, এক মাসের মধ্যে আমার জন্য পাত্রী স্থির করে দেবে, তার কি হল?

সুরেশ মুখ তুলিয়া দেখিল, মহিম গাম্ভীর্যের আড়ালে তীব্র পরিহাস করিতেছে।

সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, আমি ত ভেবে দেখলুম মহিম, ঘটকালি করা আমার ব্যবসা নয়। তার পরে হাসিয়া কহিল, কিন্তু তামাশা থাক। এতদিন আমার মান রেখেচ বলে তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু আজ যখন আমার হুকুম পেলে, তখন কাল সকালেই একবার সেখানে যাচ্ছ ত?

না, কাল সকালে আমি বাড়ি যাচ্ছি।

কখন ফিরবে?

দশ-পনেরো দিনও হতে পারে, আবার মাস-খানেক দেরি হতেও পারে।

মাস-খানেক! না মহিম, সে হবে না। বলিয়া অকস্মাৎ সুরেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিমের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আর আমার অপরাধ বাড়িয়ো না মহিম, কাল সকালেই একবার যাও। তিনি হয়ত তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহিমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুরেশের আকস্মিক আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মমহিলা সম্বন্ধে এই সসম্ভ্রম উল্লেখে সে যেন বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে সুরেশ? কেদারবাবুর মেয়ে?

সুরেশ সহসা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, থাকতেও ত পারেন?

মহিম আবার কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে যে ইতিমধ্যে ব্রাহ্মবাড়িতে গিয়া অনাহূত পরিচয় করিয়াও আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার কোনমতেই মনে উদয় হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, না সুরেশ, আমি হার মানছি—তোমার আজকের মেজাজ বাস্তবিক আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মমেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, এ কথা তোমার মুখ থেকে বোঝা আমার দ্বারা অসম্ভব।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে কথা একদিন বুঝিয়ে দেব। তুমি বল, কাল সকালেই একবার দেখা দেবে?

না, কাল অসম্ভব। আমাকে সকালের গাড়িতেই যেতে হবে।

মিনিট-কয়েকের জন্যও কি দেখা দিতে পার না?

না, তাও পারিনে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল দেখি?

সে কথা আর একদিন বলব—আজ নয়। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা বলে আসতে পারি কি?

মহিম অধিকতর আশ্চর্য হইয়া কহিল, পার, কিন্তু তার ত কিছু দরকার নেই।

সুরেশ কহিল, না থাক দরকার—দরকারই সব নয়। আমার পরিচয় দিলে তাঁরা চিনতে পারবেন?

একজন নিশ্চয়ই পারবেন।

সুরেশ বলিল, তা হলেই যথেষ্ট। তোমার বন্ধু বলে চিনবেন ত?

মহিম বলিল, হাঁ।

সুরেশ এইবার একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর চিনবেন—তোমার একজন ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হিন্দুবন্ধু বলে? না?

মহিম বলিল, কিন্তু সেই ত তোমার প্রধান গর্ব সুরেশ!

সুরেশ বলিল, তা বটে। বলিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মহিম, আমি শুতে চললুম। বলিয়া অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরেশ মনে মনে অসংশয়ে অনুভব করিতেছিল যে, কথাটা মহিম যেমন করিয়াই উড়াইয়া দিক, সে তাহারই একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই এতদিন অচলার সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সে যত ভালই বাসুক, এখন পর্যন্ত সে একটা ব্রাহ্মমেয়ের কাছে তাহার শৈশবের বন্ধুকে খাটো করিতে পারে না, এমন কথা কাল শুনিলেও সুরেশের বুকখানা গর্বে দশ হাত ফুলিয়া উঠিবে। আজ কিন্তু তাহার নির্জন শয্যায় এ চিন্তা তাহাকে লেশমাত্র আনন্দ দিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, একদিন-না-একদিন হাসি-গল্পে উপহাসে পরিহাসে বিচিত্র হইয়া সমস্ত কথা অচলার কানে উঠিবে। সেদিন সুখের ক্রোড়ে বসিয়া সে তাহার স্বামীর এই অপদার্থ বন্ধুটার নিষ্ফল ঈর্ষার কোন তাৎপর্যই খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ হাসির ছলেও সে স্বল্পভাষিণী কোনদিন কোন প্রশ্নই তাহাকে করিবে না। হয়ত-বা, শুধু মনে মনে একটুখানি হাসিয়া বলিবে, এই লোকটা বন্ধুত্বের অতি-অভিমানে কত পণ্ডশ্রমই না করিয়াছে! ব্যর্থ আক্রোশে কত অন্তর্দাহেই না জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে!

রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না। যতবার ঘুম ভাঙিল, ততবারই এই-সকল তিক্ত চিন্তা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া গেল—পরের জন্য এমন উৎকট মাথাব্যথার রোগ কবে সারিবে সুরেশ?

সকালবেলা উঠিয়া সে দিনের কোন কাজে মন দিতে পারিল না এবং বেলা বাড়িতে না বাড়িতেই গাড়ি করিয়া কেদারবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহারা জানাইল, বাবু আলিপুর আদালতে বাহির হইয়া গিয়াছেন—ফিরিতে তিন-চার ঘণ্টা দেরি হইতেও পারে।

সুরেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দুইজনেই বেরিয়ে গেছেন?

প্রশ্নটা বেহারা বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ত আমি জানিনে বাবু।

সুরেশ মুশকিলে পড়িল। গৃহস্বামীর অবর্তমানে তাহার যুবতী কন্যার সম্বন্ধে কোন-প্রকার প্রশ্ন করা ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে শিষ্টতা-বিরুদ্ধ কি না, তাহা স্থির করিতে পারিল না, অথচ এই কন্যাটিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। চিন্তা করিয়া কহিল, তোমার বাবুর ফিরতে এত দেরি নাও হতে পারে ত? আমি এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেই দেখি।

বেহারা সুরেশকে বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইয়া বলিল, দিদিঠাকরুন বাড়ি আছেন, তাঁকে খবর দেব কি? বলিয়া উত্তরের জন্য চাহিয়া রহিল। অচলা এই ভদ্রলোকটির সুমুখে যে বাহির হন তাহা সে কালই দেখিয়াছিল।

সুরেশ অন্তরের আগ্রহাতিশয্য প্রাণপণে নিবারণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কহিল, তাঁকে আবার খবর দেবে? আচ্ছা দাও, ততক্ষণ না হয় তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কই।

বেহারা চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই অচলা পার্শ্বের দরজার পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম যে বাড়ি চলে গেল। এত করে বললুম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে—কিন্তু কোনমতেই কথা শুনলে না, এমন একটা—

অচলার মুখ মুহূর্তের জন্য সাদা হইয়া গেল। কিন্তু নমস্কার করিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, যাওয়া বোধ করি খুব বেশী দরকার, বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

নমস্কার করিতে দেখিয়া সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল; এবং নিজের অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে অচলার শান্ত ধীর কথাগুলি ওজন করিয়া শতগুণে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া বলিল, দরকার যাই হোক—সে এমন কি ভয়ানক হতে পারে যে, অন্ততঃ দু মিনিটের জন্য এসেও একবার আপনাকে সে বলে যেতে পারে না? আর যখন কবে ফিরবে, তার কোন ঠিকানা নেই, আপনিই

বলুন, বাড়িতেই বা তার আছে কে—যার অসুখের জন্যে তাকে এভাবে যেতে হয়? আমি ত মরে গেলেও এমন করে চলে যেতে পারতুম না।

অচলার মুখের উপর দিয়া একটা সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি খেলিয়া গেল। কহিল, আপনার এখনও কেউ হয়নি বলেই এ কথা বললেন; কিন্তু হলে ঠিক ওঁর মতই অবহেলা করে চলে যেতেন—এ আমি নিশ্চয় বলচি।

সুরেশ তাহার বসিবার চৌকির হাতলের উপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, কখ্‌খনো না। আমাকে আপনি চেনেন না, তাই এ কথা বলতে পারলেন; কিন্তু চিনলে পারতেন না।

অচলা কহিল, বেশ ত, এখন থেকে ত চিনতে পারব, আর কেউ হলে জানতেও পারব। কি বলেন?

সুরেশ কহিল, নিশ্চয়। এক শ'বার। তা ছাড়া মহিমের মত আমি বন্ধুর কাছে কোন কথা গোপন করে রাখতেও পারিনে, রাখা ভালও মনে করিনে; বলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি বলচেন, হলে জানতে পারবেন, কিন্তু আমি বলচি যে, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার মত না নিয়ে এ-সব কখনো হবেই না; কারণ আপনাকে মহিমের সঙ্গে পৃথক করে দেখবার সাধ্য আর আমার নেই। আপনারা আমার কাছে আজ অভিন্ন।

অচলা সলজ্জ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে যাচাই করার শুভদিন না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু আপনার বন্ধুকে দোষী করতে পারব না সুরেশবাবু।

সুরেশ সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যাচাই করবার শুভদিন এ জন্মে ঘটবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে যাক। আজ সকালেই কেন আপনাদের কাছে এসেছি জানেন? কাল রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি—না এলে আজও পারব না তাও জানতুম। আমি অনেক অপরাধ করেছি—তার সমস্ত একটি একটি করে আজ আপনার কাছে স্বীকার করে আমি যাব। আমি তাই এসেছি।

তাহার প্রবল বিরুদ্ধতা অচলার অবিদিত ছিল না। তাই সে শঙ্কিত-মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি মহিম বসে আছে। ভাল কথা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আমি ব্রাহ্মদের দু'চক্ষে—অর্থাৎ কিনা, ব্রাহ্ম-সমাজটাকে আমি তেমন ভাল মনে করিনে।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমি জানি।

সুরেশ বলিতে লাগিল, জানবেন বৈ কি। কিন্তু এ কথাটাও ভুলবেন না যে, আমি তখন আপনাকে চিনতুম না। তাই মহিমকে অনুরোধ করি, সে যেন অন্ততঃ একটা মাস এখানে না আসে। কেন জানেন?

অচলা পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তবে বোধ হয়, আপনি ভেবেছিলেন পুরুষ-মানুষের ভুলতে একটা মাসই যথেষ্ট সময়। তবে বেশী বিলম্ব হওয়া সঙ্গত নয়।

আঘাতটা সুরেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, আমি চিরদিনই নির্বোধ। হয়ত এমনই কিছু একটা মনে করে থাকব। তা ছাড়া আরও একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে আমার ছিল। আমি শপথ করেছিলুম, এই একটা মাসের মধ্যেই আর কোথাও পাত্রী স্থির করে মহিমের বিয়ে দেব। যেমন করেই হোক তাকে আটকাতে হবে। আমার বন্ধু হয়ে সে যে একটা নারীর মোহে নিজেদের সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, এ যেন কিছুতেই না ঘটতে পায়।

অচলা রুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, তার পরে?

তাহার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া সুরেশ একটুখানি হাসিল; কহিল, তার পরে আর ভয় নেই। এ পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি, আজ সেই কথাই আমি স্বীকার করে যাব। আপনাকে দেখা দেবার জন্যে কাল রাত্রে তাকে অনেক অনুরোধ করেচি। একদিন আমার অনুরোধটা সে রেখেছিল, কিন্তু কালকের অনুরোধটা রাখলে না—আপনাকে দেখা না দিয়েই সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, যাবার কোন কারণ দেখিয়েছিলেন?

সুরেশ কহিল, না। দরকার আছে—এই মাত্র।

অচলা আর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল—দরকার! দরকার! চিরকাল তাঁর মুখে এই কথাই শুনে আসছি—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্বস্ব!

সুরেশ কহিল, একটা চিঠি লিখেও ত সে আপনাকে জানাতে পারত।

অচলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না। চিঠি তিনি লেখেন না।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল ; বলিল, কি প্রয়োজন, তাও কখনো বলে না। তার সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর! কখনো কাউকে তার ভাগ দিলে না। এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলেবেলা থেকে আমাকে দিয়ে এসেছে, বোধ করি, তার সীমা নেই। নিষ্ঠুর! দিনের পর দিন নিজে উপোস করে, আমার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা তিক্ত বিষাক্ত করেচে—কিন্তু কখনো কোনদিন আমার মুখ চেয়েও আমার হাত থেকে কিছু নেয়নি। আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন? বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ-দুটো অশ্রুজলে ঝকঝক করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন, আমার বাইরেটা ভারী শক্ত দেখতে, কিন্তু ভিতরটা তেমনি দুর্বল। মহিমের ঠিক তার উলটো—তবু আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।

অচলা নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল, সে আমি জানি সুরেশবাবু, এবং আরও জানি যে, সে বন্ধুত্ব আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।

শৈশবের সমস্ত পূর্বস্মৃতি সুরেশের বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যখন জানেনই, তখন এই ভিক্ষা আজ আমাকে দিন যে, অজ্ঞানে যে শত্রুতা আপনাদের করেচি, সে অপরাধ আর যেন আমার বুকে না বেঁধে।

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং এই একান্ত ব্যাকুলতায় অচলার নিজের অন্তরটাও যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়াই দেখিল, তাহার পিতা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কেদারবাবু সুরেশকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে সুরেশবাবু!

সুরেশ দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

কেদারবাবু আসন গ্রহণ না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিমের খবর কি? তাকে ত দেখচি নে!

সুরেশ বলিল, মহিম অত্যন্ত প্রয়োজনে সকালের গাড়িতেই বাড়ি চলে গেল—এই খবর জানাবার জন্যেই আমি এলুম।

কেদারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বাড়ি চলে গেল! বলিয়াই সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, সে বাড়ি যাক, থাক, আমাদের তাতে আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি বাবা সুরেশ যখন সময় পাবে বাড়ির ছেলের মত এখানে এসো, যেয়ো—আমার বড় আনন্দ হবে—কিন্তু তোমার সেই মিথ্যাচারী বন্ধুরত্নটি যেন আর কখন এ বাড়িতে মুখ না দেখায়। দেখা হলে বলে দিও তার আর কোন লজ্জা না থাকে—অন্ততঃ অপমানের ভয়টা যেন থাকে।

সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া কেদারবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, না, না, সুরেশ, তোমার লজ্জা বোধ করবার ত এতে কোনই কারণ নেই। বরঞ্চ কর্তব্য করবার গৌরব আছে। তুমি বুঝতে পারছ না যে, কি বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছ এবং কতদূর পর্যন্ত আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমি কাল থেকে এই বড় আশ্চর্য হচ্ছি অচলা, সে লোকটা সুরেশের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কি করে, আর কি করেই বা এতদিন ধরে সেটা বজায় রেখেছিল। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, যে এ পারে, সে যে আমাদের মত দুটি নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে, এ বেশী কথা নয়, মানি, কিন্তু এও বড় অদ্ভুত যে, এই লোকটা বাস্তবিক কি, কেমন—এটুকু অনুসন্ধান করার কথাও আমার মত প্রবীণ বয়সের লোকের মনেও একটা দিন ওঠেনি। আশ্চর্য!

সুরেশ কথা কহিল না, কেদারবাবুর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্যন্ত পারিল না।

কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজের পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে বাবা; একটু বসো, আমি এইগুলো ছেড়ে আসি; বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুরেশ কহিল, আমার বেলা হয়ে গেছে। আজ যাই, আর একদিন আসব, বলিয়া ব্যস্ত হইয়াই উঠিয়া পড়িল এবং কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল এবং পরদিনও ঠিক এই সময়েই তাহার গাড়ির শব্দ নীচে আসিয়া থামিল।

কিন্তু ইহার পরদিনও আবার যখন তাহার গাড়ির শব্দ শুনা গেল, তখন বেলা হইয়াছে। পিতাকে স্নানাহারের তাগিদ দিয়া অচলা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আর উঠা হইল না, তিনি সুরেশকে সানন্দে আহ্বান করিয়া লইয়া গল্প শুরু করিয়া দিলেন।

সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়াই দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরে যখন উঠিতে গেল, তখন তাহার শুষ্ক রুক্ষ মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আজ অকস্মাৎ এক-নিমেষেই কেদারবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, এখনো ত তোমার স্নানাহার হয়নি সুরেশবাবু?

সুরেশ সহাস্যে কহিল, আমার আহার একটু বেলাতেই হয়।

কেদারবাবু তাহা কানেই লইলেন না, বলিতে লাগিলেন, এবং একনিমিষেই একেবারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন—অ্যাঁ, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি? না, আর এক মিনিট দেরি নয় সুরেশ! এইখানেই স্নান করে যা পারো খেয়ে নাও। মা অচলা, একটু তাড়া দাও—বেলা বারোটা বেজে গেছে। বেয়ারা,—ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতে করিতে তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

অচলা এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখনও কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। পিতা চলিয়া যাইবার পর আস্তে আস্তে বলিল, আপনি আমাদের এখানে কি কিছু খেতে পারবেন?

সুরেশ মুখ তুলিয়া অচলার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল আপনি কি বলেন?

আপনি কখনই ত ব্রাহ্ম-বাড়িতে খান না।

না, খাইনে। কিন্তু আপনি এনে দিলে খাবো। একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় ভাবছেন, আমি তামাশা করছি; কিন্তু তা নয়। আপনি হাতে করে দিলে আমি সত্যি খাবো: বলিয়া চাহিয়া রহিল।

এইবার অচলা একটুখানি মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল; কহিল, যথার্থই আমি ভেবেছিলুম আপনি ঠাট্টা করচেন। কাল পর্যন্তও যাদের বাড়িতে খেতে আপনার ঘৃণার অবধি ছিল না, আজ তাদেরই একজনের ছোঁয়া খেতে কি করে আপনার প্রবৃত্তি হবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছিনে সুরেশবাবু।

সুরেশ ম্লানমুখে ব্যথিতস্বরে কহিল, তবে এতক্ষণ পুরে কি এই ভেবে পেলেন যে, আপনার হাতে খেতে আমার ঘৃণা হবে?

অচলা বলিল, কিন্তু এই ভাবনাই ত স্বাভাবিক সুরেশবাবু। আপনার মত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের চিরদিনের বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কার হঠাৎ একদিনে অকারণে ভেসে যাবে, এইটেই কি ভাবতে পারা সহজ?

সুরেশ কহিল, না, সহজ নয়। কিন্তু অকারণে ভেসে যাচ্ছে—তাই বা ভাবচেন কেন? কারণ থাকতেও ত পারে, বলিয়া এমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল যে, জবাব দিতে গিয়া অচলা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কথাটায় সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা সে মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং একপ্রকারের হিংস্র আনন্দও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু সে বেদনা যে অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানাকে একেবারে ছাইয়ের মত শুষ্ক

করিয়া দিতে পারে—তা সে ভাবেও নাই, ইচ্ছাও করে নাই। তাই নিজেও ব্যথা পাইয়া কথাটাকে সহজ রহস্যালাপে পরিণত করিতে, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভেবেই দেখুন আপনার মত কঠোরপ্রতিজ্ঞ লোকও—

সুরেশ বলিল, হাঁ, ভেসে যায়। তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল ; কহিল, আপনি একটা দিনের কথা বলছিলেন—কিন্তু জানেন আপনি, একদিনের ভূমিকম্পে অর্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে? একটা দিন কম সময় নয়। বলিয়া আবার নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা ভীত হইয়া উঠিল। সুরেশের মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক পাণ্ডুরতা—কপালের শির-দুটো রক্তে স্ফীত, চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করিতেছে—যেন কি একটা সে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়!

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত স্নানাহার নাই—গতরাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নীচের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—

তাহার উন্মাদ ভঙ্গীতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, বেহারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশের যায় না। সে স্থানকালের অতীত। তুমি ভূমিকম্প দেখেচ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

অচলা ব্যাধভীত হরিণীর মত চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার স্নানের যোগাড়—, বলিয়া পা বাড়াইতে সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুড় হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিয়া তাহার আর্তকণ্ঠের অস্ফুট 'মা গো!' আহ্বান তাহার কম্পিত ওষ্ঠপুট ত্যাগ করিতে না করিতে সুরেশ তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চোখ তুলিয়া মূর্ছিত মায়ামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল এবং সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসা-দগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা স্তব্ধ তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে থাকিয়া সুরেশ আর একবার অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব করে দেখ -কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট? বলতে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন্ জাত, কোন্ ধর্ম কোন্ মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না!

ছেড়ে দিন—বাবা আসচেন, বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অচলা তাহার চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া শান্ত হইয়া বসিল এবং পরক্ষণেই কেদারবাবু ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, তাইত, একটু দেরি হয়ে গেল—আর এই বেয়ারা ব্যাটা যে থেকে থেকে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই। মা অচলা—ও কি রে, তোর কি কোন অসুখ করেছে? মুখ শুকিয়ে যেন একেবারে—

অচলা কোনমতে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন?

তবু মাথাধরা-টরা? যে গরম পড়েছে, তা—

না, আমি বেশ আছি বাবা, আমার কিছুই হয়নি।

কেদারবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভাল। মুখ দেখে আমার ভয় লেগে গিয়েছিল। তবে, তুমি একটু দেখ দেখি মা, যদি—

অচলা বলিল, বেশ ত বাবা, আমি এক মিনিটে সমস্ত যোগাড় করে দিচ্চি। কিন্তু

এইমাত্র আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম সুরেশবাবুকে—আমাদের এখানে নাওয়া-খাওয়া করতে তাঁর ত আপত্তি নেই?

কেদারবাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আপত্তি কেন থাকবে? না না সুরেশ, আমি ত তোমাকে বলেইছি যে, একদিনেই তোমাকে আমি ঘরের ছেলে মনে করেচি। এ বাড়ি তোমার নিজের বাড়ি। মেয়ের দিকে চাহিয়া সগর্বে কহিলেন, আর তাই যদি না হবে অচলা, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান ওঁকে পাঠাবেন কেন? কিন্তু আর দেরি ভাল হবে না বাবা, এসো আমার সঙ্গে—স্নানের ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই গে।

কিন্তু সেই যে সুরেশ, কেদারবাবু প্রবেশ করা পর্যন্ত মাথা হেঁট করিয়াছিল, কিছুতেই আর সে মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিল না।

অচলা বলিল, কাজ কি বাবা পীড়াপীড়ি করে। আমাদের ব্রাহ্ম-বাড়িতে খেতে হয়ত ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।

কেদারবাবু একেবারে মুসড়িয়া গেলেন। সুরেশ বড়লোকের ছেলে—স্বাধীন। ঘরের গাড়ি করিয়া যাতায়াত করে। তাহাকে খাওয়াইয়া মাখাইয়া যেমন করিয়া হোক আত্মীয় করা যে তাঁহার চাই-ই; হঠাৎ তাহার আনত মুখের একাংশে নজর পড়ায় কেদারবাবু বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ! একি হয়েছে সুরেশ? শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে! ওঠো, ওঠো—মাথায় মুখে জল দিতে আর এক মিনিট বিলম্ব করো না। বলিয়া হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর কোনমতেই কেদারবাবু এই রৌদ্রের মধ্যে সুরেশকে ছাড়িয়া দিলেন না। বিশ্রামের নামে সমস্ত দুপুরটা একটা ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে চোখ বুজিয়া কৌচের উপর পড়িয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের বাহিরে মধ্যাহ্ন-সূর্য আকাশে জ্বলিতে লাগিল, ভিতরে আত্মসংযমের আত্মগ্লানি ততোধিক ভীষণ তেজে সুরেশের বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া সমস্ত বেলাটা অন্তরে-বাহিরে পুড়িয়া আধমরা হইয়া যখন সে উঠিয়া বসিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। কেদারবাবু প্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকিয়া জোর করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—গরমটা একবার দেখচ সুরেশ! আমার এতটা বয়সে কলকাতায় কস্মিনকালেও এমন দেখিনি। বলি, ঘুমটুম একটু হয়েছিল কি?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, দিনের বেলায় আমি ঘুমোতে পারিনে।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আর পারা উচিতও নয়। ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। তবুও আমি তিন-চারবার উঠে উঠে দেখি, তোমার পাখাওয়ালা টানচে, না ঘুমোচ্চে। এরা এত বড় শয়তান যে, যে মুহূর্তে তুমি একটু চোখ বুজবে, সেই মুহূর্তেই সেও চোখ বুজবে। যা হোক, একটু সুস্থ হতে পেরেচ ত? আমি নিশ্চয় জানতুম—এ রোদে বাইরে বেরুলে আর তুমি বাঁচতে না।

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু ঘরের অন্যান্য জানালাগুলো একে একে খুলিয়া দিয়া, বসিবার চৌকিখানা কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়িমসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট করে মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল?

প্রশ্নটা সুরেশের পিঠের উপর যেন মর্মান্তিক চাবুকের বাড়ি মারিল। সে এমনি চমকিয়া উঠিল যে, কেদারবাবু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, নিষ্ঠুর কর্তব্য যে কি করে করতে হয়, সে শিক্ষা ত তুমিই আমাকে এতকাল পরে দিলে সুরেশ; এখন তোমার ত পেছুলে চলবে না বাবা।

এ ত ঠিক কথা। সুরেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, কিন্তু আপনার কন্যারও এ সম্বন্ধে মতামত নেওয়া চাই।

কেদারবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, চাই বৈ কি।

তিনি কি স্পষ্ট করে চিঠি লিখে দিতেই বলেন?

কেদারবাবু ইহার সোজা জবাবটা না দিয়া কহিলেন, তা একরকম তাই বৈ কি। এ-সব বিষয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাব করাটা সকলের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু সে ত বড় হয়েছে, রীতিমত শিক্ষাও পেয়েছে; এ-সকল ব্যাপার দিন থাকতে পরিষ্কার করে না নিলে এর পাগলামিটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, এ ত সে বোঝে। তাই ভাবচি, আজ রাত্রেই কাজটা সেরে ফেলব।

সুরেশ ম্লান হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'দিন চিন্তা করাও ত উচিত।

কেদারবাবু বলিলেন, এর ভেতরে চিন্তা করব আর কোন্‌খানে? ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না, সে নিশ্চয়—তখন এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, আমার উল্লেখ করাও কি প্রয়োজন?

কেদারবাবু হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো হয়েচি, এইটুকু বিবেচনাও কি আমার নেই মনে কর? তোমার নাম কোনদিনও কেউ তুলবে না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা আরামের নিশ্বাস পড়িল, কিন্তু সে আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই নিশ্বাসটুকু কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশের আরও দু-একটা আচরণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটা অনুমান খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ফেলিলেন; কহিলেন, মস্ত উপকার আমাদের যেমন তুমি করলে বাবা, কিন্তু এর চেয়েও বড় উপকার তোমার কাছে আমরা দু'জন প্রত্যাশা করচি। আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সে-রকম ব্রাহ্ম নয়। আর আমার মেয়ে ত তার মায়ের মত মনে মনে হিন্দুই রয়ে গেছে। সে আমাদের ব্রাহ্মগিরি-টির্রি একেবারেই পছন্দ করে না।

সুরেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার এই নীরব ঔৎসুক্য কেদারবাবু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাই, মেয়েকে আমি কিছুতেই চিরকাল আইবুড়ো রাখতে পারি না। এ বিষয়ে আমি তোমাদের মতই সম্পূর্ণ হিন্দুমতাবলম্বী। একটি সম্বন্ধ যেমন তোমা হতে ভেঙ্গে গেল সুরেশ, তেমনই আর একটি তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে বাবা।

সুরেশ কহিল, যে আজ্ঞে; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

তাহার মুখের ভাব পড়িতে পড়িতে কেদারবাবু সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন, সমাজে এই নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হবে দেখতে পাচ্চি। কিন্তু যত শীঘ্র পারা যায়, অচলার বিয়ে দিয়ে এই-সব আলোচনা থামিয়ে ফেলতে হবে। তবে একটা শক্ত কথা আছে, সুরেশ। বলিয়া একবার দরজার বাহিরে চাহিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিলেন, শক্ত হচ্চে এই যে, পাত্র রূপে-গুণে ভাল হলেই যে হিন্দুসমাজের মত তাকে ধরে এনে বিয়ে দিতে পারব, তা নয়। ও চিরকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, তাতে ওর অমতে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু মত সে কোন মতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'জনের মধ্যে এমন একটা কিছু—বুঝলে না সুরেশ?

কথাবার্তার মধ্যেই সুরেশ কতকটা যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রণয়-ইঙ্গিতটা যেন আর একবার নূতন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া দিল। দুপুরবেলায় তাহার নিজের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-নিবেদনের বীভৎস উৎকট আচরণ স্মরণ হওয়ায় নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা না হইয়া একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল, এবং সকালের যে খবরের কাগজখানা এতক্ষণ পায়ের কাছে মেজেতে পড়িয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের পাতাটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেদারবাবু ইহা দেখিতে পাইলেন, এবং এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং সুযোগ বুঝিয় একটা বড়রকম চাল চালিয়া দিলেন; কহিলেন, আমি বরাবর এই বড় একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আসচি সুরেশ, যে, কেন জানিনে, একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও এক-তিল বিশ্বাস হয় না, আর একটা মানুষকে হয়ত দু ঘণ্টা মাত্র কাছে পেলেই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্যন্ত সঁপে দিতে পারি। মনে হয়, যেন জন্মজন্মান্তরের আলাপ,—শুধু দু ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি। কতক্ষণেরই বা পরিচয় বল দেখি?

ঠিক এমান সময় অচলা ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশ মুহূর্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের প্রতি মনসংযোগ করিল।

বাবা, তুমি এ বেলা চা, না কোকো খাবে?

আমি কোকোই খাব মা।

সুরেশবাবু, আপনি চা খাবেন ত?

সুরেশ কাগজের দিকে চোখ রাখিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল, আমাকে চা-ই দেবেন।

আপনার পেয়ালায় চিনি কম দিতে হবে না ত?

না, আর পাঁচজন যেমন খায় আমিও তেমনি খাই।

অচলা চলিয়া গেল। কেদারবাবু তাঁহার ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র যোজনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এই দেখ না সুরেশ, আমার এই মা-টির জন্যেই এই বুড়োবয়সে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েচি, এ কথা তোমার কাছে ত গোপন রাখতে পারলুম না। নইলে, নিজের দুর্দশা-দুরবস্থার কাহিনী সহজে কি কেউ কখনো অপরের কানে তুলতে পারে! কখনও যা পারিনি, এত বন্ধুবান্ধব থাকতে সে কথা শুধু তোমার কাছেই বলতে কেন সঙ্কোচবোধ হচ্ছে না? এর কি কোন গূঢ় কারণ নেই মনে কর?

সুরেশ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, এ ভগবানের নির্দেশ—সাধ্য কি গোপন করি? আমাকে বলতেই হবে যে! বলিয়া চৌকির হাতলের উপর তিনি একটা চাপড় মারিলেন।

কিন্তু তাঁহার এই বিস্তৃত ভূমিকা সত্ত্বেও তাঁহার দুর্দশা-দুরবস্থাটা যে মেয়ের জন্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুরেশ আন্দাজ করিতে পারিল না। কেদারবাবু তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার অমন অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা নিছক প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও তিনি অবিচলিত ধৈর্যের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেলেও একমাত্র কন্যার শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যয়সংকোচ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, গুটি-পাঁচছয় ডিক্রী-জারির ভয়ে তাঁহার আহার-বিহার বিষময় এবং খুচরা ঋণের তাগাদায় জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিলেও তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। অথচ এই কলিকাতা শহরেই এমন অনেক আছেন যাঁহারা টাকাটা অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারেন।

একটুখানি থামিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে যে জানালুম—একটুকু দ্বিধা-সংকোচ হল না—একি শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ নয়? বলিয়া পরম ভক্তিভরে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

সুরেশের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না—সে বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না, বরঞ্চ তাহার মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া গেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঋণ কত?

কেদারবাবু বলিলেন, ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাকলে কি এ আবার একটা ঋণ! বড়জোর হাজার তিন-চার। তিনি আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এমনি সময়ে অচলা বেহারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু গরম কোকো এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া, হর্ষসূচক একটা অব্যক্ত নিনাদ করিয়া পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ সুরেশ, আমার ওপর ভগবানের এই একটা আশ্চর্য কৃপা আমি বরাবর দেখে আসচি যে, তিনি কখনো আমাকে অপ্রস্তুত করেন না। মহিমকে কথাটা বলি-বলি করেও যে কেন বলতে পারতুম না—তিনি বরাবর আমার যেন মুখ চেপে ধরতেন—এতদিনে সেটা বোঝা গেল। বলিয়া আর একবার কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহার অসীম দয়ার জন্য নমস্কার করিলেন।

সুরেশ তাহার পেয়ালাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, টাকাটা কবে আপনার প্রয়োজন?

কেদারবাবু মুখ হইতে কোকোর পেয়ালাটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, প্রয়োজন আমার ত নয় সুরেশ, প্রয়োজন তোমাদের। বলিয়া একটুখানি উচ্চ-অঙ্গের হাস্য করিলেন।

হে'য়ালিটা বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ মুখ তুলিয়া চাঁহিতেই দেখিল, অচলা জিজ্ঞাসু-মুখে পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি একবার কন্যার মুখে, একবার সুরেশের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, এর মানে বোঝা ত শক্ত নয়। বাড়িটা আমি ত সঙ্গে নিয়ে যাব না! যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদেরই দু'জনের থাকবে। বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

দু'জনের চোখাচোখি হইল, এবং চক্ষের পলকে উভয়েই আরক্তমুখে মাথা হে'ট করিয়া ফেলিল।

পেয়ালা-দুই কোকো নিঃশেষ করিয়া কেদারবাবুর একখানা জরুরী চিঠি লেখার কথা স্মরণ হইল। অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ তোমার খাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ল সুরেশ, কাল দুপুরবেলা এখানে খাবে, বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিম দিকের দরজা খুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

খোলা দরজা দিয়া অস্তোম্মুখ সূর্যের এক ঝলক রাঙ্গা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, অচলা তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—সেও দৃষ্টি অবনত করিল। মিনিট-দুই বড় ঘড়িটার খটখট শব্দ ছাড়া সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরে নীরবতা ভঙ্গ করিল সুরেশ, কহিল, হঠাৎ আচ্ছা একটা কাণ্ড করে বসলুম।

অচলা কথা কহিল না।

সুরেশ পুনরায় কহিল, আপনার নিশ্চয়ই আমাকে একটা রাক্ষস বলে মনে হচ্চে। একলা বসে থাকতে বোধ করি আপনার সাহস হচ্চে না, না? বলিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। অচলা এখনও মুখ তুলিল না; কিন্তু তুলিলে দেখিতে পাইত, সুরেশের ওই একান্ত চেষ্টার নিষ্ফল হাসিটা শুধু তাহার নিজের মুখখানাকেই বারংবার অপমানিত করিয়া লজ্জায় বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আবার সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং সেই দেওয়ালের গায়ের ঘড়িটাই শুধু খটখট করিয়া স্তব্ধতার পরিমাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে এই কঠিন নীরবতা যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুরেশ তাহার সমস্ত দেহটাকে ঋজু এবং শক্ত করিয়া কহিল, দেখুন যা হয়ে গেছে, তার পরে আমাদের মধ্যে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। বেলা গেল—আমি এবার যাব। কিন্তু তার আগে গোটা-দুই কথার জবাব শুনে যেতে চাই, দেবেন?

অচলা মুখ তুলিল। তাহার চোখ-দুটি ব্যথায় ভরা। কহিল, বলুন।

সুরেশ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনার বাবার দেনাটা পরিশোধ করে দিতে কাল-পরশু একবার আসব; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাই, আমাদের দু'জনের সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি আপনি জানেন?

অচলা কহিল, আমাকে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন না।

সুরেশ বলিল, আমাকেও না। তবুও বিশ্বাস, তিনি আমাকেই—কিন্তু আপনি বোধ করি রাজী হবেন না?

অচলা কহিল, না।

কোনদিন না?

অচলা দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, না।

কিন্তু, মহিমের আশা যদি না থাকে?

অচলা অবিচলিত-স্বরে কহিল, সে আশা ত নেই-ই।

সুরেশ প্রশ্ন করিল, বোধ করি, তবুও না?

অচলা মুখ তুলিল না, কিন্তু তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, তবুও না।

সুরেশ কৌচের পিঠে ঢলিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, এ দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁচা গেল। বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু আমি এই একটা মুশকিলের কথা ভাবচি যে, আপনার বাবার দেনাটা তা হলে শোধ হবে কি করে?

অচলা ভয়ে ভয়ে একটুখানি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত সংকোচের সহিত কহিল, আর ত আপনি দিতে পারবেন না?

পারব না? কেন? প্রশ্ন করিয়া সুরেশ তীক্ষ্ণ ব্যগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির সম্মুখে অচলা পুনরায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া সুরেশ হাসিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিতে আনন্দ না থাক, কৃত্রিমতাও ছিল না। কহিল, দেখুন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত আমার কোন আচরণকেই যে ভদ্র বলা যেতে পারে না, সে আমি নিজেও জানি; কিন্তু আমি অত ছোটও নই। আপনার বাবাকে আমি এই টাকাটা ঘুষ দিতে চাইনি, তাঁর বিপদে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। সুতরাং আপনার মতামতের ওপর আমার দেওয়াটা নির্ভর করচে না। নির্ভর করচে তাঁর নেওয়াটা। এখন কি করে যে তিনি নেবেন, আমি তাই ভাবচি। বরং আসুন, এ সম্বন্ধে আমরা একটা পরামর্শ করি।

অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, বলুন।

সুরেশ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকাকড়ির উপর কোনদিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার-চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাতছাড়া করতে পারি। আর আপনার সুখের জন্য ত আরও ঢের বেশি পারি। তা যাক। এখন কথা এই যে, আপনার বাবার ধারণা, এ টাকাটা শোধ দেবার আর আবশ্যক হবে না, অথচ সে একরকম শোধ দেওয়াই হবে। বুঝলেন না?

অচলা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, হাঁ।

সুরেশ বলিতে লাগিল, কথাটা স্পষ্ট বলছি বলে মনে কিছু করবেন না। বুঝতে পারচি, টাকাটা তাঁর চাই-ই, অথচ এত টাকা ধার নিয়ে শোধ করবার অবস্থা তাঁর নেই। যদিচ, আমার নিজের তরফ থেকে তার আবশ্যকও কিছুমাত্র নেই—আচ্ছা, এ ত সহজেই হতে পারে। পরশু পর্যন্ত আপনার মনের ভাব তাঁকে না জানালেই ত আর কোন গোল থাকে না। কেমন, পারবেন ত?

অচলা তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, টাকার লোভে আপনি যে মত দিলেন না, এতে আমার ঢের বেশী শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বরঞ্চ মত দিলেই হয়ত আমি শেষে ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়াতুম। আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আমি চললুম। বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার বলবার আর মুখ নেই—তবু যাবার সময় একটা ভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছি যে, আমার দোষ-অপরাধগুলো মনে করে রাখবেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, নমস্কার। খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে বিদায় হলুম—কিন্তু বাস্তবিক, পিশাচও আমি নই। যাক—বিশ্বাস করবার যখন এতটুকু পথ রাখিনি, তখন বলা বৃথা। বলিয়াই দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরে ধীরে তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল, অচলা শুনিতে পাইল; এবং তাহার পরেই নিতান্ত অকারণে তাহার দুই চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কেদারবাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, সুরেশ?

অচলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, এইমাত্র চলে গেলেন।

কেদারবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে কি, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল? কাল এখানে খাবার কথাটা তুমি যাবার সময় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে ত?

অচলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমার মনে ছিল না বাবা।

মনে ছিল না! বেশ! বলিয়া কেদারবাবু নিকটস্থ চৌকিটার উপর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িলেন। মেয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে তাঁহার মনের মধ্যে একবার একটা খটকা বাজিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে মুখের চেহারাটা দেখিতে না পাইয়া সেটা স্থায়ী হইতে

পারিল না। বলিলেন, এ বুড়ো বয়সে যা নিজে না করব, বৌদিকে না চাইব, তাতেই একটা-না-একটা গলদ থেকে যাবে—তাই হবে না। যাই বেয়ারাটাকে দিয়ে এখ্‌খুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিই গে। সুরেশের বাড়ির ঠিকানাটা কি? বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

আমি ত জানিনে বাবা!

তাও জান না! বল কি? বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারের উপর পুনরায় হেলান দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বসিয়া রুক্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, তোমরা নিজের হাত-পা যদি নিজেই কেটে ফেলতে চাও, ত কাটো গে মা, আমার ঠেকাবার দরকার নেই। ভাল, এটা ত একবার ভাবতে হয়, যে এককথায় এতগুলো টাকা দিতে চায়, সে লোকটা কি দরের? তার বাড়ির ঠিকানাটাও কি জিজ্ঞাসা করে রাখতে নেই? তুমি যত বড় হচ্ছ, ততই যেন কি-রকম হয়ে যাচ্ছ অচলা। বলিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ঋণ-জাল-বিজড়িত বিপন্ন পিতা তাঁহার যে-সকল অসত্য ও হীনতার মধ্য দিয়া সম্প্রতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন, সে-সমস্তই অচলা দেখিতে পাইত। এ-সকল তাহার মর্মভেদ করিত, কিন্তু নীরবে সহ্য করিত। এখনও সে কথা কহিয়া তাঁহার অকারণ বিরক্তির প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু সে যেন মনে মনে অতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে, কেদারবাবু ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিয়া প্রীত হইলেন।

বেয়ারা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিতে লাগিলেন, মহিমের সম্বন্ধে কোন খোঁজ কোনদিনই তুমি নিলে না। আচ্ছা, সে না হয় ভালই হয়েচে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু সুরেশের সম্বন্ধে ত এ-সব খাটতে পারে না। দেখলে না—ঈশ্বর স্বয়ং যেন হাত ধরে এঁকে দিয়ে গেলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশবাবুর কাছ থেকে কি তুমি টাকা ধার নেবে বাবা?

কেদারবাবুর ভগবদ্ভক্তি হঠাৎ বাধা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হাঁ—না, ঠিক ধার নয়; কি জান মা, সুরেশ নাকি বড় ভাল ছেলে—একালে অমন একটি সৎ ছেলে লক্ষর মধ্যে একটি মেলে। তার মনের ইচ্ছে যে, বাড়িটা ধারের জন্য না নষ্ট হয়। থাকলে তোমাদেরই থাকবে—আমি আর কতদিন—বুঝলে না, মা?

অচলা চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু উৎসাহভরে বলিতে লাগিলেন, জান ত, আমি চিরকাল স্পষ্ট কথা ভালবাসি। মুখে এক, ভিতরে আর—আমার দ্বারা হবার নয়। কাজেই খুলে বলে দিলাম যে, এখন সমস্ত জেনেশুনে মহিমের হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। সুরেশেরও যখন তাই মত, তখন বলতেই হল যে, তার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা অনেক দূর জানাজানি হয়ে গেছে, তখন সম্বন্ধ ভাঙলেই চলবে না—একটা গড়ে তুলতেও হবে; না হলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যাই বল ছেলে বটে এই সুরেশ! আমি মঙ্গলময়কে তাই বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

পিতার প্রণাম জানানো আর একবার নির্বিঘ্নে সমাধা হইবার পর অচলা ধীরে ধীরে কহিল, এঁর কাছ থেকে এত টাকা না নিলেই কি নয় বাবা?

কেদারবাবু শঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, না নিলেই যে নয় মা!

বেশ! কিন্তু আমরা ত শোধ দিতে পারব না।

শোধ দেবার কথা কি সুরেশ—কথাটা উদ্বিগ্ন-সংশয়ে বৃদ্ধ শেষ করিতেই পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত মুখ সাদা হইয়া গেল। অচলা সে চেহারা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল, তিনি বলছিলেন, পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবেন।

শোধ দেবার কথা—

না, তা তিনি বলেন নি।

লেখাপড়া-টড়া—

না, সে ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর একেবারে নেই।

ঠিক তাই! বলিয়া পরিতৃপ্তির রুদ্ধশ্বাস বৃদ্ধ ফোঁস করিয়া ত্যাগ করিলেন এবং চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া পা-দুটা সুমুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। আনন্দে এবং আরামে তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন ক্ষণকালের জন্য শিথিল হইয়া

গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পা নামাইয়া উদ্দীপ্ত-স্বরে কহিলেন, একবার ভেবে দেখ দিকি মা, কোথেকে কি হল! এই সর্বশক্তিমানের হাত কি এতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না? অচলা নীরবে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্চি, এ শুধু তাঁর দয়া। তোমাকে বলব কি মা, এই দুটো বৎসর একটা রাত্রিও আমি ভাল করে ঘুমাতে পারিনি —শুধু তাঁকে ডেকেচি। আর সুরেশকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, সে যেন পূর্বজন্মে আমার সন্তান ছিল।

অচলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা সে জানিত বেশ, কিন্তু তাহা এতটা দূর পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই জানিত না। আজ দুই বৎসরের একাগ্র আরাধনায় তাহার দুঃখের সমস্যা যদি বা মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার নিজের সমস্যা একেবারে ভীষণ জটিল হইয়া দেখা দিল। সুরেশের কাছে টাকা লওয়া সম্বন্ধে সে এইমাত্র মনে মনে যে-সকল সংকল্প করিয়াছিল, তাহা আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লেশমাত্র বাধা দিবার কথা সে আর মনে করিতে পারিল না। যাই হোক, টাকাটা তাহাদের গ্রহণ করিতেই হইবে।

সান্ধ্য-উপাসনার জন্য কেদারবাবু উঠিয়া গেলেন। অচলা সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য সেখানেই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কাহাকে? কে সে? যে মহিম তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে, কে জানে কোন্ কর্তব্যের আকর্ষণে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে, তাহার শান্ত স্থির মুখখানা মনে করিতেই একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে অচলার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোনদিন যে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ, 'যাও' বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ জীবনে, কোন সূত্র, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না। অচলা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, সেই অভাবনীয় চির-বিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য এক তিল বিচলিত হইবে না, কাহাকেও দোষ দিবে না, হয়ত কারণ পর্যন্তও জানিতে চাহিবে না—নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয়ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু সে ছাড়া আর কাহারো তাহা চোখেও পড়িবে না।

তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তার কানে উঠিবে। সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে হয়ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়াই নিজের কাজে মন দিবে। ব্যাপারটা কল্পনা করিয়া এই নির্জন ঘরের মধ্যেও তাহার চোখ-মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দিন দশ-বার কাটিয়া গিয়াছে। কেদারবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, এত স্ফূর্তি বুঝি তাঁহার যুবা বয়সেও ছিল না, আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিবার পথে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সুরেশ, আমি এইটুকু হেঁটে সমাজে যাব বাবা, তোমরা বাড়ি যাও; বলিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন।

সুরেশ কহিল, তোমার বাবার শরীরটা আজকাল বেশ ভাল বলে মনে হয়।

অচলা সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, হাঁ, সে আপনার দয়ায়।

গাড়ি মোড় ফিরিতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। সুরেশ অচলার ডান-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, তুমি জানো এ কথায় আমি কত ব্যথা পাই। সেই জন্যেই কি তুমি বার বার বল অচলা?

অচলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, এত বড় দয়া পাছে ভুলে যাই বলেই যখন তখন স্মরণ করি। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্য বলিনে।

সুরেশ তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, সেই জন্যই ব্যথা আমার বেশী বাজে।

কেন?

আমি বেশ বুঝতে পারি, শুধু এই দয়াটা স্মরণ করেই তুমি মনের মধ্যে জোর পাও। এ-ছাড়া তোমার আর এতটুকু সম্বল নেই. সত্যি কি না বল দিকি?

যদি না বলি?

ইচ্ছে না হয় বলো না। কিন্তু আমাকে 'তুমি' বলতেও কি কোনদিন পারবে না?

অচলার মুখ মলিন হইয়া গেল। আনত-মুখে ধীরে ধীরে বলিল, একদিন বলতেই হবে, সে ত আপনি জানেন।

তাহার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুরেশ নিশ্বাস ফেলিল। কহিল, তাই যদি হয়, দু দিন আগে বলতেই বা দোষ কি?

অচলা জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিনিট-খানেক নিঃশব্দে থাকিয়া সুরেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমার মনে হয়, মহিম সমস্তই জানতে পেরেছে।

অচলা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। তাহার একটা হাত এতক্ষণ পর্যন্ত সুরেশের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সেটা টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করে জানলেন?

তাহার ব্যগ্র কণ্ঠ সুরেশের কানে খট্ করিয়া বাজিল। কহিল, নইলে এতদিনে সে আসত। পনর-ষোল দিন কেটে গেল ত!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। আচ্ছা, বাবা কি তাঁকে কোন চিঠিপত্র লিখেছেন আপনি জানেন?

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, না, জানিনে।

তিনি বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন কি না জানেন?

না। তাও জানিনে।

অচলা গাড়ির বাহিরে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাহলে খোঁজ নিয়ে একখানা চিঠিতে তাঁকে সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোনদিন আবার না এসে উপস্থিত হন।

আবার কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ আর একবার তাহার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয়, আমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা পর্যন্ত করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে, শুধু টাকার জোরেই তোমাকে ছিঁড়ে এনেচি। আমার দোষ।

অচলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, এমন কথা আপনি বলবেন না—আপনার কোন দোষ দিতে পারিনে। একটু থামিয়া বলিল, টাকার জোর সংসারে সর্বত্রই আছে, এ ত জানা কথা; কিন্তু সে জোরে আপনি ত জোর খাটান নি। বাবা না জানতে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত জেনেশুনে যদি আপনাকে অশ্রদ্ধা করি, ত আমার নরকেও স্থান হবে না।

চিরদিন সামান্য একটু করুণ কথাতেই সুরেশ বিগলিত হইয়া যায়। অচলার এইটুকু প্রিয়বাক্যেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে জল, সে অচলার হাত দুখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতেই মুছিয়া ফেলিয়া বলিল মনে করো না, এ অপরাধ, এ অন্যায়ের পরিমাণ আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু আমি বড় দুর্বল। বড় দুর্বল! এ আঘাত মহিম সইতে পারবে—কিন্তু আমার বুক ফেটে যাবে। বলিয়া একটা কঠিন ধাক্কা যেন সামলাইয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যে আমার নও, আর একজনের, এ কথা আমি ভাবতেই পারিনে। তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত যেন টলতে থাকে।

সেইমাত্র পথের ধারে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। গাড়ি তাহাদের গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপর পড়িয়া তাহার দুই চক্ষের টলটলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল। মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।

সুরেশ অচলার সেই হাতটি নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বারংবার চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার অচলা, এর বেশি আর চাইনে। কিন্তু, এটুকু থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত ক'রো না।

গাড়ি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া উভয়েই এক সঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখে মহিম দাঁড়াইয়া এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, সুরেশ, তুমি যে এখানে?

সুরেশের গলা দিয়া প্রথমে কথা ফুটিল না। তার পরে সে একটা ঢোক গিলিয়া পাংশুমুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, বাঃ—মহিম যে! আর দেখা নেই! ব্যাপার কি হে? কবে এলে? চল চল ওপরে চল। বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া হাসির ভঙ্গীতে কহিল, আচ্ছা মজা করলেন কিন্তু আপনার বাবা। তিনি গেলেন সমাজে, আর পৌঁছে দেবার ভার পড়ল এই গরীবের ওপরে। তা একরকম ভালই হয়েচে—নইলে মহিমের সঙ্গে হয়ত দেখাই হত না। বাড়িতে এতদিন ধরে করছিলে কি বল ত শুনি?

মহিম কহিল, কাজ ছিল। বিস্ময়ের প্রভাবে তাহার অচলাকে একটা নমস্কার করিবার কথাও মনে হইল না।

সুরেশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, আচ্ছা লোক যা হোক! আমরা ভেবে মরি, একটা চিঠি পর্যন্ত দিতে নেই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওপরে চল। বলিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই উপরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কিন্তু বসিবার ঘরে আসিয়া যখন সকলে উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একেবারে থামিয়া গেল। গ্যাসের তীব্র আলোকে মুখখানা তাহার কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন কেহই কথা কহিল না।

মহিম একবার বন্ধুর প্রতি একবার অচলার প্রতি শূন্য দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সব ভাল?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না।

মহিম কহিল, আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছি—কিন্তু সুরেশের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হল কি করে?

অচলা মুখ তুলিয়া, ঠিক যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ করে দিয়েছেন। তাহার মুখ দেখিয়া মহিমের নিজের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তার পরে?

তার পরে তুমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, বলিয়া অচলা ত্বরিতপদে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া কহিল, ব্যাপার কি সুরেশ?

সুরেশ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, তোমার মত আমার টাকাটাই প্রাণ নয়। ভদ্রলোক বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে আমি দিই—বাস্, এই পর্যন্ত। তিনি শোধ দিতে না পারেন ত আশা করি, সে দোষ আমার নয়। তবু যদি আমাকেই দোষী মনে কর ত এক শ-বার করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।

বন্ধুর এই অসংলগ্ন কৈফিয়ত এবং তাহা প্রকাশ করিবার অপরূপ ভঙ্গী দেখিয়া

মহিম যথার্থই মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, হঠাৎ তোমাকেই বা দোষী ভাবতে যাব কেন, তার কোন তাৎপর্যই ত ভেবে পেলুম না সুরেশ। দয়া করে আর একটু খুলে না বললে বুঝতে পারব না।

সুরেশ তেমনি রুক্ষস্বরে কহিল, খুলে আবার বলব কি! বলবার আছেই বা কি!

মহিম কহিল, তা আছে। আমি সেদিন যখন বাড়ি যাই, তখন এদের তুমি চিনতে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলই বা কি করে, আর একটা ব্রাহ্ম-পরিবারের বিপদে চার হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে, আপাততঃ এইটুকু বুঝিয়ে দিলেই আমি কৃতার্থ হব সুরেশ!

সুরেশ বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু আমার গল্প করবার এখন সময় নেই—এখুনি উঠতে হবে। তা ছাড়া, কেদারবাবুকেই জিজ্ঞাসা করো না, তিনি সমস্ত বলবার জন্যেই ত অপেক্ষা করে আছেন।

তাই ভাল, বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, শোনবার ভারী কৌতূহল ছিল, কিন্তু তবু এখন তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকবার সময় নেই। আমি চললুম—

সুরেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

মহিম বাহিরে আসিতে দেখিতে পাইল, সুমুখের রেলিং ধরিয়া, এই দিকে চাহিয়াই অন্ধকারে অচলা দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে কাছে আসিবার বা কথা কহিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না দেখিয়া সে-ও নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরী ঔষধ কিনিতে মহিম কলিকাতায় আসিয়াছিল, সুতরাং রাত্রের গাড়িতেই বাড়ি ফিরিয়া গেল। সুরেশ সন্ধান লইয়া জানিল, মহিম তাহার বাসায় আসে নাই, দিন-চারেক পরে বিকালবেলায় কেদারবাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া এই আলোচনাই বোধ করি চলিতেছিল। কেদারবাবু বায়স্কোপে নূতন মাতিয়াছিলেন; কথা ছিল, চা-খাওয়ার পরেই তাঁহারা আজও বাহির হইয়া পড়িবেন। সুরেশের গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল—এমনি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল এবং সকলের মুখের ভাবেই একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

কেদারবাবু বিবর্ণ-মুখে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এস মহিম। সব খবর ভাল?

মহিম নমস্কার করিয়া ভিতরে আসিয়া বসিল। বাড়িতে এতদিন বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শুধু জানাইল যে, বিশেষ কাজ ছিল।

সুরেশ টেবিলের উপর হইতে সেদিনের খবরের কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল এবং অচলা পাশের চৌকি হইতে তাহার সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল। সুতরাং কথাবার্তা একা কেদারবাবুর সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময়ে অচলা বাহিরে উঠিয়া গিয়া মিনিট-খানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল এবং ক্ষণেক পরেই মাথার উপরে টানা-পাখাটা নড়িয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস পাইয়া কেদারবাবু খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তবু ভাল। পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হল।

সুরেশ তীক্ষ্ন বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মহিমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। কেন অচলা উঠিয়া গিয়াছিল, কেন পাখাওয়ালার অকারণে দয়া প্রকাশ পাইল, সমস্ত ইতিহাসটা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে খেলিয়া গিয়া, যে বাতাসে কেদারবাবু খুশী হইলেন, সেই বাতাসেই তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, পাঁচটা বেজে গেছে—আর দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু।

কেদারবাবু আলাপ বন্ধ করিয়া চায়ের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেই বেয়ারা সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া অচলা পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া সুরেশ ও পিতার সম্মুখে আগাইয়া দিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাবে না মা?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবা, বড় গরম।

হঠাৎ তাঁহার মহিমের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি, মহিমকে দিলে না যে! তুমি কি চা খাবে না মহিম?

সে জবাব দিবার পূর্বেই অচলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এত গরমে তোমার খেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এবেলা ত তোমার চা সহ্য হয় না।

মহিমের বুকের উপর হইতে কে যেন অসহ্য গুরুভার পাষাণের বোঝা মায়ামন্ত্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে কথা কহিতে পারিল না, শুধু অব্যক্ত বিস্ময়ে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অচলা কহিল, একটুখানি সবুর কর, আমি লাইম-জুস দিয়ে শরবত তৈরি করে আনচি। বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বিন্দু তখন তাহার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চা-পান শেষ করিয়া কেদারবাবু তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়া দেখিলেন, অচলা নিজের জায়গায় বসিয়া একমনে সেলাই করিতেছে। ব্যস্ত এবং আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, এখনো বসে কাপড় সেলাই করচ, তৈরি হয়ে নাওনি যে?

অচলা মুখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি যাব না বাবা।

যাবে না! সে কি কথা?

না বাবা, আজ তোমরা যাও—আমার ভাল লাগচে না। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

সুরেশ অভিমান ও গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, চলুন কেদারবাবু, আজ আমরাই যাই। ওঁর হয়ত শরীর ভাল নেই, কাজ কি পীড়াপীড়ি করে?

কেদারবাবু তাহার প্রতি চাহিয়াই তাহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইলেন। মেয়েকে কহিলেন, তোমার কি কোনোরকম অসুখ করেচে?

অচলা কহিল, না বাবা, অসুখ করবে কেন, আমি ভাল আছি।

সুরেশ মহিমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল না, বলিল, আমরা যাই চলুন কেদারবাবু! ওঁর বাড়িতে কোনোরকম আবশ্যক থাকতে পারে—জোর ক'রে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কেদারবাবু কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িতে তোমার কাজ আছে?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেদারবাবু অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলচি চল। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে!

অচলার হাতের সেলাই স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত-মুখে দুই চক্ষু ডাগর করিয়া প্রথমে সুরেশের, পরে তাহার পিতার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ মুখ কালি করিয়া কহিল, আপনার সব-তাতেই জবরদস্তি। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারিনে—অনুমতি করেন ত যাই।

কেদারবাবু নিজের অভদ্র আচরণে মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলেন—সুরেশের কথায় রাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগটা পড়িল মহিমের উপর। সে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি-উঠি করিতেছিল। কেদারবাবু বলিলেন, তোমার কি কোন আবশ্যক আছে মহিম?

মহিম আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না।

কেদারবাবু চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, তা হলে আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—

মহিম কহিল, যে আজ্ঞে, আসব। কিন্তু আসার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

কেদারবাবু সুরেশকে শুনাইয়া কহিলেন, আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি দরকার মনে কর, এসো-দু-একটা বিষয় আলোচনা করা যাবে।

তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নীচে আসিয়া মহিমকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সুরেশ কেদারবাবুকে লইয়া তাহার গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

মহিম খানিকটা পথ আসিয়াই পিছনে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, কেদারবাবুর বেহারা। সে বেচারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া একটুকরা কাগজ হাতে দিল। তাহাতে পেন্সিল দিয়া শুধু লেখা ছিল, অচলা। বেহারা কহিল, একবার ফিরে যেতে বললেন।

ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল—অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই বলিল, তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছো কি বলে? বলিয়াই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেলিংটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর নত-মস্তকে ধীরে ধীরে মহিম যখন তাহার বাসার দিকে পথ চলিতেছিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণটা যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল। কি করিয়া সুরেশ এখানে আসিল, কেমন করিয়া এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিল—এই-সব ছোটখাটো ইতিহাস এখনো সে জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা আর তাহার অবিদিত ছিল না। কেদারবাবুকে সে চিনিত। যেখানে টাকার গন্ধ একবার তিনি পাইয়াছেন, সেখান হইতে সহজে কোনমতেই যে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন না, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। সুরেশকেও সে ছেলেবেলা হইতে নানারূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। দৈবাৎ যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে পাইবার জন্য সে কি যে দিতে না পারে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। টাকা ত কিছুই নয়—এ ত চিরদিনই তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। একদিন তাহারই জন্য যে মুঙ্গেরের গঙ্গায় নিজের প্রাণটার দিকেও চাহে নাই, আজ যদি সে আর-একজনের ভালবাসার প্রবলতর মোহে সেই মহিমের প্রতি দৃক্‌পাত না করে ত তাহাকে দোষ দিবে সে কি করিয়া? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করা ব্যতীত কাহারও উপর সে বিশেষ কোন দোষারোপ করিল না। কিন্তু এই যে এতগুলো বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না; তাই তাহার শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আংটিটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না। অথচ, শেষ-নিষ্পত্তি হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। এমন করিয়া নিজেকে জ্বলাইয়া আর একটা মুহূর্তও কাটানো চলে না। যা হবার তা হোক, চরম একটা মীমাংসা করিয়া সে লইবেই। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই

আজ সে তাহার দীন-দরিদ্র ছাত্রাবাসে গিয়া রাত্রি আটটার পর হাজির হইল।

পরদিন অপরাহ্ণকালে কেদারবাবুর বাটীতে গিয়া খবর পাইল, তাঁহারা এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। তাহার পরদিন গিয়াও দেখা হইল না। বেহারা জানাইল, সকলে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সকলে যে কে তাহা প্রশ্ন না করিয়াও মহিম অনুমান করিতে পারিল। অপমান এবং অভিমান যত বড়ই হোক, উপর্যুপরি দুই দিন ফিরিয়া আসাই তাহার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু হাতের আংটিটা তাহাকে তাহার বাসায় টিঁকিতে দিল না, পরদিন পুনরায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। আজ শুনিতে পাইল, বাবু বাড়ি আছেন—উপরের ঘরে বসিয়া চা-পান করিতেছেন।

মহিমকে দ্বারের কাছে দেখিয়া কেদারবাবু মুখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে শুধু বলিলেন, এসো মহিম। মহিম হাত তুলিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিল।

দূরে খোলা জানালার ধারে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসিয়া অচলা এবং সুরেশ। অচলার কোলের উপর একটা ভারী ছবির বই। দুজনে মিলিয়া ছবি দেখিতেছিল। সুরেশ পলকের জন্য চোখ তুলিয়াই, পুনরায় ছবি দেখায় মনঃসংযোগ করিল; কিন্তু অচলা চাহিয়াও দেখিল না। তাহার অবনত মুখখানি দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে যেরূপ একান্ত আগ্রহভরে তাহার বইয়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, তাহাতে এমন মনে করা একেবারে অসঙ্গত হইত না, যে পিতার কণ্ঠস্বর, আগন্তুকের পদশব্দ—কিছুই তাহার কানে যায় নাই।

মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

কেদারবাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না—একটু একটু করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। বাটিটা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল এবং আর চুপ করিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সেটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, তা হলে এখন কি করচ? তোমাদের আইনের খবর বার হতে এখনো ত মাস-খানেক দেরি আছে বলে মনে হচ্চে।

মহিম শুধু কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কেদারবাবু বলিলেন, না হয় পাসই হলে—তা পাস তুমি হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস করে হাতে কিছু টাকা না জমিয়ে ত আর কোনদিকে মন দিতে পারবে না। কি বল সুরেশ, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ত শুনতে পাই তেমন ভাল নয়।

সুরেশ কথা কহিল না। মহিম একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল প্র্যাকটিস করলেই যে হাতে টাকা জমবে, তারও ত কোন নিশ্চয়তা নাই।

কেদারবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নেই—ঈশ্বরের হাত, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'পুরুষসিংহ'; তোমাকে সেই পুরুষসিংহ হতে হবে। আর কোনদিকে নজর থাকবে না—শুধু উন্নতি আর উন্নতি। তার পরে সংসারধর্ম কর—যা ইচ্ছা কর, কোন দোষ নেই—তা নইলে যে মহাপাপ! বলিয়া সুরেশের পানে একবার চাহিয়া কহিলেন, কি বল সুরেশ—তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারব না—এমনি করেই ত হিন্দুরা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরাও যদি সংদৃষ্টান্ত না দেখাই, তা হলে সভ্যজগতের কোনমতে কারো কাছে মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারব না, ঠিক কি না? কি বল সুরেশ?

সুরেশ পূর্ববৎ মৌন হইয়া রহিল। মহিম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখব। কিন্তু আপনি কি এই আলোচনা করবার জন্যই আমাকে আসতে বলেছিলেন?

কেদারবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, না, শুধু এই নয়, আরও কথা আছে, কিন্তু—. বলিয়া তিনি সোফার দিকে চাহিলেন।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা তা হলে ও-ঘরে গিয়ে একটু বসি, বলিয়া হেঁট হইয়া অচলার ক্রোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল। তাহার এই

ইঙ্গিতটুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না। কেদারবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দুজনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে বসো গে মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

অচলা মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া শুধু কহিল, আমি থাকি বাবা।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি না হয় যাচ্ছি, বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাবু যে খুশী হইলেন না, তাহা তিনি মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু জিদও করিলেন না। খানিকক্ষণ রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহিম, তুমি মনে করো না, আমি তোমার উপর বিরক্ত; বরঞ্চ তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই আছে। তাই বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্ছি যে, এখন কোনপ্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকর্মণ্য করে তুলো না। নিজের উন্নতি কর, কৃতী হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।

মহিম মুখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল। সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল। তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য; কিন্তু আপনার কন্যারও কি তাই ইচ্ছা?

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, অন্ততঃ এটা ত নিশ্চয় যে, সমস্ত জেনে-শুনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসর্জন দিতে পারব না।

মহিম শান্তস্বরে কহিল, ইংরেজদের একটা প্রথা আছে, এ-রকম অবস্থায় তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আপনার সেই অভিপ্রায়ই কি বুঝব?

কেদারবাবু হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, দেখ মহিম, আমি তোমার কাছে হলফ নেবার জন্য তোমাকে ডাকিনি। তুমি যে-রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচ, তাতে আর কোন বাপ হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় লোক, কোনরকমের গোলমাল হাঙ্গামা ভালবাসি নে বলেই যতটা সম্ভব মিষ্টি কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। তাতে তুমি অপেক্ষা করে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবেরা কি করে, এত কৈফিয়তে ত আমাদের প্রয়োজন দেখিনে। তা ছাড়া, আমরা ইংরেজ নই, বাঙালী। মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম আসে না, মুখে অন্ন-জল রোচে না, এ-কথা তুমি নিজেই কোন্ না জান?

মহিমের চোখ-মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, আমি কি ব্যবহার করেচি, যার জন্যে অন্যত্র এত বড় কাণ্ড হতে পারত— এ প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাইনে। শুধু আপনার কন্যার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, তাঁরও এই অভিপ্রায় কি না। বলিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, কেমন, এই ত?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল, না।

একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্প মহিম সবলে নিরোধ করিয়া পুনরায় কহিল, তোমার মনের কথা নিভৃতে জানবার, জিজ্ঞেস করে জানবার অবকাশ আমি পেলুম না—সেজন্যে আমি মাপ চাচ্ছি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝোঁকের উপর যে কাজ করে ফেলেছিলে, তার জন্যেও তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। শুধু একবার বল, সেই আংটিটা ফিরে চাও কি না।

সুরেশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আমাকে মাপ করতে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা করবার জো নেই।

উপস্থিত সকলেই মৌন-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

সুরেশ অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত-দুটো বাড়াইয়া দিয়া বলিল, না—না, এ ভুলের মার্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কিনা সমস্ত ভুলে গিয়ে, এখানে বসে বৃথা সময় নষ্ট করচি!

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বল কি সুরেশ, প্লেগ? যাবে নাকি সেখানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়। অনেক পূর্বেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।

কেদারবাবু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, কিন্তু প্লেগ যে! তিনি কি তোমার এমন বিশেষ কোন আত্মীয়—

সুরেশ কহিল, আত্মীয়! আত্মীয়ের অনেক বড়, কেদারবাবু! মহিমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রথম কথা কহিল, বলিল, মহিম, আমাদের নিশীথের কাল রাত্রি থেকে প্লেগ হয়েচে, বাঁচে যে এ আশা নেই। আমার তোমাকেও একবার বলা উচিত—যাবে দেখতে?

মহিম নিশীথ লোকটিকে চিনিতে পারিল না। কহিল, কোন্ নিশীথ?

কোন্ নিশীথ! বল কি মহিম? এরই মধ্যে আমাদের নিশীথকে ভুলে গেলে? যার সঙ্গে সমস্ত সেকেণ্ড-ইয়ারটা পড়লে, তাকে তার এতবড় বিপদের দিনে আর মনে পড়ছে না? বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া লইয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, তা মনে পড়বে না বটে! প্লেগ কিনা!

এই খোঁচাটুকু মহিম নীরবে সহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ভবানীপুর থেকে আসতেন?

সুরেশ ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল, হাঁ, তাই। কিন্তু নিশীথ ত আমাদের দু-চারজন ছিল না মহিম, যে, এতক্ষণ তোমার মনে পড়েনি! বলি যাবে কি?

মহিম চিনিতে পারিয়া কহিল, নিশীথ কোথায় থাকে এখন?

সুরেশ কহিল, আর কোথায়? নিজের বাড়িতে, ভবানীপুরে। এ সময় তাকে একবার দেখা দেওয়া কি কর্তব্য বলে মনে হয় না? আমি ডাক্তার, আমাকে ত যেতেই হবে; আর অত বড় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে না থাক ত তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। কেদারবাবু, আপনাদের কথা বোধ করি শেষ হয়ে গেছে? আশা করি, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও ওকে একবার ছুটি দিতে পারবেন?

এ বিদ্রূপটা যে আবার কাহার উপর হইল, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে একবার মহিমের, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বড়লোক ভাবী জামাতাটির মান-অভিমান যে কিসে এবং কতটুকুতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আজও বৃদ্ধ তাহার কূলকিনারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, মহিমও হতবুদ্ধির মত নীরবে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া হাতের বইখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, তুমি ডাক্তার, তোমার ত যাওয়াই উচিত; কিন্তু ওঁর ওকালতির কেতাবের মধ্যে ত প্লেগের চিকিৎসা লেখা নেই? উনি যাবেন কি জন্যে শুনি?

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাবে সুরেশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, আমি সেখানে ডাক্তারি করতে যাচ্ছিনে, তার ডাক্তারের অভাব নেই। আমি যাচ্ছি বন্ধুর সেবা করতে। বন্ধুত্বটা আমার প্রাণটার চেয়েও বড় বলে মনে করি।

একটা নিষ্ঠুর হাসির আভাস অচলার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল; কহিল, সকলেই যে তোমার মত মহৎ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। অতবড় বন্ধুত্বজ্ঞান যদি ওঁর না থাকে ত আমি লজ্জার মনে করিনে। সে যাই হোক, ও জায়গায় ওঁর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সুরেশের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল।

কেদারবাবু সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিতে লাগিলেন, ও-সব তুই কি বলচিস অচলা? সুরেশের মত—সত্যই ত—নিশীথবাবুর মত—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, নিশীথবাবুকে ত প্রথমে চিনতেই পারলেন না। তা ছাড়া উনি ডাক্তার—উনি যেতে পারেন। কিন্তু আর-একজনকে বিপদের মধ্যে অনর্থক টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?

আহত হইলে সুরেশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, যা মুখে আসিল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি ভীরু নই—প্রাণের ভয় করিনে। মহিমকে

দেখাইয়া বলিল, ঐ নেমকহারামটাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি ওকে মরতে মরতে বাঁচিয়েছিলুম কি না।

অচলা দৃপ্তস্বরে কহিল, নেমকহারাম উনি! তাই বটে! কিন্তু যাকে এক সময়ে বাঁচানো যায়, আর এক সময়ে ইচ্ছে করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?

কেদারবাবু হতবুদ্ধির মত বলিতে লাগিলেন, থাম না অচলা; থাম না সুরেশ! এ-সব কি কাণ্ড বল দেখি!

সুরেশ রক্ত-চক্ষে কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি প্লেগের মধ্যে যেতে পারি—তাতে দোষ নেই! মহিমের প্রাণটাই প্রাণ, আর আমারটা কিছু নয়! দেখলেন ত আপনি!

লজ্জায় ক্ষোভে অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, ওঁর প্রাণ উনি দিতে পারেন, আমি নিষেধ করতে পারিনে; কিন্তু যেখানে বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই। আমি কোনমতেই অমন জায়গায় ওঁকে যেতে দিতে পারব না। বলিয়া সে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই কেদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, কোথায় যাস অচলা!

অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বাবা, দিন-রাত্রি এত পীড়ন আর সহ্য করতে পারিনে। যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাকতে স্বীকার করবার আমার একেবারে জো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশ বিঁধছ। বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ কেদারবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বার বার বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষ—কি-সব কাণ্ড বল ত!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক গত হইয়াছে। কেদারবাবু রাজী হইয়াছেন—মহিমের সহিত অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। সেদিন যে কাণ্ড করিয়া সুরেশ গিয়াছিল, তাহা সত্যই কেদারবাবুর বুকে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু সেই অপমানের গুরুত্ব ওজন করিয়াই যে তিনি মহিমের প্রতি অবশেষে প্রসন্ন হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা নয়। সুরেশ নিজেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে—এতদিনের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সেই রাত্রেই সে নাকি পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কবে ফিরিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

সেদিন কান্না চাপিতে অচলা ঘর ছাড়িয়া যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনজনেই মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু কথা কহিল প্রথমে সুরেশ নিজে। কেদারবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আপনার কন্যাকে গোটা-কয়েক কথা বলতে চাই।

কেদারবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! তুমি কথা বলবে, তার আবার আপত্তি কি সুরেশ? যত সব ছেলেমানুষের—

তা হলে একবার ডেকে পাঠান—আমার বেশী সময় নেই।

তাহার মুখের ও কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া কেদারবাবু মনে মনে শঙ্কা অনুভব করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া, আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, যত সব ছেলেমানুষের কাণ্ড! কিন্তু একটুখানি সামলাতে না দিলে—বুঝলে না সুরেশ, ও-সব প্লেগ-ফ্লেগের জায়গার নাম করলেই—মেয়েমানুষের মন কিনা! একবার শুনলেই ভয়ে অজ্ঞান—বুঝলে না বাবা—

কোনপ্রকার কৈফিয়তের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুরেশের মনের অবস্থা নয়—সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক কেদারবাবু, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।

তা ত বটেই। তা ত বটেই। কে আছিস রে ওখানে? বলিয়া ডাক দিয়া কেদারবাবু মহিমের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিলেন। মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা নমস্কার করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু নিজে গিয়া অচলাকে যখন ডাকিয়া আনিলেন, তখন অপরাহ্ণ-সূর্যের রক্তিম-রশ্মি পশ্চিমের জানালা-দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে

উদ্ভাসিত এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহের পানে চাহিয়া, পলকের জন্য সুরেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ খেলিয়া গেল, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না। তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে ভাব তাহার চক্ষের নিমেষে নির্বাপিত হইল। কিন্তু, তবুও সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না, নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অচলার মুখের উপর আকাশের আলো পড়ে নাই বটে, কিন্তু সুমুখের দেওয়াল হইতে প্রতিফলিত আরক্ত আভায় সমস্ত মুখখানা সুরেশের চোখে কঠিন ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্তির মত বোধ হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি যেন একটা নিবিড় বিতৃষ্ণায় এই নারীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত কোমলতা নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়া মুখের প্রত্যেক রেখাটিকে পর্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তায় একেবারে ধাতুর মত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সহসা কেদারবাবুর প্রবল নিশ্বাসের চোটে সুরেশের চমক ভাঙ্গিতেই সোজা হইয়া বসিল।

কেদারবাবু আর একবার তাঁহার পুরাতন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যত সব পাগলামি কাণ্ড—কাকে যে কি বলি, আমি ভেবে পাইনে—

সুরেশ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া নিরতিশয় গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি যা বলে গেলেন, তাই ঠিক?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

এর আর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

রক্তের উচ্ছ্বাস এক ঝলক আগুনের মত সুরেশের চোখ-মুখ প্রদীপ্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিল, আমার প্রাণটার পর্যন্ত যখন কোন দাম নেই, তখনি আমি জানতুম। তাহার বুকের ভিতরটা তখন পুড়িয়া যাইতেছিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে পড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে?

অসহ্য বিস্ময়ে অচলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

সুরেশ কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, বাপ-মেয়েতে ষড়যন্ত্র করে শিকার ধরার ব্যবসা বিলাতে নতুন নয় শুনতে পাই; কিন্তু এ-ও বলচি আপনাকে, কেদারবাবু, একদিন আপনাদের জেলে যেতে হবে।

কেদারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এ-সব তুমি কি বলচ সুরেশ!

সুরেশ অবিচলিত-স্বরে জবাব দিল; চুপ করুন কেদারবাবু; থিয়েটারের অভিনয় অনেকদিন ধরে চলচে। পুরানো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুলব না। টাকা আমার যা গেছে, তা যাক—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না; কিন্তু এই যেন শেষ হয়।

অচলা কাঁদিয়া উঠিল—তুমি কেন এ'র টাকা নিলে বাবা?

কেদারবাবু পাগলের মত একখণ্ড সাদা কাগজের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে হাত বাড়াইয়া, শেষে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ সবেগে টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, আমি এখ্খুনি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

সুরেশ বলিল, থাক—থাক, লেখালিখিতে আর কাজ নেই। আপনি ফিরিয়ে যা দেবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমিও ঐ ক'টা টাকার জন্য নালিশ করে আপনার সঙ্গে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

জবাব দিবার জন্য কেদারবাবু দুই ঠোঁট ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

সুরেশ অচলার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। তাহার একান্ত পাংশু মুখ ও সজল চক্ষের পানে চাহিয়া তাহার একবিন্দু দয়া হইল না, বরঞ্চ ভিতরের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল, কি তোমার গর্ব করবার আছে অচলা, ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ! তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও করো না।

পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখে ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ব্রাহ্মদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। যাদের ছায়া মাড়াতেও আমার ঘৃণা বোধ হত, তাদের বাড়িতে ঢোকবামাত্রই যখন আমার আজন্মের সংস্কার —চিরদিনের বিদ্বেষ একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল, তখনি আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল —এ যাদুবিদ্যা! আমার যা হয়েছে, তা হোক, কিন্তু যাবার সময় আপনাদের আমি সহস্র-কোটি ধন্যবাদ না দিয়ে যেতে পারছি নে। ধন্যবাদ অচলা!

অচলা মুখ না তুলিয়াই অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবা, ওঁকে তুমি চুপ করতে বল। আমরা গাছতলায় থাকি, সে-ও ঢের ভালো, কিন্তু ওঁর যা নিয়েছ, তুমি ফিরিয়ে দাও—

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গাছতলায়? একদিন তাও তোমাদের জুটবে না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সেদিন আমাকে স্মরণ করো, বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, উঃ, কি ভয়ানক লোক! এমন জানলে আমি কি ওকে বাড়ি ঢুকতে দিতুম!

পিতার কথা অচলার কানে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না, উপুড় হইয়া পড়িয়া যেমন করিয়া কাঁদিতেছিল, তেমনি একভাবে পড়িয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল। অদূরে চৌকির উপর বসিয়া কেদারবাবু সমস্ত দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথা উচ্চারণ করিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। বেহারা আসিয়া গ্যাস জ্বালাইবার উপক্রম করিতেই অচলা নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু, মহিম ইহার কিছুই জানিল না। শুধু যেদিন কেদারবাবু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্মতি দিলেন, সেই দিনটায় সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অনেকপ্রকারের অনেক কথা, অনেক সংশয় তাহার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু তাহার এই সৌভাগ্যের সুরেশ নিজেই যে মূল কারণ, ইহা তাহার সুদূর কল্পনারও উদয় হইল না। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু চিরদিনই সে নিঃশব্দ-প্রকৃতির লোক: আবেগ উচ্ছ্বাস কোনদিন প্রকাশ করিতে পারিত না, পারিলেও হয়ত তাহার মুখে নিতান্তই তাহা একটা অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন আচরণ বলিয়া লোকের চোখে ঠেকিত। বরঞ্চ, আজ সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী কেদারবাবুর সহিত দুই-চারিটা কথাবার্তার পর বাসায় ফিরিয়া গেল, তখন অন্যান্য দিনের মত অচলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে একটা ছোট্ট নমস্কার পর্যন্ত করিয়া যাইতে পারিল না। কথাটা কেদারবাবু নিজেই পাড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে শুরু করিয়া সম্মতি দেওয়া—মায় দিন-স্থির পর্যন্ত, একাই সব করিলেন। কিন্তু সমস্তটাই যেন অনন্যোপায় হইয়াই করিলেন; মুখে তাঁহার স্ফূর্তি বা উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তথাপি দিন কাটিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিন আসিল।

পরশু বিবাহ। কিন্তু মেয়ের বিবাহে তিনি কোনরূপ ধুমধাম হৈচৈ করিবেন না—স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, আগামী শুভকর্মের আয়োজন যতটা নিঃশব্দে হইতে পারে, তাহার ত্রুটি করেন নাই।

আজও বিকাল-বেলা তিনি যথাসময়ে চা খাইতে বসিয়াছিলেন। একটা সেলাই লইয়া অচলা অনতিদূরে কৌচের উপর বসিয়া ছিল। অনেকদিন অনেক দুঃখের মধ্যে দিন-যাপন করিয়া আজ কয়েকদিন হইতে তাহার মনের উপর যে শান্তিটুকু স্থিতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহার পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল। চা খাইতে খাইতে মাঝে মাঝে কেদারবাবু ইহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। কলহ করিয়া সুরেশ চলিয়া যাওয়া পর্যন্ত, এতদিন তিনি মন-মরা ভাবেই দিন-যাপন করিতেছিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, না করিবে—এই এক দুশ্চিন্তা; তা ছাড়া, তাহার নিজের কর্তব্যই বা এ সম্বন্ধে কি—হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেওয়া বা টাকাটা পরিশোধ করিতে আর কোথাও ঋণের চেষ্টা করা, কিংবা মহিমের উপর দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া—কি যে করা যায়, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূল-কিনারাই দেখিতেছিলেন না। অথচ একটা কিছু

করা নিতান্তই আবশ্যক—সুরেশের নিরুদ্দেশ অবস্থার উপর বরাত দিয়া যে চিরদিন চলিবে না, অথবা মেয়ের মত নিজের খেয়ালে মগ্ন হইয়া, চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে না, তাহাও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন। হতাশ প্রেমিক একদিন যে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এবং সেদিন ফিরিয়া আসিয়া কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া মস্ত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিবে এবং যে টাকাটা চেকের দ্বারা তাঁহাকে দিয়াছে—তাহা আর কোন লেখাপড়া না থাকা সত্ত্বেও যে আদালতে উড়াইতে পারা যাইবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া এ বিষয়ে একপ্রকার তিনি নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু, মেয়ের সহিত এ-বিষয়ে একটা পরামর্শ করিবার পর্যন্ত জো ছিল না। সুরেশের নামোল্লেখ করিতেও তাঁহার ভয় করিত। এখন অচলার ওই শান্ত স্থির মুখচ্ছবির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার ভারী একটা চিত্ত-জ্বালার সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটাই তাঁহার সকল দুঃখের মূল। অথচ, কি সুবিধাই না হইয়াছিল, এবং অদূর-ভবিষ্যতে আরও কি হইতে পারিত!

যে নিষ্ঠুর কন্যা বৃদ্ধ পিতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্-পাতমাত্র করিল না, সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল, সেই স্বার্থপর সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অভিশাপের মত যখন-তখন প্রায় এই কামনাই করিত—সে যেন ইহার ফলভোগ করে, একদিন যেন তাহাকে কাঁদিয়া বলিতে হয়, "বাবা, তোমার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি আমি পাইতেছি।" পাত্র হিসাবে সুরেশ যে মহিমের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। মনে মনে তাহার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না। এত কাণ্ডের পরেও যদি আজ আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ থাকিত, উপস্থিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ করি লেশমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু কোন উপায় নাই—কোন উপায় নাই! অচলার কাছে তাহার আভাসমাত্র উত্থাপন করাও অসাধ্য।

সেলাই করিতে করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবা, সুরেশবাবুর ব্যাপারটা পড়লে?

অচলার মুখে সুরেশের নাম! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন। নিজের কানকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সকালের খবরের কাগজটা টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল; অচলা সেটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কাগজখানার স্থানে স্থানে তিনি সকালবেলায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অপরের সংবাদ খুঁটিয়া জানিবার মত আগ্রহাতিশয্য তাঁহার মনের মধ্যে এখন আর ছিল না। কহিলেন, কোন্ সুরেশ?

অচলা সংবাদপত্রের সেই স্থানটা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, বোধ করি, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাদের সুরেশবাবু? কি করেছেন তিনি? কোথায় তিনি?

অচলা উঠিয়া আসিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা পিতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে দেখ না বাবা!

কেদারবাবু চশমার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন, চশমাটা হয়ত আমার ঘরেই ফেলে এসেছি। তুমি পড় না মা, ব্যাপারটা কি শুনি?

অচলা পড়িয়া শুনাইল, ফয়জাবাদ শহরের জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, সেদিন শহরের দরিদ্র-পল্লীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একে প্লেগ, তাহাতে এই দুর্ঘটনায় দুঃখী লোকের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। কিছুদিন হইতে সুরেশ নামে একটি ভদ্র-যুবক এখানে আসিয়া অর্থ দিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া, নিজের দেহ দিয়া রোগীর সেবা করিতেছিলেন। বিপদের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান, রোগশয্যায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোক একটি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহাকে উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই।

সংবাদদাতা অতঃপর লিখিয়াছেন, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে কি করিয়া এই অসমসাহসী বাঙালী যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া,—ইত্যাদি ইত্যাদি—

পড়া শেষ হইয়া গেল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু এ কি আমাদের সুরেশ বলেই তোমার মনে হয়?

অচলা শান্তভাবে বলিল, হাঁ বাবা, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।

কেদারবাবু আর একবার চমকিয়া উঠিলেন। বোধ করি, নিজের অজ্ঞাতসারেই অচলার মুখ দিয়া এই 'আমাদেরই' কথাটার উপর একবার একটা অতিরিক্ত জোর প্রকাশ পাইয়াছিল। হয়ত সে শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জানাইবার জন্যই, কিন্তু কেদারবাবুর বুকের মধ্যে তাহা আর একভাবে বাজিয়া উঠিল; এবং মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে তৃণ অবলম্বন করিতে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়, ঠিক তেমনি করিয়া বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের এই একটিমাত্র কথাকেই নিবিড় আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। এই একটি কথাই তাঁহার কানে কানে, চক্ষের নিমিষে কত কি অসম্ভব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ শুনাইয়া গেল, তাহার সীমা রহিল না। তাঁহার মুখখানা আজ এতদিন পরে অকস্মাৎ আশার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না যে—

পিতাকে সহসা থামিতে দেখিয়া অচলা মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি মনে হয় না বাবা?

কেদারবাবু সাবধানে অগ্রসর হইবার জন্য মুখের কথাটা চাপিয়া গিয়া বলিলেন, তোমার কি মনে হয় না যে, সুরেশ যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করে গেল, তার জন্য সে বিশেষ অনুতপ্ত?

অচলা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, আমার তা নিশ্চয় মনে হয় বাবা।

কেদারবাবু প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়! এক শ-বার। তা না হলে সে এভাবে পালাত না—কোথাকার একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বাঁচাতে আগুনের মধ্যে ঢুকত না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, সে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হয়েই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়েছিল। সত্য কি না বল দেখি মা!

অচলা পিতার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া ধীরে ধীরে কহিল, শুনেছি, পরকে বাঁচাতে এইরকম আরও দু-একবার তিনি নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছিলেন।

কথাটা কেদারবাবুর তেমন ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে আলাদা কথা অচলা। কিন্তু এ যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া! এ যে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! দুটোর প্রভেদ দেখতে পাচ্ছ না?

অচলা আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, তা বটে। কিন্তু যারা মহৎপ্রাণ, তাঁদের যে-কোন অবস্থাতেই, পরের বিপদে নিজের বিপদ মনে থাকে না—

কেদারবাবু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, ঠিক, ঠিক! তাই ত তোকে বলচি অচলা—সে একটা মহৎপ্রাণ। একেবারে মহৎপ্রাণ! তার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে! এত লোক ত আছে, কিন্তু কে কারে পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল দেখি! সে যাই কেন না করে থাক, বড় দুঃখেই করে ফেলেচে—এ আমি তোমাকে শপথ করে বলতে পারি।

কিন্তু শপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ সত্য অচলা নিজে যত জানিত, তিনি তাহার শতাংশের একাংশও জানিতেন না। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—নিমেষের লজ্জা পাছে তাহার মুখে ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধের সতৃষ্ণ-দৃষ্টির কাছে তাহা ফাঁকি পড়িল না। তিনি পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, মানুষ ত দেবতা নয়—সে যে মানুষ! তার দেহ দোষে-গুণে জড়ানো; কিন্তু তাই বলে ত তার দুর্বল মুহূর্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব বলে ধরে নেওয়া চলে না! বাইরের লোক যে যা ইচ্ছে বলুক অচলা, কিন্তু আমরাও যদি এইটেকেই দোষ বলে বিচার করি, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত থাকে কোন্‌খানে বল দেখি? বড়লোক ত ঢের আছে, কিন্তু এমন করে দিতে জানে কে? কি লিখেচে ওইখানটায় আর-একবার পড় দেখি মা! আগুনের ভেতর থেকে তাকে নিরাপদে বার করে নিয়ে এল! ওঃ কি মহৎপ্রাণ! দেবতা আর বলে কাকে! বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।

অচলা তেমনি নিরুত্তর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কেদারবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা,

আমাদের একখানা টেলিগ্রাফ করে কি তার খবর নেওয়া উচিত নয়? তার এ বিপদের দিনেও কি আমাদের অভিমান করা সাজে?

এবার অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানিনে বাবা।

কেদারবাবু বলিলেন, ঠিকানা! ফয়জাবাদ শহরে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের সুরেশকে আজ চেনে না? তার ওপর আমার রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিছু মনে নেই। একখানা টেলিগ্রাম লিখে এখ্খুনি পাঠিয়ে দাও মা; আমি তার সংবাদ জানবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছি।

এখুনি দিচ্চি বাবা, বলিয়া সে একখানা টেলিগ্রাফের কাগজ আনিতে ঘরের বাহির হইয়া একেবারে সুরেশের সম্মুখেই পড়িয়া গেল।

অন্তরে গভীর দুঃখ বহন করার ক্লান্তি এত শীঘ্র মানুষের মুখকে যে এমন শুষ্ক, এমন শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে, জীবনে আজ অচলা এই প্রথম দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে সে-ই কথা কহিল। বলিল, বাবা বসে আছেন; আসুন, ঘরে আসুন। ফয়জাবাদ থেকে কবে এলেন? ভাল আছেন আপনি?

অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কতখানি স্নেহের বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা সে নিজে টের পাইল না; কিন্তু সুরেশ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল; কিন্তু তবুও আজ সে তাহার বিগত দিনের কঠোর শিক্ষাকে নিষ্ফল হইতে দিল না। সেই দুটি আরক্ত পদতলে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাহার অগাধ দুষ্কৃতির সমস্তটুকু নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার দুর্জয় স্পৃহাকে আজ সে প্রাণপণ-বলে নিবারণ করিয়া লইয়া, সসম্ভ্রমে কহিল, আমার ফয়জাবাদে থাকবার কথা আপনি কি করে জানলেন?

অচলা তেমনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, খবরের কাগজে এইমাত্র দেখে বাবা আমাকে টেলিগ্রাফ করতে বলছিলেন। আপনার জন্যে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—আসুন একবার তাঁকে দেখা দেবেন, বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ বলিয়া উঠিল, তিনি হয়ত পারেন, কিন্তু তুমি আমাকে কি করে মাপ করলে অচলা?

অচলার ওষ্ঠাধরে একটুখানি হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, সে প্রয়োজনই আমার হয়নি। আমি একটি দিনের জন্যেও আপনার ওপর রাগ করিনি—আসুন, ঘরে আসুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ যখন জানাইল, সে মহিমের পত্রে বিবাহের সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, তখন কেদারবাবু লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অচলার মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

সুরেশ বলিল, মহিমের বিবাহে আমি না এলেই ত নয়, নইলে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে গেলেই ভাল হত।

কেদারবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসপাতালে কেন সুরেশ, সে-রকম ত কিছু—

সুরেশ বলিল, আজ্ঞে না, সে-রকম কিছু নয়—তবে, দেহটা ভাল ছিল না।

কেদারবাবু সুস্থির হইয়া বলিলেন, ভগবানকে সেজন্য শতকোটি প্রণাম করি। অচলা যখন খবরের কাগজ থেকে তোমার অলৌকিক কাহিনী শোনালে সুরেশ, তোমাকে বলব কি—আনন্দে, গর্বে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে মনে বললুম, ঈশ্বর! আমি ধন্য যে—আমি এমন লোকেরও বন্ধু! বলিয়া দু'হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু, তাও বলি বাবা, নিজের প্রাণ বারংবার এমন বিপদাপন্ন করাই কি উচিত? একটা সামান্য প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এতবড় একটা মহৎ প্রাণই যদি চলে যেত, তাতে কি সংসারের ঢের বেশী ক্ষতি হ'ত না?

ক্ষতি আর কি হত! বলিয়া সুরেশ সলজ্জভাবে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অচলা

নির্নিমেষ-চক্ষে এতক্ষণ তাহারই মুখের পানে চাহিয়া ছিল—এখন দৃষ্টি আনত করিল।

কেদারবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, এমন কথা মুখে আনাও উচিত নয়; কারণ আপনার লোকেদের এতে যে কত বড় ব্যথা বুকে বাজে, তার সীমা নেই।

সুরেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনার লোক আমার ত কেউ নেই কেদারবাবু! থাকবার মধ্যে আছেন শুধু পিসীমা।—আমি গেলে সংসারে তাঁরই যা-কিছু কষ্ট হবে।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও তাহার কেহ নাই শুনিয়া কেদারবাবুর শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুধু কি পিসীমাই দুঃখ পাবেন সুরেশ? তা নয় বাবা, এ বুড়োও বড় কম শোক পাবে না। তা সে যাক, অন্ততঃ আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, সে ক'টা দিন নিজের শরীরে একটু যত্ন রেখো সুরেশ, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া সুরেশ হঠাৎ হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার একটা প্রার্থনা আছে কেদারবাবু, মহিমের বিয়ে ত আমার ওখান থেকেই হবে, স্থির হয়েছে; কিন্তু সে ত পরশু। কাল রাত্রেও এই অধমের বাড়িতেই একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—নইলে বিশ্বাস হবে না যে, আমি ক্ষমা পেয়েচি। বলুন, এ ভিক্ষে দেবেন? বলিয়া সে অকস্মাৎ নীচু হইয়া কেদারবাবুর পায়ের ধুলো লইতে গেল।

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া বোধ করি বা তাহাকে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে গিয়াছিলেন—অকস্মাৎ তাহার অস্ফুট কাতরোক্তিতে লাফাইয়া উঠিলেন। পিঠের খানিকটা দগ্ধ হওয়ায় ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, একটা শাল গায়ে দিয়া এতক্ষণ সুরেশ ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। না জানিয়া টানাটানি করিতে গিয়া, তিনি ব্যাণ্ডেজটাই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন অনাবৃত ক্ষতের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া অচলা ব্যাণ্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্চি। বলিয়া তাহাকে ও-ধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সযত্নে সাবধানে ব্যাণ্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু তাঁহার চৌকির উপর ধপ্ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন—বহুক্ষণ পর্যন্ত আর তাঁহার কোনরূপ সাড়া-শব্দ রহিল না। কৌচের পিঠের উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া অচলা নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল পরেই মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না, এদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। সে শুধু নিমীলিতচক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া, তাহার অসীম প্রেমাস্পদের কোমল হাত-দু'খানির করুণ স্পর্শ বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

কোনমতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অচলা এক সময়ে চুপি চুপি বলিল, আজ আমার কাছে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সুরেশ ধ্যান ভাঙিয়া চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও তেমনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কি প্রতিজ্ঞা?

এমন করে নিজের প্রাণ আপনি নষ্ট করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রাণ ত আমি ইচ্ছে করে নষ্ট করতে চাইনে! শুধু পরের বিপদে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—এ যে আমার ছেলেবেলার স্বভাব, অচলা।

অচলা তাহার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, সুরেশ তাহা টের পাইল। বাঁধা শেষ হইয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কাল কিন্তু এ দীনের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে—তাহার দু চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল; কিন্তু কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না।

অচলা অধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সুরেশ কেদারবাবুকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবেন, আমাকে নিরাশ করবেন না যেন। বলিয়া অচলার মুখের পানে চাহিয়া, আর একবার তাহার আবেদন নিঃশব্দে জানাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে সুরেশের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। কেদারবাবু প্রস্তুত হইয়াই

ছিলেন, কন্যাকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

সুরেশের বাটীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারবাবু অবাক হইয়া গেলেন। সে বড়লোক, ইহা ত জানা কথা, কিন্তু তাহা যে কতখানি—শুধু আন্দাজের দ্বারা নিশ্চয় করা এতদিন কঠিন হইতেছিল; আজ একেবারে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাঁচিলেন।

সুরেশ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিল; হাসিয়া বলিল, মহিমের গোঁ আজও ভাঙতে পারা গেল না কেদারবাবু। কাল দুপুরের আগে এ বাড়িতে ঢুকতে সে কিছুতেই রাজী হলো না।

কেদারবাবু সে কথার কোন জবাবও দিলেন না। তিনজনে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই একজন প্রৌঢ়া রমণী দ্বারের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিজের ঘরের মেজের উপর একখানি কার্পেট বিছান ছিল, তাহারই উপর অচলাকে সযত্নে বসাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আমি সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হই বৌমা। আমি মহিমের পিসী।

অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আপনি এখানে কবে এলেন?

মহিমের যে পিসী ছিলেন, তাহা সে জানিত না। প্রৌঢ়া তাহার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া, হাসিয়া কহিলেন, আমি এইখানেই থাকি মা, আমি সুরেশের পিসী; কিন্তু মহিমও পর নয়, তাই তারও আমি পিসী হই মা।

তাঁহার স্বভাব-কোমল কণ্ঠস্বরে এমনই একটা স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল যে, একমুহূর্তেই অচলার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার মা নাই, সে অভাব এতটুকু পূর্ণ করে, বাড়িতে এমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক কোনদিন নাই। তাহার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এতদিন সে পিতার স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে স্নেহ যে তাহার হৃদয়ের কতখানি খালি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা একমুহূর্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—আজ পরের বাড়ির পরের পিসীমা যখন 'বৌমা' বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। প্রথমটা সে অভিনব সম্বোধনে একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল; কিন্তু ইহার মাধুর্য, ইহার গৌরব তাহার নারী-হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে বহুক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে দুজনের কথা জমিয়া উঠিল। অচলা লজ্জিতমুখে প্রশ্ন করিল আচ্ছা পিসীমা, আমাকে যে আপনি কাছে বসালেন, কৈ ব্রাহ্ম-মেয়ে বলে ত ঘৃণা করলেন না!

পিসীমা তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গুলির প্রান্ত দ্বারা তাহার চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমাকে ঘৃণা করব কেন মা? একটু হাসিয়া কহিলেন আমরা হিন্দুর মেয়ে বলে কি এমন নির্বোধ, এত হীন বৌমা, যে, শুধু ধর্মমত আলাদা বলে তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সঙ্কোচবোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা মা!

অচলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন পিসীমা, আমি জানতুম না। আমাদের সমাজের বাইরে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গেই কোনদিন আমি মিশতে পাইনি; শুধু শুনেছিলুম যে, তাঁরা আমাদের বড় ঘৃণা করেন, এমন কি, একসঙ্গে বসলে দাঁড়ালেও তাঁদের স্নান করতে হয়।

পিসীমা বলিলেন, সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয়ত তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে, কিন্তু সত্যি বলচি মা, সত্যিকারের ঘৃণা—আমারা কাউকে করিনে। আমাদের দেশের বাড়িতে আজও আমার বাগদী-জ্যেঠাইমা বেঁচে আছে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বলতে পারিনে।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা তোমাকে—এ কি সুরেশের মুখ থেকে শুনে, না আজ তোমার আমাকে দেখে এ কথা মনে পড়ল?

সুরেশের উল্লেখে অচলা ধীরে ধীরে বলিল, অনেকদিন আগে একবার তিনিও বলেছিলেন বটে।

পিসীমা বলিলেন, ঐ ওর স্বভাব। একটা মনে হলে আর রক্ষে নেই—ও তাই

চারিদিকে বলে বেড়াবে। কোনদিন ব্রাহ্মদের সঙ্গে না মিশেই ও ভেবে নিলে, তাদের ও ভারী ঘৃণা করে। এই নিয়ে মহিমের সঙ্গে ওর কতদিন ঝগড়া হবার উপক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ত তাকে একরকম মানুষ করেচি, আমি জানি সে কাউকে ঘৃণা করে না—করবার সাধ্যও ওর নেই। এই দেখ না মা, যেদিন থেকে সে তোমাদের দেখলে, সেদিন থেকে—

কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, অচলার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ মাঝখানেই থামিয়া গেলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কতদূর জানিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিলেও অচলার সন্দেহ হইল যে, অন্ততঃ কতকটা পিসীমার অবিদিত নাই। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই মৌন হইয়া রহিল; অচলা নিজের জন্য লজ্জাটাকে কোনমতে দমন করিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, পিসীমা, আপনিই কি তবে সুরেশবাবুকে মানুষ করেছিলেন?

পিসীমা আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, হাঁ মা, আমিই তাকে মানুষ করেছি। দু'বছর বয়সে ও মা-বাপ হারিয়েছিল। আজও আমার সে কাজ সারা হয়নি—আজও সে বোঝা মাথা থেকে নামেনি, কারুর দুঃখ-কষ্ট কারুর আপদ-বিপদ ও সহ্য করতে পারে না, প্রাণের আশা-ভরসা ত্যাগ করে তার বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত ভয়ে ভয়ে দিন-রাত থাকি বৌমা, সে তোমাকে আব বলতে পারিনে।

অচলা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ফয়জাবাদের ঘটনাটা শুনেছেন?

পিসীমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, শুনেছি বৈ কি মা! ভগবানকে তাই সদাই বলি, ঠাকুর, আমি বেঁচে থাকতে যেন আমাকে আর সে দেখা দেখিয়ো না—মাথায় পা দিয়ে একেবারে আমাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ো না। এ আমি কোনমতে সহ্য করতে পারব না। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ধরিয়া গেল। তাঁহার সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত মুখের সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া অচলার নিজের চোখ-দু'টি সজল হইয়া উঠিল; করুণকণ্ঠে কহিল, আপনি নিষেধ করে দেন না কেন পিসীমা?

পিসীমা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! আমার নিষেধে কি হবে মা? যার নিষেধে সত্যি সত্যি কাজ হবে, আমি তাকেই ত আজ কত বছর থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কিন্তু সে ত যে-সে মেয়ের কাজ নয়। ওকে বাঁচাতে পারে, তেমন মেয়ে ভগবান না দিলে আমি কোথায় পাব মা?

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মনের মত মেয়ে কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না?

পিসীমা কহিলেন, ঐ যে তোমাকে বললুম মা, ভগবান না দিলে কোনদিন কেউ পায় না। যে সুরেশ কখ্খনো এ কথায় কান দেয় না, সে নিজে এসে যেদিন বললে, পিসীমা, এইবার তোমার একটি দাসী এনে হাজির করে দেব, সেদিন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা মুখে জানানো যায় না। মনে মনে আশীর্বাদ করে বললুম, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা। সেদিন আমার কবে হবে যে, বৌ-ব্যাটা বরণ করে ঘরে তুলব। কত বললুম, সুরেশ, আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না, হেসে বললে, পিসীমা, আশীর্বাদের দিন একেবারে গিয়ে দিনস্থির করে এসো। তার পর হঠাৎ একদিন শুধু এসে বললে, সুবিধে হ'ল না পিসীমা, আমি রাত্রির গাড়িতে পশ্চিমে চললুম। কত জিজ্ঞাসা করলুম, কিসের অসুবিধে আমাকে খুলে বল্, কিন্তু কোন কথাই বললে না, সেই রাত্রেই চলে গেল। মনে মনে ভাবলুম, শুধু আমার ছেলের ইচ্ছেতেই ত আর হতে পারে না—সে মেয়েরও ত জন্মজন্মান্তরের তপস্যা থাকা চাই! কি বল মা?

অচলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। এতক্ষণে সে টের পাইল—মেয়েটি যে কে, পিসীমা তাহা জানেন না। তাহার একবার মনে হইল বটে—তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল—কিন্তু পাথরখানা যে সহজে যায় নাই, বুকের অনেকখানি স্থান ছিঁড়িয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

আহারের আয়োজন হইলে পিসীমা অচলাকে আলাদা বসাইয়া খাওয়াইলেন এবং

সঙ্গে করিয়া বাড়ির প্রত্যেক কক্ষ, প্রতি জিনিসপত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া আনিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন মা, ভগবানের আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নেই—কিন্তু এ যেন সেই লক্ষ্মীহীন বৈকুণ্ঠ। মাঝে মাঝে চোখে জল রাখতে পারিনে বৌমা!

চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল, বাহিরে কেদারবাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইতেই পিসীমা তাহার একটা হাত ধরিয়া একবার একটু দ্বিধা করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কিছু না মনে কর মা!

অচলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

পিসীমা বলিলেন, সুরেশের কাছে তোমার আর মহিমের সমস্ত কথা আমি শুনতে পেয়েচি মা। তার মুখেই শুনতে পেলুম, সে গরীব বলে নাকি তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্যেই—

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সত্যি পিসীমা।

পিসীমা অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে অচলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এই ত চাই মা! যাকে ভালবেসেচ তার কাছে টাকাকড়ি, ধনদৌলত কতটুকু? মনে কোন ক্ষোভ রেখো না মা। আমি মহিমকে খুব জানি, সে এমনি ছেলে, যত কেন না দুঃখ তার জন্যে পাও—একদিন ভগবানের আশীর্বাদে সমস্ত সার্থক হবে। তিনি এত বড় ভালবাসার কিছুতেই অমর্যাদা করতে পারবেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি।

অচলা আর একবার হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলো লইল।

তিনি তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, আহা, এমনি একটি বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর করতে পেতুম!

সুরেশ আসিয়া উভয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল। যাবার সময় লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য তাহার মুখখানা অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে মুখে যে কি ছিল, তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, জুড়ি-গাড়ি দ্রুতপদে পথে আসিয়া পড়িল। রাস্তার জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছে, সেইদিকে চাহিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল, এতক্ষণ সে যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহা সুখের কিংবা দুঃখের তাহা বলা শক্ত। কেদারবাবু এতক্ষণ মৌন হইয়াই ছিলেন—বোধ করি সুরেশের ঐশ্বর্যের চেহারাটা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ, বড়লোক বটে!

মেয়ের তরফ হইতে কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। উৎসাহের অভাবে বাকী পথটা তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারে লাগিল এবং সহিস কবাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার যেন তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল। আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, সুরেশকে আমরা কেউ চিনতে পারিনি! একটা দেবতা!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আজ অচলার বিবাহ। বিবাহ-সভার পথে পলকের জন্য সুরেশকে দেখা গিয়াছিল। তাহার পরে সে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, সারা রাত্রির মধ্যে কেদারবাবুর বাটীতে আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

বিবাহ হইয়া গেল। দুই-একটা দিন অচলার মনের মধ্যে বিপ্লব বহিতেছিল। সেই নিমন্ত্রণের রাত্রে সুরেশের পিসীমার কথা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না; আজ তাহার নিবৃত্তি হইল।

মহিমের অটল গাম্ভীর্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য-প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ

দেখিয়াই অচলার সমস্ত বুক আনন্দে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে মনে বলিল, প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিলে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।

শ্বশুরবাটী যাত্রার দিন কেদারবাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া কহিলেন, মা, আশীর্বাদ করি, স্বামীর সঙ্গে দুঃখদারিদ্র্য বরণ করে জীবনের পথে, কর্তব্যের পথে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। বলিয়া তেমনি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরে, শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্লান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সংকীর্ণ কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পালকি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব-বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত তাহার ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র ইঙ্গিতের মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিতা ছিল, কল্পনার সৌরভ ছিল। পালকি হইতে নামিয়া সে বাড়ির ভিতরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কোথাও কোন দিক হইতে কবিত্বের এতটুকু তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম সাক্ষাৎ-দৃষ্টিতে যে এমনি নিরানন্দ, নির্জন—মেটেবাড়ির ঘরগুলো যে এরূপ স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার জানালা-দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য গৃহে জীবন-যাপন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামিসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই একমুহূর্তে মায়ামরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল। বাটীতে শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ কেহই ছিল না। দূরসম্পর্কের এক ঠানদিদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বর-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য ও-পাড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের আজন্ম-পরিচিত সাজসজ্জার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া অব্যক্ত-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; অবশেষে বধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। পাড়ার যাহারা বধূ দেখিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারা অচলার বয়স অনুমান করিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি, গা টেপাটেপি করিল এবং প্রত্যাগমনকালে তাহাদের অস্ফুট কলরবের মধ্যে 'ম্লেচ্ছ' 'মেলেচ্ছ' প্রভৃতি দুই-একটা মিষ্ট কথা আসিয়াও অচলার কানে পৌঁছিল।

অনতিবিলম্বেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কথাটা সত্য যে, মহিম ম্লেচ্ছ-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। বিবাহের পূর্বেই এইপ্রকার একটা জনশ্রুতির কিছু কিছু আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল; এখন বৌ দেখিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, যাহা রটিয়াছিল, তাহা ষোল-আনাই খাঁটি।

প্রতিবেশিনীরা প্রস্থান করিলে ঠানদিদি আসিয়া কহিলেন, নাতবৌ, আজ তা হলে আসি দিদি। অনেকটা দূর যেতে হবে, আর ঘরে না গেলেও নয় কিনা— ছোট নাতিটি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি অনুরোধ-উপরোধের অবকাশমাত্র না দিয়াই চলিয়া গেলেন। তিনি যে এতক্ষণ শুধু একটা সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই যাইতে পারেন নাই এবং সেজন্য মনে মনে ছটফট করিতেছিলেন, অচলা তাহা বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ ঠানদিদির অপরাধ ছিল না। ব্যাপারটা যথার্থই এরূপ দাঁড়াইবে তাহা জানিলে হয়ত তিনি এদিক মাড়াইতেন না। কারণ পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া এ-সকল জিনিসকে ভয় করে না, এত বড় বুকের পাটা পল্লী-ইতিহাসে সুদুর্লভ।

ঠানদিদি অন্তর্ধান করিলে, বাড়ির যদু চাকর ও উড়ে বামুন এবং কলিকাতা হইতে সদ্য আগত অচলার বাপের বাড়ির দাসী হরির মা ভিন্ন সমস্ত বিবাহের বাড়িটা শূন্য খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল, পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে শুরু করিল। হরির মা কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এমন বাড়ি ত দেখিনি দিদি, কেউ যে কোথাও নেই—

অচলা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, অন্যমনস্কের মত শুধু কহিল, হুঁ—

হরির মা পুনরপি কহিল, জামাইবাবুকেও ত দেখচি নে, সেই যে একটিবার দেখা দিয়ে কোথায় গেলেন—

অচলা এ কথার জবাবও দিল না।

কিন্তু এই বনজঙ্গলপরিবৃত শূন্যপুরীর মধ্যে হরির মার নিজের চিত্ত যত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠুক, অচলাকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছে, তাহাকে একটুখানি সচেতন করিবার জন্য কহিল, ভয় কি! সত্যই ত আর জলে এসে পড়িনি! জামাইবাবু এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ততক্ষণ এ-সব ছেড়ে ফেল দিদি, আমি তোরঙ্গ খুলে কাপড়-জামা বার করে দি—

এখন থাক হরির মা, বলিয়া অচলা তেমনি অধোমুখে কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। জীবনের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্ধিত-বেগ বারিধারার মধ্যে কখন যে দিনশেষের অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লীগৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কিছুই ঠাহর হইল না। শুধু আনন্দ-লেশহীন আঁধার ঘরের কোণে কোণে আর্দ্র অন্ধকার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। যদু চাকর আসিয়া হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিল। হরির মা প্রশ্ন করিল, জামাইবাবু কোথায় গো?

কি জানি, বলিয়া যদু ফিরিতে উদ্যত হইল। তাহার সংক্ষিপ্ত ও বিশ্রী উত্তরে হরির মা শঙ্কিত হইয়া কহিল, কি জানি কি-রকম? বাইরে তিনি নেই নাকি?

না, বলিয়া যদু প্রস্থান করিল। সে যে আগন্তুকদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহা বেশ বুঝা গেল। হরির মা অত্যন্ত ভীত হইয়া অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, রকম-সকম আমার ত ভাল ঠেকছে না দিদি! দোরে খিল দিয়ে দেব?

অচলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, খিল দিবি কেন?

হরির মা ছেলেবেলায় দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, আর কখনও যায় নাই। পল্লীগ্রামের চোর-ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতি গল্পের স্মৃতি ছাড়া আর সমস্তই তাহার কাছে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। সে বাহিরের অন্ধকারে একটা চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অচলার গা ঘেঁষিয়া চুপি চুপি কহিল, পাড়াগাঁ—বলা যায় না দিদি। বলিতে বলিতেই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময়ে প্রাঙ্গণের মাঝখান হইতে ডাক আসিল, ঠানদি কোথায় গো? বলিতে বলিতেই একটি কুড়ি-একুশ বৎসরের পাতলা ছিপছিপে মেয়ে জলে ভিজিতে ভিজিতে দোরগোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, আগে একটা নমস্কার করে নিই ঠানদি, তার পরে কাপড় ছাড়ব এখন, বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অচলার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং লণ্ঠনটা অচলার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া চীৎকার করিয়া ডাক দিল, সেজদা, ও সেজদা—

মহিম বাটী পৌঁছিয়াই এই মেয়েটিকে নিজে আনিতে গিয়াছিল। ও-ঘর হইতে সাড়া দিল, কি রে মৃণাল?

এদিকে এসো না, বলচি—

মহিম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, কি রে?

মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে আর একবার ভাল করিয়া অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল, নাঃ—তুমিই জিতেচ সেজদা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।

মহিম বাহির হইতে তাড়া দিয়া কহিল, কিছুতেই আমার কথা শুনবি নে মৃণাল? আবার এই-সব ঠাট্টা? তুই কি আমার কথা শুনবি নে?

বাঃ, ঠাট্টা বৈ কি, অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, ঠানদি, মাইরি বলচি ভাই, তামাশা নয়। আচ্ছা, তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ করেছিলেন কি না!

মহিম কহিল, তবে তুই বকে মর্, আমি বাইরে চললুম।

মৃণাল কহিল, তা যাও না, তোমাকে কি ধরে রেখেচি? অচলার চিবুকটা একবার পরম

স্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই ঠানদি, হিংসে হয় নাকি? এ সংসারে আমারই ত গিন্নী হবার কথা! কিন্তু আমার মা পোড়ারমুখী কি যে মন্তর সেজদার কানে ঢুকিয়ে দিলে—আমি সেজদার দু চক্ষের বিষ হয়ে গেলুম। নইলে—ওরে যদু, ঘোষালমশাই গেলেন কোথায়?

যদু কহিল, পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছেন।

অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে? মৃণালের হাসিমুখ একমুহূর্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, যদু যা বাবা, আলো নিয়ে একবার পুকুরে। বুড়োমানুষ, এখুনি কোথায় অন্ধকারে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙবে।

পরক্ষণেই অচলার মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, কি কপাল করেছিলুম ভাই ঠানদি, কোথাকার এক বাহাত্তুরে বুড়ো ধরে আমাকে দিলে—তার সেবা করতে করতে আর তাকে সামলাতে সামলাতেই প্রাণটা গেল। আচ্ছা ভাই, আগে ও-ঘর থেকে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি, তার পরে কথা হবে। কিন্তু সতীন বলে রাগ করতে পাবে না, তা বলে দিচ্চি—আর বল ত, না হয়, আমার বুড়োটাকেও তোমায় ভাগ দেব। বলিয়া হাসির ছটায় সমস্ত ঘরটা যেন আলো করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

এই শ্রেণীর ঠাট্টা-তামাশার সহিত অচলার কোনদিন পরিচয় ঘটে নাই। সমস্ত পরিহাসই তাহার কাছে এমনি কুরুচিপূর্ণ ও বিশ্রী ঠেকিতেছিল যে, লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত বড় নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা যে কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিতে পারিত না। সুতরাং সমস্ত রসিকতাই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিতেছিল। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার আগমনে তাহার নির্বাসনের অর্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল ; এবং এ কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—সমস্ত জানিবার জন্য অচলা উৎসুক হইয়া উঠিল!

হরির মা কহিল, এ মেয়েটি কে দিদি? খুব আমুদে মানুষ।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, হাঁ।

ভিজে কাপড় ছাড়িয়া মৃণাল এ-ঘরে আসিয়া কহিল, কেবল ঠাট্টা-তামাশা করেই গেলুম ঠানদি, আমার আসল পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয়নি। আর পরিচয় এমন কি-ই বা আছে? তোমার বর যিনি, তিনি হচ্চেন আমার মায়ের বাপ। আমি তাই ছেলেবেলা থেকে সেজদা-মশাই বলে ডাকি। বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমার বাবা আর তোমার শ্বশুর—দুজনে ভারী বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা পড়ে, ডান হাতটা ভেঙে গিয়ে বাবার যখন চাকরি গেল, তখন তোমার শ্বশুর এই বাড়িতে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তার অনেক পরে আমার জন্ম হয়। সেজদা তখন আট বছরের ছেলে। তাঁর মা ত তাঁর জন্ম দিয়েই মারা যান ; বড় দু ছেলে আগে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। তাই আমার মা আসা পর্যন্তই হলেন এ বাড়ির গিন্নী। তার পরে বাবা মারা গেলেন, আমরা এ বাড়িতেই রইলুম। তার অনেক পরে তোমার শ্বশুর মারা গেলেন, আমরা কিন্তু রয়েই গেলুম। এই সবে পাঁচ বছর হল পলাশীর ঘোষাল-বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়ে সেজদা আমাকে দূর করে দিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলেও যা হোক একটু জোর থাকত।

বড়বৌ এই ঘরে নাকি? বলিয়া একটি বৃদ্ধগোছের বেঁটেখাটো গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃণাল কহিল, এসো, এসো। অচলার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ঐটি আমার কর্তা ঠানদি। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, ওই বাহাত্তুরে বুড়োর সঙ্গে আমাকে মানায়? এ জন্মের রূপ-যৌবন কি সব মাটি হয়ে গেল না ভাই?

অচলা জবাব দিবে কি, লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ভদ্রলোকটির নাম ভবানী ঘোষাল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, বিশ্বাস করবেন না ঠানদি—সব মিছে কথা। ওর কেবল চেষ্টা—আমাকে খেলো করে দেয়। নইলে, বয়স ত আমার এই সবে বায়ান্ন কি তি—

মৃণাল কহিল, চুপ করো, চুপ করো। এই সেজদাটি যে আমার কি শত্রু, তা ভগবানই

জানেন। আমাকে সর্বদিকে মাটি করেছেন। আচ্ছা, এই বুড়োর হাতে দেওয়ার চেয়ে, হাত-পা বেঁধে কি আমায় জলে ফেলে দেওয়া ভাল হত না ঠানদি? সত্যিই বলো ভাই।

অচলা তেমনি আরক্তমুখে নীরব হইয়াই রহিল।

ঘোষাল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অচলার লজ্জানত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা একটা মস্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাঁচালেন ঠানদি, এ ছুঁড়ীর অহংকার এতদিনে ভাঙল। রূপের দেমাকে এ চোখে-কানে দেখতেই পেত না।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কেমন এইবার হল ত? বনদেশে এতদিন শিয়াল-রাজা ছিলে, শহরের রূপ কারে বলে, এইবার চেয়ে দেখো।

মৃণাল কহিল, তাই বৈ কি! আমার যেখানে অহংকার সেখানে ভাঙতে যায়—সাধ্যি কার? বলিয়া স্বামীর প্রতি সে যে গোপন কটাক্ষ করিল, অচলার চোখে সহসা তাহা পড়িয়া গেল।

ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন, শুনলেন ত ঠানদি—একটু সাবধানে থাকবেন, দুজনের যে ভাব, যে আসা-যাওয়া, বলা যায় না—আর আমি ত বাহাত্তুরে বুড়ো, মাঝে থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! নিজেরটি সামলে চলবেন—হিতৈষী বুড়োর এই অনুরোধ।

মৃণাল, তোরা কি সারারাত্রি এই নিয়েই থাকবি?

কি করব সেজদা?

একবার রান্নাঘরের দিকেও যাবিনে?

মৃণাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি ভুল হয়েই গেছে সেজদা, উড়ে বামুনটাকে আমার আগে দেখে আসা উচিত ছিল। আচ্ছা, তোমরা বাইরে যাও, আমরা যাচ্চি।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কে?

মৃণাল কহিল, আমি আর ঠানদি। অচলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমি যখন এসেচি, তখন এ সংসারের সমস্ত চার্জ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবো সেজদি।

মহিম এবং ভবানী বাহিরে চলিয়া গেল। মৃণাল অচলাকে পুনরায় কহিল, আমার দু'দিন আগে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু শাশুড়ীর হাঁপানির জ্বালায় কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হও সেজদি, আমি এখ্খুনি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। বলিয়া মৃণাল রান্নাঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল এবং গাঢ় মেঘ কাটিয়া গিয়া নবমীর জ্যোৎস্নায় আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল।

রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া মৃণাল অচলার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, ঠানদিদির চেয়ে সেজদি ডাকটা ভালো, কি বল সেজদি?

অচলা মৃদুস্বরে কহিল, হাঁ।

মৃণাল কহিল, সম্পর্কে তুমি বড় হলেও বয়সে আমি বড়। তাই ইচ্ছে হয়, আমাকেও তুমি মৃণালদিদি বলে ডেকো, কেমন?

অচলা কহিল, আচ্ছা।

মৃণাল কহিল, আজ তোমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে আনলুম; কিন্তু কাল একেবারে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে দেব, কেমন?

অচলা কহিল, চাবিতে আমার কাজ নেই ভাই।

মৃণাল হাসিয়া কহিল, কাজ নেই? বাপ রে, ও কি কথা! ভাঁড়ারটা কি তুচ্ছ জিনিস সেজদি যে, বলচ—তার চাবিতে কাজ নেই? গিন্নীর রাজত্বের ওই ত হল রাজধানী গো।

অচলা কহিল, হোক রাজধানী, তাতে আমার লোভ নেই। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভারী লোভ। শিগ্‌গির ছেড়ে দিচ্চনে মৃণালদিদি।

মৃণাল দুই বাহু বাড়াইয়া অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সতীনকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না করে, ঘরে ধরে রাখতে চাও—এ তোমার কি-রকম বুদ্ধি সেজদি?

অচলা আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এই ঠাট্টাগুলো আমার ভাল লাগলো না ভাই। আচ্ছা, এ দেশে সবাই কি এই রকম করে তামাশা করে?

মৃণাল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, না গো ঠানদি, করে না। এ শুধু আমিই করি, সবাই এ জিনিস পাবে কোথায় যে করবে?

অচলা কহিল, পেলেও আমরা মুখে আনতে পারিনে ভাই। আমাদের কলকাতার সমাজে অনেকে হয়ত ভাবতে পর্যন্ত পারে না যে, কোন ভদ্রমহিলা এ-সব মুখে উচ্চারণ করতে পারে।

মৃণাল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরঞ্চ জোর করিয়া অচলাকে আর একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমাদের শহরের ক'জন ভদ্রমহিলা আমার মত এমন করে জড়িয়ে ধরতে পারে, বল ত সেজদি? সবাই বুঝি সব কাজ পারে? এই ত তোমাকে কতক্ষণই বা দেখেচি, এর মধ্যেই মনে হচ্ছে, আমার বোন ছিল না, একটি ছোট বোন পেলুম। আর এ শুধু কথার কথা নয়, সারাজীবন ধরে আমাকে এর প্রমাণ যোগাতে হবে—তা মনে রেখো। এখানে আর ঠাট্টা-তামাশা চলবে না।

অচলা শিক্ষিতা মেয়ে। এই পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধসমাজের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন যে কিভাবে কাটিবে, তাহা বাটীতে পা দিয়াই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। এ সুযোগ সে সহজে ছাড়িয়া দিল না। পরিহাসকে গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া কহিল, মৃণালদিদি, সত্যই কি এর প্রমাণ তুমি সারা জীবনভোর যোগাতে পারবে?

মৃণাল বলিল, আমরা ত শহরের মহিলা নই ভাই—যোগাতে হবে বৈ কি! যে সত্য তোমাকে ছুঁয়ে করে ফেললুম, সে ত মরে গেলেও আর উলটোতে পারব না!

অচলা এ কথার আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; হাসিয়া কহিল, শিগ্‌গির পালাবে না, তাও অমনি বল।

মৃণাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বোকা পেয়ে বুঝি ক্রমাগত ফাঁস জড়াতে চাও সেজদি? কিন্তু সে ত আগেই বলেচি ভাই, ভাল করে চার্জ বুঝিয়ে না দিয়ে পালাব না।

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, চার্জ বুঝে নেবার আমার একতিল আগ্রহ নেই।

মৃণাল বলিল, সেইটে আমি করে দিয়ে তবে যাবো, কিন্তু বেশীদিন আমার ত বাড়ি ছেড়ে থাকবার জো নেই ভাই! জান ত, কত বড় সংসারটি আমার মাথার ওপর।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, জানিনে।

মৃণাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেজদা আমার কথা তোমাকে আগে বলেন নি?

অচলা কহিল, না, কোনদিন নয়। তাঁর বাড়িঘর সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানিয়ে-ছিলেন; কিন্তু যা সকলের আগে জানানো উচিত ছিল, সেই তোমার কথাই কেন যে কখনো বলেন নি, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হচ্ছে মৃণালদিদি!

মৃণাল অন্যমনস্কের মত বলিল, তা বটে।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গে বুঝি ওঁর প্রথম বিয়ের কথা হয়?

মৃণাল তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, তবে হল না কেন? হলেই ত বেশ হত।

এতক্ষণে কথাটা মৃণালের কানের ভিতর গিয়া ঘা দিল। সে অচলার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, সে হবার নয় ব'লে হল না।

অচলা তথাপি প্রশ্ন করিল, হবার বাধা কি ছিল? তুমি ত আর সত্যিই তাঁর কোন আত্মীয়া নও? তা ছাড়া, ছেলেবেলায় যে ভালবাসা জন্মায় তাকে উপেক্ষা করাও ত ভালো কাজ নয়!

তাহার প্রশ্নের ধরনে মৃণাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে অচলার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ-সব কি তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ সেজদি? তুমি কি মনে কর, ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই? না, মানুষে বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ-জন্মের নয় সেজদি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতে তিনি সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায় আসে!

অচলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা মৃণালদিদি, আমি তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃণালের

কাছে তাহা অগোচর রহিল না। সে অচলার হাতখানি সস্নেহে মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, সেজদি তুমি শুধু সেদিন স্বামী পেয়েচ, কিন্তু আমি এই পাঁচ বছর ধরে তাঁর সেবা করচি। আমার এই কথাটা শুনো ভাই, স্বামীর এই দিকটা কোনদিন নিজের বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা ক'রো না। তাতে বরং ঠকাও ঢের ভাল, কিন্তু জিতে লাভ নেই।

যদু বাহির হইতে কহিল, দিদি, বাবুদের খাবার জায়গা হয়েছে।

আচ্ছা চল, আমি যাচ্চি, বলিয়া মৃণাল হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মুখখানা কাছে টানিয়া আনিয়া একটু চুমা খাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ওলো সেজদি!

অচলা পাশের ঘর হইতে ব্যস্ত হইয়া এ ঘরে আসিয়া পড়িল।

মৃণালের কোমরে আঁচল জড়ানো—সে একটা ছোট দেরাজ একলাই টানাটানি করিয়া সোজা করিয়া রাখিতেছিল। অচলা ঘরে ঢুকিতেই, সে মহা রাগতভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে মুখপোড়া মেয়ে, তুমি নবাবের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, আর আমি তোমার শোবার ঘর গুছিয়ে দেব? নাও বলচি ওই ঝাঁটাটা তুলে—ঐ কোণটা পরিষ্কার করে ফেল। বলিয়া হাসি আর চাপিতে না পারিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চেঁচামেচি শুনিয়া হরির মাও পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে কহিল, তোমার এক-কথা দিদি! বাড়িতে কত গণ্ডা দাসদাসী—দিদিমণির কি কোনদিন ঝাঁটা হাতে করা অভ্যাস আছে নাকি, যে আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ঘর ঝাঁট দিতে যাবে? আমি দিচ্চি, বলিয়া সে ঝাঁটাটা তুলিতে যাইতেছিল—মৃণাল কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, তুই থাম্ মাগী। দিদিমণিকে আমার চেয়ে তুই বেশী চিনিস নাকি যে, সালিসি করতে এসেচিস? বলিয়া অচলার হাতের মধ্যে ঝাঁটা গুঁজিয়া দিয়া হরির মাকে হাসিয়া বলিল, ওরে, তোর দিদিমণি ইচ্ছে করলে যে কাজ পারে, তা তোর সাতগণ্ডা পাড়াগাঁয়ের মেয়েতে পারে না। অচলাকে কহিল, নাও ত সেজদি, ঐ কোণটা চট্ করে ঝেড়ে ফেল ত।

অচলা ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, মৃণালদিদি, তুমি যাদুবিদ্যে জানো, না?

মৃণাল কহিল, কেন বল দেখি?

অচলা বলিল, তা নইলে এই বাড়ি পরিষ্কার করবার জন্য ঝাঁটা হাতে নিয়েচি, এ ভোজবিদ্যে নয় ত কি?

মৃণাল কহিল, তুমি নেবে না ত কে নেবে গো? তোমার বাড়ি ঝাঁট-পাট দেবার জন্যে কি ও-পাড়া থেকে পদির মাসী আসবে নাকি? নাও, কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, সন্ধ্যা হয়।

অচলা কাজ করিতে করিতে হাসিয়া কহিল, নিজেও একদণ্ড বসবে না, আমাকেও খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে, সত্যি বলচি মৃণালদিদি, এই পাঁচ-ছ'দিন যে খাটান আমাকে খাটিয়েচ, চা-বাগানের কর্তারাও বোধ করি তাদের কুলীদের এত করে খাটায় না।

মৃণাল কাছে আসিয়া তাহার চিবুকের উপর আঙুলের একটা ঘা দিয়া বলিল, তাই ত, ঘরদোর দেখে মনে হচ্ছে, বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে, খাটুনি বলছিস ভাই সেজদি—যেদিন স্বামী-পুত্র-ঘরকন্না নিয়ে, নাবার খাবার সময় পাবে না, শুধু তখনি ত এই মেয়েমানুষ-জন্মটা সার্থক হবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমার সেদিন আসে—এখুনি খাটুনির হয়েচে কি গিন্নী! বলিয়া হাসিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া গেল।

হরির মা হঠাৎ ডাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সেই আশীর্বাদ কর দিদি, শুধু সেই আশীর্বাদই কর। তাহার অচলার মাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল—সেই সাধ্বী অত্যন্ত অসময়ে যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন একমাত্র মেয়েকে হরির মায়ের হাতেই সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই মেয়ে এখন এতবড় হইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।

মৃণাল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, আ মর্! ছিঁচকাঁদুনী মাগী, কাঁদিস কেন?

হরির মা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাঁদি কি সাধে দিদি! তোমার কথা শুনে কান্না যে কিছুতে ধরে রাখতে পারিনে। মাইরি বলচি, তুমি না এসে পড়লে এ বাড়িতে একটা রাতও যে আমাদের কি করে কাটত, তাই আমি ভেবে পাইনে।

আজ ছয় দিন হইল, মৃণাল এ বাটীতে আসিয়াছে। আসিয়া পর্যন্ত বাড়ি-ঘরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষগুলোর পর্যন্ত চেহারা বদলাইয়া দিবার কার্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার সব কাজকর্ম, হাসিঠাট্টার মধ্যে হইতে একটা যাই-যাই ভাব অচলাকে পীড়া দিতেছিল। কারণ, মৃণালের কাজে কথায়, আচারে ব্যবহারে এতবড় একটা সহজ আত্মীয়তা ছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া অচলা উঁকি মারিয়া তাহার নূতন জীবনের অচেনা ঘরকন্নাকে চিনিয়া লইবার সময় পাইতেছিল এবং ইহার চেয়েও একটা বড় জিনিসকে তাহার ভাল করিয়া এবং বিশেষ করিয়া চিনিবার কৌতূহল হইয়াছিল, সে স্বয়ং মৃণালকে। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে সচ্ছল নহে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অলংকারবর্জিত হাত-দুখানির পানে চাহিলেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ স্বামী—কোন দিক দিয়াই যাহাকে তাহার উপযুক্ত বলিয়া অচলার মনে হয় না; তাহার উপর বাড়িতে পরিশ্রমের অন্ত নাই—জরাজীর্ণ শাশুড়ী মর মর অবস্থায় অহর্নিশি গলায় ঝুলিতেছে, কারণে অকারণে তাহার বকুনি-ঝকুনির বিরাম নাই—এ কথা সে মৃণালের নিজের মুখেই শুনিয়াছে—অথচ কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবনযাত্রার পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারে না। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন-কিছুর যেন অস্তিত্ব নাই—এমনি এই মূর্খ পাড়াগাঁয়ের মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাঁকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও মলিনতার অতীত, ঠিক তেমনি যেন এই লেখাপড়া না-জানা দরিদ্র পল্লী-লক্ষ্মীটিও সর্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহের ক্লান্তি, না আছে তাহার মুখের শ্রান্তি। সুতরাং অচলাকেও সে যে সকল অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্রান্ত টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, যদিচ তাহার কোনটার সহিত তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি না বলিযা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানটা যেন অতি-বড় লজ্জার কথা, এমনই অচলার মনে হইতেছিল। নিজের ভাগ্যটাকেও যে একবার ধিক্কার দিবার জন্য সে একমুহূর্ত বসিয়া শোক করিবে, এই ছয়টা দিনের মধ্যে সে ফাঁকটুকু পর্যন্ত তাহার মিলে নাই—সমস্ত সময়টা সে কাজ দিয়া, হাসি-গল্প দিয়া এমনি ভরাট করিয়া গাঁথিয়া আনিতেছিল। তাই তাহার শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিত মাত্রেই অচলার মনে হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত মেটেবাড়িটা তাহার দরজা-জানালা-দেয়ালসমেত যেন তাসের ঘরের মত চক্ষের নিমিষে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে, মৃণালদিদি চলিয়া গেলে এখানে সে একদণ্ডও তিষ্ঠিবে কি করিযা?

সন্ধ্যার পর একসময়ে অচলা কহিল, কেবল যে পালাই পালাই করচ মৃণালদিদি, বাপের বাড়ি এসে কে এত শীঘ্র ফিরে যায় বল ত? তা হবে না—আমি যতদিন না কলকাতায় ফিরে যাব, ততদিন তোমাকে থাকতেই হবে।

মৃণাল কহিল, কি করব ভাই সেজদি, শাশুড়ীবুড়ী না নিজে মরবে, না আমাকে একদণ্ড ছেড়ে দেবে। আমি বলি, বুড়ী তুই মর্। তোর ছেলের বয়স ষাট হতে চলল, শেষে তাকে খেয়ে তবে যাবি? তা এত যে দিবারাত্রি কাসে, দমটা ত একবারও আটকে যায় না!

অচলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমাকে বুঝি তিনি দেখতে পারেন না?

মৃণাল মাথা নাড়িয়া কহিল, দুটি চক্ষে না।

অচলা কহিল, আর তুমি?

মৃণাল বলিল, আমিও না। বুড়ীকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে আমি পাঁচ-সিকের হরির-লুট দেব মানত করে রেখেচি যে!

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না মৃণালদিদি! তুমি সংসারে কাকে যে দেখতে পারো না, তা তোমার মুখের কথা শুনে কিছুতেই বলবার জো নেই! হয়ত এই বুড়ীকেই তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস।

মৃণাল হাসিমুখে কহিল, সবচেয়ে বেশী ভালবাসি? তা হবে। বলিয়া অচলার গাল টিপিয়া দিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাই-যাই করিয়া মৃণালের আবার কিছুদিন গড়াইয়া গেল। একদিন হঠাৎ অচলার চোখে পড়িল, যাবার দিকে তাহার মুখে যত তাড়া, কাজের দিকে তত নয়। সত্যই চলিয়া যাইতে সে যেন ঠিক এত উৎসুক নয়। এতদিন তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে সে যেভাবে চিনিয়া লইতেছিল, এখন তাহার আবরণের বাহিরে আসিয়া, পৃথিবীর সে চেহারা তাহার চোখে যেন আর রহিল না। এ বাটিতে পা দিয়া পর্যন্ত যখনই তাহাকে স্বামীর সঙ্গে কোন-একটা হাসি-তামাশা করিতে দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে যেন সূচ ফুটিতে লাগিল। এ-সব কিছুই নয়, ইহার মধ্যে যথার্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নাই—মন খারাপ করিবার কোন হেতু নাই—তাহার মন বড় অশুচি—এমনি করিয়া আপনাকে সে যতই শাসন করিবার চেষ্টা করে, ততই কোথা হইতে সংশয়ের বিপরীত তর্ক তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বারংবার মুখ তুলিয়া তাহাকে ভ্যাঙচাইতে থাকে। মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়। সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই, তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি! যে তামাশা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতেও পারে! অথচ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিতমুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই কোথায় কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজকাল এ চিন্তা কোনমতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না। মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজকর্ম করিতে করিতেও তাহার এক শ'বার মনে হয়, সে নিজে মেয়েমানুষ হইয়া যখন বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষার বেদনা বহন করিতে থাকিয়াও ইহাকে কোনমতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না, একত্র এতকাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষমানুষে এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

মৃণাল আসিলেই যে উড়ে বামুন তাহার রান্নাঘরের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিত, এ কথা অচলা জানিত না। এবারেও সে ছুটি পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু অচলা কেবলই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, মৃণাল নিজের হাতে রাঁধিয়া মহিমকে খাওয়াইতে যেন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আজ সকালে সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, মৃণালদিদি, আজ তোমার ছুটি।

মৃণাল বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিসের ভাই সেজদি?

অচলা কহিল, রান্নার। আজ আমিই রাঁধব।

মৃণাল অবাক হইয়া বলিল, পোড়া কপাল! তুমি আবার রাঁধবে কি?

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, বাঃ, আমি বুঝি জানিনে? বাড়িতে আমি ত কতদিন রেঁধেছি। সে হবে না মৃণালদি, আজ আমি রাঁধবই।

তাহার আগ্রহ দেখিয়া মৃণাল হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল; কহিল, সে কি হয়, আমি থাকতে তুমি কি দুঃখে রান্নাঘরের ধুঁয়োর মধ্যে কষ্ট পেতে যাবে ভাই?

তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অচলা জিদ করিয়া বলিল, তা হলে বামুন থাকতে তুমিই বা কেন কষ্ট কর? এবেলা আমি নিশ্চয় রাঁধব।

কেন যে তাহার এই আগ্রহ, মৃণাল তাহার কিছুই বুঝিল না। সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বা রে মেয়ে! একে একে বুঝি তুমি আমার সব কেড়েকুড়ে নিতে চাও? সবই ত নিয়েছ, দুটো দিন রেঁধে খাইয়ে যাবো তাও বুঝি সইচে না? এখন থেকে সতীনের হিংসে শুরু হ'ল বুঝি?

অচলার বুকের ভিতরটায় আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মৃণালের শেষ কথাটা গিয়া তাহার ঈর্ষার ব্যথায় সজোরে ঘা দিল। সে একমুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া শুধু সংক্ষেপে কহিল, না, আজ আমিই রাঁধব।

এতক্ষণে মৃণাল দেখিতে পাইল, অচলা রাগ করিয়াছে। তাই আর তর্কাতর্ক না করিয়া

বিস্ময়মুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হলে তুমিই রাঁধো গে। আচ্ছা চল, কোথায় কি আছে, দেখিয়ে দিয়ে আসি।

মহিম যে এতক্ষণ ঘরেই ছিল, তাহা দুজনের কেহই জানিত না। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মহিম অচলাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মৃণাল যে-ক'দিন আছে ওই রাঁধুক না।

কেন যে সে আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা জানিত। কিন্তু সে কথা ত খুলিয়া বলা চলে না।

অচলা আরও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ চাপিয়া শুধু কহিল, না, আমিই রাঁধতে যাচ্ছি, বলিয়াই বাদানুবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

অচলা জোর করিয়া রাঁধিতে গেল। রান্নার কাজে সে কাহারও চেয়েই খাটো ছিল না; কিন্তু এদিকে সে মন দিতেই পারিল না। বিগত দিনের সমস্ত কাহিনী নড়িতে চড়িতে কেবলই খচখচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত মহিম কোনদিনই তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের অনতিকাল পূর্বে সুরেশকে লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এই-সকল কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া মনে করিয়া আজ সহসা সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মহিম তাহার প্রতি চিরদিনই উদাসীন; এমন কি পিতার অভিমতে পূর্ব-সম্বন্ধ যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনও মহিম যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহার যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এখানে আসা অবধি মৃণাল ও অচলা একসঙ্গে আহারে বসিত। দুপুরবেলা হরির মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া অচলা মৃণালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মৃণালদিদির জ্বরের মত হয়েছে, তিনি খাবেন না।

অচলা কোন কথা না কহিয়া মৃণালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মৃণাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া ছিল; অচলা কহিল, খাবে চল মৃণালদিদি।

মৃণাল চাহিয়া দেখিয়া, একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি খাও গে ভাই সেজদি, আমার শরীর ভাল নেই।

অচলা শঙ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে? জ্বর?

মৃণাল কহিল, তাই মনে হচ্চে। আজ উপোস করলেই সেরে যাবে।

অচলা হেঁট হইয়া হাত দিয়া মৃণালের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, আমি অত বোকা নই মৃণালদিদি, খাবে চল।

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মাইরি বলচি সেজদি, আমার খাবার জো নেই। কেন তুমি আবার কষ্ট করে ডাকতে এলে ভাই! বরং চল, আমি না হয় গিয়ে তোমার সুমুখে বসচি।

অচলা কঠিন হইয়া কহিল, একজন অভুক্ত বন্ধুকে মুখের সামনে বসিয়ে রেখে খাবার শিক্ষা আমরা পাইনি মৃণালদিদি।

মৃণাল তথাপি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, আর বন্ধুর যদি ভোজনের উপায় না থাকে, তা হলে?

অচলা তেমনিভাবে জবাব দিল, নেই কেন আগে শুনি? তোমার জ্বর হয়নি, হয়েছে রাগ। নিজে না খেয়ে আমাকেও শুকোবে, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে ত স্পষ্ট করে বল, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, স্বামীর দিব্য করে বলচি সেজদি, আমি এতটুকু রাগ করিনি। কিন্তু আমার খাবার জো নেই। চল দিদি, আমি তোমাকে কোলে করে বসে খাওয়াই গে।

অচলা কহিল, তা হলে জ্বর-টর নয়? ওটা শুধু ছল।

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এতক্ষণে বুঝলুম। কিন্তু গোড়াতেই যদি মুখ ফুটে বলে দিতে মৃণালদিদি, আমার ছোঁয়া তুমি ঘৃণায় মুখে দিতে পারবে না, তা হলে এই অন্যায়

জিদ করে তোমাকে কষ্ট দিতুম না, নিজেও দাসী-চাকরের সামনে লজ্জায় পড়তুম না। তা সে যাক—আমাকে মাপ ক'রো ভাই, কিন্তু দুধ ত ছোঁয়া যায় না শুনেছি, তাই এক বাটি এনে দি—আর যদু গিয়ে দোকান থেকে কিছু সন্দেশ কিনে আনুক। কি বল?

প্রথমটা মৃণাল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল; খানিক পরে সে ভাব কাটিয়া গেলেও সে কথা কহিল না, অধোমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

অচলা পুনরায় খোঁচা দিয়া কহিল, কি বল?

মৃণাল আঁচলে চোখ মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল, এখন থাক।

অচলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মৃণাল মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বুড়া শাশুড়ীকে তাহার রাঁধিয়া দিতে হয়; তিনি অতিশয় শুচিবাই-প্রকৃতির লোক; এ কথা শুনিলে কোনকালে যে তাহার জলস্পর্শ করিবেন না, নিদারুণ অভিমানে এ কথা সে আভাসেও অচলার কাছে প্রকাশ করিল না।

অচলা রান্নাঘরে গিয়া সেখানকার কাজকর্ম সারিয়া হাত ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আর যে-কোন কারণেই হোক, কেবল ঘৃণায় যে তাহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন মৃণাল স্পর্শ করে নাই এ কথা মিথ্যা বলিয়াই অচলা মনে মনে জানিত বলিয়া অমন করিয়া আজ আঘাত করিয়াছিল। সত্য বলিয়া বুঝিলে, মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও অচলা পারিত না। অথচ যে প্রভাত আজ কলহের দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যাহ্নে ভগবান কাহারও অদৃষ্টেই যে প্রস্তুত অন্ন মাপান নাই, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিল।

অপরাহ্নবেলায় গরুর গাড়ি আসিয়া সদরে উপস্থিত হইল। মৃণাল অচলার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, নমস্কার করতে এসেছি—সেজদি, বাড়ি চললুম। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, একটা ডাক দিয়ো, আবার এসে হাজির হব। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু যাবার সময় একটা কথাও কবে না ভাই? বলিয়া ক্ষণকাল উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু অচলা একটা কথাও কহিল না, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়াই মৃণাল দেখিতে পাইল, মহিম বাড়ি ঢুকিতেছে। কহিল, একটু দাঁড়াও সেজদা, তোমাকেও একটা নমস্কার করি।

মহিম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু না খেয়েই বাড়ি চললি মৃণাল? না হয়, রাত্রিটা থেকে সকালেই যাসনে!

মৃণাল শুধু একটুখানি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না সেজদা, যদু গাড়ি ডেকে এনেছে, আজ যাই—কিন্তু আর একদিন নিয়ে এসো। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিয়া পায়ের ধুলো লইল। বলিল, মাথা খাও সেজদামশাই, আর একদিন আনতে যেন ভুলো না ভাই।

আজ মহিম হাসিয়া ফেলিল। কহিল, পোড়ামুখী, তোর স্বভাব কি কোনদিন যাবে না রে?

মরলে যাবে, তার আগে নয়, বলিয়া আর একবার হাসিয়া মৃণাল গিয়া গাড়িতে উঠিল।

আজই এত অকস্মাৎ মৃণাল চলিয়া যাইতে পারে, অচলা তাহা কল্পনাও করে নাই। মৃণাল নিজে খায় নাই, তাহাকে খাইতে দেয় নাই, এই অপরাধের সব চেয়ে বড় দণ্ড অচলা যে কি করিয়া দিবে, একলা ঘরে বসিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত সে এই চিন্তাই করিতেছিল। যে ভালবাসে, তাহাকে ঘৃণা করার অপবাদ দেওয়ার মত গুরুতর শাস্তি আর নাই, এ কথা ভালবাসাই বলিয়া দেয়। এই গুরুদণ্ডই মৃণালের প্রতি মনে মনে বিধান করিয়া অচলা বসিয়া ছিল। মৃণালদিদি যে তাহাকে ব্রাহ্মমেয়ে বলিয়া অন্তরের মধ্যে ঘৃণা করে, উঠিতে বসিতে এই খোঁচা দিয়া সে আজকের শোধ লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

অথচ অভুক্ত মৃণাল বিদায় লইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহারও চোখের জলে দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মৃণালের মুখে সেই একফোঁটা হাসির শব্দ তপ্তমরুর মত চক্ষের পলকে তাহার উদ্গত অশ্রু শুষ্ক করিয়া ফেলিল; এবং

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সমস্ত চিত্ত দিয়া উভয়ের বিদায়ের পালা দর্শন করিয়া ঠিক বজ্রাহত তরুর মত নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনতিকাল পরে মহিম আসিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার আজন্ম শিক্ষা-সংস্কার তাহাকে ইতরতার হাত হইতে রক্ষা করিল। প্রাণপণ বলে আত্মসংবরণ করিয়া, কঠোর হাসি হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করার মত বিড়ম্বনা বোধ করি সংসারে অল্পই আছে, না?

মহিম স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলছ ত? বুঝতে পারি, প্রথমটা তোমার নানাপ্রকার কষ্ট হবে ; কিন্তু মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনাও হবে না, এ আমি কিছুতেই ভাবিনি। কেননা, তার সঙ্গে কোনদিন কারও ঝগড়া হয়নি।

অচলা কহিল, আমার সঙ্গেই যে পাড়াসুদ্ধ লোকের চিরকাল ঝগড়া হয়, এ খবরই বা তুমি কোথায় শুনলে?

মহিম ধীরে ধীরে বলিল, তোমার সমস্তদিন খাওয়া হয়নি—থাক, এ-সব কথায় এখন কাজ নেই।

অচলা অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মৃণালদিদিও সমস্তদিন না খেয়েই বাড়ি গেলেন ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতে ত তোমার আপত্তি হয়নি!

মহিম আশ্চর্য হইয়া বলিল, এ-সব তুমি কি বলচ অচলা?

অচলা কহিল, আমি এই বলচি যে, কি এমন গুরুতর অপরাধ তোমার কাছে করেচি, যাতে এই অপমানটা আমাকে না করলে তোমার চলছিল না?

মহিম হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কহিল, কি বলছ? এ-সব কথার মানে কি?

অচলা অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মানে এই যে, কি অপরাধে আমাকে এই অপমান করলে তুমি? তোমার কি করেছি আমি?

মহিম বিহ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তোমাকে অপমান করেছি?

অচলা বলিল, হাঁ, তুমি।

মহিম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, মিছে কথা।

অচলা মুহূর্তকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, আমি কোনদিন মিছে কথা বলিনে। কিন্তু সে কথা যাক ; এখন তোমার নিজের যদি সত্যবাদী বলে অভিমান থাকে, সত্য জবাব দেবে?

মহিম উৎসুক-দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল।

অচলা প্রশ্ন করিল, মৃণালদিদি যা করে আজ চলে গেলেন, তাকে কি তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমান করা বলে না?

মহিম বলিল, কিন্তু তাতে আমাকে জড়াতে চাও কেন?

অচলা কহিল, বলচি। আগে বল, তাতে কি বলা হয় এখানে?

মহিম কহিল, বেশ, তাই যদি হয়—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, হয় নয়, ঠিক জবাব দাও।

মহিম কহিল, হাঁ, পাড়াগাঁয়েও অপমান বলেই লোকে মনে করে।

অচলা কহিল, করে ত? তবে তুমি সমস্ত জেনে শুনে এই অপমান করিয়েছ। তুমি নিশ্চয় জানতে, তিনি আমার ছোঁয়া রান্না খাবেন না। ঠিক কি না? বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া মহিমের বুকের ভিতর পর্যন্ত যেন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। মহিম তেমনি অভিভূতের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে সুরেশের চীৎকার আসিয়া পেঁ'ছিল—মহিম! কোথা হে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এ কি, সুরেশ যে! এস এস, বাড়ির ভেতরে এস। ভাল ত?

মহিমের স্বাগত-সম্ভাষণ সমাপ্ত হইবার পূর্বে সুরেশ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের গ্লাডস্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, হাঁ, ভাল। কিন্তু কি রকম, একা দাঁড়িয়ে যে? অচলা বধূঠাকুরানী একমুহূর্তে সচলা হয়ে অন্তর্ধান হলেন কিরূপে? তাঁর প্রবল বিশ্রম্ভালাপ মোড়ের ওপর থেকে যে আমাকে এ বাড়ির পাত্তা দিলে।

বস্তুতঃ অচলার শেষ কথাটা রাগের মাথায় একটু জোরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক দ্বারের বাহিরেই তাহা সুরেশের কানে গিয়াছিল।

সুরেশ কহিল, দেখলে মহিম, বিদুষী স্ত্রী-লাভের সুবিধে কত? ক'দিনই বা এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের প্রেমালাপের ধরনটা পর্যন্ত এমনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, খুঁত বের করে দেয়, পাড়াগেঁয়ে মেয়েরও তা সাধ্য নেই।

মহিম লজ্জায় আকর্ণ রাঙ্গা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ ঘরের দিকে চাহিয়া অচলাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, অত্যন্ত অসময়ে এসে রসভঙ্গ করে দিলুম বৌঠান, মাপ কর। মহিম, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসবার কিছু থাকে ত নিয়ে চল, একটু বসি। হাঁটিতে হাঁটেতে ত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—ভালা জায়গায় বাড়ি করেছিলে ভাই —চল, চল, কলকাতায় চল।

চল, বলিয়া মহিম তাহাকে বাহিরের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল।

সুরেশ কহিল, বৌঠান কি আমার সামনে বের হবেন না নাকি? পর্দানশীন?

মহিম জবাব দিবার পূর্বেই পাশের দরজা ঠেলিয়া অচলা প্রবেশ করিল। তাহার মুখে কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নমস্কার করিয়া প্রসন্নমুখে কহিল, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু এমন অকস্মাৎ যে?

তাহার প্রফুল্ল হাসিমুখে সুখ-সৌভাগ্যের প্রসন্ন বিকাশ কল্পনা করিয়া সুরেশের বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন জ্বলিয়া উঠিল। হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, এখন দেখছি বটে, এমন অকস্মাৎ এসে পড়া উচিত হয়নি। কিন্তু কাণ্ডটা কি হচ্ছিল? Their first difference না,—আসা পর্যন্ত এইভাবে মতভেদ চলচে? কোন্‌টা?

অচলা তেমনি হাসিমুখে কহিল, কোন্‌টা শুনলে আপনি বেশ খুশী হন বলুন? শেষেরটা ত? তা হলে আমার তাই বলা উচিত—অতিথিকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই।

সুরেশের মুখ গম্ভীর হইল; কহিল, কে বললে নেই? বাড়ির গৃহিণীর সেই ত হল আসল কাজ—সেই ত তার পাকা পরিচয়।

অচলা হাসিতে হাসিতে কহিল, গৃহই নেই, তার আবার গৃহিণী! এই দুঃখীদের কুঁড়ের মধ্যে কি করে যে আজ আপনার রাত্রি কাটবে, সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কিন্তু ধন্য আপনাকে, জেনে শুনে এ দুঃখ সইতে এসেছেন।

স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, নয়নবাবুকে ধরে চন্দ্রবাবুর বাড়িতে আজ রাতটার মত ওঁর শোবার ব্যবস্থা করা যায় না? তাঁদের পাকা বাড়ি—বসবার ঘরটাও আছে, ওঁর কষ্ট হতো না!

সৌজন্যের আবরণে উভয়ের শ্লেষের এই-সকল প্রচ্ছন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে মহিম মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কি করিয়া থামাইবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমনি অবস্থায় সুরেশ নিজেই তাহার প্রতিকার করিল; সহসা হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েচে বৌঠান, বরং একটু চা-টা দাও, খেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তার পরে নয়নবাবুকে বল, শ্রবণবাবুকে বল—চন্দ্রবাবুর পাকা ঘরে শোবার জন্যে সুপারিশ ধরতে রাজী আছি। কিন্তু যাই বল মহিম, এর ওপর এত টান সত্যি হলে, খুশী হবার কথা বটে।

মহিমের হইয়া অচলাই তাহার উত্তর দিল: সহাস্যে কহিল, খুশী হওয়া না হওয়া মানুষের নিজের হাতে; কিন্তু এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এর ওপর টান না জন্মে বড়লাটের রাজপ্রাসাদের ওপর টান পড়লে সেইটে ত হত মিথ্যে। যাক, আগে গায়ে

জোর হোক, তার পর কথা হবে। আমি চায়ের জল চড়াতে বলে এসেচি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে হাজির করে দিচ্চি—ততক্ষণ মুখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন; বলিয়া অচলা হাসিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইতেই সুরেশের বুকের জ্বালাটা যেন বাড়িয়া উঠিল। নিজেকে সে চিরদিনই দুর্বল এবং অস্থিরমতি বলিয়াই জানিত, এবং এজন্য তাহার লজ্জা বা ক্ষোভও ছিল না। ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধবেরা যখন মহিমের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে খেয়ালী প্রভৃতি বলিয়া অনুযোগ করিত, তখন সে মনে মনে খুশী হইয়া বলিত, সে ঠিক যে, তাহার সংকল্পের জোর নাই, সে প্রবৃত্তির বাধ্য; কিন্তু হৃদয় তাহার প্রশস্ত—সে কখনও হীন বা ছোট কাজ করে না। সে নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না, পাত্রাপাত্র হিসাব করিয়া দান করিতে পারে না—মন কাঁদিয়া উঠিলে গায়ের বস্ত্রখানা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া চলিয়া আসিতে তাহার বাধে না—তা সে যাহাকে এবং যে কারণেই হোক; কিন্তু এ কথা কাহারও বলিবার জো নেই যে, সুরেশ কাহাকেও দ্বেষ করিয়াছে, কিংবা স্বার্থের জন্য এমন কোন কাজ করিয়াছে, যাহা তাহার করা উচিত ছিল না। সুতরাং আজন্মকাল হৃদয়ের ব্যাপারে যাহার একান্ত দুর্বল বলিয়াই অখ্যাতি ছিল এবং নিজেও যাহা সে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত, সেই সুরেশ যখন অকস্মাৎ অচলার সম্পর্কে শেষ-মুহূর্তে আপনার এত বড় কঠোর সংযমের পরিচয় পাইল, তখন নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির দেখা পাইয়া কেবল আত্মপ্রসাদই লাভ করিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় গর্বে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অচলার বিবাহের পরে দুটো দিন সে আপনাকে নিরন্তর এই কথাই বলিতে লাগিল—সে শক্তিহীন, অক্ষম নয়—সে প্রবৃত্তির দাস নয়; বরঞ্চ আবশ্যক হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিটাকেই সে বুকের ভিতর হইতে সমূলে উৎপাটন করিযা ফেলিয়া দিতে পারে। বন্ধুত্ব যে কি, তাহার সুখের জন্য একজন যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, এইবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী বুঝুন গিয়া।

কিন্তু কোন মিথ্যা দিয়াই দীর্ঘকাল একটা ফাঁক ভরাইয়া রাখা যায় না। আত্মসংযম তাহার সত্য বস্তু নয়, ইহা আত্মপ্রতারণা। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ না কাটিতেই এই মিথ্যা সংযমের মোহ তাহার বিস্ফারিত হৃদয় হইতে ধীবে ধীরে নিষ্কাশিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে লাগিল, মন তাহার বারংবার বলিতে লাগিল, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সে পাইল কি? ইহা তাহাকে কি দিল? কোন্ অবলম্বন লইয়া সে আপনাকে এখন খাড়া রাখিবে? পিসীমা বলিলেন, বাবা, এইবার তুই এমনি একটি বৌ ঘরে আন্, আমি নিয়ে সংসার করি।

একদিন সমাজের দোরগোড়ায় কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, কাজটা তাঁহার ভাল হয় নাই। মহিমের সহিত বিবাহ দিতে ত গোড়াগুড়িই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—শুধু সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল বলিয়াই তিনি অবশেষে মত দিলেন। ঘরে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল, এই বিবাহ দ্বারা তাহাদের কেহই যেন সুখী না হয়। নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার অপরাধ বন্ধুও অনুভব করুন, অচলাও যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মরে। কিন্তু তাই বলিয়া মন তাহার ছোট নয়। এই অকল্যাণ কামনার জন্য নিজেকে সে অনেকরকম করিয়া শাসিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পীড়িত প্রতারিত হৃদয় কিছুতেই বশ মানিল না—নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলের মত নিরন্তর ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমনি করিয়া মাস-খানেক সে কোনমতে কাটাইয়া দিয়া একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে ব্যাগ হাতে মহিমের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এখন দেখতে পাচ্চো মহিম, আমার কথাটা কতখানি সত্যি?

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা?

সুরেশ বিজ্ঞের মত বলিল, আমার পল্লীগ্রামে বাস নয় বটে, কিন্তু এর সমস্তই আমি জানি। আমি তথাপি কি সাবধান করে দিইনি যে, গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে একটা ঘোরতর বিরোধ বাধবে?

মহিম সহজভাবে কহিল, কৈ, তেমন বিরোধ ত কিছু হয়নি।

বিরোধ আর বল কাকে? তোমার বাড়িতে কেউ খেলে কি? সেইটেই কি যথেষ্ট অশান্তি অপমান নয়?

আমি খেতে কাউকে বলিনি।

বলনি? আচ্ছা, কৈ, বৌভাতে আমাকে ত নেমন্তন্ন করনি মহিম?

ওটা হয়নি বলেই করিনি।

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বৌভাত হয়নি? ওঃ—তোমাদের যে আবার—কিন্তু এমন করে ক'টা উপদ্রব এড়ানো যাবে মহিম? আপদ-বিপদ আছে, ছেলেমেয়ের কাজ-কর্ম আছে—সংসার করতে গেলে নেই কি? আমি বলি—

যদুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজে থালায় করিয়া মিষ্টান্ন লইয়া অচলা প্রবেশ করিল। সুরেশের শেষ কথাটা তাহার কানে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার মুখের ভাবে সুরেশ তাহা ধরিতে পারিল না। দুই বন্ধুর জলযোগ এবং চা-পান শেষ হইলে মহিম কাঁধের উপর চাদরটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের জমিদার মুসলমান, তাঁহার ছেলেটিকে মহিম ইংরাজি পড়াইত। জমিদারসাহেব নিজে লেখাপড়া না জানিলেও তাঁহার ঔদার্য ছিল, মহিমের সহিত সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এইজন্য গ্রামের লোক সমাজের দোহাই দিয়া আজও তাহার উপর উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই।

অচলা কহিল, আজ পড়াতে না গেলেই কি হতো না?

মহিম কহিল, কেন?

অচলার মনের জোর ও অন্তরের নির্মলতা যত বড়ই হোক, সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে তাহার আকস্মিক অভ্যাগমে কোন রমণীই সংকোচ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরেশকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার হৃদয় যত মহৎই হোক, সেই হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না—এমন কি, ভয়ই করিত। এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একলা ফেলে—

মহিম কহিল, তাতে অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া তুমি ত রইলে—

অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না। সুরেশের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাদের উড়ে বামুনটি এমনি পাকা রাঁধুনী যে, তার সঙ্গে না থাকলে কিছুই মুখে দেবার জো থাকবে না। আমি বলি, তুমি বরঞ্চ—

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না। ঘণ্টা-দুই বৈ ত নয়। বলিয়া ঘরের কোণ হইতে সে লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইল। একে ত মহিমের কাজের ধারা সহজে বিপর্যস্ত হয় না, তাহাতে এই একটা সামান্য কারণ লইয়া বারংবার নির্বন্ধ প্রকাশ করিতেও অচলার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে ভয়টা তাহার সুরেশের চোখে ধরা পড়িয়া লজ্জাটা শতগুণ হইয়া উঠে।

মহিম ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইয়া সুরেশ অচলাকে হাসিয়া কহিল, কেন নিজের মুখ হেঁট করা! চিরকাল জানি, ও সে পাত্রই নয় যে, কারও কথা রাখবে। তুমি বরং যা হোক একখানা বই আমাকে দিয়ে নিজের কাজে যাও—আমার দিব্যি সময় কেটে যাবে।

কথাটা হঠাৎ অচলাকে বাজিল যে, বাস্তবিকই মহিম কোনদিন কোন অনুরোধই তাহার রক্ষা করে না। হউক না ইহা তাহার সুমহৎ গুণ, কিন্তু তবুও সুরেশের মুখ হইতে স্বামীর এই আজন্ম কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় তাহারই সম্মুখে আজ তাহাকে অপমানকর উপেক্ষার আকারে বিঁধিল। কোন কথা না কহিয়া, সে নিজের ঘরে গিয়া, যদুকে দিয়া একখানা বাংলা বই পাঠাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ কতদিন এখানে থাকবে তোমাকে বললে?

এমনি ত নানা কারণে আজ সারাদিনই স্বামীর উপর তাহার মন প্রসন্ন ছিল না; তাহাতে এই প্রশ্নের মধ্যে একটা কুৎসিত বিদ্রূপ নিহিত আছে কল্পনা করিয়া সে চক্ষের নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল, কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

মহিম অবাক হইয়া গেল। সে সোজাভাবেই কথাটা জানিতে চাহিয়াছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাহাদের এতক্ষণের আলাপের মধ্যে এ প্রশ্নটা সে বন্ধুকে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই এবং সুরেশ নিজে হইতে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুরেশ নিশ্চয়ই অচলাকে তাহা বলিয়াছে।

মহিমকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অচলা নিজেই বলিল, এ কথার মানে এত সোজা যে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবারও দরকার নেই। তোমার বিশ্বাস যে, সুরেশবাবু কোন সঙ্কল্প নিয়েই এখানে এসেছেন, এবং তা সফল হতে কত দেরি হবে সে আমি জানি। এই ত?

মহিম আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, আমার ও-রকম কোন বিশ্বাস নেই। কিন্তু মৃণালের ব্যবহারে আজ তোমার মন ভাল নেই, তুমি কিছুই ধীরভাবে বুঝতে পারবে না। আজ শোও, কাল সে কথা হবে। বলিয়া নিজেই বিছানায় শুইয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিল।

অচলাও শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে সারাদিন যে বিরাট উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, সামান্য একটা কলহের আকারে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারিলে হয়ত সে সুস্থ হইতে পারিত; কিন্তু এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে নিজের মধ্যেই শুধু পুড়িতে লাগিল। অথচ যে প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাকে অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গায়ে পড়িয়া আন্দোলন করায় যে লজ্জা এবং ইতরতা আছে, তাহাও তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে শুধু কল্পনায় স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, জ্বালাময়ী প্রশ্নোত্তরমালায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া শয্যায় ছটফট করিতে লাগিল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া অচলা ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যদু কেটলি হাতে করিয়া বাহিরে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কিছু বলে গেছেন যদু?

যদু কহিল, এক প্রহর বেলার মধ্যেই ফিরে আসবেন বলে গেছেন।

মহিম প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া নিজের ক্ষেতখামার দেখিতে যাইত; ফিরিয়া আসিতে কোনদিন বা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।

অচলা প্রশ্ন করিল, নতুনবাবু উঠেছেন?

যদু কহিল, উঠেছেন বৈ কি। তিনিই ত চা তৈরি করতে বলে দিলেন।

অচলা তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুরেশ বহুক্ষণ পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া, খোলা দরজার সম্মুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কাগজের সেই বইখানা পড়িতেছে। অচলার পদশব্দে সুরেশ বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার মুখের উপর রাত্রিজাগরণের সমস্ত চিহ্ন দেদীপ্যমান। চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, গণ্ড পাংশু, ওষ্ঠ মলিন—সে যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার দুই চক্ষু ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না।

তাহার চাহনির ভঙ্গীতে অচলা বিস্মিত হইল, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিল না; কহিল, কখন উঠলেন? আমার উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল।

তাই ত দেখছি, বলিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। সম্মুখের দেওয়ালের গায়ে বহুদিনের পুরাতন একটা বড় আরশি টাঙ্গান ছিল; ঠিক সেই সময়েই অচলার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ায়, সুরেশের চাহনির অর্থ একমুহূর্তেই তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং নিজের শ্রীহীনতার লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এই মুখখানা কেমন করিয়া লুকাইবে, কোথায় লুকাইবে, সুরেশের মিথ্যা ধারণার কি করিয়া প্রতিবাদ

করিবে—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল, যাই, আপনার চা নিয়ে আসি গে।

সুরেশ কোন কথা বলিল না, শুধু একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট-দশেক পরে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অচলা পুনরায় যখন প্রবেশ করিল, তখন সুরেশ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল। চা খাইতে খাইতে সুরেশ কহিল, কৈ, তুমি চা খেলে না?

অচলা হাসিয়া কহিল, আমি আর খাইনে।

কেন খাও না?

আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া, এ জায়গাটা গরম না কি, খেলে ঘুম হয় না। কাল ত প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি। হাসিয়া বলিল, একটা রাত ঘুম না হলে চোখমুখের কি যে শ্রী হয়—পোড়া মুখ যেন আর লোকের সামনে বার করা যায় না। বলিয়া লজ্জিত-মুখে হাসিতে লাগিল।

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ তোমার ছেলেবেলার অভ্যাস, চা খেতে মহিম অনুরোধ করে না?

অচলা হাসিয়া বলিল, অনুরোধ করলেই বা শুনবে কে? তা ছাড়া এ আর এমন কি জিনিস যে না খেলেই নয়?

এ হাসি যে শুষ্ক হাসি সুরেশ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি ত জানই, ভূমিকা করে কথা বলা আমার অভ্যাসও নয় পারিও নে। কিন্তু স্পষ্ট করে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কি তুমি রাগ করবে?

অচলা হাসিমুখে কহিল, শোন কথা! রাগ করব কেন?

সুরেশ কহিল, বেশ। তা হলে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখানে সুখে আছ কি?

অচলার হাসিমুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, এ প্রশ্ন আপনার করাই উচিত নয়।

কেন নয়?

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি সুখে নেই—এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায়।

সুরেশ একটুখানি ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, মনটা কি ন্যায়-অন্যায় ভেবে নিয়ে তবে মনে করে অচলা? কেবল মাস-দুই পূর্বে এ ভাবনা শুধু যে আমার উচিত ছিল তাই নয়, এ ভাবনায় অধিকার ছিল। আজ দু'মাস পরে সব অধিকার যদি ঘুচে থাকে ত থাক, সে নালিশ করিনে, এখন শুধু সত্যি কথাটা জেনে যেতে চাই। এসে পর্যন্ত একবার মনে হচ্ছে জিতেছি, একবার মনে হচ্ছে হেরেছি। আমার মনটা ত তোমার অজানা নেই—একবার সত্যি করে বল ত অচলা, কি?

দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল; কিন্তু প্রাণপণে তাহাদের শক্তি প্রতিহত করিয়া অচলা বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি বেশ আছি।

সুরেশ ধীরে ধীরে কহিল, ভালই।

ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ অকস্মাৎ যেন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আর একটা কথা। তোমার জন্যে যে আমি কত সয়েচি, সে কি তোমার কখনো—

অচলা দুই কানে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত আলোচনা আপনি মাপ করবেন।

সুরেশ খোলা দরজায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া অচলার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, না, মাপ আমি করতেই পারিনে, তোমাকে শুনতেই হবে।

তাহার চোখে সেই দৃষ্টি—যাহা মনে পড়িলে আজও অচলা শিহরিয়া ওঠে। একটুখানি পিছাইয়া গিয়া সভয়ে কহিল, আচ্ছা বলুন—

সুরেশ কহিল, ভয় নেই, তোমার গায়ে আমি হাত দেব না—আমার এখনো সে জ্ঞান আছে। বলিয়া পুনরায় চৌকির উপরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, এই কথাটা তোমাকে

মনে রাখতেই হবে যে, আমি তোমার ওপর সমস্ত অধিকার হারালেও, আমার ওপর তোমার সমস্ত অধিকার বর্তমান আছে।

অচলা বাধা দিয়া কহিল, এ মনে রাখায় আমার কোন লাভ নেই, কিন্তু—, বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল, কথাটা যেন সজোরে আঘাত করিয়া সুরেশকে পলকের জন্য বিবর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সেই মুহূর্তে নিজেও স্পষ্ট অনুভব করিল অনুতাপের কথা তাহার নিজের পিঠের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সে কোমলকণ্ঠে বলিল, সুরেশবাবু, এ-সব কথা আমারও শোনা পাপ, আপনারও বলা উচিত নয়। কেন আপনি এ-সব কথা তুলে আমাকে দুঃখ দিচ্চেন?

সুরেশ তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, দুঃখ কি পাও অচলা?

অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?

সুরেশ তাহার সেই দৃষ্টি অচলার মুখের উপর হইতে নামাইল না বটে, কিন্তু অচলার দুই চক্ষু নত হইয়া পড়িল। সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল, ব্যস্, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশী আর চাইনে। বলিয়া এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তুমি যখন পাষাণ নও, তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেছি, তখন তোমারও দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার থাক—এই বর আজ মাগি—আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও। বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অচলার চোখ দিয়াও তাহার বিগত দিবারাত্রির সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইবার গলিয়া ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি সময়ে ঠিক দ্বারের বাহিরেই জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, কি হে সুরেশ, চা-টা খেলে?

সুরেশ সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে কোনমতে মুখ নীচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাঠের ভিতর এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আপনাকে সংবরণ করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

মানব-চিত্ত যে অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে পারে, সুরেশের তখন সেই অবস্থা। সে চট করিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল; সলজ্জ হাস্যে, উদারভাবে স্বীকার করিল যে, সে বাস্তবিকই ভারী দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মহিম সেজন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, এমন কি তাহার হেতু পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না।

সুরেশ তখন নিজেই নিজের কৈফিয়ত দিতে লাগিল। কহিল, যিনি যাই বলুন মহিম, এ আমি জোর করে বলতে পারি যে এদের চোখে জল দেখলে কোথা থেকে যেন নিজেদের চোখেও জল এসে পড়ে—কিছুতে সামলানো যায় না। আমি না গিয়ে পড়লে কেদারবাবু ত এ যাত্রা কিছুতেই বাঁচতেন না, কিন্তু বুড়ো আচ্ছা বদমেজাজী লোক হে মহিম, একটিমাত্র মেয়ে, তবুও তাকে খবর দিতে দিলে না। বিয়ের দিন থেকে সেই যে ভদ্রলোক চটে আছে, সে চটা আর জোড়া লাগল না। বললুম, যা হবার, সে ত হয়েই গেছে—

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, চা পেয়েছ ত হে?

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ পেয়েছি। কিন্তু বাপের কাছে এ-রকম ব্যবহার পেলে

কার চক্ষে না জল আসে বল? পুরুষমানুষই সব সময় সইতে পারে না, এ ত স্ত্রীলোক।

মহিম বলিল, তা বটে। রাত্রে তোমার শোবার কোন ব্যাঘাত হয়নি সুরেশ, বেশ ঘুমোতে পেরেছিলে? নতুন জায়গা—

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, না, নতুন জায়গায় আমার ঘুমের কোন ত্রুটি হয়নি—একপাশেই রাত কেটে গেছে। আচ্ছা মহিম, কেদারবাবু তাঁর অসুখের খবর তোমাদের একেবারেই দিলেন না, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার ভেবে দেখ দেখি!

মহিম একান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য বৈ কি! বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, হাতমুখ ধুয়ে একটু বেড়াতে বার হবে নাকি? যাও ত একটু চটপট সেরে নাও ভাই, আমাকে আবার ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে। এখনও আমার সকালের কাজকর্মই সারা হয়নি।

সুরেশ তাহার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া কহিল, গল্পটা বেশ লাগছে—এটা শেষ করে ফেলি।

তাই কর। আমি ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আসছি, বলিয়া মহিম উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে পিছন ফিরিবামাত্রই সুরেশ চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল, কোন্ অদৃশ্য হস্ত এক মুহূর্তের মধ্যে আগাগোড়া মুখখানার উপরে যেন এক পোঁচ লজ্জার কালি মাখাইয়া দিয়াছে।

যে দ্বার দিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল, সেই খোলা দরজার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া সুরেশ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অযাচিত জবাবদিহির সমস্ত নিষ্ফলতা ক্রুদ্ধ অভিমানে তাহার সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়া দংশন করিতে লাগিল।

দুই বন্ধুর কথোপকথন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অচলা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। মহিম কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিবার অব্যবহিত পরেই সে কবাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মহিম মুখ তুলিয়া চাহিতেই অচলা স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি তোমার কাছে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেছেন?

অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া মহিম জিজ্ঞাসুমুখে নীরব রহিল।

অচলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথাটা বুঝি বুঝতে পারলে না?

মহিম কহিল, না, কথাগুলো প্রিয় না হলেও স্পষ্ট বটে; কিন্তু তার অর্থ বোঝা কঠিন। অন্ততঃ আমার পক্ষে বটে।

অচলা অন্তরের ক্রোধ যথাশক্তি দমন করিয়া জবাব দিল, এ-দুটোর কোনটাই তোমার কাছে কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে স্বীকার করা। সুরেশবাবুকে যে কথা তুমি স্বচ্ছন্দে জানিয়ে এলে, সেই কথাটাই আমাকে জানাবার বোধ করি তোমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার বাবা কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন যে, তাঁর সাংঘাতিক অসুখের খবরটাতে তুমি কান দেওয়া আবশ্যক মনে কর না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুবই করি। কিন্তু যেখানে সে আবশ্যক নেই, সেখানে আমাকে কি করতে বল?

অচলা কহিল, কোন্‌খানে আবশ্যক নেই শুনি?

মহিম ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কঠোরকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, যেমন এইমাত্র সুরেশের ছিল না। আর যেমন এ নিয়ে তোমারও এতখানি রাগারাগি করে আমার মুখ থেকে কড়া কথা টেনে বার করবার প্রয়োজন ছিল না। যাক, আর না। যার তলায় পাঁক আছে তার জল ঘুলিয়ে তোলা আমি বুদ্ধির কাজ মনে করিনে।—বলিয়া মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, অচলা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল পরে সে দাঁত দিয়া সজোরে অধর চাপিয়া রহিল, ঠিক যেন একটা আকস্মিক দুঃসহ আঘাতের মর্মান্তিক চীৎকার সে প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছে মনে হইল। তারপরে

কহিল, তোমার বাইরে কি বিশেষ জরুরী কোন কাজ আছে? দু মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না?

মহিম কহিল, তা পারব।

অচলা কহিল, তা হলে কথাটা স্পষ্ট হয়েই যাক। জল যখন সরে আসে, তখনই পাঁকের খবর পাওয়া যায়, এই না?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

অচলা বলিল, নিরর্থক জল ঘুলিয়ে তোলার আমিও পক্ষপাতী নই, কিন্তু সেই ভয়ে পঙ্কোদ্ধারটাও বন্ধ রাখা কি ভাল? একদিন যদি ঘোলায় ত ঘোলাক না, যদি বরাবরের জন্যে পাঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়! কি বল?

মহিম কঠিনভাবে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দরকারী কাজ আমার পড়ে রয়েছে—এখন সময় হবে না।

অচলা ঠিক তেমনি কঠিনস্বরেই জবাব দিল, তোমার এই ঢের বেশী দরকারী কাজ সারা হয়ে গেলে ফুরসত হবে ত? তবে, ততক্ষণ আমি না হয় অপেক্ষা করেই রইলুম। বলিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে স্নান করিবার প্রসঙ্গ লইয়া বাহিরে সুরেশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার তখন মুখের শ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন চেহারা সুরেশ চোখ তুলিবামাত্র অনুভব করিল। মহিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না।

অচলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি হচ্ছে?

সুরেশ ব্যাগের মধ্যে তাহার কল্যকার ব্যবহৃত জামা-কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, কহিল, একটার মধ্যেই ত ট্রেন, একটু আগেই ঠিক করে নিচ্ছি।

অচলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি কি আজই যাবেন নাকি?

সুরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, হাঁ।

অচলা কহিল, কেন বলুন ত?

সুরেশ তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই বলিল, আর থেকে কি হবে? তোমাদের একবার দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তবে উঠে আসুন। এ-সব কাজ আপনাদের নয়, মেয়েমানুষের; আমি গুছিয়ে সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমাকে কিছু করতে হবে না—এ কিছুই নয়—এ অতি—

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অচলা ব্যাগটা তাহার সুমুখ হইতে টানিয়া লইয়া সমস্ত জিনিসপত্র উপুড় করিয়া ফেলিয়া ভাঁজ করা কাপড় আর একবার ভাঁজ করিয়া ধীরে ধীরে ব্যাগের মধ্যে তুলিতে লাগিল। সুরেশ অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, এর কিছুই আবশ্যক ছিল না—সে যদি—আমি নিজেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথারই প্রত্যুত্তর করিল না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে করিতে কহিল, আপনার ভগিনী কিংবা স্ত্রী থাকলে তাঁরাই করতেন, আপনাকে করতে দিতেন না; কিন্তু আপনার ভয় যদি বন্ধুটি ফিরে এসে দেখতে পান—এই না? কিন্তু তাতেই বা কি, এ ত মেয়েমানুষেরই কাজ।

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র মহিমের সহিত তাহার যাহা হইয়া গিয়াছে, অচলা তাহা নিশ্চয়ই জানে না। তাই কথাটা পাড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহার সাহস হইল না, অথচ ভয় করিতেও লাগিল, পাছে সে আসিয়া পড়িয়া আবার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া ফেলে।

ব্যাগটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, বাবার অসুখের কথা না তুললেই ছিল ভাল। এতে তাঁর অপমানই শুধু সার হল—উনি ত গ্রাহ্যই করলেন না।

সুরেশ চকিত হইয়া কহিল, কি বললে তোমাকে মহিম?

অচলা তাহার ঠিক জবাব না দিয়া পাশের দরজাটা চোখ দিয়া দেখাইয়া কহিল, ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই সমস্ত শুনেচি।

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, সেজন্যে আমি তোমার কাছে মাপ চাচ্চি অচলা।

অচলা মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কেন?

সুরেশ অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, কারণ ত তুমি নিজেই বললে। আমার নিজের দোষে তাঁকে তোমাকে দু জনকে আজ আমি অপমান করেছি; সেইজন্যেই তোমার কাছে বিশেষ করে ক্ষমা প্রার্থনা করচি অচলা!

অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল। সহসা তাহার সমস্ত চোখমুখ যেন ভিতরের আবেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, যাই কেননা আপনি করে থাকেন সুরেশবাবু, সে ত আমার জন্যেই করেছেন? আমাকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই ত আজ আপনার এই লজ্জা। তবুও আমার কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এত বড় অমানুষ আমি নই। কিসের জন্যে আপনি লজ্জিত হচ্ছেন? যা করেছেন, বেশ করেছেন।

সুরেশের বিস্মিত হতবুদ্ধিপ্রায় মুখের পানে চাহিয়া অচলা বুঝিল, সে তাহার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আজই আপনি যাবেন না, সুরেশবাবু! এখানে লজ্জা যদি কিছু পেয়ে থাকেন সে ত আমারই লজ্জা ঢাকবার জন্যে; নইলে নিজের জন্যে আপনার ত কোন দরকারই ছিল না! আর বাড়ি আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও ত কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আজ আমি নিমন্ত্রণ করচি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছুদিন থাকুন।

তাহার সাহস দেখিয়া সুরেশ অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত-হৃদয়ে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, মহিম তাহার বাহিরের কাজ সারিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে। অচলা তখন পর্যন্ত ব্যাগটা সম্মুখে লইয়া মেঝের উপর বসিয়া এই দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; পাছে মহিমের আগমন জানিতে না পারিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে মহিম, কাজ সারা হ'ল তোমার?

হাঁ হ'ল, বলিয়া মহিম ঘরে পা দিয়াই অচলাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও কি হচ্ছে?

অচলা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া কহিল, আপনি আমারও ত বন্ধু—শুধু বন্ধুই বা কেন, আমাদের যা করছেন, তাতে আপনি আমার পরমাত্মীয়। এমন করে চলে গেলে আমার লজ্জার, ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে ত আমি কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারব না।

সুরেশ শুষ্ক হাসিয়া কহিল, শোন কথা মহিম! তোমাদের দেখতে এসেছিলুম, দেখে গেলুম, বাস্। কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অনর্থক বেশীদিন ধরে রেখে তোমাদেরই বা লাভ কি, আর আমারই বা সহ্য করে ফল কি বল?

মহিম ধীরভাবে জবাব দিল, বোধ করি রাগ করে চলে যাচ্ছিলে; কিন্তু সেটা উনি পছন্দ করেন না। অচলা তীক্ষ্যকণ্ঠে কহিল, তুমি পছন্দ কর নাকি?

মহিম জবাব দিল, আমার কথা ত হচ্ছে না।

সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তার এই অপ্রিয় আলোচনা কোনমতে থামাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্লতার ভান করিয়া সহাস্যে কহিল, এ কি মিথ্যে অপবাদ দেওয়া! রাগ করব কেন হে, আচ্ছা লোক ত তোমরা! বেশ, খুশীই যদি হও, আরও দু-একদিন না হয় থেকেই যাবো। বৌঠান, কাপড়গুলো আর তুলে কাজ নেই, বের করেই ফেলো। মহিম, চল হে, তোমাদের পুকুর থেকে আজ স্নান করেই আসা যাক; তার পরে বাড়ি গিয়ে না হয় একশিশি কুইনিনই গেলা যাবে।

চল, বলিয়া মহিম জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যাহারা নূতন জুতার সুতীক্ষ্ণ কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভান করে, ঠিক তাহাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসিখুশিতে কাটাইয়া দিল; কিন্তু আর একজন, যাহাকে আরও গোপনে এই দংশনের অংশ গ্রহণ করিতে হইল. সে পারিল না।

স্বামীর অবিচলিত গাম্ভীর্যের কাছে এই কদাকার ভাঁড়ামিতে, এত বেহায়াপনায় তাহার ক্ষোভে অপমানে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহাকে সে আজও হৃদয়ের দিক হইতে চিনিতে না পারিলেও বুদ্ধির দিক হইতে চিনিয়াছিল। সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, এই তীক্ষ্ণ-ধীমান অল্পভাষী লোকটির কাছে এ অভিনয় একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, অথচ লজ্জার কালিমা প্রতি মুহূর্তেই যেন তাহারি মুখের উপর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। আজ সকালবেলার পরে মহিম আর বাটীর বাহির হয় নাই ; সুতরাং দিনের বেলায় ভাত খাওয়া হইতে শুরু করিয়া রাত্রির লুচি খাওয়া পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সময়টাই এইভাবে কাটিয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানার উপর ছটফট করিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, সারারাত্রি আলো জেলে পড়লে আর একজন ঘুমোতে পারে না। তোমার কাছে এটুকু দয়াও কি আর আমি প্রত্যাশা করতে পারিনে?

তাহার কণ্ঠস্বরে মহিম চমকিয়া উঠিয়া এবং তাড়াতাড়ি বাতিটা নামাইয়া দিয়া কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে, আমাকে মাপ করো। বলিয়া বই বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। এই প্রার্থিত অনুগ্রহলাভের জন্য অচলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না. কিন্তু ইহা তাহার নিদ্রার পক্ষেও লেশমাত্র সাহায্য করিল না। বরঞ্চ যত সময় কাটিতে লাগিল, এই নিঃশব্দ অন্ধকার যেন ব্যথায় ভারী হইয়া প্রতি মুহূর্তেই তাহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সহিতে না পারিয়া এক সময়ে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, সংসারে ভুল করলেই তার শাস্তি পেতে হয়, এ কথা কি সত্যি?

মহিম অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, অভিজ্ঞ লোকেরা তাই ত বলেন।

অচলা পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তবে যে ভুল আমরা দু'জনেই করেছি, যার কুফল গোড়া থেকেই শুরু হয়েচে, তার শেষ ফলটা কি-রকম দাঁড়াবে, তুমি আন্দাজ করতে পারো?

মহিম কহিল, না।

অচলা কহিল, আমিও পারিনে। কিন্তু ভেবে ভেবে আমি এটুকু বুঝেছি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ বলেই এই শাস্তির বেশী ভার পুরুষের বহা উচিত।

মহিম বলিল, আরও একটু ভাবলে দেখতে পাবে, মেয়েমানুষের বোঝা তাতে এক তিল কম পড়ে না। কিন্তু পুরুষটি কে? আমি, না সুরেশ?

অচলা যে শিহরিয়া উঠিল, অন্ধকারের মধ্যেও মহিম তাহা অনুভব করিল।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অচলা ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে একদিন আমাকে মুখের ওপরেই অপমান করতে শুরু করবে, এ আমি ভেবেছিলুম। আর এও জানি, এ জিনিস একবার আরম্ভ হলে কোথায় যে শেষ হয়, তা কেউ বলতে পারে না ; কিন্তু আমি ঝগড়া করতেও পারব না, কিংবা বিয়ে হয়েচে বলেই ঝগড়া করে তোমার ঘর করতেও পারব না। কাল হোক, পরশু হোক, আমি বাবার ওখানে ফিরে যাবো।

মহিম কহিল, তোমার বাবা কিন্তু আশ্চর্য হবেন।

অচলা বলিল, না। তিনি জানতেন বলেই আমাকে বারংবার সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এর ফল কোনদিন ভাল হবে না। কলকাতায় চলে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সমাজ, আত্মীয়, বন্ধু সকলকে ত্যাগ করে শুধু স্ত্রী নিয়ে কারও বেশী দিন চলে না। সুতরাং তিনি আর যাই হোন, আশ্চর্য হবেন না।

মহিম কহিল, তবে তাঁর নিষেধ শোনোনি কেন?

অচলা প্রাণপণ-বলে একটা উচ্ছ্বসিত শ্বাস দমন করিয়া লইয়া কহিল, আমি ভাবতুম, তুমি কিছুই না বুঝে কর না।

সে ধারণা ভেঙে গেছে?

হাঁ।

তাই ভাগের কারবারে সুবিধে হলো না টের পেয়ে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছো?

হাঁ।

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে যেয়ো। কিন্তু একে ব্যবসা বলেই যদি বুঝতে শিখে থাকো, আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে না, কিন্তু এ কথাটাও ভুলো না যে, ব্যবসা জিনিসটাকেও বুঝতে সময় লাগে। সে ভুল যদি কখনো ধরা পড়ে আমাকে জানিয়ো, আমি তখনি গিয়ে নিয়ে আসব।

অচলার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; হাত দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া বলিল, ভুল মানুষের বার বার হয় না। তোমার সে কষ্ট স্বীকার করবার দরকার হবে, মনে করিনে।

মহিম কহিল, মনে করা যায় না বলেই তাকে ভবিষ্যৎ বলা হয়। সেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যে রেখে আজ আমাকে মাপ কর, আমি আর বকতে পারচি নে।

অচলা আঘাত পাইয়া বলিল, আমাকে কি তুমি তামাশা করচ? তা যদি হয়, তোমার ভুল হচ্ছে। আমি সত্যই কাল-পরশু চলে যেতে চাই।

মহিম কহিল, আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে।

অচলা হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে রাখবে? সে তুমি কিছুতেই পারো না, জানো?

মহিম শান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বেশ ত, সেও ত আজই রাত্রে নয়। কাল-পরশু যখন যাবে, তখন বিবেচনা করে দেখলেই হবে। ঢের সময় আছে, আজ এই পর্যন্ত থাক। বলিয়া সে মাথার বালিশটা উলটাইয়া লইয়া সমস্ত প্রসঙ্গ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিল এবং বোধ করি বা পরক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে চা খাইতে বসিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মহিম ত মাঠের চাষবাস দেখতে আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে বোধ হয়?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গেলেও তার অন্যথা হবার জো নেই।

সুরেশ চায়ের বাটিটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, এক হিসেবে সে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তার কাজের একটা গতি আছে, যা কলের চাকার মত যতক্ষণ দম আছে, ততক্ষণ চলবেই।

অচলা কহিল, কলের মত হওয়াটাই কি আপনি ভাল বলেন?

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, তা বলি, কেননা, এ ক্ষমতা আমার নিজের সাধ্যাতীত। দুর্বল হওয়ার যে কত দোষ, সে ত আমি জানি; তাই যে স্থিরচিত্ত, তাকে আমি প্রশংসা না করে পারিনে। কিন্তু আজ আমাকে ছুটি দাও, আমি বাড়ি যাই।

অচলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, যান। আমি কাল যাচ্চি।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, তুমি কোথায় যাবে কাল?

কলকাতায়।

হঠাৎ কলকাতায় কেন? কৈ, কাল এ মতলব ত শুনিনি?

বাবার অসুখ, তাই তাঁকে একবার দেখতে যাব।

সুরেশের মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, অসুস্থ বাপকে হঠাৎ দেখবার ইচ্ছে হওয়া কিছু সংসারে আশ্চর্য ঘটনা নয়; কিন্তু ভয় হয়, পাছে বা আমার জন্যেই একটা রাগারাগি করে—

অচলা তাহার কোন জবাব দিল না। যদু সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, সুরেশ ডাকিয়া কহিল, তোর বাবু মাঠ থেকে ফিরেছেন রে?

যদু কহিল, তিনি ত আজ সকালে বার হননি! তাঁর পড়বার ঘরে ঘুমোচ্ছেন।

অচলা তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, মহিম একটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া বসিয়া দুই পা টেবিলের উপরে তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছে। একটা লোক রাত্রের অতৃপ্ত নিদ্রা এইভাবে পোষাইয়া লইতেছে, সংসারে ইহা একান্ত অভূত নহে, কিন্তু অচলার বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে স্বচক্ষে দেখিল, তাহার স্বামী দিনের কর্ম বন্ধ রাখিয়া এই অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের অপর্যাপ্ত আলোক সেই নিদ্রামগ্ন মুখের উপর পড়িয়াছিল। আজ অকস্মাৎ এতদিন পরে তাহার চোখের উপর এমন একটা নতুন জিনিস পড়িল যাহা ইতিপূর্বে কোনদিন সে দেখে নাই। আজ দেখিল, শান্ত মুখের উপর যেন একখানা অশান্তির সূক্ষ্ম জাল পড়িয়া আছে; কপালের উপব যে কয়েকটা রেখা পড়িয়াছে, এক বৎসর পূর্বেও সেখানে সে-সকল দাগ ছিল না। সমস্ত মুখেব চেহারাটাই আজ যেন তাহার মনে হইল, কিসের গোপন ব্যথায় শ্রান্ত, পীড়িত। সে নিঃশব্দে আসিয়াছিল, নিঃশব্দেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু পিকদানিটা পায়ে ঠেকিয়া যেটুকু শব্দ হইল, তাহাতেই মহিম চোখ মেলিয়া চাহিল, অচলা অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, এখন ঘুমাচ্চো যে? অসুখ করেনি ত?

মহিম চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি জানি, অসুখ না হওয়াই ত আশ্চর্য!

অচলা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পবেই সুরেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল, মহিম অদূরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল; অচলা দ্বারের নিকটে আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, কাল আমিও যাচ্ছি। সুবিধে হলে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।

সুরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই নাকি? বলিয়াই মহিমের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠানকে তুমি কালই কলকাতা পাঠাচ্চ নাকি মহিম?

স্ত্রীর এই গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতায় মহিমের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু মুখের ভাব প্রসন্ন রাখিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে নাটক তৈরি করার রীতি নেই। কালই বা কেন, আজই ত তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

সুরেশের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; অচলা চক্ষের পলকে তাহা লক্ষ্য করিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, সুরেশবাবু, আমাদের শহরে বাড়ি বলে লজ্জিত হবার কারণ নেই। অসুস্থ বাপ-মাকে দেখতে যাওয়া যদি পাড়াগাঁযের রীতি না হয়, আমি ত বলি আমাদের শহরের নাটকই ঢের ভাল। আপনি না হয় আজকের দিনটেও থেকে যান না, কাল একসঙ্গেই যাবো।

তাহার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে সুরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল, না না, আমার আর থাকবার জো নেই বৌঠান! তোমাব ইচ্ছে হলে কাল যেয়ো, কিন্তু আমি আজই চললুম। বলিতে বলিতেই সে তীব্র উত্তেজনায় হঠাৎ ব্যাগটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার উত্তেজনার আবেগ অচলাকেও একবার যেন মূল হইতে নাড়িয়া দিল। সে অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, এখনও ট্রেনের অনেক দেরি সুরেশবাবু, এরি মধ্যে যাবেন না—একটু দাঁড়ান। আমার দুটো কথা দয়া করে শুনে যান। তাহার আর্ত কণ্ঠস্বরের আকুল অনুরোধে উভয় শ্রোতাই যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

অচলা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে বলো, এরা আমাকে বন্ধ করে বেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—

আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।

মহিম বিহ্বলের ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি জানো মহিম, উনি ব্রাহ্মমহিলা। নামে স্ত্রী হলেও ওঁর ওপর পাশবিক বলপ্রয়োগের তোমার অধিকার নেই।

মহিম মুহূর্তকালের জন্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া শান্তস্বরে স্ত্রীকে কহিল, তুমি কিসের জন্যে কি করচ, একবার ভেবে দেখ দিকি অচলা। সুরেশকে কহিল, পশু-বল, মানুষ-বল, কোন জোরই আমি কারও উপর কোন দিন খাটাই নে। বেশ ত সুরেশ, তুমি যদি থাকতে পার, আজকের দিনটা থেকে ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও না। আমি নিজে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব—তাতে গ্রামের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টিকটুও হবে না। একটুখানি থামিয়া বলিল, একটু কাজ আছে, এখন চললুম। সুরেশ, যাওয়া যখন হ'লই না, তখন কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অচলা মূর্তির মত চৌকাঠ ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ মিনিট-খানেক হেঁটমুখে থাকিয়া হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, বাঃ রে, বাঃ। বেশ একটি অংক অভিনয় করা গেল! তুমিও মন্দ করনি, আমি ত চমৎকার! ওর বাড়িতে ওর স্ত্রী নিয়ে ওকেই চোখ রাঙিয়ে দিলুম। আর চাই কি? আর বন্ধু আমার মিষ্টিমুখে একটু হেসে ঠিক যেন বাহবা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি অচলা, ও আড়ালে শুধু গলা ছেড়ে হোহো করে হাসবার জন্যেই কাজের ছুতো করে বেরিয়ে গেল। যাক, আরশিখানা একবার আন ত বৌঠান, দেখি নিজের মুখের চেহারা কি-রকম দেখাচ্চে! বলিয়া চাহিয়া দেখিল, অচলার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। সে কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যে শয্যা স্পর্শ করিতেও আজ অচলার ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল, তাহাই যখন সে যথানিয়মে প্রস্তুত করিতে অপরাহ্নবেলায় ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সমস্ত মনটা যে তাহার কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিল—মানব-চিত্ত সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারই অগোচর রহিবে না।

যন্ত্র-চালিতের মত অভ্যস্ত কর্ম সমাপন করিয়া ফিরিবার মুখে পাশের ছোট টেবিলটির প্রতি অকস্মাৎ তার চোখ পড়িয়া গেল; এবং ব্লটিং প্যাডখানিব উপর প্রসারিত একখানি ছোট্ট চিঠি সে চক্ষের নিমিষে পড়িয়া ফেলিল। মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই, মৃণাল লিখিয়াছে—সেজদামশাই গো, করছ কি? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ-দুটি ক্ষয়ে গেল যে!

বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা নড়িল না। ঠিক পাথরে-গড়া মূর্তির পলক-বিহীন দৃষ্টি সেই একটি ছত্রের উপর পাতিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ চিঠি কবেকার, কখন, কে আনিয়া দিয়া গেছে—সে কিছুই জানে না। মৃণালের বাটী কোন্ দিকে, কোন্ মুখে তাহার বাড়ি ঢুকিতে হয়, কোন্ পথটার উপর, কিজন্য সে এমন করিয়া তাহার ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি পাতিয়া রাখিয়াছে, তাহার কিছুই জানিবার জো নাই। সম্মুখের এই ক'টি কালির দাগ শুধু এই খবরটুকু দিতেছে যে, কোন্ এক পরশু হইতে একজন আর একজনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া চোখ নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু দেখা মিলে নাই।

এদিকে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার নিজের চোখ-দুটি বেদনায় পীড়িত এবং কালো কালো অক্ষরগুলা প্রথমে ঝাপসা এবং পরে যেন ছোট

ছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তবুও এমনি একভাবে দাঁড়াইয়া হয়ত সে আর কতক্ষণ চাহিয়া থাকিত; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে এতক্ষণ ধরিয়া তাহার ভিতরে ভিতরে যে নিশ্বাসটা উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই যখন অবরুদ্ধ স্রোতের বাঁধ ভাঙ্গার ন্যায় অকস্মাৎ সশব্দে গর্জিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন সেই শব্দে সে চমকিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। দ্বারের বাহিরে মুখ তুলিয়া দেখিল, সন্ধ্যায় আঁধার প্রাঙ্গণতলে নামিয়া আসিয়াছে এবং যদু চাকর হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া বাহিরের ঘরে দিতে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ফিরে এসেছেন, যদু?

যদু কহিল, না মা, কৈ এখনও ত তিনি ফেরেন নি।

এতক্ষণে অচলার মনে পড়িল, দুপুরবেলার সেই লজ্জাকর অভিনয়ের একটা অঙ্ক শেষ হইলে, সেই যে তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই! স্বামীর প্রাত্যহিক গতিবিধি সম্বন্ধে আজ তাহার তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সুরেশের আসা পর্যন্ত এমনই একটা উৎকট ও অবিচ্ছিন্ন কলহের ধারা এ বাটীতে প্রবাহিত হইয়াছিল যে তাহারই সহিত মাতামাতি করিয়া অচলা আর সব ভুলিয়াছিল। সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল। মৃণালের কথাটা সে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই মৃণালের একটিমাত্র ছত্র তাহার সমস্ত পুরাতন দাহ লইয়া যখন উলটা-স্রোতে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একমুহূর্তে প্রমাণ হইয়া গেল, তাহার সেই ভুল-করা স্বামীরই অন্য নারীতে আসক্তির সংশয় হৃদয় দগ্ধ করিতে সংসারে কোন চিন্তার চেয়েই খাটো নয়।

লেখাটুকু সে আর একবার পড়িবার জন্য চোখের কাছে তুলিয়া ধরিতে হাত বাড়াইল, কিন্তু নিবিড় ঘৃণায় হাতখানা তাহার আপনি ফিরিয়া আসিল। সে চিঠি সেইখানেই তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল, অচলা ঘরেব বাহিরে আসিয়া, বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল--সব মিথ্যা। এই ঘরদ্বার, স্বামী-সংসার, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা কিছুই সত্য নয়—কোন কিছুর জন্যেই মানুষের তিলার্ধ হাত-পা বাড়াইবার পর্যন্ত আবশ্যকতা নাই। শুধু মনের ভুলেই মানুষে ছটফট করিয়া মরে, না [illegible] পল্লীগ্রাম শহরই বা কি, খড়ের ঘর রাজপ্রাসাদই বা কি, আর স্বামী-স্ত্রী, বাপ-মা, ভাই-বোন সম্বন্ধই বা কোথায়! আর কিসের জন্যেই বা রাগারাগি, কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি করিয়া মরে। দুপুরবেলা অত বড় কাণ্ডেব পরেও যে স্বামী স্ত্রীকে একলা ফেলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে কাটাইতে পারে, তাহার মনের কথা যাচাই করিবার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন? সমস্ত মিথ্যা! সমস্ত ফাঁকি! মরীচিকার মতই সমস্ত অসত্য! কিন্তু সংসার তাহার কাছে এতদূর খালি হইয়া যাইতে পারিত না, একবার যদি সে মৃণালের ঐ ভাষাটুকুর উপরে তাহার সমস্ত চিত্ত ঢালিয়া না দিয়া, সেই মৃণালকে একবার ভাবিবার চেষ্টা করিত। অন্য নারীর সহিত সেই পল্লীবাসিনী সদানন্দময়ীর আচরণ একবার মনে করিয়া দেখিলে তার নিজের মনটাকে ঐ ক'টা কথার কালিমাই এমন করিয়া কালো করিয়া দিতে বোধ করি পারিত না।

যদু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, চায়ের জল গরম হয়েছে কি?

অচলা ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল, কহিল, কোন্ বাবু?

যদু জোর দিয়া বলিল, আমাদের বাবু। এইমাত্র তিনি ফিরে এলেন যে। চায়ের জল ত অনেকক্ষণ গরম হয়ে গেছে মা।

চল যাচ্ছি, বলিয়া অচলা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খানিক পরে চা এবং জলখাবার চাকরের হাতে দিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, মহিম অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করিতেছে এবং সুরেশ ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের কাছে মুখ লইয়া একমনে খবরের কাগজ পড়িতেছে। যেন কেহই কাহারো উপস্থিতি আজ জানিতেও পারে নাই। এই যে অত্যন্ত লজ্জাকর সঙ্কোচ দুটি চিরদিনের বন্ধুর মাঝখানে আজ সহজ শিষ্টাচারের পথটা পর্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপলক্ষটা মনে পড়িতেই অচলার পা-দুটি থামিয়া গেল।

অচলাকে দেখিয়া মহিম থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সুরেশকে চা দিতে এত দেরি হ'ল যে?

অচলার মুখ দিয়া কিছুতেই কথা বাহির হইল না। সে মুহূর্তকাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদু চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলে, সুরেশ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল; কহিল, মহিম কৈ, সে এখনো ফেরেনি নাকি?

সঙ্গে সঙ্গেই মহিম প্রবেশ করিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যে মিনিট-দশেক ধরিয়া তাহারই কানের কাছে বারান্দার উপরে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল, এই বাহুল্য কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করিল না।

তার পরেই সমস্ত চুপচাপ। অচলা নিঃশব্দে অধোমুখে দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া এক বাটি সুরেশকে দিয়া, অন্যটা স্বামীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া নীরবেই উঠিয়া যাইতেছিল, মহিমের আহ্বানে সে চমকিয়া দাঁড়াইল।

মহিম কহিল, একটু অপেক্ষা কর, বলিয়া নিজেই চট করিয়া উঠিয়া কবাটে খিল লাগাইয়া দিল। চক্ষের নিমেষে তাহার ছয়-নলা পিস্তলটার কথাই সুরেশের স্মরণ হইল; এবং হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া খানিকটা চা চলকাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মুখখানা মড়ার মত বিবর্ণ করিয়া বলিল, দোর বন্ধ করলে যে?

তাহার কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা ও প্রশ্নের ভঙ্গীতে অচলারও ঠিক সেই কথাই মনে পড়িয়া মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। বোধ করি বা একবার যেন সে চীৎকার করিবারও প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। মহিম ক্ষণকালমাত্র অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিল। তার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাকরটা এসে পড়ে, এই জন্যেই—নইলে পিস্তলটা আমার চিরকাল যেমন বাক্সে বন্ধ থাকে, এখনো তেমনি আছে। তোমরা এত ভয় পাবে জানলে আমি দোর বন্ধ করতাম না।

সুরেশ চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া হাসিবার মত মুখের ভাব করিয়া বলিল, বাঃ, ভয় পেতে যাবো কেন হে? তুমি আমার উপর গুলি চালাবে—বাঃ—প্রাণের ভয়! আমি? কবে আবার তুমি দেখলে? আচ্ছা যা হোক—

তাহার অসংলগ্ন কৈফিয়ত শেষ হইবার পূর্বেই মহিম কহিল, সত্যই কখনো ভয় পেতে তোমাকে দেখিনি। প্রাণের মায়া তোমার নেই বলেই আমি জানতাম। সুরেশ, আমার নিজের দুঃখের চেয়ে তোমার এই অধঃপতন আমার বুকে আজ বেশী করে বাজল। যাতে তোমার মত মানুষকেও এত ছোট করে আনতে পারে—না, সুরেশ, কাল তুমি নিশ্চয় বাড়ি যাবে। কোন ছলে আর দেরি করা চলবে না।

সুরেশ তবুও কি একটা জবাব দিতে চাহিল; কিন্তু এবার তাহার গলা দিয়া স্বরও ফুটিল না, ঘাড়টাও সোজা করিতে পারিল না; সেটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই ঝুঁকিয়া পড়িল।

তুমি ভেতরে যাও অচলা, বলিয়া মহিম খিল খুলিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল।

এইবার সুরেশ মাথা তুলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, শোন কথা। অমন কত গণ্ডা বন্দুক-পিস্তল রাতদিন নাড়াচাড়া করে বুড়ো হয়ে এলুম, এখন ওর একটা ভাঙ্গা ফুটো রিভলভারের ভয়ে মরে গেছি আর কি! হাসালে যা হোক, বলিয়া সুরেশ নিজেই টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসিতে যোগ দিবার মত লোক ঘরের মধ্যে অচলা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে কিন্তু যেমন ঘাড় হেঁট করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি ভাবেই আরও কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে মহিম নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কেহ নাই। পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মাটিতে মাদুর পাতিয়া, হাতের উপর মাথা রাখিয়া অচলা শুইয়া আছে। স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল। পাশে একটা খালি তক্তপোশ ছিল, মহিম তাহার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, কেমন, কাল তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া ত ঠিক?

অচলা নীচের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

মহিম অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হবে, এত বড় অন্যায় উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার ওপর করতে পারব না।

কিন্তু অচলা তেমনি পাষাণ-মূর্তির মত নিঃশব্দ স্থির হইয়া রহিল দেখিয়া মহিম বলিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ওপর আমার অন্য নালিশ আছে। আমার স্বভাব ত জানো। শুধু বিয়ের পর থেকেই ত নয়, অনেক আগেই ত আমাকে জানতে যে, আমি সুখ-দুঃখ যাই হোক, নিজের প্রাপ্য ছাড়া একবিন্দু উপরি পাওনা কখনো প্রত্যাশা করিনে—পেলেও নিইনে। ভালবাসার ওপর ত জোর খাটে না অচলা। না পারলে হয়ত তা দুঃখের কথা, কিন্তু লজ্জার কথা ত নয়। কেন তবে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলে? কেন আমাকে না জানিয়ে ভেবে নিয়েছিলে, আমি জোর করে তোমাকে আটক রাখবো? কোনদিন কোন বিষয়েই ত আমি জোর খাটাই নি। তাঁরা তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে—আর আমাকে জানালে কি কোন উপায় হ'তো না? তোমার প্রাণের দামটা কি শুধু তাঁরাই বোঝেন।

অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালবাসো না।

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলিনি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বলতে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে? বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে?

অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে করো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে—দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর। শুধু আমাদেরই—

মহিম প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি আমার টেবিলের ওপর?

অচলা মুখে আঁচল গুঁজিয়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। তাহার কাছে আর কোন জবাব না পাইয়া মহিম আস্তে আস্তে তাহার টেবিল দেখিতে গেল। তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর খান-কতক বই পড়িয়াছিল; প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া সেইগুলা উলটিয়া-পালটিয়া দেখিয়া, তাহার নীচে, আশেপাশে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া স্ত্রীর অভিযোগের কিছুমাত্র তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, বিমূঢ়ের ন্যায় ফিরিয়া আসিবার পথে শোবার ঘরটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ভিতরে একটা পা দিয়াই মৃণালের সেই চিঠিখানার উপর তাহার চোখ পড়িল। সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া পড়িবামাত্রই, অকস্মাৎ অন্ধকারে বিদ্যুৎহানার মতই আজ একমুহূর্তে মহিম পথ দেখিতে পাইল। অচলা যে কি ইঙ্গিত করিয়াছে, আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সেটুকু হাতের মধ্যে লইয়া মহিম বিছানার উপর বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেমন করিয়া সে প্রথম দিনটিতে আসিয়াছিল, যেভাবে সে চলিয়া গিয়াছিল, সতীন বলিয়া সে অচলাকে যত পরিহাস করিয়াছে—একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। পল্লী-গ্রামের এইসকল রহস্যালাপের সহিত যে মেয়ে পরিচিত নয়, প্রতিদিন তাহার যে কিরূপ বিঁধিয়াছে, এবং সে নিজেও যখন কোনদিন এই পরিহাসে খোলা মনে যোগ দিতে পারে নাই, বরঞ্চ স্ত্রীর সম্মুখে লজ্জা পাইয়া বারংবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে—তাহার সেই লজ্জা যদি এই উচ্চশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী রমণীর ধারণায় অপরাধীর সত্যকার লজ্জা বলিয়া ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়া থাকে ত আজ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবে সে কি দিয়া? বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতেই আজ অনেক সত্য তাহাকে দেখা দিতে লাগিল। কেমন করিয়া অচলার হৃদয় ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গ দিনের পর দিন বিষাক্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া স্বামীর আশ্রয় প্রতিমুহূর্তে কারাগার

হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এই প্রাণান্তকর অবরোধের মধ্যে হইতে পরিত্রাণ পাইবার সেই যে আকুল প্রার্থনা সুরেশের কাছে তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে যে তাহার অন্তরের কোন্ অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাও আজ মহিমের মনশ্চক্ষের সম্মুখে প্রচ্ছন্ন রহিল না। অচলাকে সে যথার্থই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিল। সেই অচলার এতদিন এত কাছে থাকিয়াও, তাহার এত বড় মনোবেদনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকাটাকে সে গভীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিল। কিন্তু এমন করিয়া আর ত একটা মুহূর্তও চলিবে না। স্ত্রীর হৃদয় ফিরিয়া পাইবার উপায় আছে কি না, তাহা কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে, অনুমান করাও আজ দুঃসাধ্য। কিন্তু অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও স্বামী বলিয়া যাহাকে সে একদিন আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই কাছে অপমান এবং লাঞ্ছনা পাইয়া যে আজ তাহাকে ফিরিতে হইতেছে, এত বড় ভুল ত তাহাকে জানানো চাই।

মহিম ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অচলার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, কবাট রুদ্ধ এবং ঠেলিয়া দেখিল, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ। আস্তে আস্তে বার-দুই ডাকিয়া যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন শুধু যে জোর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিবারই তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাহা নহে, একটা অতি কঠিন পরীক্ষার দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়া নিজেও যেন বাঁচিয়া গেল।

মহিম ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিন্তু যাহার অভাবে পার্শ্বের স্থানটা আজ শূন্য পড়িয়া রহিল, ও-ঘরে সে অনশনে মাটিতে পড়িয়া আছে মনে করিয়া কিছুতেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। উঠিয়া গিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনা উচিত কি না, ভাবিতে ভাবিতে দ্বিধা করিতে করিতে অনেক রাত্রে বোধ করি, সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা মুদ্রিত-চক্ষে তীব্র আলোক অনুভব করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। শিয়রের খোলা জানালা দিয়া এবং চালের ফাঁক দিয়া অজস্র আলোক ও উৎকট ধূমে ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সন্নিকটে এমন একটা শব্দ উঠিয়াছে যাহা কানে প্রবেশমাত্রই সর্বাঙ্গ অসাড় করিয়া দেয়। কোথায় যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াও ক্ষণকালের জন্য সে হাত-পা নাড়িতে পারিল না। কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার মাথার ভিতর দিয়া যেন ব্রহ্মাণ্ড খেলিয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘর এবং যে ঘরে আজ অচলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বারান্দার একটা কোণ বিদীর্ণ করিয়া প্রধূমিত অগ্নিশিখা উপরের সমস্ত জাম-গাছটাকে রাঙ্গা করিয়া ফেলিয়াছে। পল্লীগ্রামে খড়ের ঘরে আগুন ধরিলে তাহা নিবাইবার কল্পনা করাও পাগলামি, সে চেষ্টাও কেহ করে না; পাড়ার লোক, যে যাহার জিনিসপত্র ও গরু-বাছুর সরাইতে ছুটাছুটি করে, এবং ভিন্ন পাড়ার লোক একদিকে মেয়েরা এবং একদিকে পুরুষেরা সমবেত হইয়া অত্যন্ত নিরুদ্বেগে হায় হায় করিয়া এবং কি পরিমাণের দ্রব্য-সম্ভার দগ্ধ হইতেছে এবং কি করিয়া এ সর্বনাশ ঘটিল, তাহারই আলোচনা করিয়া সমস্ত বাড়িটা ভস্মসাৎ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তার পরে ঘরে ফিরিয়া হাত-পা ধুইয়া বাকী রাত্রিটুকু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় সকালবেলা একে একে গাড়ু-হাতে দেখা দেয়; এবং আলোচনার জেরটুকু সকালের মত শেষ করিয়া বাড়ি গিয়া স্নানাহার করে। কিন্তু একজনের গৃহপ্রাঙ্গণের বিরাট ভস্মস্তূপ আর একজনের নিয়মিত জীবনযাত্রার লেশমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।

মহিম পল্লীগ্রামের লোক, সকল কথাই সে জানিত। তাই নিরর্থক চেঁচামেচি করিয়া অসময়ে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল না। বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাহার আম-কাঁঠালের এত বড় বাগানটা অতিক্রম করিয়া এই অগ্ন্যুৎপাত যে আর কাহারও গৃহ স্পর্শ করিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না। বাহিরের সারের যে কয়টা ঘরে সুরেশ এবং চাকর-বাকরেরা নিদ্রিত ছিল, অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার তখনও তাহাদের বিলম্ব ছিল। বিলম্ব ছিল না শুধু অচলার ঘরটার। সে তাহারই দ্বারে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা ঠিক যেন জাগিয়াছিল, এমনিভাবে উত্তর দিল, কেন?

মহিম কহিল, দোর খুলে বেরিয়ে এস!

অচলা শ্রান্তকণ্ঠে জবাব দিল, কি হবে? আমি ত বেশ আছি!

মহিম কহিল, দেরি করো না, বেরিয়ে এসো—বাড়িতে আগুন লেগেছে।

প্রত্যুত্তরে অচলা একবার ভয়জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পরে সমস্ত চুপচাপ। মহিমের পুনশ্চ ব্যগ্র আহ্বানে সে আর সাড়াও দিল না। ঠিক এই ভয়ই মহিমের ছিল; কারণ বাটীতে আগুন লাগা যে কি ব্যাপার, তাহার কোনপ্রকার ধারণাই অচলার ছিল না। মহিম ঠিক বুঝিল, ইতিপূর্বে সে চোখ বুজিয়াই কথা কহিতেছিল, কিন্তু চোখ মেলিয়া যে দৃশ্য তাহাকেও কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অপর্যাপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত সমস্ত ঘরটা চোখে পড়িবামাত্র অচলারও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য মহিম প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে একটা কবাট নাড়িয়া উঁচু করিয়া হাসকলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং মূর্ছিতা স্ত্রীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

এইবার সে বাটীর অন্য সকলকে সজাগ করিবার জন্য নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুরেশ পাংশুমুখে বাহির হইয়া আসিল, যদু প্রভৃতি অপর সকলেও দ্বার খুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরেই একটা প্রচণ্ড শব্দে অচলা সচেতন হইয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ প্রাণপণ-বলে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মহিম সকলকে লইয়া যখন বাহিরের খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল, তখন বড়-ঘরের চালে আগুন ধরিয়াছে। এইবার তাহার মনে পড়িল, অচলার অলঙ্কার প্রভৃতি দামী জিনিস যাহা কিছু আছে, সমস্তই এই ঘরে এবং আর মুহূর্ত বিলম্ব করিলে কিছুই বাঁচানো যাইবে না।

অচলা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; সে সজোরে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, সে হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে? কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না। যাক, সব পুড়ে যাক।

না গেলে চলবে না, অচলা, বলিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মহিম সেই জমাট ধূমরাশির মধ্যে দ্রুতবেগে গিয়া প্রবেশ করিল। যদু চেঁচাইতে চেঁচাইতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

সুরেশ এতক্ষণ পর্যন্ত অভিভূতের মত চাহিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; অকস্মাৎ সংবিৎ পাইয়া, সে পিছু লইবার উপক্রম করিতেই অচলা তাহার কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া কঠোরকণ্ঠে কহিল, আপনি যান কোথায়?

সুরেশ টানাটানি করিয়া বলিল, মহিম গেল যে—

অচলা তিক্তস্বরে বলিল, তিনি গেলেন তাঁর জিনিস বাঁচাতে। আপনি কে? আপনাকে যেতে আমি কোনমতেই দেব না।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্নেহের লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না—এ যেন সে অনধিকারীর উৎপাতকে তিরস্কার করিয়া দমন করিল।

মিনিট দুই-তিন পরেই মহিম দুই হাতে দু'টা বাক্স লইয়া এবং যদু প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ মাথায় করিয়া উপস্থিত হইল। মহিম অচলার পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল, তোমার গহনার বাক্সটা যেন কিছুতে হাতছাড়া করো না, আমরা বাইরের ঘরে যদি কিছু বাঁচাতে পারি, চেষ্টা করি গে।

অচলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার মুঠোর মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল, তেমনি ধরা রহিল। মহিম পলকমাত্র সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই অচলার বুকের ভিতরটা হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সে কোনমতে সংবরণ করিতে

পারিল না। এ কি হইয়াছে! মাথার চুল ধূলোতে, বালুতে, ভস্মে রুক্ষ, বিবর্ণ; শীর্ণ বিরস-মুখ অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসিয়া একটা রাত্রির মধ্যেই তাহার অমন সুন্দর স্বামীকে যেন বুড়া করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কলরব করিতেছে। পিতল-কাঁসার বাসন-কোসন সে ত সমস্তই গিয়াছে দেখা যাইতেছে। তা যাক—কিন্তু শাল-দোশালা গহনাপত্র তাই-বা আর কত ঐ একটিমাত্র তোরঙ্গে রক্ষা পাইয়াছে—এই লইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ম সমালোচনা চলিতেছে। ইহাদেরই একটু দূরে নির্বাণোন্মুখ অগ্নিস্তূপের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া মহিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। ও-পাড়ার ভিখু বাঁড়ুয্যে—অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি—বাতের জন্য এ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; এখন লাঠিতে ভর দিয়া সদম্ভবলে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহিম অগ্রসর হইয়া গেল। বাঁড়ুয্যে-মশাই বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, মহিম, তোমার বাবা অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি আর আমি ভিন্ন ছিলাম না। আমরা দুজনে হরিহর-আত্মা ছিলাম।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ইহাতে তাহার কোন সংশয় নাই। শুনিয়া তিনি কহিলেন যে, এই কাণ্ডটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্বাহ্নেই জানিতেন।

মহিম চকিত হইয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। পার্শ্বেই বেড়ার আড়ালে অচলা জিনিসপত্র লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, সেও শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ভূমিকা এই পর্যন্ত করিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মার ক্রোধ ত শুধু শুধু হয় না বাবা! আমাদের একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে না, এতবড় বামুনের ছেলে হয়ে কি অকর্মটাই না করলে বল দেখি।

মহিম কথাটা বুঝিতে পারিল না। তিনি নিজের কথাটার তখন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সবাই বলাবলি করি যে, কিছু একটা ঘটবেই। হৈ, আর কারুর প্রতি ব্রহ্মার অকৃপা হ'ল না কেন? বাবা, বেম্মও যা, খ্রীষ্টানও তাই। সাহেব হলেই বলে খ্রীষ্টান, আর বাঙালী হলেই বলে বেম্ম। এ আমাদের কাছে—যাদের শাস্ত্রজ্ঞান জন্মেছে—তাদের কাছে চাপা থাকে না।

উপস্থিত সকলেই ইহাতে অনুমোদন করিল। তিনি উৎসাহ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন যাই কর না বাবা, আগে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ওটাকে ত্যাগ করে—

মহিম হাত তুলিয়া বলিল, থামুন। আপনাদের আমি অসম্মান করতে চাইনে, কিন্তু যা নয়, তা মুখে আনবেন না। আমি যাঁকে ঘরে এনেচি তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই; না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে। বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

বাঁড়ুয্যেমশাই সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাঠি ঠকঠক করিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে যাহা বলিতে বলিতে গেলেন তাহা মুখে না আনাই ভাল।

অচলা সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল; তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

যদু আসিয়া কহিল, মা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বাবু পাল্কিবেহারা ডেকে আনতে বললেন। আনব?

অচলা আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবুকে একবার ডেকে দাও ত যদু।

পাল্কি?

এখন থাক।

মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইতেই মহিম বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হয়ত সে স্বামীর হাত-দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত, হয়ত বা আরও কিছু ছেলে-মানুষি করিয়া ফেলিত; কি করিত, তা সে তাহার অন্তর্যামীই জানিতেন; কিন্তু সকাল হইয়া গিয়াছে—চারিদিকে কৌতূহলী লোক; অচলা আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, পাল্কি কেন?

মহিম কহিল, নটার ট্রেন ধরতে পারলেই ত সবদিকে সুবিধে। একটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে স্নানাহার করতে পারবে। কাল রাত্রেও ত কিছু খাওনি।

আর তুমি?

আমি! মহিম আর একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমারও যা হোক একটা উপায় হবে বৈ কি।

তা হলে আমারও হবে। আমি যাবো না।

কি উপায় হবে বল?

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। একবার তাহার মুখে আসিল—বনে, গাছতলায়! কিন্তু সে ত সত্যই সম্ভব নয়। আর পাড়ায় কাহারও বাটীতে একটা ঘণ্টার জন্যও আশ্রয় লওয়া যে কত অপমানজনক, সে ইঙ্গিত ত সে এইমাত্র ভাল করিয়াই পাইয়াছে। মৃণালের কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই, তাহা নহে, বারংবার স্মরণ হইয়াছে; কিন্তু লজ্জায় তাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

মহিম আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি সঙ্গে যাবো? তাতে লাভ কি?

অচলা বলিল, লাভ-লোকসান দেখবার ভার আজ থেকে আমি নেব। তোমার শুভানুধ্যায়ী এখানে বেশী নেই সে আমি জানতে পেরেচি। তা ছাড়া, তোমার মুখের চেহারা এক রাত্রির মধ্যেই যা হয়ে গেছে, সে তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি পাচ্ছি। আমার গলায় ছুরি দিলেও, এখানে তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি যেতে পারবো না।

মহিমের মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থির হইয়া রহিল।

অচলা বলিতে লাগিল, কেন তুমি অত ভাবচ? আমার গয়নাগুলো ত আছে। তা দিয়ে পশ্চিমে যেখানে হোক কোথাও একটা ছোট বাড়ি অনায়াসে কিনতে পাববো। যেখানেই থাকি, আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে তুমি পারবে না। সে চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। আর বলেইচি ত তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।

যদু অদূরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাল্কি আনতে যাবো মা?

উত্তরের জন্য অচলা উৎসুক-চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মহিম ইহার জবাব দিল। যদুকে আনিতে হুকুম করিয়া স্ত্রীকে বলিল, কিন্তু আমি ত এখুনি যেতে পারিনে।

শুনিয়া অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তিতে অচলার বুক ভরিয়া গেল। সে অন্তরের আবেগ সংবরণ করিয়া সহজভাবে কহিল, সে সত্যি, এক্ষুণি তোমার যাওয়া হয় না; কিন্তু সন্ধ্যের গাড়িতে নিশ্চয় যাবে বল? নইলে আমি খাবার নিয়ে বসে বসে ভাবব, আর—

কিন্তু মন্তব্যটা তাহার মহিমের দীর্ঘশ্বাসে যেন নিবিয়া গেল। সে মলিন হইয়া সভয়ে কহিল, ও বেলা যেতে পারবে না? তবে এই অন্ধকার রাত্রে কার বাড়িতে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে থামিয়া গেল। যাহার বাটীতে তাহার স্বামীর রাত্রি যাপনের সম্ভাবনা, সে কথা মনে হইতেই তাহার মুখশ্রী গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ করি, তাহার মনের কথা মহিম বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমাকে কোথায় যেতে বল?

অচলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কেন, বাবার ওখানে।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

না কেন? সেও কি তোমার নিজের বাড়ি না?

মহিম তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

অচলা কহিল, না হয় সেখানে কেবল দুটো দিন থেকেই আমরা পশ্চিমে চলে যাবো।

না।

অচলা জানিত, তাহাকে টলানো সম্ভব নয়। একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, তবে চল, এখান থেকেই আমরা পশ্চিমের কোন শহরে গিয়ে উঠি গে। আমি সঙ্গে থাকলে কোথাও আমাদের কষ্ট হবে না আমি বেশ জানি। কিন্তু গহনাগুলো ত বেচতে হবে; সে কলকাতা ছাড়া হবে কি করে?

মহিম আর একদিকে চাহিয়া নীরব হইয়া রহিল। অচলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,

পশ্চিমেও ত বড় শহর আছে, সেখানেও ত বিক্রি করা যায়? আমার বাক্সে প্রায় দু শ টাকা আছে, এখন তাতেই ত আমাদের যাওয়া হতে পারে? চুপ করে রইলে যে? বল না শিগগির!

মহিম স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল, বলিল, তোমার গহনা নিতে পারব না অচলা।

অকস্মাৎ একটা গুরুতর ধাক্কা খাইয়া যেন অচলা পিছাইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, কেন পারবে না, শুনতে পাই?

মহিম তাহার উত্তর দিল না এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ অচলা একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, পৃথিবীতে স্বামী কি কেবল তুমি একটি? দুঃসময়ে তাঁরা নেন কি করে? স্ত্রীর গহনা থাকে কি জন্যে? এত কষ্টে এগুলো বাঁচাতে গেলেই বা কেন? বলিয়া সে ছোট টিনের বাক্সটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আর বিপদের দিনে যদি কোন কাজেই না লাগে ত মিথ্যে বোঝা বয়ে বেড়িয়ে কি হবে? আগুন এখনও জ্বলচে, আমি টান মেরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই—তোমার মনে যা আছে করো। বলিয়া সে আঁচল দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া মহিম ধীরে ধীরে কহিল, আমি সমস্ত ভেবে দেখলাম অচলা। কিন্তু, তুমি ত জানো আমি কোন কাজ ঝোঁকের ওপর করিনে, কিংবা আর কেউ করে, সেও চাইনে। তুমি যা দিতে চাচ্ছো, তা নিজের করে নিতে পেলে আজ আমার সুখের সীমা থাকত না, কিন্তু কিছুতেই নিতে পারিনে। দুঃখ দেখে তোমার মত আরও একজন আরও ঢের বেশী আমাকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সেও যেমন দয়া, এও তেমনি দয়া। কিন্তু এতে না তোমাদের না আমার কারও শেষ পর্যন্ত ভাল হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

অচলা আর সহ্য করিতে পারিল না। কান্না ভুলিয়া তেজ করিয়া প্রতিবাদ করিবার জন্যই দৃপ্ত চক্ষু দুটি উপরে তুলিবামাত্র স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল, কতকটা দূরে তাহাদের যে পুষ্করিণী আছে তাহারই ঘাটের পাশে বাঁধানো নিমগাছতলায় সুরেশ হাতে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। অচলার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল এবং উচ্ছ্রিত মাথা তাহার আপনি হেঁট হইয়া গেল।

কিন্তু মহিম যেন কতকটা অন্যমনস্কের মত আপন মনেই বলিতে লাগিল শুধু যে কখনো শান্তি পাবো না তা নয়, তোমাকে বারংবার বঞ্চিত করতে পারি, এ সম্বন্ধই কোন দিন আমাদের মধ্যে হয়নি। একটুখানি থামিয়া কহিল, অচলা, নিজেকে রিক্ত করে দান করবার অনেক দুঃখ। কিন্তু ঝোঁকের ওপর হয়ত তাই একমুহূর্তে পারা যায়, কিন্তু তার ফলভোগ হয় সারা জীবন ধরে। আমি জানি, একটা ভুলের জন্যে তোমাদের মনস্তাপের অবধি নেই। আমার একটা ভুল হয়ে গেলে, তুমি না পারবে কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে না পারবে আমাকে মাপ করতে। এ ক্ষতি সইবার মত সম্বল তোমার নেই, এ কথা আজ না টের পেতে পারো, দু'দিন পরে পাবে। তাই তোমার কাছ থেকে কিছুই আমি নিতে পারব না।

কথাগুলো অচলার বুকের ভিতর বিঁধিল। স্বামীর চক্ষে সে যে কত পর তাহা আজ যেমন অনুভব করিল এমন আর কোনদিন নয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালের স্মৃতিতে সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেও কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি এতক্ষণ ধরে যা বোঝাচ্ছো সে আমি বুঝেচি। হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত তোমার মুখ দেখে দয়া হওয়াতেই আমার যথাসর্বস্ব দিতে চেয়েছিলুম... হয়ত দুদিন পরে আমাকে সত্যি এর জন্যে অনুতাপ করতে হতো; সব ঠিক, কিন্তু দ্যাখো অপরের মনের ইচ্ছে বুঝে নেবার মত যত বুদ্ধিই তোমার থাক, তোমাকে বুঝিয়ে দেবারও জিনিস আছে। স্ত্রীর জিনিস জোর করে নেওয়া ত দূরের কথা, হাত পেতে নেবার সম্বল তোমারই বা কি আছে? আর তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। এটুকু বিবেক-বুদ্ধি যে এখনো তোমাতে বাকী আছে, আজ থেকে তাই আমার সান্ত্বনা। কিন্তু যেখানেই থাকি, একদিন না একদিন তোমাকে সব কথা বুঝতেই হবে। হবেই হবে। বলিয়া সে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কান্না রোধ করিল।

ন'টার ট্রেনে সুরেশও বাটী ফিরিতেছিল। গত রাত্রের অগ্নিকাণ্ড তাহাকে কেমন যেন একরকম করিয়া দিয়াছিল। কাহারও সহিত কথা কহিবার যেন শক্তিই তাহাতে ছিল না। গাড়ি আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব ছিল; সুরেশ মহিমকে স্টেশনের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, মহিম, আগুন লাগার জন্যে আমাকে ত তুমি সন্দেহ করোনি?

মহিম তাহার হাতদুটো সজোরে ধরিয়া ফেলিয়া শুধু বলিল, ছি!

সুরেশের দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বলিল, কাল থেকে এই ভয়ে আমার শান্তি নেই মহিম।

মহিম নীরবে শুধু একটু তাহার হাতের মধ্যে চাপ দিল। তাহার পরে কহিল, সুরেশ, একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে আনে। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে, সে তুমি কোনদিন করতে পার না বলে আজও আমি বিশ্বাস করি। একটুখানি থামিয়া কহিল, সুরেশ, তুমি ভগবান মানো না বটে, কিন্তু যে যথার্থ মানে সে অহর্নিশি প্রার্থনা করে, এ বিশ্বাস তিনি যেন তার না ভেঙ্গে দেন।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়িতে অচলা এবং তাহার দাসীকে তুলিয়া দিয়া মহিম সুরেশের কাছে আসিতেই সে জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, তোমার কালকের ক্ষতিটা পূর্ণ করে দেবার প্রার্থনাটা আমার কিছুতেই মঞ্জুর করলে না, কিন্তু তোমার ভগবান তোমার প্রার্থনা যেন মঞ্জুর করেন ভাই। আমাকে যেন আর তিনি ছোট না করেন, বলিয়াই সে হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ওদিকে জানালায় মুখ রাখিয়া অচলা যদুর সঙ্গে এতক্ষণ চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল, মহিম নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, মৃণালদিদির স্বামী নাকি আজ মারা গেছেন?

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঘণ্টা-খানেক পূর্বে মারা গেছেন শুনলাম।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রায় দশ-বারোদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোনদিন তুমি আবশ্যক মনে করোনি?

মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে, ভাবিতে ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তখনও কেদারবাবু আগেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে আসিয়া বারান্দায় একখানা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হয়ত একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, দরজায় ঠিকা গাড়ির কঠোর শব্দে চোখ মেলিয়া দেখিলেন সুরেশ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কন্যা ও ঝি অবতরণ করিল। ঘুমের ঝোঁক তাঁহার নিমিষে উড়িয়া গেল; কি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া গলা বাড়াইয়া চীৎকার করিলেন, অচলা যে? সুরেশ, তুমি কোথা থেকে? কি, ব্যাপার কি? এ-সব কি কাণ্ড-কারখানা, আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে!

অচলা উঠিয়া আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিল। সুরেশ প্রণাম করিয়া কহিল মহিমের টেলিগ্রাফ পাননি?

কেদারবাবু উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, কৈ, না!

সুরেশ একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিয়া বলিল, তা হলে হয় সে টেলিগ্রাফ করতে ভুলেছে, না হয় এখনো এসে পৌঁছায় নি।

কেদারবাবু কহিলেন, টেলিগ্রাফ যাক, ব্যাপার কি, তাই আগে বল না! তুমি এদের কোথা থেকে নিয়ে এলে?

সুরেশ বলিল, কাল রাত্রিতে আগুন লেগে মহিমের বাড়ি পুড়ে গেছে।

বাড়ি পুড়ে গেছে? সর্বনাশ! বল কি—বাড়ি পুড়ে গেল? কেমন করে পুড়ল? মহিম

কে? তুমি এদের পেলে কোথায়? এক নিশ্বাসে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া কেদারবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বলিল, এদের সেখান থেকেই নিয়ে আসচি। আমি সেখানেই ছিলাম কিনা।

কেদারবাবুর মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিলেন, তুমি ছিলে সেখানে? কবে গেলে, আমি ত কিছু জানিনে। কিন্তু সে কৈ?

সুরেশ বলিল, মহিম ত আসতে পারচে না, তাই—

তাঁহার গম্ভীর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, এ-সব ভাল কথা নয়। অতিশয় মন্দ কথা। যৎপরোনাস্তি অন্যায়। এ-সব ত আমি কোনমতেই—, বলিতে বলিতে তিনি চোখ তুলিয়া কন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন।

অচলা এতক্ষণ একটা চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার এই সংশয় তাহার মর্মে গিয়া বিঁধিল। তাহার এই অকস্মাৎ আগমনের হেতু যে তিনি লেশমাত্র বিশ্বাস করেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখে আর রক্তের চিহ্ন রহিল না।

কেদারবাবু এখানে ভুল করিলেন। মেয়ের মুখের চেহারায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। আরাম-চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া হাতের কাগজখানা মুখের উপরে টানিয়া নিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা ভাল বোঝ তোমরা কর। আমি কালই বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো।

সুরেশ ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ের সহিত কহিল, এ-সব আপনি কি বলচেন কেদারবাবু? আপনি বা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কেন, আর হয়েছেই বা কি? বলিয়া সে একবার অচলার প্রতি, একবার তাহার পিতার প্রতি চাহিতে লাগিল; কিন্তু কাহারও মুখ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

কেদারবাবুর কাছে কোন জবাব না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক, আমার ওপর মহিম যা ভার দিয়েছিল তা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন। আমার নাওয়া-খাওয়া এখনো হয়নি, আমি বাড়ি চললুম। বলিয়া সে কয়েক পদ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কেদারবাবু উঠিয়া বসিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিলেন, আহা, যাও কেন ছাই। ব্যাপারটা কি, তবু শুনিই না। আগুন লাগল কি করে?

সুরেশ অভিমান-ভরে বলিল, তা জানিনে।

তুমি গেলে কবে সেখানে?

দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে। আমি খাইনি এখনো, আর দেরি করতে পারিনে, বলিয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আহা-হা, নাওয়া-খাওয়া ত তোমাদের কারও হয়নি দেখচি, কিন্তু জলে পড়নি এটাও ত বাড়ি, এখানেও ত চাকরবাকর আছে। অচলা, ডাকো না একবার বেয়ারাটাকে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস, বোস, সুরেশ, ব্যাপারটা কি হ'লো, খুলেই সব বল শুনি।

সুরেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত্রে ঘুমুচ্চি, মহিমের চীৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখি, সমস্ত ধুধু করে জ্বলছে; খড়ের ঘর, নিবোবার উপায়ও ছিল না, সে বৃথা চেষ্টাও কেউ করলে না—সর্বস্ব পুড়ে গেল আর কি!

কেদারবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বল কি হে, সর্বস্ব পুড়ে গেল? কিছুই বাঁচাতে পারা গেল না? অচলার গয়নাপত্রগুলো?

সেগুলো বেঁচেচে।

তবু রক্ষে হোক! বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবু, কি করে আগুনটা লাগল?

সুরেশ কহিল, বললুম ত আপনাকে, সে খবর এখনো জানা যায়নি। তবে গ্রামের মধ্যে বড় কেউ আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী নেই, তা জেনে এসেছি।

নেই বুঝি?

না।

কেদারবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া

বসিয়া থাকিয়া পরিশেষে আর একটা গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাও, স্নান করে এসো গে সুরেশ, আর বেলা করো না। দেখি, রান্না-বান্নার কি যোগাড় হচ্ছে। বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আহারাদির পরেও তিনি সুরেশকে মুক্তি দেন নাই। সে একটা আরাম-চৌকির উপরে অর্ধনিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। অচলাও সেই যে স্নানান্তে তাহার ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল, আর তাহার কোন সাড়াশব্দ ছিল না। বিশ্রাম ছিল না শুধু কেদারবাবুর। এখন যে টেলিগ্রাম আসা না আসার বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল না, তাহারই জন্য সমস্ত বেলাটা ছটফট করিয়া, সন্ধ্যার সময় অসময়ে ঘুমানো শোভন নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, তোমরা যে বললে, সে টেলিগ্রাম করেচে—টেলিগ্রাম করেচে—কৈ তার ত কিছুই দেখিনে। তোমরা ট্রেনেতে এসে পড়লে, আর তারের খবর এতক্ষণেও পৌঁছল না। আচ্ছা, দাঁড়াও ত দেখি. বলিয়া মেয়ের মুখের জবাব না শুনিয়াই চটিজুতা ফটফট করিতে করিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণকাল পরেই নীচে হইতে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অচলার দাসীকে ধরিয়া তিনি নানাপ্রকারে জেরা করিতেছেন, এবং প্রত্যুত্তরে সে আশ্চর্য হইয়া বারংবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, সে কি বাবু, আগুন লেগে ঘরদোর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, চক্ষে দেখে এলুম, আর আপনি বলছেন, পোড়েনি! আর আগুন যদি না-ই লাগবে, তবে ঘরদোর পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল কি করে, একবার বিবেচনা করে দেখুন দেখি।

সুরেশ সমস্তই শুনিতেছিল; সে মাথা তুলিয়া দেখিল, অচলা চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া পাংশু-মুখে কান পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিতেছে। শুষ্ক উপহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তোমার বাবার হ'ল কি, বলতে পারো?

অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

সুরেশ কহিল, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি উনি বিশ্বাস করেন নি। ওঁর ধারণা, আগুন লাগার গল্পটা আমাদের আগাগোড়া বানানো। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সত্যি-মিথ্যে একদিন টের পাবেনই, কিন্তু ওঁর সন্দেহটা এমন যে, এখানে আসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেচে।

অচলা শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর আসবেন না?

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বোধ করি সম্ভব নয়। আমারও ত কিছু আত্মসম্মান-বোধ আছে। কোন লোককে দিয়ে আমার ব্যাগটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার এখানে আসা না-আসার সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

তা হলে কাল সকালেই দিয়ো। অনেক দরকারী জিনিস আমার ওর মধ্যে আছে, বলিয়া সে কেদারবাবুর জন্যে অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু ফিরিয়া আসিয়া কিছু আশ্চর্য হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যে অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা বোধ হইল না।

রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শয্যার উপর ছটফট করিয়া অচলা উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা, বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সম্মুখের রাজপথের উপর লোকচলাচলের প্রতি চাহিয়া কিছু-ক্ষণের জন্যেও অন্যমনস্ক হয়।

তাহার ঘরের ও-দিকের কবাট খুলিয়া সে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, তখনও বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। প্রথমে মনে করিল, চাকরেরা গ্যাস বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই ভিতর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর কানে আসিতে তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। চিরদিন তিনি দশটা বাজিতে না বাজিতেই শয্যা গ্রহণ করেন; কিন্তু আজ সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই দাসীর গলা শুনা গেল। সে বলিতেছে, এখন সোয়ামী মারা গেছে- আর যে মৃণাল-দিদিমণি শ্বশুরঘর করে, এমন ত আমার মনে হয় না বাবু। জামাইবাবুর সঙ্গে কি যে দাদা-নাতনী সুবাদ. তা তেনারাই জানে।

প্রত্যুত্তরে কেদারবাবু শুধু হুঁ বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন।

অচলা বুঝিল, ইতিপূর্বে অনেক কথাই হইয়া গিয়াছে। মৃণালের সম্বন্ধে, মহিমের সম্বন্ধে, তাহার সম্বন্ধে—কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু পাছে নিজের সম্বন্ধে নিরতিশয় অপ্রিয় কথা নিজের কানেই শুনিতে হয়, এই ভয়ে সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনই নীরবে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু কিসে যেন তাহার পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।

কেদারবাবু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, দু'জনের তা হলে বনিবনাও হয়নি বল?

ঝি কহিল, মোটে না বাবু, মোটে না। একটি দিনের তরে না।

এই দাসীটিকে অচলা নির্বোধ বলিয়াই এতদিন জানিত; আজ দেখিল, বুদ্ধি তাহার কাহারো অপেক্ষা কম নয়।

কেদারবাবু আবার মিনিট-খানেক মৌন থাকিয়া বলিলেন, কাল রাতে তা হলে কারও খাওয়া হয়নি বল? সুরেশ যাওয়া পর্যন্তই একরকম ঝগড়াঝাটিতেই দিন কাটছিল?

দাসীর উত্তর শুনা গেল না বটে, কিন্তু পিতার মুখের মন্তব্য শুনিয়াই বুঝা গেল, সে গ্রীবা আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অভিমত ব্যক্ত করিল। কারণ, পরক্ষণেই কেদারবাবু একটা গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, এমনটি যে একদিন ঘটবে, আমি আগেই জানতুম। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ত বাপ-মায়ের কথা গ্রাহ্য করে না; নইলে আমি ত সমস্তই একরকম ঠিক করে এনেছিলুম। আজ তা হলে ওর ভাবনা কি! বলিয়া আর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহাও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

ঝি পূর্ণ সহানুভূতির সহিত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কহিল, তাই বলুন ত বাবু, নইলে আজ ভাবনা কি! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে কিনা একটা খোড়ো মেটে বাড়ি! তাও রইল কৈ? আজ জামাইবাবুও ত—, বলিয়া সেও কথাটাকে শেষ না করিয়াও একটা দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা অনেকদূর পর্যন্ত ঠেলিয়া দিল।

কপাল! বলিয়া কেদারবাবু মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই যা; বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আলো নিবাইবার জন্য বেয়ারাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

অচলা পা টিপিয়া আস্তে আস্তে তাহার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিতার উদারতা, তাঁহার ভদ্রতাবোধের ধারণা কোনদিনই তাহার মনের মধ্যে খুব উচ্চ অঙ্গের ছিল না, কিন্তু সে যে বাটীর দাসীর সহিত নিভৃতে আলোচনা করিবার মত এত ক্ষুদ্র, ইহাও সে কখনও ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার নিজের মন ছোট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বামী, তাহার পিতা, তাহার দাসী, তাহার বন্ধু—সবাই যখন তাহারই মত ভূমিতলে পড়িয়া, তখন কাহাকেও অবলম্বন করিয়া কোনদিন যে সে এই ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এ ভরসা সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কেদারবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিবাহে জামাই যাহাতে পাস-করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এম. এ. পাস করিয়াছে, দেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার গাড়ি চড়িয়া আসিয়া একটা উলটা রকমের খবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদারবাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্মতত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মেয়েমানুষে যাহার কাছে গাড়ি পালকি চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে

পায়, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্তব্য হয় ত এত বড় অযাচিত সুযোগ কোনমতেই যে হাতছাড়া করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেশী চিন্তা করিতে হয় নাই।

এমন কি, বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ করিয়া বিবাহের পূর্বেই হাজার-পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই; এবং বাড়িটা যখন তাহার থাকিবে, তখন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।

অথচ হতভাগা মেয়েটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল—কিছুতেই বাগ মানিল না। অতএব শেষ পর্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাঁহাকে মেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। তা ছাড়া, যে কথাটা এখন তাঁহাকে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিতে হইল তাহা এই যে, টাকাটা এইবার ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জিনিসটা লেখাপড়ার মধ্যে না থাকায় এবং পরিশোধের রাস্তাটাও খুব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে না পড়ায়, ইহার চিন্তাটাকেও তিনি হৃদয়ের মধ্যে তেমনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সুতরাং, প্রশ্নটা যদিচ মনের মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তেমনি ঝাপসা হইয়া রহিল।

অচলা শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা কেদারবাবু পছন্দ করিতেন না। বাটী নাই অজুহাতে অধিকাংশ সময় দেখাও দিতেন না। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া মেয়ের দুর্ব্যবহারে বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াই রহিলেন।

এইভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজে পুত্রাধিক সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। তিনি স্বয়ং ঋণের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে যৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই যুবকটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন গভীর ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কন্যার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের ন্যায় উদয় হইত যে, দুর্ভাগা মেয়েটা এমন রত্ন চিনিল না, উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, সে যেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিম তাঁহার দু চক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কন্যা যে নারীধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীত্যাগের গভীর দুষ্কৃতি সর্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে যত বড় হউক, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে।

অন্যপক্ষে, পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব পূর্বে যেমনি থাক, যেদিন তিনি শুদ্ধমাত্র টাকার লোভেই মহিমকে বর্জন করিযা সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এবং পরিশোধের কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাহার কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে মানুষ হিসাবে কেদারবাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল কাল রাত্রে, যখন সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল, তিনি নিজের কন্যার চরিত্রের সম্বন্ধে গোপনে দাসীর মতামত গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজি আপনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া চোখে পড়িল, যে মুহূর্তে সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেই মুহূর্তেই নারীর সর্বোত্তম মর্যাদাও জগৎসংসার হইতে তাহার জন্য মুছিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচারিকার কাছে ছোট, এমন কি সেই সুরেশের মত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে তাহাকে লালসার সঙ্গিনী কল্পনা করাও তাহার পক্ষে আর দুরাশা নয়। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এমনি ছোট? এই ত সেদিন সে যাহার ভালবাসাকেই সর্বজয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহারই মধ্যে সে কথা কি সবাই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী তাহার কোন সংবাদ লইলেন

না। এই ঔদাসীন্যের নিগূঢ় অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি যেন আগুন দিয়া পোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ-বা প্রভাতের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এ সময়ে কেহই ত ঘরে বসিয়া নাই, আর আমিই বা যথার্থ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে দণ্ড তিনিই দিবেন; কিন্তু নির্বিচারে যে-কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথা পাতিয়া লইব কিসের জন্য?

অচলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্ত গ্লানি যেন জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু তাঁহার আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, একটি-বার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেয়ারা কেৎলিতে গরম চায়ের জল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, কেদারবাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং বাটিটা হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম-চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সমস্ত লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে যাচিয়া তাঁহার চা তৈরি করিয়া দিতে কিংবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের মূর্তির মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। এমন কি, এইভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার সহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কিনা এবং না হইলেই বা সে কি উপায় করিবে, এই জটিল সমস্যার কোথাও একটু নিরালায় বসিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে যখন সে উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কেদারবাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের জিনিসগুলো সরাইবার জন্য বেয়ারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়িতে তুলে দাও ত। শেভ করবার জিনিসগুলো পর্যন্ত তার মধ্যে আছে। দেরি করো না, আমি এখখুনি যাবো।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সে চলিয়া গেলে আবার সমস্ত কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মহিমের কোন খবর পাওয়া গেল?

কেদারবাবু মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য!

তার পরে আবার সমস্ত চুপচাপ। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ব্যাগ তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি তা হলে চললুম। মহিমের চিঠি এলে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন, বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই সহসা কেদারবাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর সুরেশ, আমি আসচি। বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়াই চটিজুতার পটাপট শব্দ করিয়া একটু দ্রুতবেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ অবধি অচলা অধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই বিস্মিত সুরেশ

অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অচলার ত্রস্তপীড়িত ও একান্ত মলিন দুই চক্ষুর উপর গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, আমি যে কত দুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েচি তা বলে জানাতে পারিনে।

অচলা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এত বড় পাষণ্ড ভাবতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও মনে করিনি।

এ অভিযোগেও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, আমার এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে এখখুনি মহিমের কাছে গিয়ে তাকে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কেদারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেইখানা সুরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিলেন, গড়িমসি করে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঁচ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখেই দিলুম—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়িটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।

সুরেশ স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আমি ত আপনার কাছে হ্যাণ্ডনোট চাইনি কেদারবাবু!

কেদারবাবু বলিলেন, তুমি চাওনি সত্য, কিন্তু আমার ত দেওয়া উচিত। এতদিন যে দিইনি, সেই আমার যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে সুরেশ, কাগজখানা তুমি পকেটে তুলে রাখো। বুড়ো হয়েচি, হঠাৎ যদি মরে যাই, টাকাটার গোল হতে পারে।

সুরেশ আবেগের সহিত জবাব দিল, কেদারবাবু, সুরেশ আর যাই করুক, সে টাকা নিয়ে কখনো কারোর সঙ্গে গোল করে না। তা ছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন, এ টাকা আমি চাইনে—এ আমি আমার বন্ধুকে যৌতুক দিয়েচি।

কেদারবাবু বলিলেন, তা হলে সে তোমার বন্ধুকেই দিয়ো, আমাকে নয়। আমি যা নিয়েছি, সে আমারই ঋণ।

সুরেশ কহিল, বেশ, আমার বন্ধুকেই দেবো, বলিয়া কাগজখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই, কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, খবরদার সুরেশ! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেচি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না বলে দিচ্ছি। বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার আরাম-কেদারায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা সুরেশ চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ওইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলার প্রতি ফিরাইয়া দেখিল, সে এক-মুহূর্তে যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। প্রবল চেষ্টায় একবার সুরেশ কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার শুষ্ককণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন স্পষ্ট কিছুই বাহির হইল না। আবার ফিরিয়া দেখিল, কেদারবাবু দুই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া তেমনি পড়িয়া আছেন। আর সে কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট-খানেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কন্যা ও পিতা ঠিক তেমনি একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা নিষ্ঠুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নীচে সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়িখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝিতে পারা গেল এবং পরক্ষণেই বেহারা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাগজ। আর কিছু বলিতে হইল না, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, নিয়ে যা বলচি ব্যাটা, নিয়ে যা সুমুখ থেকে। বেরো বলচি—

হতবুদ্ধি বেহারাটা মনিবের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেই, তিনি কন্যার

প্রতি অগ্নি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কন্ঠস্বর আরও একপর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার যদি আর কোনদিন কোন ছলে আমার বাড়ি ঢোকবার চেষ্টা করে ত তাকে পুলিশে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলুম অচলা!

নিজের নাম শুনিয়া অচলা তাহার একান্ত পান্ডুর মুখখানি ধীরে ধীরে উন্নত করিয়া ব্যথিত ম্লান চক্ষুদুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে বন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড যেন এ কথা মনে রাখে।

কন্যা তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তর্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হ্যান্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘুষ দেওয়া যায় না, এ কথা আমি তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়ব। এ বাড়ি আমি নিজে বিক্রি করে নিজের ঋণ পরিশোধ করে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো—আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, তা বলে রাখচি।

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা বাধা পাইল বটে, কিন্তু তার পরে স্থির অবিচলিত-কণ্ঠে কহিল, ঋণ-পরিশোধ না করে বাড়িটা আমার জন্যে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলে ত এ কাজ আমাকেই করতে হ'তো।

কেদারবাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, তোমরা যা করে এসেছ, শুধু তাইতেই ত আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারচি নে, তা তুমি জানো?

অচলা তেমনি শান্ত দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, না, আমি জানিনে। আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, তার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা হলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর যারই অভাব থাক, ডুবে মরবার মত জলের অভাব ছিল না। বলিতে বলিতেই কান্নায় তাহার গলা ধরিয়া আসিল, কহিল, কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি করচ, শুধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেচি, নইলে—

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার, শোক করিবার অর্থাৎ কন্যার নিন্দিত আচরণে সর্বপ্রকার গভীর বিষাদের কারণ একমাত্র তাঁহারই ঘটিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপর পক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তিরস্কার করিয়া তীব্র অভিমানে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। তাই অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বারংবার বলিতে লাগিলেন, এই নাও—এ আবার এক কাণ্ড!

ইহার পরে আট-দশদিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, বাটীর চাকর-দাসীর কাছেও মুখ-দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিগত কয়দিনের মত আজও সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার জন্য খোলা জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল।

শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল তাহাও নহে, অথচ অভ্যাসমত উপরে নীচে, আশেপাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। এমনি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বাকী নাই, সহসা দেখিতে পাইল, সুরেশের গাড়ি তাহাদের বাটীতে প্রবেশ ক[illegible]তেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং পুলিশ দেখি[illegible] চোর [illegible] উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আ[illegible] এব[illegible] খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট-কুড়ি পরে তাহার রুদ্ধ দরজায় ঘা পড়িল; এবং বাহির হইতে তাহার পিতা স্নিগ্ধস্বরে ডাক দিলেন, মা অচলা, জেগে আছো কি?

কিন্তু সাড়া না পাইয়া অধিকতর কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, বেলা গেছে মা, ওঠো। সুরেশের পিসীমা তোমাকে নিতে এসেছেন, মহিম নাকি ভারী পীড়িত।

অচলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে দ্বার খুলিয়া দিতেই সুরেশের পিসীমা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিল।

কেদারবাবু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একান্তে বসিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমাদের চলে আসার পর থেকেই মহিমের ভারী জ্বর। খুব সম্ভব রাত্রে হিম লেগে দুশ্চিন্তায় পরিশ্রমে নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে। বলিয়া সুরেশের পিসীকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি, এদের পাঠিয়ে পর্যন্ত সে একটা সংবাদ দিলে না কেন? সুরেশ আমার দীর্ঘজীবী হোক, সে গিয়ে বুদ্ধি করে তাকে এখানে না এনে ফেললে কি যে হতো তা ভগবানই জানেন। বলিয়া সস্নেহ অনুতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

সুরেশের পিসীমা অচলার বাহুর উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ভয় নেই মা, সে দু'দিনেই ভাল হয়ে যাবে।

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আলনা হইতে শুধু গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শীতের অপরাহ্ণে ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি গায়ে, অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল; কিন্তু পুরোবর্তী ঐ বিধবার সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন, চল মা, আমিও সঙ্গে যাচ্চি, বলিয়া চটি-জুতা পায়ে দিয়াই সকলের অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহিমের প্রতি অচলার সকলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী হইয়াও সে একটি দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পায় নাই। এই লইয়া সুরেশও বন্ধুর সহিত ছেলেবেলা হইতে অনেক বিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কৃপণের ধনের মত মহিম সেই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এমনি একান্ত করিয়া আগলাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখ দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে থাক, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোনদিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।

সুতরাং বাড়ি যখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃপিতামহের ভস্মীভূত গৃহস্তূপের প্রতি চাহিয়া মহিমের বুকে যে কি শেল বিঁধিল, তাহার মুখ দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। মৃণালের বৈধব্যেও স্বামীর দুঃখের পরিমাণ করা তাহার তেমনি অসাধ্য। যেদিন নিজের মুখে শুনাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে ভালবাসে না, সেদিন সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে এমনি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এত বড় নির্বোধও সে নহে যে সর্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্বিকার ঔদাসীন্যকে যথার্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে; তাহার মনের মধ্যে কোন সংশয়ই উঁকি মারিত না। তাই সেদিন স্টেশনের উপরে সে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারংবার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সহিষ্ণুতার ওই মিথ্যা মুখোশের অন্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ!

আজ তাহার পীড়ার সংবাদটাকে লঘু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার জন্য

কেদারবাবু যখন সহজ গলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্চর্য হন নাই, বরঞ্চ এত বড় দুর্ঘটনার পরে এমনিই কিছু একটা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অন্তরে যে ভাব একমুহূর্তের জন্যও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিমিশ্র উৎকণ্ঠা বলাও সাজে না।

সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। পিসীমা এক দিকের দরজা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাহার পার্শ্বে অচলা পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। শুধু কেদারবাবু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের দিকে শূন্য-দৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন। সুরেশের মত দয়ালু বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলে ভূ-ভারতে নাই; মহিমের একগুঁয়েমির জ্বালায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে দেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, শুধু চোর-ডাকাত, শিয়াল-কুকুরের বাস, সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাস করার শাস্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে,—এমনি সমস্ত সংলগ্ন-অসংলগ্ন মন্তব্য তিনি নিরন্তর এই নির্বাক রমণী-দুইটির কর্ণে নির্বিচারে ঢালিয়া চলিতেছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেদারবাবু স্বভাবতঃই যে এতটা হালকা প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদযের গূঢ়-আনন্দ কোন সংযমের শাসনই মানিতেছিল না। তঁহাদের পরম মিত্র সুরেশের সহিত প্রকাশ্য বিবাদ, একমাত্র কন্যার নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কদর্য সংশয়ের গোপন গুরুভার বিগত কয়েকদিন হইতে তাঁহার বুকের উপর জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসীমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অসুখের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই দেন নাই। যদি সে রাত্রির দৈব-দুর্বিপাকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া একটু জ্বরভাবই হইয়া থাকে ত সে কিছুই নহে। পিসীমা দুই-তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছিলেন, হয়ত সে সময়ও লাগিবে না, হয়ত কাল সকালেই সারিয়া যাইবে। পীড়ার সম্বন্ধে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, সুরেশ স্বয়ং গিয়া তাহাকে আপনার বাড়িতে ধরিয়া আনিয়াছে এবং যে-কোন ছলে তাহার স্ত্রীকে তাহার পার্শ্বে আনিয়া দিবার জন্য নিজের পিসীমাকে পর্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে। কন্যা-জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আজ এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ায়, এই অবিশ্রাম বকুনির মধ্যেও তাঁহার নিরতিশয় আত্ম-গ্লানির সহিত মনে হইতে লাগিল, এখানে পৌঁছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ভদ্র যুবকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি করিয়া? কিন্তু তাঁহার কন্যার সর্বদেহের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে বুঝিয়াছিল, শুধু বুঝিতে পারিতেছিল না, সুরেশ তাহাকে ধরিয়া আনিল কিরূপে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ি সুরেশের বাটীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়িবারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেদারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সহসা উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই অচলার চকিত দৃষ্টি গিয়া তাহার উপরে পড়িল এবং লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুরেশ একজন প্রবীণ ইংরাজকে সসম্ভ্রমে গাড়িতে তুলিয়া দিতেছে এবং আর একজন সাহেবী-পোশাকপরা বাঙালী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইঁহারা যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ইঁহাদের গাড়ি আসিয়া গাড়িবারান্দায় লাগিল। সুরেশ দাঁড়াইয়া ছিল, কেদারবাবু চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, মহিম কেমন আছে সুরেশ? অসুখটা কি?

সুরেশ কহিল, ভাল আছে। আসুন।

কেদারবাবু অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখটা কি তাই বল না শুনি?

সুরেশ কহিল, অসুখের নাম করলে ত আপনি বুঝতে পারবেন না কেদারবাবু! জ্বর, বুকে একটু সর্দি বসেছে। কিন্তু আপনি নেমে আসুন, ওঁদের নামতে দিন।

কেদারবাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, একটু সর্দি বসেছে, তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই করতে পার! আমি ছেলেমানুষ নই সুরেশ, দু'জন ডাক্তার কেন? সাহেব-ডাক্তারই বা কিসের জন্যে? বলিতে বলিতে তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশ নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া বলিল, পিসীমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি।

অচলা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না, তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না; নামিতে গিয়া পাদানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না, সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে নামিয়া পিসীমার পিছনে পিছনে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মিনিট-কয়েক পরে দ্বারের ভারী পর্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মহিম বোধ করি তাহার বাটীর সম্বন্ধে কি-সব বলিতেছিল। সেই জড়িত-কণ্ঠের দুটা কথা কানে প্রবেশ করিবামাত্রই আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহা অর্থহীন প্রলাপ এবং রোগ কতদূর গিয়া দাঁড়াইয়াছে; মুহূর্তকালের জন্য সে দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া আপনাকে দৃঢ় করিয়া রাখিল।

যে মেয়েটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বরফ দিতেছিল, সে ফিরিয়া চাহিল এবং ধীরপদে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড়ভাবে বিরাজ করিতেছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই; এখন মুখোমুখি স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই ক্ষণ-কালের জন্য উভয়েই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল; একবার অচলার সমস্ত দেহ দুলিয়া নড়িয়া উঠিল; কি একটা বলিবার জন্য ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ছিন্নলতার মত মৃণালের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাহিয়া দেখিল, সে পিতার ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একজন দাসী গোলাপজলের পাত্র হইতে তাহার চোখেমুখে ছিটা দিতেছে এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুরেশ একখানা হাতপাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে, স্মরণ করিতে তাহার কিছুক্ষণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতে লজ্জায় মরিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, একটু বিশ্রাম কর মা, এখন উঠে কাজ নাই।

অচলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি, বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, এখন উঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সুরেশও অস্ফুটে বোধ করি এই কথারই অনুমোদন করিল। অচলা নীরবে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রত্যুত্তরে কেবল পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঘুমোবার জন্যে ত এখানে আসিনি বাবা—আমার কিছুই হয়নি—আমি ও-ঘরে যাচ্ছি। বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ বাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্মৃত হয় নাই। রোগীর কক্ষ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাহিয়া দেখিল; কহিল, তুমি এসে একটুখানি বসো সেজদি, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই গে। বরফের টুপীটা গড়িয়ে না পড়ে যায়, একটু নজর রেখো। বলিয়া সে অচলাকে নিজের জায়গায় বসাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নিমোনিয়া রোগ সারিতে সময় লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এ যাত্রায় আর তাহার ভয় নাই, এ কথা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া

উঠিয়াছিল। তাহার মুখের অর্থহীন বাক্য, চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সমস্তই শান্ত এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

দিন-দশেক পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় মহিম শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এ বৎসর সর্বত্রই শীতটা বেশী পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রোগীর খাটের সহিত একটা বড় তক্তপোশ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়াছিল। সকলের চোখে-মুখেই একটা নিরুদ্বিগ্ন তৃপ্তির প্রকাশ: শুধু পিসীমা গৃহকর্মে অন্যত্র নিযুক্ত এবং কেদারবাবু তখনও বাড়ি হইতে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই।

সুরেশের প্রতি চাহিয়া মৃণাল হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিল, এইবার আমার ছাড়পত্র মঞ্জুর করতে হুকুম হোক সুরেশবাবু. আমি দেশে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাশুড়ী হয়ত বা মরেই গেল।

সুরেশ কহিল, এখনও কি তাঁর বেঁচে থাকা দরকার নাকি? না, তাঁর জন্য আপনার যাওয়া হবে না।

মৃণাল পলকের তরে ঘাড় ফিরাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘনিশ্বাসই চাপিয়া লইল; তাহার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, শুধু আপনিই নয় সুরেশবাবু, এ প্রশ্ন পূর্বে আমিও অনেকবার করেছি। মনেও হয়, এখন তাঁর যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাঁচনের মালিক যিনি, তাঁর ত সে খেয়াল নেই, থাকলে হয়ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকেই মানুষ নিস্তার পেত।

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথায় বোধ করি তাহার স্বামীর মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল. তার মানে যিনি অন্তর্যামী তিনি জানেন, মানুষ শত দুঃখেও নিজের মৃত্যু চায় না।

মৃণালের মুখের উপর একটা গোপন বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না সেজদি, তা নয়। এমন সময় সত্যিই আসে যখন মানুষে যথার্থই মরণ-কামনা করে। সেদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে যেতে শাশুড়ী-ঠাকরুনকে বিছানায় পেলুম না। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুরঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, তিনি গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের কাছে করজোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইচেন। বলছেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কায়মনে তোমার সেবা করে থাকি ত আজ আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাইনে, স্বর্গ চাইনে, শুধু এই চাই ঠাকুর, তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না—আমি এ মুখ আমার বৌমার কাছে বার করতে পারচি নে। বলিতে বলিতেই মৃণাল ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের কত বড় সুগভীর বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। সুরেশের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও সামান্য দুঃখেই সে কাতর হইয়া পড়িত; আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাও দিদি, তোমার বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে কর্তব্য কর গে, আমি আর তোমাকে আটকে রাখব না। এই হতভাগ্য দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ! এমন জিনিসটি বোধ করি, আর কোন দেশ দেখাতে পারে না। বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-মুখে একবার অচলার প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জানালার বাহিরে একখণ্ড ধূসর মেঘের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল বলিয়া তাহার কাছ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কিন্তু মৃণাল লজ্জা পাইয়া নিজের দিক হইতে আলোচনাটাকে অন্য পথে সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, নেই বৈ কি! আপনি সব দেশের খবর জানেন কিনা! আচ্ছা, সেজদার চেয়ে আপনি বড় না ছোট?

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেশ সহাস্যে কহিল, কেন বলুন ত?

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, না, আমাকে আর আপনি নয়। আমি দিদি হলেও যখন বয়সে ছোট, তখন—মেজদা? নদা?—বলুন, বলুন, শিগ্‌গির বলুন, কি?

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার তাহার দিকে চাহিল। অনেকদিন পূর্বে যেদিন এই মেয়েটি এমনি দ্রুত, এমনি অবলীলাক্রমে তাহার সহিত সেজদি সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু মৃণালের চরিত্রের এই দিকটা সুরেশের জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল, নদা! নদা! তোমার সেজদার চেয়ে আমি প্রায় দেড় বছরের ছোট।

মৃণাল কহিল, তা হলে নদা, দয়া করে একটি লোক ঠিক করে দিন, যে আমাকে কাল সকালের গাড়িতে রেখে আসবে।

যাইবার অনুমতি এইমাত্র সুরেশ নিজে দিলেও সে যে কাল সকালেই যাইতে উদ্যত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। তাই ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, আর দুটো দিনও কি থাকতে পারবে না দিদি? তোমার ওপর ভার দিয়ে আমরা মহিমের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা করতে আমি হাসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেচি বলে মনে হয় না। কি বল অচলা?

প্রত্যুত্তরে অচলা শুধু মাথা নাড়িল।

মৃণাল সুরেশের চিন্তিতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি সেজন্যে একটুকুও ভাববেন না। যার জিনিস, তারই হাতে দিয়ে যাচ্ছি, নইলে আমিও হয়ত যেতে পারতুম না। আপনার ত মনে আছে, আমাদের কি রকম তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছিল। তাই কোনো বন্দোবস্ত করেই আসা হয়নি। কাল আমাকে ছুটি দিন নদা, আবার যখনই হুকুম করবেন, তখনই চলে আসব।

সুরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সহসা বলিয়া বসিল, আচ্ছা মৃণাল, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শুধু কেবল একটা বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে, আর পুজো-আহ্নিক করে তোমার সমস্ত সময়টা কাটবে কি করে, আমি তাই শুধু ভাবি।

মৃণালের মুখের উপর পুনরায় ব্যথার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, সময় কাটাবার ভার ত আমার ওপর নেই নদা। যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

সুরেশ কহিল, আচ্ছা, সে যেন হলো। কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত বেশীদিন বাঁচবেন না, আর মহিমকেও ডাক্তারের হুকুমমত ভাল হয়ে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর শহরে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে হবে। তখন একলাটি সেখানে তুমি থাকবে কি করে?

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, সে উনিই জানেন।

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, নদা বুঝি এ-সব মানেন না?

কি সব?

এই যেমন ভগবান—

না।

তবে বুঝি আমাদের জন্যে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে গেল নদা?

সুরেশ এ প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না মৃণাল, তা নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার, তেমনি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে, তা আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু এ-সব আলোচনা থাক দিদি, হয়ত আমার প্রতি তোমার একটা ঘৃণা জন্মে যাবে।

মৃণাল তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া কহিল, আচ্ছা, থাক।

সুরেশ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, এটা আবার কি হলো মৃণাল?

কোন্‌টা নদা?

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ পায়ের ধুলো নেওয়াটা?

মৃণাল কহিল, বড়ভাইয়ের ধুলো নিতে কি আবার দিনক্ষণ দেখাতে হয় নাকি? বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

আচ্ছা মেয়ে ত! বলিয়া সস্নেহ-হাস্যে সুরেশ অচলার মুখের প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখ শ্রাবণ-আকাশের মত ঘন মেঘে যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, এমনি বোধ হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া এ-সম্বন্ধে কোনোপ্রকার প্রশ্নের আভাসমাত্র দিবার পূর্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিবার অজস্র অবকাশ দিয়া ত্বরিতপদে মৃণালের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল? মৃণালের প্রণাম করার সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নিজের ভিতর হইতেই নিশ্চয় অনুমান করিতে লাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না ফেলিতে কেনই-বা অচলা ওরূপ বিবর্ণমুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। নিজের ব্যবহার ও কথাবার্তাগুলো সে আগাগোড়া বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করিয়াও কিন্তু কোন কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ পাশাপাশি এত বড় দুটো ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং তাহারই কোন অজ্ঞাত নিন্দিত আচরণই যে এই অনর্থের মূল, এ সংশয় তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ-সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাত্রিটা সে এক-রকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রভাতে একসময়ে অচলাকে নিভৃতে পাইয়া কহিল তোমাকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।

অচলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অগোচর ছিল না। গত রাত্রিব সেই তাহার অদ্ভুত আচরণের এই কৈফিয়ত দিতে হইবে বুঝিবা সে আরক্ত-মুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

সুরেশ আস্তে আস্তে বলিল, কাল মৃণাল হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে গেল, তুমিও মুখ ভার করে রাগ করে চলে গেলে, সে কি তার শাশুড়ীর মরণেব কথা বলেছিলুম বলে?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, এ-রকম প্রসঙ্গ কি তোমার তোলা উচিত ছিল? সে বেচারার স্বামী নেই, শাশুড়ীর মৃত্যুতে তার নিঃসহায় অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি!

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচতে পারেন না, এ ত মৃণাল নিজেও বোঝে। তা ছাড়া সে নিঃসহায় হবেই বা কেন?

অচলা জবাব দিল, এ কথা আমরা ত তাকে একবারও বলিনি। বরঞ্চ তুমিই তাকে নানা-রকমে ভয় দেখালে, দেশে সে একলাটি থাকবে কেমন করে?

সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে সে যাবার পূর্বে আমার কি তাকে সাহস দেওয়া উচিত নয়? তার যে কোন ভয় নেই, এ কথা কি তাকে—বলিতে বলিতেই অকৃত্রিম করুণায় তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পরদুঃখকাতর সহৃদয় যুবকের সহস্র দয়ার কাহিনী তাহার চক্ষের নিমিষে মনে পড়িয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, তোমার সাহস দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। যখন সে সময় আসবে, তখন আমি চুপ করে থাকব না।

সুরেশ আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ তাহার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই ত তোমার যোগ্য কথা! এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা! বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় হাত ছাড়িয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তাহার যে উচ্ছ্বাস মুহূর্তপূর্বে পরার্থপরতার নির্মল আনন্দের মধ্যে জন্মলাভ

করিয়াছিল, এই লজ্জিত পলায়নে তাহা এক নিমিষেই কদর্য কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরিয়া উঠিল এবং সর্বাঙ্গ বারংবার শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্তী একখানা চেয়ারের উপর সে নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পীড়িত স্বামীর শয্যায় গিয়া নিজের আসনটি গ্রহণ করিতে আজ সমস্ত সকালটা তাহার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

যাই যাই করিয়াও যাইতে মৃণালের দিন-দুই দেরি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল, আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই মিথ্যা নিদ্রার হেতু নিশ্চিত অনুমান করিয়াও চুপি চুপি কহিল, ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সেজদি। কি বল?

প্রত্যুত্তরে অচলার ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল। মৃণাল মনে মনে বুঝিল, এ ছলনা সে ছাড়াও আরো একটি নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অচলা অন্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষার ভাব পোষণ করে, তাহা সে মহিমের কাছে কোনদিন আভাসমাত্র না পাইয়াও জানিত। এই একান্ত অমূলক দ্বেষ তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। কিন্তু তথাপি অচলা যে নিজের হীনতা দিয়া আজিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্বলতাটুকুকে বিকৃত করিয়া দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। মুহূর্তকালের নিমিত্ত তাহার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া কানে কানে কহিল, তুমি ত সব জান সেজদি, আমার হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। বলো, ভাল হয়ে আবার যখন দেশে ফিরবেন, বেঁচে থাকি ত দেখা হবে।

নীচে কেদারবাবু বসিয়াছিলেন। মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিলেন। জামার হাতায় অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, মা, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমরা যমের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। যখনি ইচ্ছে হবে, যখনই একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে ভুলো না মা। আমার বাড়ি তোমার জন্যে রাত্রি-দিন খোলা থাকবে মৃণাল।

অচলা অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মৃণাল তাহাকে দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল, যমের বাপের সাধ্যি কি বাবা, ওঁর কাছ থেকে সেজদাকে নিয়ে যায়। যেদিন সেজদির হাতে পৌঁছে দিয়েছি, সেইদিনই আমার কাজ চুকে গেছে।

কেদারবাবুর মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

দুইজন বৃদ্ধগোছের কর্মচারী ও একজন দাসী মৃণালকে দেশে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের সকলকে লইয়া স্টেশনের অভিমুখে ঘোড়ার গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া গেলে কেদারবাবুর অন্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন, অদ্ভুত, অপূর্ব মেয়ে!

সুরেশের মনটাও বোধ করি এইভাবেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া সায় দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি কেদারবাবু! এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি, এমন নিপুণ কাজকর্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও, এমন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে যে মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চিরকালটা আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, কোনদিন গ্রামের বাইরে পর্যন্ত যায়নি।

কেদারবাবু ইহা সত্য বলিয়া জানিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন বল কি সুরেশ!

সুরেশ কহিল, যথার্থই তাই। ওর পানে চেয়ে চেয়ে আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, এই যে জন্মান্তরের সংস্কার বলে একটা প্রবাদ আছে, কি জানি সত্যি নাকি। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই হোক, এ কয়দিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস

হয়েছে, এ মেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারাজীবন এমন জীবন্মৃত করে রাখা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ। ও আমার মেয়ে হলে আমি কোনমতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতুম না।

সুরেশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করতেন?

বৃদ্ধ উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন, আমি আবার বিবাহ দিতুম। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর ওই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছে, তারা ওর মিত্র নয়, ওর শত্রু। শত্রুর কার্যকে আমি কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতুম না।

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, তাছাড়া ওর স্বামীর ব্যবহারটাই একবার মনে করে দেখ দিকি সুরেশ। সে লোকটার দু-দুটো স্ত্রী গত হতে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন এমন মেয়েকে বিবাহ করতে রাজী হলো তখন নিজের সুখ-সুবিধে ভিন্ন স্ত্রীর ভবিষ্যতের দিকে পাষণ্ড কতটুকু দৃষ্টিপাত করেছিল, কল্পনা কর দেখি।

সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভালমন্দ তর্ক তুলচি নে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে ম'লেও আমি মানবো না, এই ব্যবস্থাই ওই দুধের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ। ওর এমন এতটুকু কিছু নেই, যার মুখ চেয়ে ও একটা দিন কাটাতে পারে। সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিস পেয়েছ সুরেশ, যে ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য করে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ওর জন্যেই রাতারাতি বদলে ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে! মেয়েটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন ফেটে যেতে থাকে।

সুরেশ জবাব দিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে, চৌকাঠে ভর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্যন্ত মূর্তির মত দাঁড়াইয়াছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা যখনই সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, তখনই তাহার মনে হয়, সে বিমনা হইয়া আছে এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

দুই দিন পরে একদিন অপরাহ্ণে সুরেশ নীচের বারান্দার একধারে রৌদ্রের মধ্যে আরাম-কেদারাটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল, তাহারই জন্য চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্বে কোনদিন ঘটে নাই; তাই সে আশ্চর্য হইয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেয়ারা কৈ? আজ তুমি যে!

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই একটা ছোট টিপয় চেয়ারের পাশে টানিয়া চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিল এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে আর সুরেশের সাহস হইল না। শুধু চায়ের পেয়ালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরেশ-বাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল বলে মনে করেন না?

সুরেশ চায়ের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, করি। তার কারণ, কুসংস্কার আজও আমার অতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

অচলা চিন্তা করিবার নিজেকে আর মুহূর্ত অবসর না দিয়া বলিল, তাহলে মৃণালের মত মেয়েকে বিবাহ করতে আপনার ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুরেশ চায়ের বাটিটা হাতে করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া বলিল, এ কথার মানে?

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজভাবে বলিল, আপনার কাছে আমি অসংখ্য ঋণে ঋণী। তা ছাড়া আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে আমি সুস্থ, সহজ, সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি স্বীকার করুন।

এক নিশ্বাসে মুখস্থের মত এতগুলো কথা বলিয়া অচলা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

সুরেশ পাথরে-গড়া মূর্তির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, এতে তুমি কি সত্যই সুখী হবে?

অচলা কহিল, হাঁ।

সে রাজী হবে?

তাই ত আমার বিশ্বাস।

সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস তা নয়। বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত। এদের মুখের কথায় সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, একটা একটা করে হাত-পা কাটতে থাকলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজী করানো যাবে না। এ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করে মাঝ থেকে আমাকে তার কাছে মাটি করে দিও না অচলা। আমাকে সে দাদা বলে ডেকেছে, তার কাছে আমি সম্মানটুকু বজায় রাখতে চাই।

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। সুরেশের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি বলে জেনে রাখবেন সুরেশবাবু! বলিয়া স্তম্ভিত অভিভূত সুরেশের প্রতি দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়াই এই গর্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

একজনের উচ্ছ্বসিত অকপট প্রশংসার মধ্যে যে আর একজনের কত বড় সুকঠোর আঘাত ও অপমান লুকাইয়া থাকিতে পারে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কেহই বোধ করি তাহা মুহূর্তকাল পূর্বেও জানিত না। সুরেশ হাতের বাটি হাতে লইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, এবং অচলা তাহার ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিযা বালিশে মুখ গুঁজিয়া মর্মান্তিক ক্রন্দনের দুর্নিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল,—পাশেই মহিমের ঘর, পাছে বিন্দুমাত্র শব্দও তাহার কানে গিয়া পৌঁছে। বস্তুতঃ অন্তর্যামী ভিন্ন সে কান্নার ইতিহাস আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী-জীবনের সতীত্ব যে কতবড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই প্রথম যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিল। সেদিন সুরেশের সংস্পর্শে পিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সে অন্যায় উপদ্রব মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেই যখন সতীত্বের পাদপদ্মে অমন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যকার স্থানটাও আর তাহার দৃষ্টির অগোচর রহিল না।

আরও একটা জিনিস। সুস্পষ্ট বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ, আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়মন-নিষ্ঠাই যে সতীত্ব, এ কথা তাহার অবিদিত ছিল না। শুধু দেহ বা শুধু মন কোনটাই যে একাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত! তথাপি মন যখন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিহ্বা যখন এ কথা উচ্চরবে ঘোষণা করিতেও সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু কোনদিন তাহার আপনাকে ছোট বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ যখন সুরেশের মুখের সুস্পষ্ট বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা যোগ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এক বুক-ফাটা বেদনার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া মৃণালের প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল, তাহা নহে; কিন্তু এই মেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ লাভ করিল, ইহা সে জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবে না, ইহা আপনার কাছে আপনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে পিতার লাঠির আওয়াজ এবং পিছনে সুরেশের পদশব্দ সে শুনিতে পাইল।

বুঝিল, তাঁহারা মহিমকে দেখিতে চলিয়াছেন, এবং অল্পকাল পরেই পিতার কণ্ঠস্বরে তাহার আহ্বান শুনিয়া সে বেশ করিয়া আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ও-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, আজ ব্যাপার কি? দুটোর সময় সুরুয়া দেবার কথা, চারটে বাজে যে! ও কি, চোখ-মুখ অমন ভারী কেন? ঘুমুচ্ছিলে না কি?

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রোগীকে সুরুয়া দিবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা মৃণালই করিত। চাকর চড়াইয়া দিত, সে আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে নামাইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভারটা অচলার উপরেই পড়িয়াছিল। আজ সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আগুন বহুক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা শুকাইয়া পুড়িয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাবু এ কথা শুনিয়া অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন-ভাবে বলিলেন, তখনি ত তোমাকে বলেছিলুম সুরেশ, এখন একজন ভাল নার্স না রাখলে মহিমকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের মেয়েকে কি আমার চেয়ে তোমরা বেশী বোঝো?

সুরেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত ম্লান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন ধীরে ধীরে কহিল, নার্সের হাতে আমার ওষুধ পর্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হবে না সুরেশ। তবে ওঁকে সাহায্য করবার একজন লোক দাও। কাল-পরশু দুটো রাত্রিই ওঁকে সারারাত্রি জাগতে হয়েছে। দিনের বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ না পেলে কলের মানুষকে দিয়েও কাজ পাবে না ভাই।

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও মিথ্যা নয়। সুরেশ খুশী হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাবু নিজের রূঢ়বাক্যে লজ্জা পাইয়া কোন-কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে তাহার অনেকবার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রুগ্ন স্বামীর কাছে বহু অপরাধের জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহার মত পাপিষ্ঠাকে তিরস্কার হইতে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় কোনমতেই এ প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

সুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে সে একবার করিয়া মহিমের ঘরে ঢুকিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে শুইতে যাইত। মৃণাল থাকিতে সে প্রায় সারারাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং তাহার আবশ্যকও ছিল; কিন্তু কয়দিন হইতে দেখা গেল, সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে দাসী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষণকালের জন্য একটিবার মাত্র নিজে আসিয়া সংবাদ গ্রহণ করে। তাহার এই নূতন আচরণ সকলের অগ্রে অচলারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন হইয়াই ছিল; কিন্তু যেদিন মহিম নিজে ইহার উল্লেখ করিল, তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল তিনি অধিকাংশ সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার হেতু কি, তাহাও সে জানে না। মহিম চুপ করিয়া শুনিল, কোনপ্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নীচে নামিতেছিল, এবং সুরেশও কি একটা কাজে এই সিঁড়ি দিয়াই উপরে উঠিতেছিল; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবামাত্রই অন্যদিকে সরিয়া গেল। সে যে সর্বপ্রকারে তাহাকেই পরিহার করিয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না; এবং একদিন যাহা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, আজ তাহার সেই মনই সুরেশের আচরণে বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অচলার সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত ওঠা-বসার মধ্যেও নিভৃত হৃদয়তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জ্বালা করিতেই লাগিল, তাহা এই যে, সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন কাজ করিতেছে, যাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি মাঝে বিকট ভয়ে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় ঠিক মাথায় জাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না। প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত, অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে; তথাপি ছায়ার মত এ কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল এবং বোধ করি বা, এই বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত দিন রাত্রির একটুকু কাল স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস করিল না। পাশের যে ঘরটা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কয়দিনের মধ্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; এমন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই জব্বলপুরে চেঞ্জে যাইবার কথাবার্তা চলিতেছে। সেদিন সকালবেলা অচলা মেঝের উপর বসিয়া একটি স্টোভে স্বামীর জন্য দুধ গরম করিতেছিল; দুধ মুহুর্মুহুঃ উথলিয়া উঠিতেছে, কোন দিকে চাহিবার তাহার এতটুকু অবসর নাই, মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল, সে জানিত না—হঠাৎ স্বামীর দীর্ঘশ্বাস কানে যাইতেই সে মুখ তুলিয়া একটিবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

মহিম কোনদিন বেশী কথা কহে না; কিন্তু আজ সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোনদিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয়, আমার একটা দিনও কাটবে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করেনি, কিন্তু কি জানি, যখনই জ্ঞান হ'তো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম; কেবলি মনে হ'তো হয়ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে—এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন করে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতেবাঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধতেই হবে। আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ। বলিয়া মহিম একটুখানি হাসিল।

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতেই লাগিল, কোন কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও।

তবুও অচলা জবাব দিল না, তেমনি অধোমুখেই বসিয়া রহিল। প্রথমটা মহিম একটু-খানি বিস্মিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল, স্বামীর কাছে অচলা চোখের জল গোপন করিবার জন্যই অমন করিয়া একভাবে অধোমুখে বসিয়া আছে।

কেন যে সুরেশ বড়-একটা আসে না, তাহার হেতু নিশ্চয় করিয়া মহিম না বুঝিলেও কতকটা অনুমান করে নাই, তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ, অচলা যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জনে অকস্মাৎ দেখা হইতে পারে, এই ভয়েই সে যে ঘর ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে না, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল। আজ তাই সারাদিন ধরিয়া মন যেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া কাটাইল।

তাহার শয্যার কিছু দূরে একটা চৌকি ছিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার উপরে বসিয়া অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লান্তিবশতঃ সেখানেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে মহিমের ডাকে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা দিয়া দেখিল, বেলা হইয়া গিয়াছে।

মহিম কি-একটা কাজ বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল, এবং স্ত্রীর আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিজের গায়ের কাপড় কি হলো?

অচলা ততোধিক বিস্ময়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া যেখানা সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানা সুরেশের। স্বামীর প্রশ্নটা তাহাকে যেন চাবুক মারিল। লজ্জার ব্যথায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এ যে কি করিয়া ঘটিল, তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্মরণ হইল, গত রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে সে নিজের শালখানা পাট করিয়া তাঁহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অল্পলমাত্র গায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে জাগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু স্ত্রীর একান্ত লজ্জিত ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মহিম সস্নেহে সকৌতুকে হাসিল। কহিল, এতে লজ্জা কি অচলা? চাকরটাই হয়ত উলটা-পালটা করে তোমারটা তার ঘরে দিয়ে তারটা এখানে রেখে গিয়েছে। না হয় সুরেশ নিজেই হয়ত কাল বিকেলবেলা ফেলে গিয়েছে, রাত্রে চিনতে না পেরে তুমি গায়ে দিয়েছ। বেয়ারাকে ডেকে বদলে আনতে বলে দাও।

দিই, বলিয়া সেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া যখন অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে ওভাবে নিদ্রিত দেখিয়া আপনার গাত্রবাসখানি দিয়া ঘুমন্ত তাহাকে সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না। সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার জন্য এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য সে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং হয়ত প্রতি রাত্রেই আসিয়া থাকে কেহ জানিতেও পারে না।

এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না; এবং ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্রপ্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এ চৌর্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোনমতেই সায় দিতেছে না, ইহাও তাহার অগোচর রহিল না এবং কোথায় কিসে যে তাহাকে এতদিন উঠিতে বসিতে বিঁধিতেছিল, তাহাও যেন একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

কেদারবাবুর এক বাল্যবন্ধু জব্বলপুর শহরে বাস করেন; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে এ স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার নিজের বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের যদি আসাই হয়, ত সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কেদারবাবু আসিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; এবং মাঘ মাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে এবং পথের অল্পস্বল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে সমর্থ, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্তব্য। যুবা-বয়সে তিনি নিজে একবার জব্বলপুরে গিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জগদীশের স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন, তিনি মায়ের মত মহিমকে যত্ন করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষে তাঁহারও আর একবার দেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিম চুপ করিয়া এই-সকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহহীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রস্থান করিলে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, জব্বলপুর ত বেশ জায়গা, তোমার যেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবচ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোনদিন হব কিনা, তার আমি আশা করিনে!

অচলা বলিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর করে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশী দিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য এতদিন রুদ্ধ হইয়া ছিল, সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু-একটা করিয়া বসে এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ে ব্যথায় সে উন্মুক্ত দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আবার যখন উভয়ে সাক্ষাৎ হইল তখন স্বামী-স্ত্রীর কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল, জগদীশবাবু টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছেন, তাঁর বাসার কাছে আমাদের জন্যে তিনি একটা ছোট বাড়ি ঠিক করেছেন।

মহিম কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু বলে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়িতে জায়গা দিতে পারেন। কিন্তু দুজনে গিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না! তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার জন্যে টেলিগ্রাম করতে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার জবাব। বলিয়া সে হলদে খামখানা স্বামীর বিছানার উপর ছুড়িয়া দিল।

মহিম হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা। অচলা যে স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাইতে চাহে, ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কন্যাকার আচরণ, যাহা আজিও তাহার কাছে তেমনি দুর্বোধ্য, তেমনিই দুর্জ্ঞের, তাহাই স্মরণ করিয়া কোনরূপ অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে যাত্রার উদ্যোগ পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। সেদিন দুপুর-বেলা সে বাটীতে আসিয়া তাহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিল, কেদারবাবু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় মা?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয়, পিতা হইয়া কন্যাকে এ কথা জানাইতে কেদারবাবু লজ্জা বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিমের বর্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশীদিন ত নয়। তা ছাড়া, জগদীশের ওখানে তার কোন অসুবিধেই হতো না। এই অল্পকালের জন্যে বেশী কতকগুলো খরচপত্র করে—

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বলছিলেন বুঝি?

না না, মহিম কিছু বলেন নি, শুধু আমি ভাবছি-

তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে আমি সমস্ত ঠিক করে নেবো, বলিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করিল এবং পরদিনই লুকাইয়া তাহার দুখানা গহনা বিক্রি করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সংকল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসীমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন স্থির করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

যাইবার দিন-দুই পূর্ব হইতেই অচলার সারা প্রাণটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে

লাগিল। এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্বামিগৃহবাস ব্যতীত তাহাকে জীবনে কখনো অন্যত্র যাইতে হয় নাই, আজিও সে পশ্চিমের মুখ দেখে নাই। সেখানে কত প্রাচীন কীর্তি, কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, কত নদ-নদী, জলপ্রপাত, এমন কত কি আছে, যাহার গল্প লোকের মুখে শুনো ভিন্ন নিজে দেখিবার কল্পনা কোনদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এইবার সেই-সকল আশ্চর্য সে স্বচক্ষে দেখিতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্বামী ভগ্নদেহ ফিরিয়া পাইবে, একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সর্বকার্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, সেখানে জীবন-যাত্রার পথ সহজ ও সুগম, তিনি ভাল হইলে হয়ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাহাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচিরভবিষ্যতে যে-সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের কচি মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এমনি কত কি যে সুখের স্বপ্ন দিবা-নিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার ইয়ত্তা নাই। আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। আর তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ রহিল না—অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত নির্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ তাহার বড় সাধ হইতে লাগিল, যাইবার আগে একবার মৃণালকে দেখে এবং সমস্ত বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জানা-অজানা সকল অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা মাগিয়া লয়। আর সুরেশের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সে যে পরম বন্ধু হইয়াও লজ্জায় সঙ্কোচে তাহাদের দেখা দিতে পারে না, তাহার এই দুর্ভাগ্যের গোপন বেদনাটি সে আজ যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোনদিন করে নাই। তাঁহারও কাছে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবার আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তিনি কাল হইতেই গৃহে নাই।

যাইবার দিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা হইয়াছে, কিছু কিছু স্টেশনেও পাঠানো হইয়াছে, টিকিট পর্যন্ত কেনা হইয়া গিয়াছে। অচলার জন্যও সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু সে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া মহিমকে বলিয়াছিল, টাকা মিথ্যে নষ্ট করবার সাধ থাকে ত কিনতে দাও গে। আমি সুস্থ সবল, তা ছাড়া কত বড়লোকের মেয়েরা ইন্‌টার ক্লাসের মেয়েগাড়িতে যাচ্ছে, আর আমি পারিনে? আমি দেড়া ভাড়ার বেশি কোনমতেই যাবো না।

সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ দুটো দিন সুরেশের দেখা নাই। কিন্তু আজ সকালে দুর্যোগের জন্যই হোক বা অপর কোন কারণেই হোক, সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দহীন কক্ষের মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দমকা বাতাসের মত গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আতিশয্য উপচাইয়া পড়িতেছিল; বলিল, সুরেশবাবু, এ জন্মে আমাদের আর মুখ দেখবেন না নাকি? এত বড় অপরাধটা কি করেছি, বলুন ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের বাড়ি পুড়িয়া গেলে আশে-পাশের গাছগুলোর যে চেহারা অচলা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের এই মুখখানা এমনি করিয়াই তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল—সে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেচে, সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ কথা বলনি।

শুধু পলকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ নত করিয়া কহিল, না, আমার কোন অসুখ করেনি, আমি ভালই আছি; বলিয়া সেই বইখানার পাতা উলটাইতে উলটাইতে পুনরায় কহিল, আজই ত তোমরা যাবে, সমস্ত ঠিক হয়েছে? কতকাল হয়ত আর দেখা হবে না।

কিন্তু মিনিট-খানেক পর্যন্ত অপর পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুরেশ বিস্ময়ে

মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখোচোখি হইবামাত্রই বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুরেশের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া, আপনাকে সংযত করিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার কখ্খনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

সুরেশ মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার জন্যে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের বাহির হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবু, আপনার চা— বলিতে বলিতে সে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং পরক্ষণেই অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে, মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ ক'দিন থেকে কোথায় গেছে জানো? পিসীমাকেও কিছু বলে যায়নি, সে কি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে না নাকি?

অচলা আস্তে আস্তে কহিল, আজ ত তিনি বাড়িতেই আছেন।

মহিম কহিল, না। এইমাত্র আমাকে ঝি বলে গেল, সে সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পূর্বেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে ছেলেবেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—শুধু কেবল এইটুকু কৃতজ্ঞতার জন্যও একবার তাহাকে আমাদের ওখানে আহ্বান করা উচিত—আর তাহাকে ভয় নাই—লজ্জিতাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আর লজ্জা দিয়ো না—তাহার অন্তরের এই-সকলের একটা কথাও জিহ্বা আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্যন্ত পারিল না; নিঃশব্দে নিরুত্তরে হাতের কাছে যে-কোন একটা কাজের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্তী হইয়া উঠিল। নীচে কেদারবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল এবং পিসীমা পূর্ণঘট প্রভৃতি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরেরা জিনিসপত্র গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিল, শুধু যিনি গৃহস্বামী, তাঁহারই কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ, এই বলিয়া প্রকাশ্যে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না—ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে এমনিই যেন সকলকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেদারবাবু কন্যাকে একটু নিরালায় পাইয়া মাথায় হাত দিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন সতীলক্ষ্মী হও মা, মায়ের মত হও। বুড়োবয়সে না বুঝে অনেক মন্দ কথা বলেচি মা, রাগ করিস নে; বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়িতে উঠিতে গিয়া অচলাকে একান্তে ক্ষুণ্নস্বরে চুপি চুপি কহিল সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। একটা কথা তাকে বলবার জন্যে আমি দু'দিন পথ চেয়ে ছিলাম।

পিতার বাক্যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দ্বারের অন্তরালে পিসীমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। অচলা প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি গদগদ-কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন হাতের নোয়া অক্ষয় হোক মা, স্বামীকে নীরোগ করে শিগ্গির ফিরিয়ে এনো, এই প্রার্থনা করি।

এই আমার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ পিসীমা!—বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে গাড়িতে গিয়া বসিল। কথাটা কেদারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিজে অমার্জনীয় লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া স্টেশন হইতে পশ্চিমের গাড়ি ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি-টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। লোকের পায়ে পায়ে জলে-কাদায়

সমস্ত প্লাটফর্ম ভরিয়া উঠিয়াছে,—যাত্রীরা পিছল বাঁচাইয়া ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে মোটঘাট লইয়া জায়গা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; এমনি সময় অচলা চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে।

বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায় কেদারবাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিতে না আসিতে তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেছ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ—তোমার উপদেশ, নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখলুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সারতে পারি কি না! বাস্তবিক বলচি ম—

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ। তা ছাড়া, নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছ, আজ সকালবেলা পর্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘূণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল, অচলা!

কিন্তু অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সুরেশ ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া অকস্মাৎ ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল কিন্তু আর ত দেরি নেই। চল চল, গাড়িতে উঠে তার পরে কথাবার্তা। চলুন কেদারবাবু বলিয়া সে কেবলমাত্র সম্মুখের দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে একপ্রকার যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার জায়গায় বসাইয়া দিয়া অচলাকে মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। শুধু গাড়ি ছাড়িবার সময় সুরেশ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে গিয়া বসিল তখনই তাহাকে বলিলেন তুমি সঙ্গে আছ, আশা করি, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। মেয়েদের গাড়িটা একটু দূরে রইল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। সুরেশ এবং মহিমকে আর-একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌঁছেই খবর দিতে যেন ভুল হয় না—দেখো। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকব বলিয়া চোখের জল চাপিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মলিন মুখ ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ পর্যন্ত দুই বন্ধুরই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িলে ঠাণ্ডার ভয়ে মহিম কম্বল মুড়ি দিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ সেইখানে একভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে যে-কেহ বলিতে পারিত, ওই দুটো চোখের দৃষ্টি আজ কোনমতেই স্বাভাবিক নয়—ভিতরে অতি বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটিতে থাকিলে মানুষের চোখ দিয়া কিছুতেই অমন কঠিন আলো ফুটিয়া বাহির হয় না।

শ্লো প্যাসেঞ্জার ছোট-বড় প্রত্যেক স্টেশনেই ধরিতে ধরিতে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বাহিরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি সমভাবেই বর্ষিতে লাগিল। একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিবার উপক্রম করিলে, মহিম তাহার আবরণের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু শুয়ে নিলে না কেন সুরেশ? এমন সুবিধে ত বরাবর আশা করা যায় না।

সুরেশ চমকিয়া বলিল, হাঁ, এই যে শুই।

এই চমকটা এমনই অসঙ্গত ও অকারণে কুণ্ঠিত দেখাইল যে, মহিম সবিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অগোচরে কি একটা অপরাধ করিতেছিল, ধরা পড়ার ভয়েই এমন ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ি আসিয়া থামিল।

সুরেশ আপনার অবস্থাটা অনুভব করিয়া একটুখানি হাসির আভাসে মুখখানা সরস করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই এমনি চমকে উঠেছিলুম—

মহিম শুধু কহিল, হুঁ; কিন্তু এই অনাবশ্যক কৈফিয়তটাও তাহার ভাল লাগিল না।

সুরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কিনা একবার খবর নিতে পারলে—

কিন্তু জল পড়চে না?

ও কিছুই নয়, আমি চট করে দেখে আসচি, বলিয়া সুরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মেয়েগাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, অচলা ইতিমধ্যে একটি সমবয়সী সঙ্গী পাইয়াছে এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। সে-ই অগ্রে সুরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ ফিরিয়া বসিল, অচলা চাহিয়া দেখিতেই সুরেশ কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করিল। অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার জলে ভিজতে হবে না, যাও। বলিয়াই কিন্তু নিজের জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু যাঁর জন্যে ভাবনা তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

সুরেশ কহিল, তা আছে, কিন্তু তোমার কিছু খাবার, কিংবা শুধু একটু জল—

অচলা সহাস্যে বলিল, না গো না, আমার কিছু চাইনে। কিন্তু তুমি নিজে কি জলে ভিজে অসুখ করতে চাও নাকি?

সুরেশ পলকমাত্র অচলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল, কহিল, অনেকদিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগ্যের কাছে অসুখ পর্যন্ত ঘেঁষতে চায় না যে!

কথা শুনিয়া অচলার কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে সুরেশ মুখ তুলিয়াই তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে কোনমতে ইহাকে একটা পরিহাসের আকার দিতে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, একবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাব যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেষ করিতে পারিল না, তাহার অদৃশ্য লজ্জা এই ছদ্ম রহস্যের বাহ্য প্রকাশকে যেন অর্ধপথেই ধিক্কার দিয়া থামাইয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, সুরেশ কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া ফিরিয়া দেখিল, তাহার র‍্যাপারের একটা খুঁট অচলার হাতের মুঠার মধ্যে। সে ফিসফিস করিয়া অকস্মাৎ তর্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে ডেকেছি, এ কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে কেন? কেন আমাকে অমন অপ্রতিভ করলে?

ঠিক এই কথাটাই সুরেশ তখন হইতে সহস্রবার তোলাপাড়া করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাই প্রত্যুত্তরে কেবল করুণকণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছি অচলা।

অচলা লেশমাত্র শান্ত না হইয়া তেমনি উত্তপ্তস্বরে জবাব দিল, না বুঝে বৈ কি! সকলের কাছে আমার শুধু মাথা হেঁট করবার জন্যেই তুমি ইচ্ছে করে বলেচ।

ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছিল; সুরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে দুরুদুরু বক্ষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল; সে কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া আর একজনের হৃৎস্পন্দন একেবারে থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মহিম ঠিক তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল উনিই বুঝি আপনার বাবু?

অন্যমনস্ক অচলা শুধু একটা হুঁ দিয়াই আর একটা জানালার বাহিরে গাছপালা, মাঠ ময়দানের প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে সুরেশের কাছে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার প্রবৃত্তিমাত্র রহিল না।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার মনের ক্লেদ কাটিয়া গিয়া মুখ নির্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার সঙ্গিনীর সহিত

স্বচ্ছন্দচিত্তে কথাবার্তায় যোগ দিতে পারিল; যে লজ্জা ঘণ্টা-কয়েকমাত্র পূর্বে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় স্টেশনে সুরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাঙ্গামা করতে কে বলে দিচ্ছে বল ত? তোমার বন্ধুরত্নটি বুঝি?

এ বিষয়ে সুরেশ কাহারো যে বলার অপেক্ষা রাখে না, অচলা তাহা ভাল করিয়াই জানিত, তথাপি এই অযাচিত যত্নটুকুর পরিবর্তে সে এই স্নিগ্ধ খোঁচাটুকু না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সুরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সে চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সহসা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় কুণ্ঠায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এই আরক্ত আভাসটুকু সুরেশ দুই চক্ষু দিয়া যেন আকণ্ঠ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সংবাদের জন্যই সুরেশকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল। তাঁহার কোনপ্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি না, বা কিছু আবশ্যক আছে কি না—একবার আসিতে পারেন কি না, এই-সকল একটি একটি করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ-সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাম্ভীর্যের সহিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ি বদল করতে হবে? কত রাত্রে সেখানে পৌঁছবে জানেন? একবার জেনে এসে আমাকে বলে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া সুরেশ একটু আশ্চর্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই মেয়েটি তাহার জায়গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিয়াছে। অচলা অন্তরের বিরক্তি গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনাদের বাড়িতে বুঝি কেউ চা-রুটি খায় না?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাত্ম্য থেকে বুঝি কোন বাড়ি নিস্তার পেয়েচে ভাবেন? ও ত সবাই খায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় ঘৃণায় সরে বসলেন?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে বলিল, না ভাই, ঘৃণায় নয়—পুরুষেরা ত সমস্ত খায়, তবে আমার শ্বশুর এ-সব পছন্দ করেন না, আর—আমাদের মেয়েমানুষের ত—

একদিন এমনি একটা খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার লইয়া মৃণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেদিনও সে যে-কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেমনি একটা অন্তর্জ্বালায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, এবং মেয়েটির কথা শেষ না হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনাকে বিব্রত করতে আমি চাইনে, আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে এসে আপনার জায়গায় বসুন; বলিয়া চক্ষের নিমিষে চা এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে একেবারে সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি, সে ইহাই ভাবিল, এতক্ষণের এত আলাপ, এত কথাবার্তার যে বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখিল না, না জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিলেও আকাশে ঘন মেঘ উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আসিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি নামিয়া যাইবে, সে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করি৻ে লাগিল।

অচলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে আপনি মাপ করুন।

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না।

অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন খারাপ থাকলে কি যে করে ফেলি তার কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি, ভাল হ'ল ভালই, না হলে

ঐ বিদেশে কি যে হবে, তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখলে ত পীড়িত বলে মনে হয় না।

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়িতেই আছেন কিন্তু আপনি তাঁকে দেখেন নি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই বন্ধুটি তাঁহার স্বামী কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে যে হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছিল এ কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু তাহার বিস্ময়কে অচলা সম্পূর্ণ অন্যভাবে গ্রহণ করিল। সুরেশের সহিত তাহার আচরণ ও বাক্যালাপে সে নিজের অন্তরে জ্বালা দিয়া বিকৃত করিয়া হিন্দুনারীর চক্ষে ইহা কিরূপ বিসদৃশ দেখাইয়াছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল এবং একান্ত নিরর্থক ও বিশ্রী জবাবদিহির স্বরূপে বলিয়া ফেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল দেখিয়া অচলা সসঙ্কোচে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমাদের আচার-ব্যবহার আপনারা সমস্ত বুঝতে না পারলেই আমাদের অদ্ভুত বলে ভাববেন না।

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবিনে, বরঞ্চ আপনারাই যে-কোন কারণে হোক আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান। কেমন করে জানলুম? আমাদেরই দুই-একটি আত্মীয় আছেন, যাঁরা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেচি বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সে কারণটি কি?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন, বলিয়া হাসিয়া প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দিয়া কহিল, আচ্ছা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসুন না।

কোথায়, আরায়?

মা গো! সেখানে কি মানুষ থাকে! আমার উনি ঠিকেদারী কাজ করেন বলেই ওঁকে মাঝে মাঝে আরায় গিয়ে থাকতে হয়। আমি ডিহরীর কথা বলচি। শোন নদীর উপর আমাদের ছোট বাড়ি আছে, সেখানে দু'দিন থাকলে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত-দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল কিন্তু আপনার স্বামীর ত অনুমতি চাই। তিনি না বললে ত যেতে পারিনে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস, তাই বৈ কি! আমরা সেবা করতে দাসী বলে বুঝি সব তাতেই দাসী? মনেও করবেন না। হুকুম দেবার বেলায় আমরাই ত কর্তা। সে দেশ পছন্দ না হলে সোজা ডিহরীতে চলে আসবেন—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে বলে দিলুম। অনুমতি নিতে হয় আমি নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এই স্বামী সৌভাগ্যবতী মেয়েটি তাহার আনন্দের আতিশয্যে অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আরা স্টেশন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, তাহা ট্রেনের মন্দগতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত-দুটি পুনরায় নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগভরে বলিল আমার সময় হ'ল, আমি চললুম, কিন্তু আপনি ভেবে ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করতে পাবেন না বলে যাচ্ছি। আপনার কোন ভয় নেই, স্বামী আপনার খুব শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু কথা দিন, ফেরবার পথে একটিবার আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সেদিন যদি পাই, নিশ্চয় আপনাকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনাকে আমি চিনতে পেরেচি। এই

আমি বলে যাচ্ছি, আপনার এত বড় ভক্তি-ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না; এমন হতেই পারে না।

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি আসিয়া প্ল্যাটফর্মে থামিল। মেয়েটির ছোট দেবর অন্যত্র ছিল, সে আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাম ত মুখে আনবেন না জানি, কিন্তু আপনার নিজের নামটি কি বলুন ত? যদি কখনো ফিরে আসি, কি করে আপনার খোঁজ পাব?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাক্ষুসী। ডিহ্‌রীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেই সে আমার সন্ধান বলে দেবে। কিন্তু দু'জনে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিব্যি রইল, আমি পথ চেয়ে থাকবো। শোন নদীর উপরেই আমাদের বাড়ি। এই বলিয়া মেয়েটি দুই হাত জোড় করিয়া হঠাৎ একটা নমস্কার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাষ্পীয় শকট আবার ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল—তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি-অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আলোর মুখ, আনন্দের মুখ আর সে কখনও দেখিবে না—ইহা হইতে এ জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই। সঙ্গিবিহীন নির্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগাগোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং এইবার তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এত বড় দুঃখ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোনমতে আয়ত্ত করিতে পারিল না। অদম্য তরঙ্গের মত সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীদের মনে পড়িল, পিসীমাকে মনে পড়িল, মৃণালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে মেয়েটি রাক্ষুসী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া গেল, তাহাকে মনে পড়িল,—যদু চাকরটা পর্যন্ত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বার বার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলের নিকট সে যেন জন্মের শোধ বিদায় লইয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, বক্ষের মধ্যে তাহার এমনি ব্যথা বাজিতে লাগিল।

এইভাবে নিরন্তর অশ্রুবিসর্জন করিয়া, গাড়ি যখন পরের স্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন বেদনাতুর হৃদয় তাহার অনেকটা শান্ত হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুল-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, যদি কোন স্ত্রীলোক যাত্রী এই দুর্যোগের রাত্রেও তাহার কক্ষে দৈবাৎ পদার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ নামিয়া গেল, কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামরার সন্নিকটেও কেহ আসিল না।

গাড়ি ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার জায়গায় ফিরিয়া আসিল এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন অচিন্তনীয় কারণে তাহার দুঃখার্ত চিত্ত অকস্মাৎ সুখের কল্পনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নতুন নহে; যেদিন বায়ুপরিবর্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এমনি স্বপ্নই দেখিয়াছিল। আজও সে তেমনি তাহার রুগ্ন স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনন্দ ও সুখ-শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে বিভোর হইয়া গেল।

কখন এবং কতক্ষণ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে যাইবামাত্রই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, দ্বারের কাছে সুরেশ দাঁড়াইয়া এবং সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া অজস্র জল-বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, শিগ্‌গির নেমে পড়, প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলার দুই চক্ষে ঘুম তখনও জড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল, এলাহাবাদ স্টেশনে জব্বলপুরের গাড়ি বদল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া শশব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জলের মধ্যে তাঁকে নামাবে কি করে? এখানে পালকি-টালকি কিছু কি পাওয়া যায় না? নইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে সুরেশবাবু।

সুরেশ কি যে জবাব দিল, জলের শব্দে তাহা বুঝা গেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হস্তে অচলার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া ও-দিকের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ট্রেনটা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারই একটা যাত্রিশূন্য ফার্স্টক্লাস কামরার মধ্যে অচলাকে ঠেলিয়া দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তুমি স্থির হয়ে বসো, তাকে নামিয়ে আনি গে।

তা হলে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো। বলিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাত্রবস্ত্রটা সুরেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায়, অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পোস্টের উপর দূরে দূরে স্টেশনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে সে আলোক এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া যাত্রীরা ছুটাছুটি করিতেছে, কুলীরা মোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্মচারীরা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে—ঝাপসা ছায়ার মত তাহা দেখা যায় মাত্র। ক্রমশঃ তাহাও বিরল হইয়া আসিল, স্টেশনের ঘণ্টা তীক্ষ্ণরবে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অজগরের ন্যায় ফোঁসফোঁস শব্দে তাহা আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অখণ্ড অন্ধকার ব্যতীত সম্মুখে আর কোন ব্যবধানই রহিল না।

আবার ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ইহা যে এ গাড়ির জন্য অচলা তাহা বুঝিল, কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, জিনিস-পত্র সমস্ত তোলা হইল কি না, না কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিয়াদা সর্বাঙ্গে কম্বল ঢাকিয়া নীল লণ্ঠন হাতে বেগে চলিয়াছে। সুমুখে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, সমস্ত প্যাসেঞ্জার উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ মেমসাহেব।

অচলা কতকটা সুস্থির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায় লোকটা কহিল, নয় বাজকে—

নয় বাজকে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদে পৌঁছিতে ত রাত্রি প্রায় শেষ হইবার কথা। ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। উপরে ছাদ ছিল না, তাই আকাশের বৃষ্টি ছাড়া গাড়ির ছাদ হইতে জল ছিটাইয়া তাহার চোখে-মুখে সূচের মত বিঁধিতেছিল। সে হাতের আলোকটা সবেগে নাড়িয়া দিয়া, মোগলসরাই! মোগলসরাই!—বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এমনি সময়ে সুরেশ তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভয় নেই—আমি পাশের গাড়িতেই আছি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার চেহারা, তা সে যত অস্পষ্টই হোক, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্তে এই কি-একটা নূতন স্টেশনেই বা গাড়ি বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার

গায়ের জামা সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার বার মুখ বাহির করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহা সে-ই জানে, কিন্তু এ কথা তাহার মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ গাড়িতে তাহার স্বামী নাই—সে একেবারে অনন্যনির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন এক দিগ্বিহীন নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে। এমন হইতে পারে না! এই গাড়িতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন।

সুরেশ যাই হোক, এবং সে যাই করুক, একজন নিরপরাধা রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া এই অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দিবে, এতবড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এ সোজা কথাটুকু যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত ভালবাসার কথা মুখে আনিয়াছিল কোন্ মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই।

সহসা একটা প্রবল ঝাপটা তাহার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল এবং ততক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সর্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই। বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে, অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাতে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না এবং কিছু কিছু পরিবর্তন করিবার মানসে কম্পিতহস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গাড়ির গতি অতি মন্দ হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বে তাহা স্টেশনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ স্টেশন জানিবার উপায় নাই। তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশবাবু!

এই কামরায় জন-দুই বাঙালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড়ভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয়ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর তীব্র আর্তনাদের মত শুধু সুরেশকেই নয়, উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল, দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা; তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ির উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনিই একটা রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধ-দৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখচি নে—কৈ তিনি? কোন্ গাড়িতে তাঁকে তুলেচ?

চল দেখিয়ে দিচ্চি, বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল এবং যেদিক হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেইদিক পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূলুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং স্তব্ধমুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুললে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও থাক—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও—না হয়,

শুধু বলে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্ছি; বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্চো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য। গাড়ি চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে নিরাশা যেন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন করে তোমার—

এতবড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দিকে ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে পা-দুটা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এ কাজ আমি পারি বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি করেচ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বল; বলিয়া সে আর একবার তাহাব পা-দুটা ধরিযা তাহারই পরে সজোরে মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু পা-দুটো যাহার, সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ন্যায় কেবল নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিল।

বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমান বারংবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃংখল ঝড়-জল তেমনি-ভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড কবিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ-হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ-সমস্ত একেবারে তুচ্ছ আকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সহসা অচলা তাহার ছ শয্যা ছাড়িয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশের যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, পরের স্টেশন সন্নিকটবর্তী হওয়ায় গাড়ির বেগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অচলা কেন যে এমন করিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সুরেশ ডান হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, ব'স। মহিম এ গাড়িতে নেই।

নেই! তবে কোথায় তিনি? বলিতে বলিতে অচলা সম্মুখের বেঞ্চের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সুরেশ লক্ষ্য করিযা দেখিল তাহার মুখের উপর হইতে রক্তের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি, এতক্ষণের এত কান্নাকাটি, এত মাথা-কোটাকুটির মধ্যেও হৃদয়ে, তাহার সমস্ত প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধেও একপ্রকার অব্যক্ত অন্তর্নিহিত আশা ছিল, হয়ত এ-সকল আশঙ্কা সত্য নহে, হয়ত প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের দুঃসহ বেদনা ঘুমভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসেই অবসান হইয়া গিয়া পুলকে সমস্ত চরাচর রাঙা হইয়া উঠিবে। এমনি কিছু একটা অচিন্তনীয় পদার্থ হয়ত তখনও তাহার আগাগোড়া বুক খালি করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করে নাই। কেননা, এই ত তখন পর্যন্তও তাহার সংসারে যাহা-কিছু কামনার সমস্ত বজায় ছিল; অথচ একটা রাত্রিও পোহাইল না, আর তাহার কিছু নাই—একেবারে কিছু নাই। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে জীবনটা একেবারে দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমা ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল! এতবড় পরিমাণবিহীন বিপত্তিতে তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই বোধ করি কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। উভয়ে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি আসিয়া একটা অজানা স্টেশনে লাগিল এবং অল্পকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জানালার কাচ তুলিয়া দিয়া কয়েকবার পায়চারি করিয়া সহসা অচলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম ভাল আছে। এতক্ষণে বোধ হয় সে এলাহাবাদে পৌঁছেছে। একটুখানি থামিয়া বলিল, ওখান থেকে জব্বলপুরেও যেতে পারে, কলকাতায়ও ফিরে আসতে পারে।

অচলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

সেই অশ্রু-কলঙ্কিত মুখের উপর দুঃখ-নিরাশার চরম প্রতিমূর্তি আর-একবার সুরেশের চোখে পড়িল। তাহার ভুল যে কত বড় হইয়া গিয়াছে, এ কথা আর তাহার অগোচর ছিল না এবং ইহার জন্য আজ সে নিজেকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারিত। কিন্তু যাহার সহস্র ছলনা তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই ভুলের মধ্যেই বারংবার অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়াছে সেই ছলনাময়ীর বিরুদ্ধেও তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ সে অচলার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমরা সশরীরে নরকেই যাচ্ছি। যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর পর্যন্ত টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে না! এখন শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আপাদমস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে মিথ্যাচারী কাপুরুষ পরস্ত্রীকে এমন করিয়া বিপথে ভুলাইয়া আনিয়াও অসঙ্কোচে এত বড় নির্লজ্জ অপবাদ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাকে বলিবার আর কাহার কি থাকে!

সুরেশ আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাষাণ-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন একা তোমারই সর্বনাশ! কিন্তু সর্বনাশ বলতে যা বোঝায় তা আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানো? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করিনে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেয়েমানুষের যা-কিছু অস্ত্র-শস্ত্র তোমার তূণে সে সব প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আছে, তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো? আমি পুরুষমানুষ—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলি করতে হবে। বলিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়া মুখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যে উপচাইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া সুরেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ময়ূরপুচ্ছ মাথায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়। তুমি অসূর্যম্পশ্যা হিন্দুর ঘরের কুলবধূ নও এতটুকুতে তোমাদের জাত যাবে না। তুমি যেখানে খুশি নেমে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মহিমকে দেখিও, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্চি, তোমার বাপকে দিয়ো—তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চিন্তা কি অচলা, এ এমনি কি বেশী অপরাধ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না, তাহার জ্বলন্ত শূলে কোথায় কি কাজ করিল। খাবারের লোভে বনাপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায় তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেইভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, এ এমনি কি ভয়ানক অপরাধ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপরে বলেছিলে, একজন পরপুরুষকে ভালবাস—সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চলে আসতে চেয়েছিলে এবং এলেও তাই; স্মরণ হয়? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আসতে সেধেছিলে মনে পড়ে? তার চেয়েও কি এটা বেশী অপরাধ? আরও কত-কি প্রতিদিনের

অসংখ্য খুঁটিনাটি! তাই আজ আমার এত সাহস! আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি। ভেবেছিলুম, প্রথমে একটুখানি চমকে উঠবে মাত্র। তার বেশি তোমার কাছে আশা করিনি। তোমাকে বার বার বলে দিচ্চি অচলা, তুমি সতী-সাবিত্রী নও। সে তেজ, সে দর্প তোমার সাজে না, মানায় না—সে তোমার একান্ত অনধিকারচর্চা! বলিয়া সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে নির্জীব হইয়া থামিতেই অচলা মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থামবেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন। আমাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে সংসারে যত কটু কথা, যত কুৎসিত বিদ্রূপ, যত অপমান আছে, সব করুন; বলিয়া মেঝের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ রোদনের বিদীর্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল, এই আমি চাই, এই আমার দরকার! এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ! পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য।

সুরেশ দেয়ালে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুদীর্ঘ কেশভার স্রস্তবিপর্যস্ত হইয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত গাত্রবাস ধুলায় কাদায় মলিন কদর্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সেদিকে সুরেশ পা বাড়াইতে পারিল না। নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূপতিত পক্ষিণীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্তের সাক্ষ্য লইতে দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার গাড়ির গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া ধীরে ধীরে স্টেশনে আসিয়া থামিল। সুরেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলায় বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তুমি উঠে বসো, আমি আমার ঘরে চললুম। সকাল হলে তুমি যেখানে নামতে চাইবে আমি নামিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে, আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্টা করো না, তাতে কোনো ফল হবে না। বলিয়া সুরেশ কপাট খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝবে না, কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্যার মীমাংসার ভার আমি নিলুম। আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘটতে দেব না—এর সমস্ত ঋণ আমি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে যাবো, বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেনের টানা ও একঘেয়ে শব্দের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই সুরেশের তন্দ্রা ভাঙিতেছিল বটে, কিন্তু চোখের পাতার ভার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর যেন তাহাতে ছিল না। ভিজা কাপড়ে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, বস্তুতঃ সে যে অসুখে পড়িতে পারে এবং বর্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্রপরিবর্তনের উদ্যম একটা অসাধ্য অভিলাষের মতই তাহার মনের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক পৌঁছিল—কুলী! কুলী! সে অর্ধসজ্ঞাগভাবে চোখ মেলিয়া দেখিল, গাড়ি কোন একটা স্টেশনে থামিয়া আছে, এবং কখন অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্লান্তবর্ষণ ধূসর মেঘের মধ্য দিয়া একপ্রকারের ঘোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেকে নামিতেছে, অনেকে চড়িতেছে, এবং তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি শোকাচ্ছন্ন রমণীমূর্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এ অচলা। একজন কুলী ঘাড়ে একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে সে তাহাকে কি-একটা জিজ্ঞাসা করিয়া গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণ পর্যন্ত সুরেশ নিশ্চেষ্টভাবে শুধু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ি ছাড়িবার বেলের শব্দ প্ল্যাটফর্মের কোন এক প্রান্ত হইতে সহসা ধ্বনিয়া উঠিয়া তড়িৎস্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে একমুহূর্তে এক করিয়া তাহার সমস্ত জড়িমা ঘুচাইয়া দিল, এবং পলকের মধ্যে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিটবাবুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ পিছন হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, দাঁড়িয়ো না, চল আমি টিকিট দিচ্ছি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠায় ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ার পূর্বেই সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নলিখিত মত কথাবার্তা হইল।

সুরেশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি সোজা কলকাতাতেই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহরীতে নেমে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্যদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়াই জবাব দিল, কলকাতায় আমি কার কাছে যাবো?

কিন্তু এখানে?

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয়ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সেজন্য আমার নালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেষ সময়ে কিছু ভিক্ষা চাই।

অচলা তেমনি নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোঝাবারও নয়, আমি বোঝাতেও চাইনে। আমার জিনিস আমার সঙ্গেই যাক। যেখানে গেলে এখানের আগুন আর পোড়াতে পারবে না, আমি সেই দেশের জন্যই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু আমাকে দাও, আমি হাতযোড় করে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তথাপি অচলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

সুরেশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেচি, অনেক দুঃখ দিয়েচি; কিন্তু পরে যে ভাল থাকার দম্ভে ওপরে বসে তোমার মাথায় কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে কালো করে তুলবে, সে আমি মরেও সইতে পারবো না। আমার জন্যে তোমাকে আর দুঃখ না পেতে হয়, বিদায় হবার আগে আমাকে এইটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে যাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন, অকস্মাৎ তপ্ত-অশ্রুতে অচলার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপণে অবিকৃত রাখিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুরেশ পকেট হইতে টাইম-টেবিলখানা বাহির করিয়া গাড়ির সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন কোনদিকে যাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে অবিশ্বাস করো না, এই শুধু আমি চাই। আমা হতে তোমার আর কোন অকল্যাণ হবে না, এ কথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করচি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে যে সম্মত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

লোকের দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকর্ষণ করিবার আশঙ্কায় স্টেশনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে দুজনের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল, বড় রাস্তার উপরে সম্রাট শের শাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শহরের একপ্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে দুজনে ক্ষণকালের জন্য নিজেদের মর্মান্তিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একখানা গরুর গাড়ি করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতিও চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নামিতে গিয়া পলকের জন্য সুরেশের মুখের প্রতি অচলার দৃষ্টি পড়িয়া মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। তাহার দুই চোখ ভয়ানক রাঙ্গা অথচ মুখের উপর কিসে যেন কালি

মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক ঝড়ঝাপটের মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া সুরেশ মনি-ব্যাগটা সেখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার মনে হয়, নিতে লজ্জা করো না।

অচলার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, এ কথার অর্থ কি? কিন্তু পারিল না।

সুরেশ কহিল, এই সুমুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামাকাপড়গুলো ছেড়ে আসি। কি জানি, এইগুলোর জন্যেই বোধ করি এ-রকম শীত ঠেকচে; বলিয়া সে অচলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া ঠিক মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া কোণের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেলে অচলা একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভারী ব্যাগটা টানিয়া টানিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং তাহারই উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাস্তার উপরে লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই ঘরের সম্মুখে ব্যাগের উপরে বসিয়া আশা ও আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতে পারিল না। কিছুক্ষণ সূর্য উঠিয়াছে। শীতের দিনের ধূলি-ধূসরিত তরুশ্রেণী কল্যকার ঝড়-জলে স্নাত ও নির্মল হইয়া প্রভাতসূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। সিক্ত-স্নিগ্ধ রাজপথের উপর দিয়া বিগত-ক্লেশ পান্থ প্রফুল্লমুখে চলিতে শুরু করিয়াছে; কদাচিৎ দুই-একটা এক্কাগাড়ি ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে রাখাল-বালকেরা গো-মহিষের দল লইয়া অদ্ভুত ও অসম্ভব আত্মীয়সম্বন্ধের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোন গ্রাম-প্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্তী কোন এক কুটির হইতে গমভাঙ্গা যাঁতার শব্দে মিশিয়া হিন্দুস্থানী গৃহস্থ-বধূর অশ্রান্ত অপরিচিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সবসুদ্ধ লইয়া এই যে একটি নূতন দিনের কর্মস্রোত তাহার চেতনায় ধীরে ধীরে গতিশীল হইয়া উঠিতে-ছিল, ইহারই বিচিত্র প্রবাহে তাহার দুঃখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। ঠিক কিসের জন্য, কেন সে এখানে এভাবে বসিয়া, তাহার স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল জন-দুই পল্লী-বালকের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে! তাহারা আঙ্গিনার একপ্রান্ত হইতে শুধু বিস্ফারিতচক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়াছিল। এই জীর্ণ মলিন পান্থশালার প্রাচীন দিনের গৌরব-ইতিহাস ছেলে-দুটার জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান হওয়া অবধি এরূপ বিশিষ্ট অতিথিব সমাগম যে এ গৃহে কখনো ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া অচলাকে জানাইয়া দিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া নিত্য-নিয়মিত খেলা করিতে আসিয়া আজ সহসা এই আশ্চর্য ব্যাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গিয়াছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে-দুটা নিমিষে অন্তর্ধান হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাহার মনে পড়িল, প্রায় ঘণ্টা-দুই পূর্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আর দেখা দেয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে জানিবার জন্য সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং অবরুদ্ধ কবাটের ভিতর হইতে কোনপ্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সামনেই যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র আবেগে ও বিকট ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার সমস্ত দেহমন যেন পাষাণ হইয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার, শুধু ওদিকের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া খানিকটা আলো ঢুকিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে আলো-আঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছন্ন ধুলো-বালির

উপরে সুরেশ চিত হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গায়ে তখনও সেই-সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর হইতে কতকগুলো জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেষ-কথাগুলো অচলার মনে পড়িল; সে ডাক্তার, সে শুধু মানুষের জীবনটা ধরিয়া রাখিবার বিদ্যাই শিখিয়াছিল, তাহা নয়, তাহাকে নিঃশব্দে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল না। মনে পড়িল, নিদারুণ ভুলের জন্য তাহার সেই উৎকট আত্মগ্লানি; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদায় চাওয়া, সেই আশ্বাস দেওয়া—সর্বোপরি তাহার সেই বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত; সমস্তই একসঙ্গে এক নিশ্বাসে যেন ওই অবলুণ্ঠিত দেহটার কেবল একটিমাত্র পরিণামের কথাই তাহার কানে কানে কহিয়া দিল। সেইখানে সেই দ্বার ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল—তাহার এমন সাহস হইল না যে, আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন দেহটার প্রতি চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল! যে তাহারই জন্য এত বড় দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া হতাশ্বাসে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জনা করিতে পারে না, এত বড় কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে, এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিজের অপরাধও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

সুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সেদিন পর্যন্ত যতকিছু কামনা-বাসনা, যত ভুলভ্রান্তি, যত মোহ, যত ছলনা, যত আগ্রহ-আবেগ উভয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সমস্তই একে একে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিজের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে হইল, শুধু কেবল নিজের নয়, অনেকের অনেক পাতকের গুরুভার বহন করিয়াই আজ সুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিঃশব্দে মুখ বুজিয়া সমস্ত শাস্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিংবা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে!

ওই লোকটির সংসারে উপভোগ করিবার অনেক সাজ-সরঞ্জাম অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, লেশমাত্র আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অচলাকে আজ ফিরিয়া ফিরিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে যে যথার্থই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, সে কথা আজ ওই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না।

আবার তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গতরাত্রে গাড়ির মধ্যে তাহাদের বিস্তর কঠিন কটু কথা, বিস্তর ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে-সকল যে কত বড় অর্থহীন প্রলাপ, অচলা তখন তাহার কি জানিত। ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম নাই, বিচার-বিবেক ভালমন্দ-বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে, সে যে এই-সব সমাজের হাতেগড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ-সকল বিধিনিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া মনে হইল, মৃতদেহটা যেন একটুখানি নড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্তস্বরের সঙ্গে সুরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। সে মরে নাই—জীবিত আছে; একটা প্রচণ্ড আগ্রহবেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং ভগ্নকণ্ঠে কহিল, সুরেশবাবু!

আহ্বান শুনিয়া সুরেশ দুই আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া অশ্রুর আকারে দুই চক্ষু দিয়া নিরন্তর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত পূর্বের অশ্রুর সহিত এ অশ্রুর কতই না প্রভেদ!

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সংগোপনে পীড়া দিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিচিত স্থানে সুরেশের মৃতদেহ লইয়া সে কি উপায় করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কাহাকে বলিবে—হয়ত অনেক অপ্রীতিকর

আলোচনা, অনেক কুৎসিত প্রশ্ন উঠিবে—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে, হয়ত পুলিশে টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে—সেই-সকল অনাবৃত প্রকাশ্যতার লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যে অন্তরে অন্তরে পীড়িত, কিরূপ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্তটা বোধ করি সে নিজেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিমেয় লাঞ্ছনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না যেন আর থামিতে চাহিল না, এবং সে মরে নাই, শুধু ইহাতে তাহার প্রতি অচলার সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে সুরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছ কেন অচলা?

অচলা ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন করে শুয়ে রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ, এমনই মধুর যে, শুধু সুরেশের নয়, অচলার নিজের মধ্যেও কেমন একপ্রকার মোহের সঞ্চার করিল। সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘুম পেয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আমি ত ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার করে যা হোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা তৈরি করে দিতে পারতুম। ট্রেনের সময় হতে ত ঢের দেরি ছিল।

সুরেশ কোন জবাব দিল না, শুধু বিগলিত স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম! তোমার কি জ্বর হয়েছে নাকি!

সুরেশ কহিল, হুঁ। তা ছাড়া এ জ্বর সহজে সারবে বলেও আমার মনে হয় না। বোধ হয়—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাসই পড়িল। তাহার উদ্বেলিত সমস্ত স্নেহ-মমতা একমুহূর্তে জমিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। সহ্য করিবার, ধৈর্য ধরিবার তাহার যে কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাটুকু গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অভাবিতপূর্ব বিপদের মেঘে তাহার আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকু যখন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন মৃত্যু ভিন্ন জগতে আর প্রার্থনীয় বস্তু তাহার দ্বিতীয় রহিল না।

ইহাকে এইভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিল না। কিন্তু যাহার পীড়ার সর্বপ্রকার দায়িত্ব, সমস্ত গুরুভার তাহার মাথায় পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে, কি পরিচয়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, অহর্নিশি কি অভিনয় করিবে, এই-সকল চিন্তা বিদ্যুৎবেগে তাহার মাথায় প্রবাহিত হওয়ায় সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে, না সজোরে মাথা কুটিয়া এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা হাতে-হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটারই যেন কূল-কিনারা পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন স্টেশন হইতে পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কেদারবাবু সাত-আটদিন গাঁটের বাত ও সর্দিজ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা-জামাতার কুশল-সংবাদের অভাবে অতিশয় চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জব্বলপুরের বন্ধুকে একখানা পোস্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না, এইটুকু মাত্র খবর দিয়াছেন। ছত্র-কয়টি কেদারবাবু বার বার পাঠ করিয়া বিবর্ণমুখে শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চশমার কাচ-দুটা ঘন ঘন মুছিতে লাগিলেন। তাহাদের কি হইল, কোথায় গেল সংবাদের

জন্য তিনি কাহাকে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সকল আপদে-বিপদে যে ব্যক্তি কায়মন দিয়া সাহায্য করিত সেই সুরেশও নাই, সে-ও সঙ্গে গিয়াছে।

ঠিক এমনি সময়ে বেহারা আসিয়া আর-একখানি পত্র তাঁহার সুমুখেই রাখিয়া দিল। কেদারবাবু কোনমতে নাকের উপর চশমাখানা তুলিয়া দিয়া ব্যগ্রহস্তে চিঠিখানি তুলিয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কন্যা অচলার নামে। মেয়েলি হাতের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আগ্রহে অপরের চিঠি খোলা-না-খোলার প্রশ্ন তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, 'তোমার মৃণাল'। তাহার পর এখানিও তিনি আদ্যোপান্ত বার বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চশমা মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা জগদীশ্বর জানেন। বহুক্ষণে চশমা পরিষ্কারের কাজটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আর-একবার চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র-মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—

সেজদা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না সত্য, জিজ্ঞাসা করিলেও ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু আমি ত মেয়েমানুষ, আমি ত সব বুঝিতে পারি! আচ্ছা সেজদি, ঝগড়া-বিবাদ কাহার না হয় ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া এত অভিমান! তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-মনের বর্তমান অবস্থা না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অন্যায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি যাই বলিতেই তুমি স্বচ্ছন্দে সায় দিয়া বলিলে, আচ্ছা, তাই হোক, যাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবল ভাবি সেজদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার মৃতকল্প স্বামীটিকে এত সহজে এই বনের মধ্যে বিসর্জন দিলে এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আটদিন বলি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ি বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিসপত্র লইয়া বাড়ি ঢুকিলেন আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। তোমাদের কেন ঝগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার বদলে তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন, এ-সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতে চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিব্য রহিল তুমি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসিবে। জানই ত ভাই, আমার শাশুড়ীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার জো নাই। তবুও হয়ত আমি নিজে গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজদা এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একবার এস, একবার নিজের চোখে তাঁকে দেখ, তখন বুঝিবে, এই অসঙ্গত মান করিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছ। এ বাড়িও তোমার, আমিও তোমার, সেইজন্য এ বাড়িতে আসিতে কোন দ্বিধা করিবে না। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম, শ্রীচরণে শত কোটি প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজদা যেন শুনিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি—তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনশ্চ দিয়া কৈফিয়ত দিয়াছে যে, যেহেতু স্বামীর অনুপস্থিতিতে তুমি একটা বেলাও সুরেশবাবুর বাটীতে থাকিবে না জানি, তাই তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানাতে লিখিলাম। ভরসা করি এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কেদারবাবুর হাত হইতে চিঠিখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চশমা-মোছার কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। এটুকু বুঝা গিয়াছে, মহিম জব্বলপুরের পরিবর্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোথায়, তাহার কি হইল, এ-সকল কথা হয় মহিম জানে না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ মনে হইল, সুরেশই বা কোথায়? সে যে তাহাদের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল। সে নিশ্চয়ই বাটীতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার দেখা করিতই। তাহার পরে পিতার বুকের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাৎ শূলের মত আসিয়া পড়িল, সে আঘাতে

তিনি আর সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কেদারাটায় হেলান দিয়া পড়িয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দুপুরবেলা দাসী সুরেশের বাটী হইতে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার পিসীমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠিপত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছেন।

রাত্রে নিভৃত শয়ন-কক্ষে কেদারবাবু প্রদীপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানি লইয়া বসিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি দাঁড়াইবার মত কোথাও এতটুকু জায়গা পাওয়া যায়। না হইলেও যে তিনি কোথায় গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন, ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন ভদ্রলোক বাঁচিতে পারে, এ কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সেই আজন্ম-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধু-বান্ধব সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথাও অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ-জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই দুঃসহ দুর্ভর দিন-কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে সে তাঁহার চিন্তার অতীত এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

সারারাত্রির মধ্যে তিনি একবার চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ায় আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এতবড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের সূর্য অপরাহ্নবেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোন নদের পার্শ্ববর্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালু-মরু ধু-ধু করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলোবাটীর বারান্দায় রেলিং ধরিয়া অচলা সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়াবাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি?

অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। যে মেয়েটি একদিন 'রাক্ষুসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা স্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল, এ সেই। কাছে আসিয়া অচলার উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত শ্রীহীন মুখের প্রতি মুহূর্তকাল দৃষ্টি রাখিয়া অভিমানের সুরে কহিল, আচ্ছা দিদি, সবাই দেখচে সুরেশবাবু ভাল হয়ে গেছেন; ডাক্তার বলচেন, আর একবিন্দু ভয় নেই, তবু যে দিবারাত্রি তোমার ভাবনা ঘোচে না, মুখে হাসি ফুটে না, এটা কি তোমার বাড়াবাড়ি নয়? আমাদের কর্তারা আছেন, তাঁদের অসুখ-বিসুখেও আমরা ভেবে সারা হই, কিন্তু মাইরি বলচি ভাই, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

অচলা মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোন উত্তর দিল না।

মেয়েটি রাগ করিয়া বলিল, ইস্! ফোঁস করে যে কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বড়! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া যখন অচলার নিকট হইতে কোনপ্রকার জবাব পাইল না, তখন তাহার একখানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, সত্যি কথা বলো ভাই, আমাদের বাড়িতে তোমার এক-দণ্ডও মন টিকচে না, না? বোধ হয় খুবে অসুবিধে আর কষ্ট হচ্ছে, সত্যি না?

অচলা নদীর দিকে যেমন চাহিয়াছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল; কিন্তু এবার উত্তর দিল, কহিল, তোমার শ্বশুর আমার যে উপকার করেছেন, সে কি এ-জন্মে কখনো ভুলতে পারবো ভাই!

মেয়েটি হাসিল; কহিল, ভোলবার জন্যই যেন তোমাকে আমি সাধাসাধি ক'রে বেড়াচ্চি! এবং পরক্ষণেই কৃত্রিম অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, আর সেজন্যই বুঝি তখন বাবার অত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিলে না? তুমি ভাবলে, বুড়ো যখন তখন—

অচলা একান্ত বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, না, এমন কখ্খনো হতে পারে না।

রাক্ষুসী জবাব দিল, পারে না বৈ কি! তবু যদি না আমি নিজে সাক্ষী থাকতুম! ঠাকুরঘর থেকে আমার কানে গেল,—সুরমা! ও-মা সুরমা! এমন চার-পাঁচবার শুনলুম, বাবা ডাকছেন তোমাকে। পুজোর সাজ করছিলুম, একপাশে ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখি তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। সত্যি বলছি দিদি, তামাশা করছি নে!

অচলাই শুধু মনে মনে বুঝিল, কেন বৃদ্ধের 'সুরমা' আহ্বান তাহার বিমনাচিত্তের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই। তথাপি সে লজ্জায় অনুতাপে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, বোধ হয় তাই ঘরের মধ্যে—

রাক্ষুসী বলিল, কোথায় ঘরের মধ্যে। যাঁর জন্যে ঘর, তিনি যে তখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। উঠন থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ঠিক এমনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বলিয়া একটু থামিয়া হাসিমুখে বলিল, কিন্তু তুমি ত আর তোমাতে ছিলে না ভাই, যে বুড়ো-সুড়োর ডাক শুনতে পাবে! যা ভেবেছিলে, তা যদি বলি ত—

অচলা নীরবে পুনরায় নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, এই-সকল ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র করিল না। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, রাক্ষুসী নামের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না; এবং নামও তাহার রাক্ষুসী নয়, বীণাপাণি। জন্মকালে মা মরিয়াছিল বলিয়া পিতামহী রাগ করিয়া এই অপবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট হইতে এ দুর্নাম সে গোপন রাখিতে পারে নাই।

অচলাকে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্বাক হইতে দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জা পাইল, অনুতপ্ত-স্বরে বলিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, তোমাকে কি একটা ঠাট্টাও করবার জো নেই ভাই? আমি কি জানিনে, বাবাকে তুমি কত ভক্তি-শ্রদ্ধা কর? তাঁর কাছে ত আমরা সমস্ত শুনেচি। তিনি সকালে বেড়িয়ে আসছিলেন, আর তুমি এই অজানা জায়গায় কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার খুঁজতে ছুটেছিলে। তারপরে তিনি তোমার সঙ্গে গিয়েই সরাই থেকে তোমার স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এ সবই ভগবানের কাজ দিদি, নইলে এ বাড়িতে যে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বে, সেদিন গাড়িতে এ কথা কে ভেবেছিল? কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হ'লো না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের এখানে যে তোমার একদণ্ডও ভাল লাগচে না, সে আমি টের পেয়েচি। কিন্তু কেন? কি কষ্ট, কি অসুবিধে এখানে তোমাদের হচ্ছে ভাই, তাই কেবল জানতে চাইচি; বলিয়া পূর্বের মত এবারও ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ এই মেয়েটির মনে হইল, যে-কোন কারণেই হোক, সে উত্তরের জন্য মিথ্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তখন যাহাকে তাহার শ্বশুর সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছেন এবং সে নিজে সুরমাদিদি বলিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মুখখানা জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে; বীণাপাণি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া শূন্যদৃষ্টি অন্যত্র সঞ্চারিত করিল।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সদ্যপ্রাপ্ত একখানা মাসিকপত্র হইতে একটা ছোটগল্প বীণাপাণি অচলাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। একখানা বেতের চৌকির উপর অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অচলা কতক-বা শুনিতেছিল, কতক-বা তাহার কানের মধ্যে একেবারেই পৌঁছিতেছিল না, এমনি সময়ে বীণাপাণির শ্বশুর রামচরণ লাহিড়ী মহাশয় সিঁড়ি হইতে 'মা রাক্ষুসী' বলিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বীণাপাণি একখানি চৌকি টানিয়া বৃদ্ধের সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

এই বৃদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিয়া অচলার

মুখের প্রতি সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, একটা কথা আছে মা। ভট্‌চায্যি-মশাই এইমাত্র এসেছিলেন, তিনি তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর নামে সংকল্প ক'রে নারায়ণকে তুলসী দিচ্ছিলেন, তা কাল শেষ হবে। তবে কাল তোমাকে মা, কষ্ট স্বীকার ক'রে একটু বেলা পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে। তিনি আমাদের বাড়িতেই নারায়ণ এনে কাজ সমাপ্ত ক'রে যাবেন, আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। কথা শুনিয়া অচলার সমস্ত মুখ একবারে কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে বৃদ্ধের তাহা নজরে পড়িল না, কিন্তু বীণাপাণির পড়িল। সে হিন্দুঘরের মেয়ে, জন্মকাল হইতে এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে এবং পীড়িত স্বামীর কল্যাণে ইহা যে কত উৎসাহ ও আনন্দের ব্যাপার, তাহা সে সংস্কারের মতই বুঝে, কিন্তু অচলার মুখের চেহারার এই উৎকট পরিবর্তনে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তথাপি সখীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, নারায়ণকে তুলসী দেওয়ালে ত তুমি সুরেশবাবুর জন্যে, তবে উনি উপোস না ক'রে দিদিকে করতে হবে কেন?

বৃদ্ধ সহাস্যে কহিলেন, তিনি আর তোমার এই দিদিটি কি আলাদা মা? সুরেশবাবু ত তাঁর এ অবস্থায় উপবাস করতে পারবেন না, তাই তোমার সুরমাদিদিকেই করতে হবে। শাস্ত্রে বিধি আছে মা, কোন চিন্তা নাই।

অচলা ইহারও প্রত্যুত্তরে যখন হাঁ-না কোন কথাই কহিল না, তখন তাহার এই নিরুদ্যম নীরবতা অকস্মাৎ এই শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধেরও যেন চোখে পড়িয়া গেল। তিনি সোজা অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে সুরমা? বলিয়া একান্ত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সহসা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁকে বললে তিনিই করবেন বোধ হয়।

তাহার পরে সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অনুভব করিল না, কিন্তু শুধু অন্তর্যামী ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে, বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। ভৃত্য আলো দিয়া গেল, কিন্তু দুজনেই সংকুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মাসিকপত্রে সেই অত বড় উত্তেজক ও বলশালী গল্পের বাকীটুকু শেষ করিবার মত জোরও কাহারও মধ্যে রহিল না।

বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই দুইটি ক্ষুব্ধ মৌন লজ্জিত নারীর চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

এইভাবেই হয়ত আরও বহুক্ষণ কাটিতে পারিত, কিন্তু কি ভাবিয়া বীণাপাণি সহসা তাহার চৌকিটা অচলার পাশে টানিয়া আনিল এবং নিজের ডান হাতখানি সখীর কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, ও-পারের ওই চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি। যেন অমনি অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি—ও কি, এমন শিউরে উঠলে কেন ভাই?

অচলা মুহূর্তকাল নির্বাক থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, হঠাৎ কেমন যেন শীত ক'রে উঠল ভাই।

বীণাপাণি উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গরম কাপড় আনিয়া অচলার সর্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিল, কহিল, একটা কথা তোমাকে ভারী জিজ্ঞেসা করতে ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। যদি রাগ না কর ত—

অজানা আশঙ্কায় অচলার বুকের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। পাছে বেশী কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া যায়, এই ভয়ে সে শুধু কেবল একটা 'না' বলিয়াই স্থির হইল।

বীণাপাণি আদর করিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিতে লাগিল, এখন যেন তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোটবোন। কিন্তু সেদিন গাড়িতে ত আমি তোমার কেউ ছিলাম না, তবে কেন নিজের পরিচয় আমার কাছ থেকে অমন ক'রে লুকোতে চেয়েছিলে? যিনি স্বামী, তাঁকে বললে কেউ নয়—বললে, পীড়িত স্বামী অন্য কামরায়,

তাকে নিয়ে জব্বলপুরে যাচ্ছো, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারনি। আমি ঠিক চিনেছিলাম, উনি তোমার কে। আবার বললে তোমরা ব্রাহ্ম, বলিয়া একবার সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু এখন দেখছি, তোমার কর্তাটির পৈতের গোছা দেখলে, নিকুপুরের পাচক ঠাকুরের দল পর্যন্ত লজ্জা পেতে পারে। আচ্ছা ভাই, কেন এত মিথ্যা কথা বলেছিলে বল ত?

অচলা জোর করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, যদি না বলি?

বীণাপাণি কহিল, তা হলে আমিই বলব। কিন্তু আগে বল, যদি ঠিক কথাটি বলতে পারি, কি আমাকে দেবে?

অচলার বুকের মধ্যে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। তাহার মুখের উপরে যে মৃত্যু-পান্ডুরতা ঘনাইয়া আসিল, বাতির ক্ষীণ আলোকে বীণাপাণির তাহা চোখে পড়িল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সে মুখ টিপিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, কিছু দাও আর না দাও, যদি সত্যি কথাটি বলতে পারি, আমাকে কি খাওয়াবে বল অচলাদিদি।

অচলার নিজের নামটা নিজের কানে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণ হইতেই সে একপ্রকার অর্ধচেতনে অর্ধ-অচেতনের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, আমাদের দুই বোনের কিন্তু তত দোষ নেই ভাই, দোষ যত আমাদের কর্তা দুটির। একজন জ্বরের ঘোরে তোমার সত্যি নামটি প্রকাশ করে দিলেন, আর অপরটি তাই থেকে তোমার সত্যি পরিচয়টি ভেবে বার ক'রে আনলেন।

অচলা প্রাণপণ-বলে তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি পরিচয়টি কি শুনি?

বীণাপাণি বলিল, সত্যি হোক আর নাই হোক ভাই, বুদ্ধি যে তার আছে, সে কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে। তিনি একদিন রাত্রে হঠাৎ এসে বললেন, তোমার অচলাদিদির কান্ডটা কি জানো গো? তিনি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি রাগ করে বললুম, যাও, চালাকি করতে হবে না। এ কথা দিদির কানে গেলে ইহজন্মে আর তিনি তোমার মুখ দেখবেন না।

অচলা চেয়ারের হাতায় দুই মুঠা কঠিন করিয়া বসিয়া রহিল

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, তিনি বললেন, মুখ আমার তিনি দেখুন, আর নাই দেখুন, এ কথা যে সত্য, আমি দিব্য করে বলতে পারি। জা-ননদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই হোক, আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতেই হোক, স্বামী নিয়ে তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সুরেশবাবুর ত ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, তোমার দিদি তাঁকে সমুদ্রে ডুবতে হুকুম করলেও তাঁর না বলার শক্তি নাই। তার পরে যেখানে হোক একটা ছদ্মনামে অজ্ঞাতবাসে দুটিতে থাকবেন, যতদিন না বুড়ো-বুড়ী পৃথিবী খুঁজে সেধে-কেঁদে তাঁদের বৌ-বেটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যদি না আসল ঘটনা হয় ত তুমি আমাকে—

আমি বললুম, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু গাড়িতে আমার মত একটা অপরিচিত মুখ্যু মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে বলবার দিদির কি এমন গরজ হয়েছিল? কর্তা তাতে হেসে জবাব দিলেন, তোমার দিদিটি যদি তোমার মত বুদ্ধিমতী হতেন, তা হলে হয়ত কোন গরজই হ'ত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই নয়। যাই শুনলেন, তোমার বাড়ি ডিহরীতে, তুমি দুদিন পরে ডিহরীতেই যাবে, তখনই তিনি অচলার বদলে সুরমা, ডিহরীর বদলে জব্বলপুর-যাত্রী এবং হিন্দুর বদলে ব্রাহ্ম-মহিলা হয়ে উঠলেন। এটা তোমার মাথায় ঢুকল না রাক্ষুসী, যাঁরা টিকিট কিনে জব্বলপুর যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ গাড়ি বদল করে এদিকেই বা ফিরবেন কেন, আর পীড়িত স্বামী নিয়ে কোন বাঙালীর বাড়িতে না উঠে ওই অতদূরে হিন্দুস্থানী পল্লীতে, একটা ভাংগা সরাইয়ের মধ্যে গিয়েই বা হাজির হবেন কেন? বলিতে বলিতেই বীণাপাণি অকস্মাৎ পার্শ্বে হেলিয়া অচলার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং স্নেহে প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, বল না দিদি,

কি হয়েছিল? আমি কোনদিন কাউকে কোন কথা বলব না—এই তোমাকে ছুঁয়ে আজ আমি দিব্যি করচি।

বীণাপাণির মুখে তাহাদের সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কারের মিথ্যা ইতিহাস শুনিয়া অচলার সমস্ত দেহটা যেন একখন্ড অচেতন পদার্থের মত সখীর আলিঙ্গনের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্তি ধরিয়া এক-পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয়রূপে মুখ ফিরাইয়া আর-এক পথে চলিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শমাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না। শুধু দুই চক্ষের অবিশ্রান্ত অশ্রুপ্রবাহ ব্যতীত বহুক্ষণ পর্যন্ত কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ আর তাহার মধ্যে অনুভূত হইল না।

এমন কতক্ষণ কাটিল। বীণাপাণি আপন অঞ্চলে বার বার করিয়া অচলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে করুণস্বরে কহিল, সুরমাদিদি, তুমি বয়সে বড় হলেও ছোটবোনের কথাটা রাখো ভাই, এইবার বাড়ি ফিরে যাও। আমি বলচি, এ যাত্রা তোমাদের সুযাত্রা নয়। অনেক দুঃখে হাতের নোয়াটা যদি বজায় রয়েই গেছে দিদি, তখন অভিমান করে আর গুরুজনদের দুঃখ দিয়ো না, আর তাঁদের ভাবিয়ো না। হেঁট হয়ে শ্বশুর-ঘরে ফিরে যেতে কোন লজ্জা, কোন অগৌরব নেই দিদি।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, চুপ করে রইলে যে ভাই। যাবে না? মা-বাপের ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে সুরেশবাবু কখনো ভাল নেই। তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে তিনি খুশীই হবেন, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

অচলা চোখ মুছিয়া এইবার সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, বীণাপাণি তেমনি উৎসুক-মুখে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রথমটা উত্তর দিতে তাহার অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাক্ রহিয়াই যে ওই মেয়েটির কাছে মুক্তি পাওয়া যাইবে না, তাহাতে যখন আর কোন সংশয় রহিল না, তখন সমস্ত সংকোচ জোর করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কোন পথ নাই বীণা।

বীণাপাণি বিশ্বাস করিল না। কহিল, কোন পথ নেই? তোমাকে আমি বেশীদিন জানিনে সত্যি, কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি ক'রে বলতে পারি, তুমি এমন কাজ কখনো করতে পারো না দিদি, যার জন্যে কেউ তোমার কোন-দিকের পথ বন্ধ করতে পারে। আচ্ছা, তোমার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা ব'লে দাও, আমরা ত পরশু সকালের গাড়িতে বাড়ি যাচ্ছি, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হব, দেখি বুড়ো-বুড়ী আমাকে কি জবাব দেন। তোমার যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ী, তাঁরা আমারও তাই—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন লজ্জা নেই।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, তোমরা পরশু দেশে যাবে, এ কথা ত শুনিনি? এখানে কে কে থাকবেন?

বীণাপাণি কহিল, কেউ না, শুধু চাকর-দরোয়ান বাড়ি পাহারা দেবে। আমার জাঠ-শাশুড়ী অনেকদিন থেকেই শয্যাগত, তাঁর প্রাণের আশা আর নেই—তিনি সকলকেই একবার দেখতে চেয়েছেন।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুরবাড়িটি কোথায়?

বীণাপাণি বলিল, কলকাতার পটলডাঙ্গায়।

পটলডাঙ্গা নাম শুনিয়া অচলার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বীণা, তা হলে আমাদেরও এ-বাড়ি ছেড়ে কালই যেতে হয়। এখানে থাকা ত আর চলে না।

বীণাপাণি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই বুঝি তোমাদের বাড়ি ফেরবার জন্যে এত সাধা-সাধি করচি? এতক্ষণে বুঝি আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে! না দিদি, আমার ঘাট হয়েছে, তোমাকে কোথাও যেতে আর কখনো আমি বলব না; যতদিন ইচ্ছে এই কুঁড়েঘরে তোমরা বাস কর, আমাদের কারও আপত্তি নেই।

কিন্তু এই সদয় নিমন্ত্রণের অচলা কোন উত্তরই দিতে পারিল না। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের যাওয়া কি সত্যই স্থির হয়ে গেছে?

বীণাপাণি কহিল, স্থির বৈ কি। আজ আমাদের গাড়ি পর্যন্ত রিজার্ভ করা হয়েচে। বাবার ঘরে যদি একবার উঁকি মারো ত দেখতে পাবে বোধ হয়, পনের-আনা জিনিসপত্রই বাঁধাছাঁদা ঠিকঠাক।

দাসী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিল, বৌমা, মা একবার তোমাকে রান্নাঘরে ডাকচেন।

যাই, বলিয়া সে একটু হাসিয়া সহসা আর একবার দুই বাহু দিয়া অচলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কানে কানে কহিল, এতদিন লোকের ভিড়ে অনেক মুশকিলেই তোমাদের দিন কেটেচে। এবার খালি বাড়ি—কেউ কোথাও নেই—আপদ-বালাই আমিও দূর হয়ে যাবো—এবার বুঝলে না ভাই দিদিমণিটি? বলিয়া সখীর কপোলের উপর দুটি আঙুলের একটু চাপ দিয়াই দ্রুতবেগে দাসীর অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

এক টুকরা আনন্দ, খানিকটা দক্ষিণা হাওয়ার মত এই সৌভাগ্যবতী তরুণী লঘুপদে দৃষ্টির বাহিরে অপসৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার কানে কানে বলা শেষ কথা-দুটি অচলা দুই কানের মধ্যে লইয়া সেইখানে পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি এবং কল্যকার দিনটা মাত্র বাকী। তাহার পরে আর কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নাই—এই নির্জন নীরব পুরীর মধ্যে—কাছে এবং দূরে, তাহার যতদূর দৃষ্টি যায়—ভবিষ্যতের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিল—কেবল একাকী এবং কেবলমাত্র সুরেশ ব্যতীত আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দিন প্রতি মুহূর্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই - আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার পর্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।

বীণাপাণি বলিয়াছিল সুরমাদিদি, শ্বশুর-ঘর আপনার ঘর সেখানে হেঁট হয়ে যেতে মেয়েমানুষের কোন শরম নেই।

হায় রে, হায়! তাহার কে আছে, আর কি নাই, সে জমাখরচের হিসাব তাহার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে রাখিয়াছে! তথাপি আজও তাহার আপনার স্বামী আছে এবং আপনার বলিতে সেই তাহাদের পোড়া ভিটাটা এখনও পৃথিবীর অঙ্ক হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও সে একটা নিমিষের তরেও তাহার মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আবদ্ধ পশুর চোখের উপর হইতে যতক্ষণ না এই বাহিরের ফাঁকটা একেবারে আবৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন সে একই স্থানে বারংবার মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার অবাধ্য মনের প্রচণ্ড কামনা তাহার বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিয়া বাহিরের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে সুরেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রিত, মধ্যের দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত এবং তাহারই এ-ধারে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া আপনার আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকিয়া হিন্দুস্থানী দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সমস্ত বাটীর মধ্যে কেহ যে জাগিয়া আছে, তাহার আভাসমাত্র নাই—শুধু সেই যেন অগ্নিশয্যার উপরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন এই পালঙ্কের উপরেই তাহার পার্শ্বে বীণাপাণি শয়ন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার স্বামী উপস্থিত, সে তাহার নিজের ঘরে শুইতে গিয়াছে, এবং পাছে এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া নিজের বিক্ষিপ্ত পীড়িত চিত্ত অকস্মাৎ তাহাদেরই অবরুদ্ধ কক্ষের সুষুপ্ত পর্যঙ্কের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হিংসায়, অপমানে, লজ্জার অণু-পরমাণুতে বিদীর্ণ হইয়া মরে, এই ভয়ে সে যেন আপনাকে আপনি প্রচণ্ড শক্তিতে টানিয়া ফিরাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত দেহটা তার তীব্র তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পার্শ্বের কোন একটা ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। গায়ের গরম কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই অনুভব করিল, এই শীতের রাত্রেও তাহার কপালে-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। তখন শয্যা ছাড়িয়া মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখিতে পাইল, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর খণ্ড-চন্দ্র ঠিক সম্মুখেই দেখা দিয়াছে, এবং তাহারই স্নিগ্ধ মৃদু কিরণে শোনের নীল জল বহুদূর পর্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস তাহার তপ্ত ললাটের উপর স্নেহের হাত বুলাইয়া দিল এবং সেইখানে সেই জানালার উপরে সে তাহার অদৃষ্টের শেষ সমস্যা লইয়া বসিয়া পড়িল।

এই কথাটা অচলা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই অভিশপ্ত, হতভাগ্য জীবনের যাহা কিছু সত্য, সমস্তটাই লোকের কাছে শুধু কেবল একটা অদ্ভুত উপন্যাসের মত শুনাইবে এবং যেদিন হইতে এই কাহিনীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, সেইদিন হইতে যত মিথ্যা এ জীবনে সত্যের মুখোশ পরিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটি একটি করিয়া মনে করিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যে ভাগ্যবিধাতা তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটিকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত, এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করিল না, সেই নির্মম নিষ্ঠুরকে সে যদি শিশুকাল হইতে ভগবান বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে ত সে শিক্ষা তাহার একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বর! তোমার এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কৌতুক করিয়া আমোদ করিবার আর কি ছাই কিছুই ছিল না!

মনে মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি এবং কোথায় ছিল সুরেশ! ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লোকেরই কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না? আবার সেই মিথ্যাটা কি তাহার নিজের মুখ দিয়াই প্রচার হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল? অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? স্বামীকে সে অনেক দুঃখেই পাইয়াছিল, কিন্তু সে সহিল না—তাহার চরম দুর্দশার বোঝা বহিয়া অকস্মাৎ একদিন সুরেশ গিয়া অভিসম্পাতের মত তাহাদের দেশের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহার সুখের নীড় দগ্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্যটাও যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, এ কথা বুঝিতে আর যখন বাকী রহিল না, তখন আবার কেন তাহার পীড়িত স্বামীকে তাহারই ক্রোড়ের উপরে আনিয়া দেওয়া হইল! যাহাকে সে একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল, সেবার ভিতর দিয়া আবার তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি বিধাতার সঙ্কল্প ছিল, তবে আজ কেন তাহার দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-অপমানের আর কূলকিনারা নাই?

অচলা দুই হাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, জগদীশ্বর! রোগমুক্ত স্বামীর স্নেহাশীর্বাদে সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই যদি একদিন আমাকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলে, তবে এতবড় দুর্গতির মধ্যে আবার ঠেলিয়া দিলে কিসের জন্য? সে যে সঙ্কোচ মানে নাই, এত কাণ্ডের পরেও সুরেশকে সঙ্গে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হইবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছিবে না—কিন্তু অন্তর্যামী, আমার অদৃষ্টে তুমিও কি ভুল বুঝিলে? এই বুকের ভিতরটায় চিরদিন কি রহিয়াছে, সে কি তোমার চোখেও ধরা পড়িল না।

পিতার চিন্তা, স্বামীর চিন্তা সে যেন প্রাণপণ-বলে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, আজও সকল ভাবনাকে সে কাছে ঘেঁষিতে দিল না; কিন্তু তাহার মৃণালের কথাগুলো মনে পড়িল, আর মনে পড়িল পিসীমাকে। আসিবার কালে স্নেহার্দ্র করুণ-কণ্ঠে সতী-সাধ্বী বলিয়া তিনি যত আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেই-সব। তাহার সম্বন্ধে আজ তাঁহাদের মনোভাব কল্পনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ মর্মান্তিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত বোধ-শক্তি তাহার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দেহ-মনের সেই অশক্ত অভিভূত অবস্থায় জানালার গায়ের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, এমন সময়

পিছনে মৃদু পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, খালি-গায়ে খালি-পায়ে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়ত সে কিছু বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। ইহাকে দমন করিয়া কথা কহিতে বোধ হয় আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাই পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি করিয়াই গরাদের উপর মাথা রাখিল; কিন্তু যে অশ্রু এতক্ষণ তাহার চোখ দিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে পড়িতেছিল, সে যেন অকস্মাৎ কূল ভাঙিয়া উন্মত্ত-ধারায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, রাত্রির গভীর নীরবতা গৃহের ভিতরে-বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিল। পিছনে দাঁড়াইয়া সুরেশ পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ—সহসা তাহার সমস্ত দেহটা বাতাসে বাঁশপাতার মত কাঁপিতে লাগিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই সে দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অচলা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল, কিন্তু অতি বড় বিস্ময় এই যে, যে লোকটা তাহার এতবড় দুঃখের মূল, তাহার এই ব্যবহারে আজ অচলার উৎকট ঘৃণা বোধ হইল না, বরঞ্চ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, তুমি এ ঘরে এসেচ কেন.

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কণ্ঠস্বরের অভাবেই সে জবাব দিতে পারিল না।

অচলা ধীরে ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, শীতে তোমার হাত কাঁপচে, যাও, খালি-গায়ে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় গে।

সুরেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল- অচলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, তা হলে তুমিও আমার ঘরে এসো।

অচলা মুহূর্তকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল না, আজ নয়। এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল।

এই শান্ত সংযত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঠিক কি ছিল, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অচলা তাহার প্রতি না চাহিয়াই পুনশ্চ কহিল, আমি জেগে আছি জানতে পেরে কি তুমি এ ঘরে ঢুকেছিলে?

সুরেশ আহত হইয়া বলিল, নইলে কি তোমাকে ঘুমন্ত জেনেই ঢুকেছি এই তুমি আশা কর?

আশা! অচলা মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিল। এই তীক্ষ্ণ কঠিন হাসি দীপের অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকেও সুরেশের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসি যেন স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল, ওরে কাপুরুষ! নিদ্রিত রমণীর কক্ষে যে চোরের মত প্রবেশ করিতে নাই, পুরুষের এ মহত্ত্ব কি তুমি আজও দাবী কর? কিন্তু মুখে কোন কথাই কহিল না। ক্ষণেক পরে গবাক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল তোমার শরীর ভাল নেই, আর জেগো না—যাও, শোও গে। বলিয়া সে ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া গায়ের কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আড়ষ্টভাবে সুরেশ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই-একজন দাস-দাসী ব্যতীত দিন পাঁচ-ছয় হইল, বাটীর সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কেবল যাওয়া ঘটে নাই কর্তার। কি একটা জরুরী কাজের অজুহাতে তিনি শেষ-সময়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। এ-কয়দিন রামচরণবাবু নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বড়-একটা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। হঠাৎ আজ প্রত্যূষেই তিনি সাড়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুরমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

শীতের দিনের এমন প্রভাতে তখন পর্যন্ত কেহ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, আহ্বান শুনিয়া অচলা শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই

সুরেশও আর একটা দরজা খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। এই সদ্যনিদ্রোত্থিত দম্পতিকে বিভিন্ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি যে সহসা বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সুরেশ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অচলার চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

রামবাবু সুরেশের দিকে চাহিয়া একটু অনুতাপের সহিত কহিলেন, তাই ত সুরেশ-বাবু, হাঁকাহাঁকি করে অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম বড় অন্যায় হয়ে গেল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল অন্যায় কিছুই নয়। তার কারণ আমি জেগেই ছিলুম, বাইরে থেকে ডেকে কেন ঢাক পিটেও আমার ঘরের শান্তিভঙ্গ করতে পারতেন না। কিন্তু এত ভোরেই যে?

বৃদ্ধ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আজ আমার সুরমা মায়ের ওপর একটু উপদ্রব করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে, বলিয়া একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন আমার পালকি প্রস্তুত এখুনি বার হতে হবে, বোধ করি দুটো-তিনটের আগে আর ফিরতে পারবো না, এই বুড়োটার জন্যে আজ চারটি ডাল ভাত ফুটিয়ে রেখো মা, অত বেলায় এসে যেন না আর আগুন-তাতে যেতে হয়।

এই পরম নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখনও আহার করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এমন কি, সকলের সে ঘরে যাওয়ার পর্যন্ত অধিকার ছিল না, এবং স্বপাক আহার তাঁহার মাঝে মাঝে অভ্যাস ছিল বলিয়াই মেয়েরা বাড়ি ছাড়িয়া দেশে যাইতে পারিয়াছিল। এ-কয়দিন তাঁহার সেই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল কিন্তু আজ অকস্মাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটির উপর ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সে বিস্ময়ে, এবং সকলের চেয়ে বেশী ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

রামবাবু সেই ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, তুমি ভাবছ মা, এ বুড়ো আজ বলে কি! রান্না-খাওয়া নিয়ে যার এত বাছবিচার, অত হাঙ্গামা, তার আজ হলো কি? তা হোক। রাক্ষুসীর হাতে খেতে যখন আপত্তি হয় না তখন তুমিই বা দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিলে অপ্রবৃত্তি হবে কেন? আর হোক ভাল না হোক ভাল, মা, অতখানি বেলায় ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেলতে যেতে পারব না। বলিয়া অচলার নিরুত্তর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভাবচ, এ বুড়োটার মধ্যে হঠাৎ যদি এতবড় ঔদার্যই জন্মে থাকে তবে আমাকে কষ্ট না দিয়ে হিন্দুস্থানী বামুন-ঠাকুরের হাতে খেলেই ত হতো। না গো মা তা হতো না। আজও এ বুড়োর তেমনি গোঁড়ামি, তেমনি কুসংস্কার আছে মরে গেলেও ঐ সন্ধ্যা গায়ত্রীহীন হিন্দুস্থানী মহারাজের অন্ন আমার গলা দিয়ে গলবে না। আর আমার রাক্ষুসী মাকে আর তোমাকে এরই মধ্যে একবার এক করে নিতে পেরেচি সেও সত্য নয় কিন্তু যতই দেখচি আমার মনে হচ্চে এই মা জননীটিও যদি একদিন বেঁধে দেন সে যে আমার অন্নপূর্ণার অন্ন হবে না এ আমি কোনমতেই মানব না। কিন্তু আর ত দেরি করতে পারিনে মা, বাকী যেটুকু বলবার রইল, সেটুকু খেতে খেতেই বলব। আর সেই বলাই তখন সবচেয়ে সত্যিকার বলা হবে। বলিয়া বৃদ্ধ চলিবার উপক্রম করিতেই অচলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে না করিতে যে কথাটা সকলের পূর্বে মুখে আসিয়া পড়িল, তাহাই বলিয়া ফেলিল কহিল কিন্তু আমি ত ভাল রাঁধতে জানিনে। আমার রান্না আপনার ত পছন্দ হবে না।

বৃদ্ধ রামবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন এই কথাটা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল মা?

অচলা কহিল সকলেই কি রাঁধতে জানে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন সকলেই জানে তাই কি আমি বলচি?

অচলা এ কথার হঠাৎ কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশের পক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। অচলার বিবর্ণ মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সে তাহার বেদনা বুঝিল। এই বৃদ্ধের সংস্কার তাঁহার হিন্দু

আচার ভাল হউক, মন্দ হউক, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা যে অচলার অগোচর নাই এবং এই ভদ্র-নারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন কথার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিতেছে না, ইহা তাহার শ্রীহীন পান্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখহাত ধোয়ার অছিলায় দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তা হলে আমি চললুম, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামচরণবাবুও সুরেশের অনুসরণ করিলেন। মুহূর্তকালমাত্র অচলা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরেই নিজেকে জোর করিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়া ডাকিল, একবার শুনুন—

বৃদ্ধ ফিরিয়া দেখিলেন, সুরমা কি যেন বলিতে চাহিয়াও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, আর একটা কথা তোমাকে জানাবার আছে মা। তোমার সঙ্কোচ যখন কোনমতেই কাটতে চাইচে না, তখন—কি জান সুরমা, ছেলেবেলায় আমি ছিলাম পাড়ার মেজদা। তোমার বাপের চেয়ে হয়ত বয়সে ছোটও হব না। তা হলে আমাকে কেন মেজ-জ্যাঠামশাই বলে ডেকো না মা!

এই বৃদ্ধ যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অচলা তাহা জানিত। ভালবাসার এই প্রকাশ্যতায় তাহার চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িল। তাই সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বলবে?

অচলা তেমনি নীরবে ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া এইবার বোধ হয় সে নিজের সমস্ত শক্তিই এক করিয়া শুধু অস্ফুটে বলিল, কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামচরণবাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন, সত্যিকারের, না পাঁচজন কলকাতায় এসে দু'দিন শখ করে যেমন হয়, তেমনি? তারা ব্রাহ্মদের দলে বসে হিন্দুদের কোসে গালাগালি দেয়—তেমন গাল সত্যিকারের ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আনতেও পারে না—তার পরে ঘরে ফিরে সমাজে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মদের নাম করে আবার এমনি গালিগালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিন্দুদের চৌদ্দপুরুষও কখনো উচ্চারণ করতে পারে না। বলি, তেমনি ত মা? তা হয় ত আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

অচলার চোখমুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, কেবলমাত্র কহিল, না, তিনি সত্যিকার ব্রাহ্ম।

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ একটু যেন দমিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তা হলেনই বা বাবা ব্রাহ্ম, মেয়ে ত আর তাঁর খাতক নয় যে, এখন ভয় করতে হবে। বরঞ্চ যাঁর সঙ্গে তুমি ধর্ম ভাগ করে নিয়েচ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ওই সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কর্ম ত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না! কিন্তু তুমি যত ফন্দিই কর না, সুরমা, জ্যাঠামশাইকে আজ আর ফাঁকি দিতে পারচ না। আজ তোমাকে রেঁধে ভাত দিতেই হবে। তাই বাপের শিক্ষার গুণে সেদিন উপোস করতে চাওনি বটে! আজ তার সুদসুদ্ধ উসুল করে তবে ছাড়বো। বলিয়া তিনি পুনরায় চলিয়া যান দেখিয়া অচলা এতক্ষণ পরে তাহার অভিভূত ভাবটাকে একনিমিষে অতিক্রম করিয়া গেল। সুস্পষ্টকণ্ঠে বলিল, আচ্ছা জ্যাঠা-মশাই, আমি ব্রাহ্মমহিলা হলে আপনি আমার হাতে খাবেন না?

বৃদ্ধ বলিলেন, না। কিন্তু সে ত তুমি নও। সে ত তুমি হতে পার না।

অচলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাও যদি হতো, তা হ'লে কি শুধু আমার ধর্মমতটা আলাদা বলেই আমি আপনার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে যেতুম?

বৃদ্ধ বলিলেন, অস্পৃশ্য হবে কেন মা, অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তোমার হাতে খেতে পারতাম না।

এ সম্বন্ধে আজ তাহার অনেক কথাই জানা প্রয়োজন! তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, কেন পারতেন না, সে কি ঘৃণায়?

বৃদ্ধ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিল, বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনার মায়া-দয়া যে কত বড়, তার অনেক সাক্ষী এ পৃথিবীতে আছে জানি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। তবে আপনার মত মানুষের মন যে কেমন করে এত অনুদার হতে পারে, তাই আমি ভেবে পাইনে। আপনি কি করে মানুষকে এমন ঘৃণা করতে পারেন?

বৃদ্ধ অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি ঘৃণা করি? কাকে মা? কখন মা?

অচলা বলিল, যার হাতের ছোঁয়া আপনার অস্পৃশ্য, সেই আপনার ঘৃণার পাত্র—তাকেই আপনি মনে মনে ঘৃণা করেন। আর ঘৃণা যে করেন, তাও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ভুলে গেছেন। আমাদের ওই হিন্দুস্থানী চাকরটার কথা ছেড়ে দিন, পাচকটার হাতের রান্নাও যে কোন মতেই আপনার গলা দিয়ে গলবে না, সেও আপনি নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন। এতে দেশের কত ক্ষতি, কত অবনতি হয়েচে সে ত—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, অচলার উত্তেজনাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার কথা হঠাৎ শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, মা, ঘৃণা আমরা কোন মানুষকেই করিনে। যে নালিশ তুমি করলে, সে নালিশ সাহেবেরা করে—তাদের কাছে তোমার বাবার শেখা—আর তাঁর কাছে তুমি শিখেচ। নইলে মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয়, আমাদেরও ছিল, আজও আছে।

এই সময় নীচে হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতেছিল, বৃদ্ধ সেদিকে এক-মুহূর্ত কান পাতিয়া কহিলেন, সুরমা, খাওয়া জিনিসটা যাদের মধ্যে মস্ত বড় জিনিস, মস্ত ঘটা-পটার ব্যাপার, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। আমাদের ভাতে-ভাত খাওয়াটা তুচ্ছ বস্তু, সেটুকুর আজ একটু যোগাড় করে রেখো—মুখে দিতে দিতে তখন আলোচনা করা যাবে, ঘৃণাটা আমরা কাকে কত করি এবং দেশের অবনতি তাতে কতখানি হচ্চে—কিন্তু গোলমাল বাড়চে—আর নয় মা, আমি চললুম। বলিয়া তিনি একটু দ্রুতবেগে নামিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় অপরাহ্ণবেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যেদিন জানতে পারবেন, আজ আপনার জাত গেছে, সেদিন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্চি।

বৃদ্ধ সস্নেহে মৃদুহাস্যে ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা মা, তাই হবে, বলিয়া আচমন করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ যতক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত অচলা সমস্ত দৃষ্টি দিয়া যেন ওই আওয়াজটাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল, তার পর কখন যে সে শব্দ মিলাইল, কখন যে বাহিরের সংসার তাহার চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া তাহাকে পাথর করিয়া দিল, সে টেরও পাইল না।

অনেকদিনের হিন্দুস্থানী দাসীটি বাংলা কথার সঙ্গে বাঙালীর আচার-ব্যবহার কায়দা কানুনও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, সে কি একটা কাজে এদিকে আসিয়া বহু-মার বসিয়া থাকার ভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল এবং বয়োজ্যেষ্ঠার অধিকারে তাহার শেখা-বাংলা তর্জন-শব্দে বেলার দিকে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না এমনভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই চলিবে?

অচলা চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বেলা আর নাই, শীতের সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। একটা দীপ্তিহীন নিষ্প্রভতা শ্রান্তির মত আকাশের সর্বাঙ্গে ভরিয়া আসিয়াছে, লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল, আমি যে একেবারে সন্ধ্যার পরেই খাব বলে ঠিক করেছি লালুর মা। আজ ক্ষিদে-তেষ্টা এতটুকু নেই।

লালুর মা বিস্মিত হইয়া কহিল, বড়বাবুর খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি খাবে একটু, আগেই যে বললে বহু-মা?

নাঃ—একেবারে রাত্রিতেই খাবো, বলিয়া আর বেশী বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই অচলা ত্বরিতপদে উপরে চলিয়া গেল।

একটু সময় পাইলেই সে উপরের বারান্দায় রেলিং-এর পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিত। আজিকার রাত্রেও সেইরূপ বসিয়াছিল হঠাৎ রামবাবুর চটিজুতার শব্দ পাইয়া অচলা ফিরিয়া দেখিল বৃদ্ধ একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি হাতের হুঁকাটা এককোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা করতে এলাম সুরমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানী বাবাটি ঠিক না এই বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথাটি ঠিক, তর্কটার যা হোক একটা নিষ্পত্তি না করে আজ আর নীচে যাচ্ছিনে।

অচলা বুঝিল এ সেই জাতিভেদের প্রশ্ন, শ্রান্তস্বরে বলিল, আমি তর্কের কি জানি জ্যাঠামশাই!

রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওরে বাস্ রে, তুমি কি সোজা লোকের বেটি নাকি মা! তবে কথাটা নাকি একেবারে মিথ্যে, তাই যা রক্ষা নইলে ও বেলায় ত হেরে গিয়েছিলাম আর কি!

অচলার কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়, সে এই তর্কযুদ্ধ হইতে আত্মরক্ষার একটুখানি ফাঁক দেখিতে পাইয়া কহিল, তা হ'লে আর তর্ক কি জ্যাঠামশাই! আপনারই ত জিত হয়েছে! একটুকু থামিয়া বলিল, যে হেরে গেছে, তাকে আবার দু'বার করে হারিয়ে লাভ কি আপনার?

রামবাবু তৎক্ষণাৎ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে সংসারে তিনি অনেক জিনিস দেখিয়াছেন, সুতরাং, এই অবসন্ন কণ্ঠস্বরও যেমন তাঁহার অগোচর রহিল না, এই মেয়েটি যে সুখে নাই, ইহার মনের মধ্যে কি যে একটা ভয়ানক বেদনা পাঁজার আগুনের মত অহর্নিশি জ্বলিতেছে ইহাও তেমনি এই শ্রান্ত-পাণ্ডুর মুখের উপরে আর একবার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ একটা হাসিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, নাঃ—হলো না খাটল না মা! বুড়ো মানুষ, বকতে ভালবাসি—সন্ধ্যাবেলায় একলাটি প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে তাই ভাবলুম মিথ্যে টিথ্যে বলে মাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে দুটো গল্প করি গে, কিন্তু ছল ধরা পড়ে গেল। বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুঁকাটার জন্য একবার হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

তিনি যে যাইবার জন্য এটি সংগ্রহ করিতেছেন অচলা তাহা বুঝিল এবং নীচে গিয়া একাকী এই বৃদ্ধের যে অনেক দুঃখেই সময় কাটিবে তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাই সে চকিতের ন্যায় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিজেই তাহা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের প্রসারিত হস্তে দিতে দিতে বলিল, আপনি যত খুশি তামাক খাবেন, এইখানে বসে খান কিন্তু এখন উঠে যেতে আপনাকে আমি কিছুতে দেব না।

বৃদ্ধ হুঁকা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে বাপ্ রে একদম অতখানি রাশ টেনে দিও না মা, আখের সামলাতে পারবে না! আমার মুখ-বুজে তামাক খাওয়া যে কি ব্যাপার তা ত দেখনি! তার চেয়ে বরঞ্চ একটু আধটু বলতে দাও যে—

মানুষের দম আটকে না যেতে যায় না জ্যাঠামশাই? আচ্ছা তাই ভাল। কিন্তু কি নিয়ে তর্কটি শুরু করবেন বলুন ত?

রামবাবু মুখ হইতে একগাল ধুঁয়া উপরের দিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, এইবার মুশকিলে ফেললে মা। মহা বক্তার লোককেও এ প্রশ্ন করলে তার মুখ বন্ধ হয়ে আসে যে!

আচ্ছা জ্যাঠামশায়, কোনদিন যদি জানতে পারেন, জোর করে যার হাতে আজ ভাত খেয়েচেন, তার চেয়ে নীচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই তখন কি করবেন? প্রায়শ্চিত্ত? আর শাস্ত্রে যদি তার বিধি পর্যন্ত না থাকে, তা হ'লে?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা হ'লে ত ল্যাঠা চুকেই গেল মা, প্রায়শ্চিত্ত আর করতে হবে না।

কিন্তু আমার উপর তখন কি-রকম ঘৃণাই না আপনার হবে!

কখন মা?

যখন টের পাবেন, আমার একটা জাত পর্যন্ত নেই।

রামবাবু হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের এই কথাটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে মা। আর 'তোমাদের' বলি কেন, জানো সুরমা, আমার নিজের ছেলের মুখ থেকেও এ নালিশ শুনেচি। সে ত স্পষ্টই বলে, এই খাওয়া-ছোঁয়ার বাচ-বিচার থেকেই সমস্ত দেশটা ক্রমাগত সর্বনাশের দিকে তলিয়ে যাচ্চে। কারণ, এর মূলে আছে ঘৃণা, এবং ঘৃণার ভিতর দিয়ে কোন বড় ফল পাওয়া যায় না।

অচলা মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইল। এ বাড়িতেও যে এ-সকল আলোচনা কোন অবকাশ দিয়া পথ পাইতে পারে, এ তাহার ধারণাই ছিল না। কহিল, কথাটা কি তবে মিথ্যে?

রামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কি না, সে জবাব নাই দিলাম মা। কিন্তু সত্যি নয়। শাস্ত্রের বিধিনিয়ম মেনে চলি, এইমাত্র। যারা আরও একটু বেশী যায়—এই যেমন আমার গুরুদেব, তিনি নিজে রেঁধে খান, মেয়েকে পর্যন্ত হাত দিতে দেন না। তাই থেকে কি এই স্থির করা যায়, তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে ঘৃণা করেন!

অচলা জবাব দিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হুঁকাটায় আর গোটা-কতক টান দিয়া বলিলেন, মা, যৌবনে আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েচি। কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, আর কতরকমের লোক, কতরকমের আচার-ব্যবহার, সে-সব নাম হয়ত তোমরা জান না—কোথাও খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আছে, কোথাও বা তার আভাস পর্যন্ত শোনেনি, তবু ত মা, তারা চিরদিন তেমনি অসভ্য, তেমনি ছোট। বলিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় পুনরায় গোটা-দুই নিষ্ফল টান দিয়া বৃদ্ধ শেষবারের মত সেটাকে থামের কোণে ঠেস দিয়া রাখিলেন। অচলা যেমন নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল।

রামবাবু নিজেও খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আসল কথা জান সুরমা, তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েচ। তারা উন্নত, তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু করে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বলতে, ঠিক অমনি করে চলতে না শিখলে আর উন্নতির কোন আশা-ভরসাই নেই।

এই সকল তর্ক-যুক্তি অচলা বাংলা দৈনিক কাগজে অনেক পড়িয়াছে, তাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। হাসিটুকু বৃদ্ধ দেখিলেন, কিন্তু যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে নিজের পুনরাবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিলেন, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে যখন যাই, তখন জানা-অজানা কত লোকের মধ্যে গিয়েই না পড়ি। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার সেখানে নেই, করবার কথাও কখনো মনে হয় না; কিন্তু ঘৃণার মধ্যে এর জন্ম হলে কি এত সহজে সে কাজ পেরে উঠতাম! এই ত আমি কারও হাতেই প্রায় খাইনি, কিন্তু পথের অতিবড় দীন-দুঃখীকেও যে কখনো মনে মনে ঘৃণা করেচি—

অচলা ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে জানিনে জ্যাঠা-মশাই? এত দয়া সংসারে আর কার আছে?

দয়া নয় মা, দয়া নয়,—ভালবাসা। তাদেরই আমি যেন বেশী ভালবাসি। কিন্তু আসল কথা কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষই বা কি, ধীরে ধীরে যখন সে হীন হয়ে যাবে, তখন সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সান্ত্বনা লাভ করে। মনে করে, এই সহজ বাধাটুকু সামলে নিয়েই সে রাতারাতি বড় হয়ে উঠবে। আমাদেরও ঠিক সেই ভাব। কিন্তু যেটা কঠিন, যেটা মূল শিকড়—

কথাটা শেষ করিবার আর সময় পাইলেন না। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই সুরেশকে দেখিতে পাইয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি ত হিন্দু, আপনি ত আমাদের জাতিভেদ মানেন?

সুরেশ থতমত খাইয়া গেল—এ আবার কি প্রশ্ন? যে চোরাবালির উপর দিয়া তাহার পথ চলিয়াছে, তাহাকে প্রতি হাত যাচাই না করিয়া হঠাৎ পা বাড়াইলে যে কোন্ অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইবে, তাহার ত স্থিরতাই নাই। এখানে সত্যটাই সত্য কি না সাবধানে হিসাব

করিতে হয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না। তখন শুষ্ক একটু হাসিয়া দ্বিধা-জড়িতস্বরে কহিল, আমরা কি, সে ত আপনি বেশ জানেন রামবাবু।

রামবাবু কহিলেন, বেশ জানি বলেই ত জানতাম। কিন্তু আপনার গৃহিণীটি যে একেবারে আগাগোড়া ওলট-পালট করে দিতে চাচ্ছেন। বলছেন, জাতি-ভেদের মত এত বড় অন্যায়, এত বড় সর্বনাশকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না, ম্লেচ্ছর অন্ন আহার করতেও তাঁর আপত্তি নেই এবং এ শিক্ষা জন্মকাল থেকে তাঁর ব্রাহ্ম বাবার কাছেই পেয়েছেন। ওঁর হাতে খেয়ে আজ আমার জাত গেছে কি না এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন কি না, এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। আপনি কি বলেন?

সুরেশ নির্বাক্। অচলার মেজাজ তাহার অবিদিতও নয় এবং সেখানে বিদ্রোহের অগ্নি যে অহরহ জ্বলিয়াই আছে, এ খবরও তাহার নূতন নয়। কিন্তু সেই আগুন আজ অকস্মাৎ যে কিজন্য এবং কোথা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে না পারিয়া সে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শুষ্ক হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণেক পরেই আত্মসংবরণ করিয়া পূর্বের মত আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার চেষ্টাটা শুধু হাসিকে আচ্ছন্ন করিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিল মাত্র।

সুরেশ বলিল, উনি আপনাকে তামাশা করচেন।

রামবাবু গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, উচিত না হলেও এ কথা ভাবতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণেও যখন হিন্দুঘরের মেয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করতে চাইলেন না—তুলসী দেওয়ার দিনটাতেও কিছুতে উপবাস করলেন না—ভাল, এ যদি তামাশা হয় ত কিছু কঠিন তামাশা বটে। আচ্ছা সুরেশবাবু, বিবাহ ত আপনার হিন্দু মতেই হয়েছিল?

সুরেশ কহিল, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, তা আমি জানি। অচলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, যদিচ তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে মা, কিন্তু তোমার বাবার ব্রাহ্ম হওয়ায় আর কোন দুঃখ নাই। এমন ব্রাহ্ম আমি অনেক জানি, যাঁরা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন, অল্প-স্বল্প অনাচারও করেন; কিন্তু মেয়ের বিয়ের বেলা আর হিসাবের গোল করেন না। যাক, আমার একটা ভাবনা দূর হ'ল।

কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক বেশী ভাবনা দূর হইয়া গেল সুরেশের। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক বলেছেন রামবাবু, আজকাল এই দলের লোকই বেশি। তাঁরা—

হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কথার মাঝখানেই অচলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন গর্জন করিয়া উঠিল। সে সুরেশের মুখের উপর দুই চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, এত অপরাধের পরেও তোমার অপরাধ বাড়াতে লজ্জা হয় না? আবার তা আমারই মুখের উপরে? তুমি জানো, এ-সব মিথ্যে? তুমি জানো, বাবা ঠক নন, তিনি মনে প্রাণে যথার্থই ব্রাহ্ম-সমাজের। তুমি জানো, তিনি—, বলিতে বলিতেই সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ প্রথমটা থতমত খাইল, কিন্তু ঘাড় ফিরাইয়া বৃদ্ধের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ সেও যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, মিছে কথা কিসের? তোমার বাবা কি হিন্দুঘরে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না? তুমিও সত্যি কথা বলো!

অচলা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বোধ হয় মুহূর্তকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, সে কথা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন? তার হেতু কি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী তুমি নিজেই জানো না? তুমি ঠিক জানো আমি কি, আমার বাবা কি, কিন্তু এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করতে আমার শুধু যে প্রবৃত্তি হয় না তাই নয়, আমার লজ্জা করে। তোমার যা ইচ্ছে হয়, ওঁকে বানিয়ে বল, কিন্তু—আমি শুনতে চাইনে। বল—আমি চললুম। বলিয়া সে একরকম দ্রুতপদেই পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের নিমিত্ত উভয়েই যেন নিশ্চল পাথরের মত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বোধ করি নিতান্তই মনের ভুলে একবার তাঁর হুঁকাটার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু তখনই হাতটা টানিয়া লইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া, একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, আজকাল শরীরটা কেমন আছে সুরেশবাবু?

সুরেশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বেশ আছে; বলিয়াই বোধ হয় সত্য কথাটা স্মরণ হইল, কহিল, বুকে এইখানটায় একটুখানি ব্যথা—কি জানি কাল থেকে আবার বাড়লো না—

রামবাবু বলিলেন, তবেই দেখুন দেখি সুরেশবাবু, এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রি পর্যন্ত কি আপনার বাইরে ঘুরে বেড়ান ভাল?

ঠিক ঘুরে বেড়াই নি রামবাবু! সেই বাড়িটার জন্যে আজ দু'হাজার টাকা বায়না দিয়ে এলুম।

রামবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, নদীর উপর বাড়িটি ভালই। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি হয়ত নিষেধ করতাম। সেদিন কথায় কথায় যেন বুঝে-ছিলাম, সুরেমার এখানে বাস করার একান্ত অনিচ্ছা। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মত নিয়েছেন, না কেবল নিজের ইচ্ছেতেই কিনে বসলেন?

সুরেশ এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া শুধু কহিল, অনিচ্ছার বিশেষ কোন হেতু দেখিনে। তা ছাড়া, বাস করবার মত কিছু কিছু আসবাবপত্রও কলকাতা থেকে আনতে দিয়েছি, খুব সম্ভব কাল-পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

রামবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সহসা কি ভাবিয়া ডাক দিয়া উঠিলেন, সুরমা!

অচলা সাড়া দিল না, কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে নীরবে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার চৌকিতে আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, মা, তোমার স্বামী যে আমাদের দেশে মস্তবড় বাড়ি কিনে ফেললেন। এই বুড়ো জ্যাঠামশাইকে আর ত ফেলে চলে যেতে তুমি পারবে না মা।

অচলা চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, শুধু বাড়ি আর আসবাবপত্র নয়, আমি জানি, গাড়িঘোড়াও আসচে। আর তার চেয়েও বেশী জানি, সমস্তই কেবল তোমারি জন্যে। বলিয়া তিনি সহাস্যে একবার সুরেশ ও একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু সেই গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ হইতে আনন্দের এতটুকু চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। এই অস্পষ্ট আলোকে হয়ত ইহা অপরের ঠিক লক্ষ্য না পাইতে পারিত, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষু তাহা এড়াইল না। তথাপি তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মা, তোমার মতটা—

অচলা এইবার কথা কহিল, বলিল, আমার মতের ত আবশ্যক নেই জ্যাঠামশাই।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সে কি একটা কথা মা! তুমিই ত সব, তোমার ইচ্ছেতেই ত—

অচলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই না, আমার ইচ্ছায় কিছুই আসে-যায় না। আপনি সব কথা বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও আমি পারব না—কিন্তু আর আমাকে দরকার না থাকে ত আমি যাই—

বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না এবং তাহার আবশ্যকও হইল না; সহসা হিন্দুস্থানী দাসী একটা কড়ায় এক কড়া আগুন লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি তাহারই উপর গিয়া পড়িল। রামবাবু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি বেহারাটাকে আনতে হুকুম দিয়েছিলুম, সে আবার আর একজনকে হুকুম দিয়েছে দেখচি। আমার এই ব্যথাটায় একটু—

অগ্নির প্রয়োজনের আর বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইল না, কিন্তু তাহার জন্য ত আর একজন চাই। রামবাবু অচলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে নিমিষে মুখ ফিরাইয়া লইয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার ভারী ঘুম পেয়েছে, জ্যাঠামশাই, আমি চললুম। বলিয়া

উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই তাহার কপাট রুদ্ধ হওয়ার শব্দ আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দাসীর হাত হইতে আগুনের মালসাটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, তা হলে চলুন সুরেশবাবু—

আপনি?

হ্যাঁ, আমিই। এ নতুন নয়, এ কাজ এ জীবনে অনেক হয়ে গেছে; বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে তাহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং মালসাটা ঘরের মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না সুরেশবাবু, না, এ কোনমতেই চলতে পারে না—কোনমতেই না। আমি নিশ্চয় জানচি, কি একটা হয়েচে—আমি একবার আপনার—; কিন্তু থাক সে কথা—যদি প্রয়োজন হয় ত এ বুড়ো আর একবার—, বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন।

সুরেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু ছেলেমানুষের মত প্রথমটা তাহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপর চোখের জল গোপন করিতে মুখ ফিরাইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একটা কোচের উপর সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল এবং সন্নিকটে একখানা চৌকি টানিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাহার পীড়িত বক্ষে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিলেন, এমন সময়ে উভয়েই দ্বার খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, অচলা প্রবেশ করিতেছে। সে বিনা আড়ম্বরে কহিল, রাত অনেক হয়েছে, জ্যাঠামশাই, আপনি শুতে যান।

সেইজন্যেই ত অপেক্ষা করে আছি মা, বলিয়া বৃদ্ধ চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এতক্ষণ দুজনেরই শুধু কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হ'ল বৈ ত নয়! এ-সব কাজ কি আমরা পারি? অচলার প্রতি চেয়ারটা ঈষৎ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, যার কর্ম তাকেই সাজে মা, এই নাও, ব'সো—আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। বলিয়া বৃদ্ধ বিপুল শ্রান্তির ভারে মস্ত একটা হাই তুলিয়া গোটা-দুই তুড়ি দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইলেন, এবং ঘরের বাহির হইয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিতে করিতে সহাস্যে কহিলেন, ঢুলতে ঢুলতে যে হাত-পা পুড়িয়ে বসিনি সেই ভাগ্য, কি বলেন সুরেশবাবু?

সুরেশ কোন কথা কহিল না, শুধু নিমীলিত নেত্রের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া একটা নমস্কার করিল।

অচলা নীরবে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনটি অধিকার করিয়া বসিল এবং সেক দিবার ফ্লানেলটা উত্তপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার ব্যথা হ'লো কেন? কোন্‌খানটায় বোধ হচ্চে?

সুরেশ চোখ মেলিল না, উত্তর দিল না, শুধু হাত তুলিয়া বক্ষের বাম দিকটা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। সে এমনি যে, মনে হইতে লাগিল, বুঝিবা এই নির্বাক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত এমনি নীরবেই সমাপ্ত হইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না। সহসা অচলার ফ্লানেলসুদ্ধ হাতখানা সুরেশ তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। অচলার মুখের উপর উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না; সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল, কেবল কহিল, ছাড়ো, আরও একটু সেক দিয়ে দিই।

সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। একমুহূর্ত পূর্বে যেমন মনে হইয়াছিল, এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এমনি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল,

এই উন্মত্ত নির্লজ্জতার বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই, সর্বদিক সর্বকাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এমনি অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে—কোনদিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

অচলা বাধা দিল না, জোর করিল না; মনে হইল, ইহার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শুধু কেবল তাহার শান্ত মুখখানা একেবারে পাথরের মত শীতল ও কঠোর হইয়া উঠিল। সুরেশের চৈতন্য ছিল না—বোধ হয় সৃষ্টির কঠিনতম তমিস্রায় তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে এ মুখ-চুম্বন করার লজ্জা ও অপমান আজ তাহার কাছে ধরা পড়িতেও পারিত। ধরা পড়িল না সত্য, কিন্তু সুদ্ধমাত্র শ্রান্তিতেই বোধ করি এই উন্মাদনা যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন অচলা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আরও ক্ষণকাল দুজনেরই যখন চুপ করিয়া কাটিল, তখন সুরেশ অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, অচলা, এমন ক'রে আর আমাদের কতদিন কাটবে? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কহিতে লাগিল, তোমার কষ্ট আমি জানি, কিন্তু আমার দুঃখটাও একবার ভেবে দেখ। আমি যে গেলুম।

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে বাড়ি কিনেচ?

সুরেশ বিপুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, সে ত তোমারই জন্য অচলা!

অচলা ইহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, আসবাবপত্র, গাড়ি-ঘোড়াও কি কিনতে পাঠিয়েচ?

সুরেশ তেমন করিয়াই উত্তর দিল, কিন্তু সমস্তই ত তোমারই জন্যে।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। এ-সকলে তাহার কি প্রয়োজন, এ-সকল সে চায় কি না—ওই লোকটার কাছে এ প্রশ্ন করার মত নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কি আছে? তাই এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া মৌন হইয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করিল, রামবাবুর কাছে কি তুমি আমার বাবার নাম করেচ। বাড়ি কোথায় বলেচ?

সুরেশ বলিল, না।

আর কি সেক দেবার দরকার আছে?

না।

তা হলে এখন আমি চললুম। আমার বড় ঘুম পাচ্চে। বলিয়া অচলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আগুনের পাত্রটা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া কবাট বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আজ আর একটা কথা বলে যাও অচলা। তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও? সত্যি বলো?

অচলা কহিল, সে কোথায়?

সুরেশ বলিল, যেখানে হোক। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, কেউ জানে না তেমন কোন দেশে। সে দেশ যত—

আগ্রহে আবেশে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, অচলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে সে একান্ত স্বাভাবিক ও সরল গলায় আস্তে আস্তে জবাব দিল, এদেশেও ত আমাদের কেউ চিনত না। আজও ত আমাদের কেউ চেনে না।

সুরেশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, ক্রমশঃ জানতে পারবে? খুব সম্ভব পারবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা ত অন্য দেশেও আছে?

সুরেশ উল্লাসে চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, তা হলে এখানেই স্থির। এখানেই তোমার সম্মতি আছে, বল অচলা? একবার স্পষ্ট করে বলে দাও—, বলিতে বলিতে কিসে যেন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কিন্তু ব্যগ্র পদ মেঝের উপর দিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অচলা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়া এক ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সুরেশের নূতন বাটীতে অপর্যাপ্ত আসবাব ও সাজসরঞ্জাম কলিকাতা হইতে আসিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া লইবার দিকে

কোন পক্ষেরই কোন গা নাই। একজোড়া বড় ঘোড়া ও একখানা অতিশয় দামী গাড়ি পরশু আসিয়া পর্যন্ত কোন একটা আস্তাবলে সহিস-কোচম্যানের জিম্মায় রহিয়াছে, কেহই খোঁজ লয় না। দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় একদিন দুপুরবেলায় বৃদ্ধ রামবাবু এক হাতে হুঁকা এবং অপর হাতে একখানি নীলরঙের চিঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন।

অচলা রেলিংএর পার্শ্বে বেতের সোফার উপর অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া একখানা বাংলা মাসিকের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, জ্যাঠামশাইকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। রামবাবু চিঠিখানা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও সুরমা, তোমার রাক্ষুসীর পত্র। সে এতদিন তোমাকে লিখতে পারেনি ব'লে আমার চিঠির মুখেই যেমন অসংখ্য মাপ চেয়েছে, তেমনি অসংখ্য প্রণামও করেচে। তাকে তুমি মার্জনা কর। বলিয়া তিনি হাসিমুখে কাগজটুকু তাহার হাতে দিয়া অদূরে একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং নদীর দিকে চাহিয়া একমনে হুঁকা টানিয়া টানিয়া ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া তুলিলেন।

অচলা পত্রখানি আদ্যোপান্ত বার-দুই পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, এ'রা সকলেই তা হলে পরশু সকালের গাড়িতে এসে পড়বেন? পিসীমা কে, জ্যাঠামশাই? আর তাঁর রাজপুত্রবধূ, রাজপুত্র, গারজেন টিউটার—

রামবাবু হাসিয়া কহিলেন, রাক্ষুসী বেটী তামাশা করার একটা সুযোগ পেলে ত আর ছাড়বে না। পিসীমা হলেন আমার বিধবা ছোট ভগিনী আর রাজপুত্রবধূ হলেন তাঁর মেয়ে—ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর স্ত্রী—তা সে যাই বলুক, রাজা-রাজড়ার ঘরই সে বটে। রাজপুত্র হ'লো তার বছর-দশেকের ছেলে—আর শেষ ব্যক্তিটি যে কি, তা ত চোখে না দেখলে বলতে পারিনে মা। হবেন কোন বেশী মাইনের চাকর-বাকর। বড়লোকের ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, এটা-ওটা-সেটা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যুগিয়ে দিয়ে সাবালক-নাবালক উভয় পক্ষের মন রাখেন—এমনি কিছু একটা হবেন বোধ করি। কিন্তু সেজন্যে ত ভাবচিনে সুরমা, আসুন, খান-দান, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় গলাজ্বালা, বুকজ্বালা, দুদিন স্থগিত হয় ত খুব খুশীই হবো; কিন্তু চিন্তা এই যে, বাড়িটি ত আমার ছোট; রাজা-রাজড়ার কথা ভেবে তৈরিও করিনি, ঘরদোরের বন্দোবস্তও তার উপযোগী নয়। সঙ্গে দাস-দাসীও আসবে হয়ত প্রয়োজনের তিনগুণ বেশী। আমি তাই মনে করচি তোমার বাড়িটাকে যদি—

অচলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই জ্যাঠামশাই, তা ছাড়া একলা অত দূরে থাকা কি তাঁদের সুবিধে হবে?

রামবাবু কহিলেন, সময় আছে, যদি এখন থেকেই লাগা যায়। আর জায়গা প্রস্তুত থাকলে কোথায় কার সুবিধে হবে, সে মীমাংসা সহজেই হতে পারবে। সুরেশবাবু ত শোনামাত্রই টমটম ভাড়া করে চলে গেছেন—তোমার গাড়িও তৈরী হয়ে এলো বলে; তুমি নিজে যদি একটু শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিতে পারো মা, আমিও তা হলে সে ফুরসতে জুতো-জোড়াটা বদলে একখানা উড়ুনি কাঁধে ফেলে নিই। তোমার ঘর-সংসারের বিলিব্যবস্থা ত সত্যি সত্যি আমরা পেরে উঠবো না।

অচলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আচ্ছা, আমি কাপড়টা বদলে নিচ্ছি, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়, অস্পষ্টও নয়। আত্মীয় রাজকুমার ও রাজমাতার স্থান-সংকুলান করিতে এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে এবার তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, এ কথা অচলা সহজেই বুঝিল; কিন্তু বুঝা সহজ হইলেই কিছু তাহার ভার লঘু হইয়া ওঠে না। মনের মধ্যে সেটা যতদূর গেল, ততদূর গুরুভার স্টিল রোলারের ন্যায় যেন পিষিয়া দিয়া গেল।

এতদিনের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও কেহ তাহাকে বাটীর বাহির করিতে সম্মত করিতে পারে নাই। মিনিট-পনেরো পরে আজ প্রথম যখন সে নিজের অভ্যস্ত সাজে প্রস্তুত হইয়া শুধু এইজনাই নামিয়া আসিল, তখন চারিদিকের সমস্তই তাহার চক্ষে নূতন এবং আশ্চর্য বলিয়া ঠেকিল, এমন কি আপনাকে আপনিই যেন আর-একরকম

বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড জুড়ি; নব-পরিচ্ছদে সজ্জিত কোচম্যান মনিব জানিয়া উপর হইতে সেলাম করিল; সহিস দ্বার খুলিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ রামবাবু যখন সম্মুখের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন তখন সমস্তটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার আচ্ছন্ন দৃষ্টি গাড়ির যে অংশটার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিল, তাহাই বোধ হইল, এ কেবল বহুমূল্য নয়, এ শুধু ধনবানের অর্থের দম্ভ নয়, ইহার প্রতি বিন্দুটি যেন কাহার সীমাহীন প্রেম দিয়া গড়া।

কঠিন পাথরের রাস্তার উপর চারজোড়া খুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জুড়ি ছুটিল, কিন্তু অচলার কানের মধ্যে তাহা শুধু অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় হয়ত শেষ পর্যন্ত এমন অভিভূত হইয়াই থাকিত, কিন্তু সহসা রামবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া উঠিল। তিনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, মা, ওই তোমার বাড়ি দেখা যায়। লোকজন দাসদাসী সবই নিযুক্ত করা হয়ে গেছে, মোটামুটি সাজানো-গোছানোর কাজও বোধ করি এতক্ষণে অনেক এগিয়ে এলো, শুধু তোমাদের শোবার ঘরটিতে মা, আমি কাউকে হাত দিতে মানা করে দিয়েছি। তাঁর যাবার সময় বলে দিলাম, সুরেশবাবু, বাড়ির আর যেখানে যা খুশি করুন গে, আমি গ্রাহ্য করিনে, শুধু মায়ের ঘরটিতে কাজ করে মায়ের আমার কাজ বাড়িয়ে দেবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি সলজ্জ হাসিমুখের আশায় চোখ তুলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন।

তিনি কেন যে এমন করিয়া থামিয়া গেলেন, অচলা তাহা সেই মুহূর্তেই বুঝিল, তাই যতক্ষণ না গাড়ি নূতন বাংলোর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া এই বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিল।

গাড়ির শব্দে সুরেশ বাহিরে আসিল, দাসদাসীরাও কাজ ফেলিযা অন্তরাল হইতে সভয়ে তাহাদের নূতন গৃহিণীকে দেখিতে আসিল; কিন্তু সে মুখের প্রতি চাহিয়া কেহই কোন উৎসাহ পাইল না।

রামবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীরবে নামিয়া আসিল, সুরেশের প্রতি একবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না; তার পরে তিনজনেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এই নূতন বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতরে-বাহিরে উপরে-নীচে কোথাও যে আনন্দের লেশমাত্র আভাস আছে, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত কোনদিকে চাহিয়া কাহারো চক্ষে পড়িল না।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু ইহার মধ্যে ভুল যে কত বড় ছিল, তাহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বাটী সাজাইবার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এই-সকল অত্যন্ত মহার্ঘ ও অপর্যাপ্ত উপকরণ-রাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া একটি চিন্তা সকলের মনে বার বার ঘা দিতে লাগিল যে, যাহার টাকা আছে সে খরচ করিয়াছে, এ একটা পুরাতন কথা বটে; কিন্তু এ ত শুধু তাই নয়। এ যেন একজনকে আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কাজের ভিড়ের মধ্যে, জিনিসপত্র নাড়ানাড়ির মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা অনেক হইল, চোখাচোখি অনেকবার হইল, কিন্তু সকলের ভিতর হইতেই একটা অনুচ্চারিত বাক্য, অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রহিয়া রহিয়া কেবল এইদিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে লাগিল।

বাড়িটার ধোয়া-মোছার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইতেই সারা বেলাটা গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তিনজনেই যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়িতে আসিযা বসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা ধূসর রঙের খণ্ডমেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদী পার হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া

চলিয়াছিল এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছপালার উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সৌন্দর্য দুচক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে বৃদ্ধ রামবাবু জানালার বাহিরে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যাহারা বৃদ্ধ নয়, প্রকৃতির সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিবারই যাহাদের বয়স, তাহারাই কেবল গাড়ির দুই গদী-আঁটা কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনেকদিন পূর্বেকার একটা স্মৃতি অচলার মনের মধ্যে একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, অনেকদিন পরে আজ আবার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল—যেদিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এমনি গাড়ি করিয়াই ফিরিতেছিল। যেদিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যেদিন এই সুরেশের হাতেই আত্ম-সমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই—বহুকাল পরে কেন যে সহসা আজ সেই কথাটাই স্মরণ হইল, ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরের নিগূঢ় ছবিটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিতে লাগিল।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! এই গাড়ি, ওই বাড়ি ও তাহার কত কি আয়োজন সমস্তই তাহার—সমস্তই তাহার স্বামীর আদরের উপহার বলিয়া একদিন সবাই জানিল; আবার একদিন আসিবে, যখন সবাই জানিবে ইহাতে তাহার সত্যকার অধিকার কানাকড়ির ছিল না—ইহার আগাগোড়াই মিথ্যা! সেদিন লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? অথচ আজিকার জন্য এ কথা কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, ইহার সবটুকুই সুধুমাত্র তাহারই পূজার নিমিত্ত সযত্নে আহরিত হইয়াছে এবং ইহার আগাগোড়াই স্নেহ দিয়া, প্রেম দিয়া, আদর দিয়া মণ্ডিত। এই যে মস্ত জুড়ি দিগ্বিদিক কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া ছুটিয়াছে, ইহার সুকোমল স্পর্শের সুখ, ইহার নিস্তরঙ্গ অবাধ গতির আনন্দ—সমস্তই আজ তাহার! আজ যে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া ওই অগণিত দাসদাসী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্য দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গা-যমুনার মতই পাশাপাশি বহিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকে সে অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি বাটী পৌঁছিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাঁহার সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে চলিয়া গেলে, সে যখন অকস্মাৎ শ্রান্তি ও মাথা-ব্যথার দোহাই দিয়া অত্যন্ত অসময়ে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরের কবাট রুদ্ধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল, তখন একমাত্র লজ্জা ও অপমানই যেন তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপরি অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। সুধুমাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায়?

অথচ যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিনের শয্যা বা তরুমূলবাস কোনটাকেই কাহাকেও কামনার বস্তু বলিতে সে শুনে নাই। সেখানে প্রত্যেক চলাফেরা, মেলামেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; যেখানে হিন্দুধর্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই; সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে,—যাহার প্রত্যেক নরনারীই সংসারের আকণ্ঠ-পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়াই উঠিয়াছে।

তাই এই নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য জিনিসটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ কথাতেও মন তাহার কোন মতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়, অথচ গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই যত সম্পদ, যত উপকরণ—এই দেহটাকে সর্বপ্রকারে সুখে রাখিবার মত যত [illegible] আয়োজন—

আজ অযাচিত তাহার পদতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে অবিশ্রান্ত এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ফেলিতে লাগিল।

অথচ দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চরণ করে, তেমনি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অসম্ভব, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাহাদের অনুরূপ সকল সমাজেই বিধবার আবার বিবাহ হয়, হিন্দু নারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না। তাই জীবন-মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই মন এক স্বামীর জীবিতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই কেননা পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।

বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া রামবাবু ডাকিয়া বলিলেন, জলস্পর্শ না করে শুয়ে পড়লে মা, শরীরটা কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে?

অচলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল, এ যেন তাহার বাবার গলা। রাগ করিয়া অসময়ে শুইয়া পড়িলে ঠিক এমনি উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে তিনি কবাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেন।

এই চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ঠাঁই দিত না, কিন্তু এই স্নেহের আহ্বানকে সে ঠেকাইতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাড়া দিল, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তি এতদিনে অত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বরাবর একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন; এ বাটীতে ইহাদের আজ শেষ দিন মনে করিয়াই বোধ হয় এক নিমিষে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গেলেন। এক হাত অচলার কাঁধের উপর রাখিয়া, অন্য হাতে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত পরেই সহাস্যে বলিলেন, বুড়ো জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দুষ্টামি মা? কিছু হয়নি, এসো, বলিয়া হাত ধরিয়া আনিয়া বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন।

অদূরে আর একটা চৌকির উপর সুরেশ বসিয়াছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিল। কথা ছিল, রাত্রে ধীরে-সুস্থে বসিয়া সারাদিনের কাজ-কর্মের একটা আলোচনা করা হইবে, সে সেইজন্যই শুধু একাকী বসিয়া রামবাবুর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রতিই চাহিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, সুরেশবাবু, আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি ত কোন্ এক বিলিতি বাপের মেয়ে—দিন-ক্ষণ পাঁজি-পুঁথি মানেন না। তখন আপনি নিজে মানুন, না মানুন, বিশেষ যায়-আসে না—কিন্তু আমার এই তিন-কুড়ি বছরের কুসংস্কার ত যাবার নয়! কাল প্রহর-দেড়েকের ভেতরেই একটা শুভক্ষণ আছে—

সুরেশ ইঙ্গিতটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াই প্রশ্ন করিল, কিসের শুভক্ষণ?

রামবাবু ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারিলেন না। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এর পরে কিন্তু সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে পাঁজিতে আর দিন খুঁজে পেলাম না—তাই ভাবছিলাম—

কথাটা এবার সুরেশ বুঝিল বটে, কিন্তু হাঁ-না কোনপ্রকার জবাব দিতে না পারিয়া সভয়ে গোপনে একবার মুখ তুলিয়া অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া আর চোখ নামাইতে পারিল না, দেখিল, সে দুটি স্থির দৃষ্টি তাহারই উপর নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

অচলা শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাল সকালেই ত আমরা ও-বাড়ি যেতে পারি?

বিস্ময়াভিভূত সুরেশের মুখে এই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর কিছুতেই বাহির হইল না। সে শুধু অনিশ্চিত কণ্ঠে কোনমতে এই কথাটাই বলিতে চাহিল যে, সে বাড়ি এখনও সম্পূর্ণ বাস করিবার মত হয় নাই। তাহার মেঝেগুলো হয়ত এখনও ভিজা, নূতন দেয়ালগুলো হয়ত এখনও কাঁচা—হয়ত অচলার কোন একটা অসুখ-বিসুখ, না হয়ত তাহার—

কিন্তু আপত্তির তালিকাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলা একটু যেন হাসিয়াই বলিল, তা হোক গে। যে দুর্দিনে শিয়াল-কুকুর পর্যন্ত তার ঘর ছাড়তে চায় না, সেদিনেও যদি আমাকে অজানা জায়গায় গাছতলায় টেনে আনতে পেরে থাকো ত একটু ভিজে মেঝে, কি একটু কাঁচা দেওয়ালের ভয়ে তোমাকে আমার জন্যে ভেবে সারা হতে হবে না। সেদিন যার মরণ হয়নি সে আজও বেঁচে থাকবে।

রামবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, আপনি একটুও ভাববেন না জ্যাঠামশাই। আমরা কাল সকালেই যেতে পারবো। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারবো না জ্যাঠামশাই, আমরা কালই বিদায় হবো। বলিতে বলিতেই সে কাঁদিয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিজের ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ রামবাবু ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি একবার সুরেশের আনত মুখের প্রতি, একবার ওই অবরুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিয়া কেবলই এই বিফল প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ কি হইল? কেন হইল? কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কিন্তু অন্তর্যামী ভিন্ন এই মর্মান্তিক অভিমানের আর কে উত্তর দিবে।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মলিন আকাশতলে সমস্ত সংসারটাই কেমন একপ্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সজ্জিত গাড়ি দ্বারে দাঁড়াইয়া; কিছু কিছু তোরঙ্গ, বিছানা প্রভৃতি তাহার মাথায় তোলা হইয়াছে; পাঁজির শুভমুহূর্তে অচলা নীচে নামিয়া আসিল এবং গাড়িতে উঠিবার পূর্বে রামবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, মা, বুড়োমানুষের মা হওয়া অনেক ল্যাঠা। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে, আর মাইল-দুই তফাতে পালিয়েই পরিত্রাণ পাবে যেন মনে করো না।

অচলা সজল চক্ষু-দুটি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমি ত তা চাইনে জ্যাঠামশাই!

এই করুণ কথাটুকু শুনিয়া বৃদ্ধের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত মেয়েটি আবার যেন পরিচয়ের বাহিরে কতদূরেই না সরিয়া যাইতেছে। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে কহিলেন, সে কি আমি জানিনে মা। নইলে স্বামী নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্ছ, চোখে আবার জল আসবে কেন? কিন্তু তবুও ত আটকাতে পারলাম না। বলিয়া হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, কাছে ছিলে, রাত্রিদিন উপদ্রব করতাম এখন সেইটে পেরে উঠবো না বটে, কিন্তু এর সুদসুদ্ধ তুলে নিতেও ত্রুটি হবে না, তাও কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো।

সুরেশ পিছনে ছিল, সে আজ এই প্রথম যথার্থ ভক্তিভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, আমার এখানে আপনি সুখে ছিলেন না, সে আমি জানি সুরেশবাবু। নিজের গৃহে এবার এইটেই যেন দূর হয়, আমি কায়মনে আশীর্বাদ করি।

সুরেশ কোন কথাই কহিল না, কেবল আর-একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া গাড়িতে গিয়া বসিল।

রামবাবু আর একদফা আশীর্বাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও একখানা এক্কা আনিতে বলিয়া দিয়াছেন। হয়ত বা বেলা পড়িতে না পড়িতেই গিয়া হাজির হইবেন, কিন্তু তখন রাগ করিলে চলিবে না। এই বলিয়া পরিহাস করিতে গিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

গাড়ি চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ভালই হইল যে, ইহারা সময় থাকিতে চলিয়া গেল। এখানে শুধু যে স্থানাভাব, তাই নয়, তাঁহার বিধবা ভগিনীটির স্বভাবটিও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অপরের নাড়ীর খবর জানিতে তাহার কৌতূহলের অবধি নাই। সে আসিয়াই সুরমাকে কঠিন পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তাহার ফল আর যাহাই হোক, আহ্লাদ করিবার বস্তু হইবে না। এই মেয়েটির কিছুই না জানিয়াও তিনি জানিয়াছিলেন, সে সত্য সত্যই ভদ্রমহিলা। কোন একটা সুবিধার খাতিরে সে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিবে না; সে যে ব্রাহ্ম-পিতার কন্যা, সে যে নিজেও ছোঁয়াছুঁয়ি ঠাকুরদেবতা মানে না, ইহার কোনটাই গোপন করিবে না। তখন এ বাটীতে যে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিতেও হৃদ্‌কম্প হয়। কিন্তু ইহা ত গেল তাঁহার নিজের সুখ-সুবিধার কথা। আরও একটা ব্যাপার ছিল, যাহাকে তিনি নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিতেন না। তাঁহার মেয়ে ছিল না, কিন্তু প্রথম সন্তান তাঁহার কন্যা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে অচলার জননী হইতে পারিত, সুতরাং বয়স বা চেহারার সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধাটা যে তাঁহার কত বড় ছিল, তাহা সেই অচেনা মেয়েটিকে যেদিন পথে পথে কাঁদিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিলেন সেইদিনই টের পাইয়াছিলেন। সেদিন মনে হইয়াছিল, সেই বহুদিনের হারানো সন্তানটিকে যেন হঠাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছেন; এবং তখন হইতে সে ক্ষুধাটা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্তরেও অনুভব করিতেন সত্য, কিন্তু কি যেন একটা গভীর রহস্য এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া তাঁহাদের অগোচরে আছে; তাই থাক—যাহা চোখের আড়ালে আছে, তাহা আড়ালেই থাকুক চেষ্টা করিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া আর কাজ নাই।

একদিন রাক্ষুসী একটুমাত্র আভাস দিয়াছিল যে, বোধ হয় ভিতরে একটা পারিবারিক বিবাদ আছে—বোধ হয় কলহ করিয়া সুরেশবাবু স্ত্রী লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন হঠাৎ যেদিন অচলা আপনাকে ব্রাহ্মমহিলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ সুরেশের কণ্ঠে ইতিপূর্বেই যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল, সেদিন বৃদ্ধ চমকিত হইয়াছিলেন, আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এই গুপ্ত রহস্যের যেন একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, সেদিন নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল, সুরেশ ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করিয়াই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এই বিশ্বাসই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এই বৃদ্ধলোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে গৃহত্যাগ, ইহার সৌন্দর্য, ইহার মাধুর্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারী মুগ্ধ করিত। ইহাকে না জানিয়া প্রশ্রয় দিতে যেন সমস্ত মন তাঁহার রসে ডুবিয়া যাইত। তাই যখনই এই দুটি বিদ্রোহী প্রণয়-অভিমান তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের আকারে প্রকাশ পাইত, তখন অতিশয় ব্যথার সহিত তাঁহার এই কথাটাই মনে হইত, পরগৃহের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সংকুচিত গণ্ডির মধ্যে যে মিলন কেবল ঠোকাঠুকি খাইতেছে, তাহাই হয়ত নিজের বাটীর স্বাধীন ও প্রশস্ত অবকাশে সংসারের অসংখ্য কাজে ও অকাজে শান্তি ও সামঞ্জস্যে স্থিতিলাভ করিবে।

তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছিল, গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীর পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মনে মনে হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, মা, যাবার সময় এই বুড়োটার উপর বড় অভিমান করেই গেলে। ভাবলে, আপনার লোকের খাতিরে জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে না; কিন্তু দু-চারদিন পরে যেদিন গিয়ে দেখতে পাবো, চোখে-মুখে হাসি আর আঁটচে না, সেদিন এর শোধ নেব। সেদিন বলব, এই বুড়োটার মাথার দিব্যি রইল মা, সত্যি করে বল দেখি, আগেকার রাগের মাত্রাটা এখন কতখানি আছে? দেখব বেটি কি জবাব দেয়। বলিয়া প্রশান্ত নির্মল হাস্যে তাঁহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই থালায় সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার হাতের তৈরী এই মিষ্টি যদি না খান জ্যাঠামশাই ত সত্যি সত্যিই ভারী ঝগড়া হয়ে যাবে!

স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করার মাঝে মাঝেও মেয়েটার সেই লুকোইবার চেষ্টাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুড়ার ভারী হাসি পাইতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে ক্ষোভ গতরাত্রি হইতে নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ফিরিবার পথেই কল্পনার স্নিগ্ধ বর্ষণে জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

কাল সকালেই সকলে পৌঁছিবেন, তার আসিয়াছে। সঙ্গে রাজকুমার নাতি এবং রাজবধূ ভাগিনেয়ীর সংস্রবে সম্ভবতঃ লোকজন কিছু বেশী আসিবে। আজ তাঁহার বাটীতে কাজ কম ছিল না। উপরন্তু আকাশের গতিকও ভাল ছিল না। কিন্তু পাছে জল আসিয়া পড়ে, পাছে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে রামবাবু বেলা পড়িতে না পড়িতে এক্কা ভাড়া করিয়া, বকশিশের আশা দিয়া দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পথেই ঝলো হাওয়ার সাক্ষাৎ মিলিল এবং এ বাটীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু কিছু বর্ষণও শুরু হইয়াছে।

অচলা বাহির হইয়া কহিল, এই দুর্যোগের মধ্যে আজ আবার কেন এলেন জ্যাঠামশাই? আর একটু হলেই ত ভিজে যেতেন।

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে ভাবী আনন্দের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বুড়ার মন দমিয়া গেল। এজন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না—কে যেন তাঁহার কল্পনার মালাটাকে একটানে ছিঁড়িয়া দিল। তথাপি মুখের উৎসাহ বজায় রাখিয়া কহিলেন, ওরে বাস রে, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল, জলে ভেজাটাকে সামলাতে পারব, কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র হয়ে চিরটা কাল কে থাকবে মা?

এই দুর্বোধ মেয়েটাকে বুড়া কোনদিনই বেশ ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রির ব্যবহারে ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আজিকার আচরণে যেন একবারে দিশাহারা, আত্মহারা হইয়া গেলেন। সে যে কোনকালে, কোন কারণেই ওরূপ করিতে পারে, তেমন স্বপ্ন দেখাও যেন অসম্ভব। কথা ত মাত্র এইটুকু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ঠিক পাগল হইয়া গিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উপুড় হইয়া হুহু স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, জ্যাঠামশাই কেন আমাকে আপনি এত ভালবাসেন—আমি যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্চি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু এক হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহার্দ্র চিত্ত সেই-সব সামাজিক অনুমোদিত বিবাহের কথা, আত্মীয়স্বজন, হয়ত-বা বাপ-মায়ের সহিত বিদ্রোহ-বিচ্ছেদের কথা, বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগের কথা—এই-সকল পুরাতন, পরিচিত ও বহুবারের অভ্যস্ত ধারা ধরিয়াই যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আর একটা নূতন খাদ খনন করিবার কল্পনামাত্র করিল না। এমনি করিয়া এই নির্বাক্ বৃদ্ধ ও রোরুদ্যমানা তরুণী বহুক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পরে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, এতে আর লজ্জা কি মা! তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার সেই সতীলক্ষ্মী মা, অনেককাল আগে কেবল দুদিনের জন্য আমার কোলে এসেই চলে গিয়েছিলে—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বুকে ফিরে এসেছ—আমি যে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম সুরমা! বলিয়া তাহাকে নিকটবর্তী একটা চেয়ারে বসাইয়া নানারকমে পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই বুঝাইতে লাগিলেন যে, ইহাতে কোন লজ্জা, কোন শরম নাই। যুগে যুগে চিরদিনই ইহা হইয়া আসিতেছে। যিনি সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘর করিতে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ, আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে, আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে যত্নে তুলিয়া লইবে। দেখ দেখি মা, আমার এ আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হইবে না।

এমনি কত-কি বৃদ্ধ মনের আবেগে বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সার যাহা ছিল, তাহা থাক, কিন্তু তাহার ভারে যেন শ্রোতাটির আনত মাথাটি ধীরে ধীরে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। চাপিয়া বৃষ্টি আসিয়াছিল। এমনি সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল, সুরেশ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া কোথা হইতে হনহন করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে।

দেখিবামাত্রই অচলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জল হাত বাড়াইয়া লইয়া অশ্রুজলের সমস্ত চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রামবাবু বুঝিলেন, সুরমা যে-জন্যই হোক, চোখের জলের ইতিহাসটা স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চায়।

সে উপরে উঠিয়া রামবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাবার্তা পরে হবে সুরেশবাবু আমি পালাই নি। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

সুরেশ হাসিয়া কহিল, এ কিছুই না। বলিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল,—জ্যাঠামশায়ের কথাটা শুনতে দোষ কি? এক মাস হয়নি তুমি অতবড় অসুখ থেকে উঠেছ—বার বার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?

তাহার বাক্য ও চাহনির মধ্যে এত বড় ব্যবধান ছিল যে, দুজনেই বিস্মিত হইলেন. কিন্তু এই বিস্ময়ের স্রোতটা বহিতে লাগিল ঠিক বিপরীত মুখে। সুরেশ কোন জবাব না দিয়া নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, আর রামবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেই বাহিরের বারিপাতের আর বিরাম নাই; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বৃষ্টির প্রকোপ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের আকর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রামবাবুর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া অচলা আস্তে আস্তে বলিল, ফিরে যেতে বড় কষ্ট হবে জ্যাঠামশাই, আজ রাত্তিরেই কি না গেলে নয়?

তিনি হাসিলেন, মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিলেন, কষ্টের জন্য না হোক, এই দুর্যোগে এই নূতন জায়গায় তোমাদের ছেড়ে আমি যেতাম না। কিন্তু কাল সকালেই যে ওঁরা সব আসবেন, রাত্রির মধ্যেই আমার ত ফিরে না গেলেই নয় সুরমা। কিন্তু মনে হচ্ছে, এ-রকম থাকবে না, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই কমে আসবে। আমি এই সময়টুকু অপেক্ষা করে দেখি।

এই প্রসঙ্গে কাল যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচনা সংসারের দিকে, সমাজের দিকে, ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য ইহলোক পরলোক কত দিকেই না ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ে এমনি মগ্ন হইয়া রহিলেন যে, সময় কতক্ষণ কাটিল, রাত্রি কত হইল, কাহারও চোখেও পড়িল না। বাহিরে গর্জন ও বর্ষণ উত্তরোত্তর কিরূপ নিবিড়, অন্ধকার কত দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কেহ দৃষ্টিপাত করিল না; এই বৃদ্ধের মধ্যে যে জ্ঞান, যে ভূয়োদর্শন, যে ভক্তি সঞ্চিত ছিল, তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রীটির কাছে তাহা অবাধে উৎসারিত হইতে পাইয়া এই কেবলমাত্র দুটি লোকের নিরালা সভাটিকে যেন মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়া দিল। অচলার শুধু এই চেতনাটুকু অবশিষ্ট রহিল যে, সে এমন একটি লোকের হৃদয়ের সত্য অনুভূতির খবর পাইতেছে, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে একান্তভাবেই লাভ করিয়াছে।

হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া উভয়েই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, মা, রাত অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে—আপনার খাবার কি দিয়ে যাবে?

অচলা চমকিয়া কহিল, বারোটা বাজে? বাবু?

তিনি এইমাত্র খেয়ে শুতে গেছেন।

সে যে সেই গিয়াছে, আর আসে নাই, ইহা শুধু এখনই চোখে পড়িল। অচলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শোবার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। রামবাবু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা, বড় অন্যায় হয়েছে। তোমাকে এমন ধরে রাখলাম যে, তাঁর খাওয়া হ'ল কি না, তুমি চোখে দেখতেও পেলে না। এখন যাও মা তুমি খেতে—

অচলা এ-সকল কথায় বোধ হয় কোন কান দিল না। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, কোচম্যান গাড়ি জুতে ঠিক সময়ে আনেনি কেন?

ভৃত্য কহিল, নূতন ঘোড়া, এই ঝড়-জল-অন্ধকারে বার করতে তার সাহস হয় না।

তা হলে আর কোন গাড়ি আনা হয়নি কেন?

ভৃত্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অর্থ অপরাধ স্বীকার করা নয়, বরঞ্চ প্রতিবাদ করা যে, এ হুকুম ত তাহারা পায় নাই।

রামবাবু উৎকণ্ঠার পরিবর্তে লজ্জা পাইয়াই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, গাড়ির আবশ্যক নেই- না গেলেও ক্ষতি নেই - কেবল প্রত্যুষে স্টেশনে গিয়ে হাজির হতে পারলেই চলবে। আমি রাত্রে কিছুই খাইনে, আমার সে ঝঞ্ঝাটও নেই—শুধু তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুতে যাও মা, কথায় কথায় বড্ড রাত হয়ে গেছে—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। এই বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে নীচে যাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং মিনিট-পনের পরে সে উপরে আসিতে, ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এক মিনিট দেরি নয় মা, তুমি শুতে যাও। আমি এই বসবার ঘরের কোচখানার উপর দিব্যি শুতে পারব, আমার কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা হবে না—শুধু তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।

বৃদ্ধের সনির্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্য-সম বৃদ্ধের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার দ্বারাই পাইয়া আসিয়াছে, সেই লোভেই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কণ্ঠরোধ করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের নির্জন শয়ন-মন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামিহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতর পঙ্কে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়মাল্য পরিয়া তাহাকে কোনমতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

নূতন স্থানে রামবাবুর সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষতঃ মনের মধ্যে চিন্তা থাকায় অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বৃষ্টি থামিয়াছে বটে কিন্তু ঘোর কাটে নাই। চাকরেরা কেহ উঠিয়াছে কিনা, দেখিবার জন্য বারান্দার একপ্রান্তে আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কে যেন টেবিলে মাথা পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, সুরমা, তুমি যে? এত ভোরে উঠেছ কেন মা?

সুরমা একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্ধমৃত নারীদেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা দুটিখানি গরম মুড়ি দিয়া চা খাওয়া শেষ করিয়া কেদারবাবু একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইতে মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন, মা, তোমার এই গরম মুড়ি আর পাথরের বাটির চা'র ভেতরে যে কি অমৃত আছে জানিনে, কিন্তু এই একটা মাসের মধ্যে আর নড়তে পারলুম না।

অচলার সম্পর্কে মৃণাল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, কেন তুমি পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত হও বাবা, তোমার এ—আমি কি সেবা করতে জানিনে?

তোমার এ মেয়ে কি—এই কথাটাই মৃণাল অসাবধানে বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু চাপিয়া গিয়া অন্যপ্রকারে প্রকাশ করিল। তাই বোধ করি, এ ইঙ্গিত কেদারবাবু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁহার সহসা করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, কৈ আর পালাতে ব্যস্ত হই মা! তোমার তৈরী চা, তোমার হাতের রান্না, তোমার এই মাটির ঘরখানি ছেড়ে আমার স্বর্গে যেতেও ইচ্ছা করে না। ওই ছোট্ট জানালার ধারটিতে বসে আমি কতদিন ভাবি মৃণাল, আর দুটো বৎসব যদি ভগবানের দয়ায় বাঁচতে পাই ত কলকাতার মধ্যে থেকে সারা-জীবন ধরে যত ক্ষতি নিজে করেচি, তার সবটুকু পূরণ করে নেব। আর সেই মূলধনটুকু হাতে নিয়েই যেন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কত বড় বেদনাব ভিতর দিয়া তিনি এই কথাগুলি বলিলেন এবং কিরূপ মর্মান্তিক লজ্জায় কলিকাতার আজন্মপরিচিত পল্লী ও বাসভবন ছাড়িয়া, চিরদিনের আশ্রিতসমাজ ত্যাগ করিয়া এই বনের মধ্যে পর্ণ-কুটিরে বাকি দিনগুলো কাটাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, মৃণাল তাহা বুঝিল, এবং সেইজন্যই কোন উত্তর না দিয়া চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এইখানে একটু গোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রায় মাস-খানেক হইল, কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই। মহিমের অসুখের সময় সুরেশের কলিকাতার বাটীতে এই বিধবা মেয়েটির সহিত তিনি প্রথম পরিচিত হন, কিন্তু এখানে তাহার নিজের বাটীতে আসিয়া যে পরিচয় ইহার পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন যেন সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেল। এই বন্ধন হইতেই বৃদ্ধ কোনমতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অন্যত্র কত কাজই না তাঁহার বাকী পড়িয়া আছে।

মহিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার আসার সংবাদ পাইয়াই সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যায। যাবার সময় মৃণাল ধরিয়া রাখিতে টানাটানি করে নাই, কারণ শিশুকাল হইতে সেজদার সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রতি, বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি তাহার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল, অচলার সহিত দেখা করা এখন উচিত নয় বলিয়াই কেবল মহিম এমন করিয়া পলায়ন করিতেছে। সে মনে করিয়াছিল, তাহার পত্র পাইয়া কেদারবাবু কন্যা-জামাতার একটা মিটমাট করিয়া দিতে এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আসিলেন তিনি একাকী।

আজিও পরিষ্কার কিছুই হয নাই, শুধু সংশয়ের বোঝায় উত্তরোত্তর ভারাক্রান্ত দিন-গুলি একটির পর একটি করিয়া নীরবে বহিয়াছে। কেবল উপরের দিকে চাহিয়া একটু বুঝা গিয়াছে যে, আকাশে দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর যদি কোনদিন কাটে ত কাটিতে পারে, কিন্তু তাহার পিছনে অন্ধকারই সঞ্চিত হইয়া আছে, চাঁদের জ্যোৎস্না নাই।

সুরেশের পিসীমা নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রের-জন্য ব্যাকুল হইয়া মৃণালকে পত্র লিখিয়া-ছেন, সে পত্র কেদারবাবুর হাতে পড়িয়াছে। মহিম কোন একটা বড় জমিদার-সরকারের গৃহ-শিক্ষকের কর্ম লইয়াছে জানাইয়া যে সংবাদ দিয়াছে, সে চিঠিখানিও তিনি বার বার পাঠ করিয়াছেন, কোথাও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহার কন্যার উল্লেখমাত্র নাই, তথাপি চিঠি দুখানির প্রতি ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ, দুর্ভাগ্য পিতার কর্ণে কেবল একটা কথাই এক শ'বার করিয়া বলিয়াছে, যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তিই তাঁহার নাই।

অচলা শুধু যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাই নয়, শিশুকালে যখন তাহার মা মরে, তখন হইতে তিনিই জননীর স্থান অধিকার করিয়া বুকে করিয়া এই মেয়েটিকে মানুষ করিয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই মেয়ের গভীর অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ কালি হইয়া আসিতেছিল, অথচ অমঙ্গল যে পথ ইঙ্গিত করিতেছিল, সে পথ সকল পিতার পক্ষেই জগতে সর্বাপেক্ষা অবরুদ্ধ।

গ্রামের দুই-চারিজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত,

কিন্তু তিনি নিজে কখনও সঙ্কোচে কাহারও গৃহে যাইতেন না। মৃণাল অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলিতেন, কাজ কি মা! আমার মত ম্লেচ্ছের কারও বাড়ি না যাওয়াই ত ভাল।

মৃণাল কহিত, তা হলে তাঁরাই বা আসবেন কেন?

বৃদ্ধ এ কথার আর কোন জবাব না দিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন। সেখানে চাষীদের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করিতেন। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা, গৃহস্থালীর কথা, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের কথা—এমনি কত কি আলোচনা করিতে বেলা বাড়িয়া উঠিলে তবে ঘরে ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে চা খাওয়ার পরে এই ছিল তাঁর কাজ।

জন্মকাল হইতে তাঁহারা চিরদিন কলিকাতাবাসী। শহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লী-গ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—আত্মীয়-কুটুম্বও ধর্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব অধিকাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছুই না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন, তাহাও বিচিত্র নয়। যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারাজীবন কাটাইয়া দেয়, শহরের মুখ দেখা যাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি একপ্রকার পশু বলিয়াই জানিতেন এবং সেই সমাজটাকেও বন্যসমাজ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য যখন তাহার তীক্ষ্ন বিষদাঁত দুটো তাঁহার মর্মের মাঝখানে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন যতই এই-সকল লেখাপড়া-বিহীন পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই এক-দিকে যেমন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনিই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাহার ধর্ম তাহার সভ্যতা, তাহার বিধি-বিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন, ইহারা লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে। নীতির মোটা কথাগুলো ইহারা জানে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই, কারণ জগতের সকল ধর্মই যে মূলে এক, এবং তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, এই জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লাও যে একই বস্তু, এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বার বার বলিতে থাকে, ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশী জানি? কিসের জন্য ইহাদের সমাজ, ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি? আর সে দূর এত বড় দূর যে, এই-সব আপন-জনের কাছে আজ একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি।

এমনিধারা মন লইয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা। মৃণাল আসিয়া বলিল, কাল তোমার শরীর ভাল ছিল না বাবা, আজ যেন আবার পুকুরে স্নান করতে যেয়ো না। তোমার জন্যে আমি গরম জল করে রেখেছি।

একেবারে করে রেখেচ। বলিয়া কেদারবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মৃণাল আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়ান, পরনে পট্টবস্ত্র, মুখখানি প্রসন্ন, তাহার সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া যেন অত্যন্ত নির্মল শুচিতা বিরাজ করিতেছে—তাহার প্রতি চোখ রাখিয়া বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন, এ কষ্ট কেন করতে গেলে মা, এর ত দরকার ছিল না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি ত কলকাতার মানুষ, কলের জলই আমার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু তুমি আমাকে এমন আশ্রয় দিয়েছ মৃণাল যে তোমার এঁদো পুকুর পর্যন্ত আমার খাতির না করে পারেনি। ওর জলে আমার কোনদিন অসুখ করে না—আমি পুকুরেই নাইতে যাবো মা।

মৃণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হতে পারবে না। কাল তোমার অসুখ করেছিল, আমি ঠিক জানি, আমি জল নিয়ে আসি গে—তুমি তেল মাখতে বসো। বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হলো, কিন্তু আজ এই কথাটা

আমাকে বল দেখি মৃণাল, পরকে এমন সেবা করার বিদ্যাটা তুমি এটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন করে শিখলে? এমনটি যে আর আমি কোথাও দেখিনি মা!

লজ্জায় মৃণালের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, না, পর নই—আমি তোমার ছেলে। কিন্তু এমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাব আজ দিয়ে তবে যেতে পাবে।

মৃণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি সলজ্জ হাসিমুখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শক্ত কাজ যে, চেষ্টা করে শিখতে হবে? এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বাবা—

তা যাক, বলিয়া কেদারবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছুদিন থেকে ভাবচি মৃণাল। মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখি জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার জো নেই মা! এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও না কোথাও, কোন না কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের এই বিরাট-বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিনরাত ভাবচি। আমি ভাবি এই যে—

কিন্তু তোমার জল যে একেবারে—

থাক না মা জল। পুকুর ত আর শুকিয়ে যাচ্চে না। আমি ভাবি এই যে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শিশুর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথাই শিখে নিচ্ছে, সে ত আর তাঁর খবর নেই! আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্র-তন্ত্রে কানাকড়ির বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তবু যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পাঁশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমন করে কোষাকুষি নিয়ে বসে যাই।

মৃণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধর্ম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে? তাকেও ত দোষ কেউ দিতে পারে না।

কেদারবাবু বলিলেন, কেউ পারে কিনা আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি করতে বসব না। সে ভাল হোক, মন্দ হোক, এ বয়সে তাকে ত্যাগ করবার সামর্থ্য নেই, বদলাবারও উদ্যম নেই। এই রাস্তা ধরেই জীবনের শেষ পর্যন্ত চলতে হবে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি—যখন দেখি, এইটুকু বয়সে এত বড় আত্মবিসর্জন, যিনি স্বর্গে গেছেন, তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠা, তাঁর মাকেই মা জেনে—আচ্ছা, থাক থাক, আর বলব না। কিন্তু আমিও যার মধ্যে মানুষ হয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম মা, তাকেও ত মনে মনে তুলনা না করে থাকতে পারিনে। সমাজ ছাড়া যে ধর্ম, তার প্রতি আর যে আস্থা কোন মতেই টিকিয়ে রাখতে পারিনে মৃণাল।

মৃণাল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যকে যে তিনি এমনি করিয়া নিজের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার উপরেই আরোপ করিবেন, ইহা তাহার কাছে অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল। বলিল, বাবা, ঠিক এমনি করে যখন আমাদের সমাজটাকে দেখতে পাবেন, তখন এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন আমরাও নিজেদের দোষগুলো আপনার কাঁধের বদলে সমাজের কাঁধেই তুলে দিতে ব্যস্ত। আমরাও—

কিন্তু কথাটা শেষ না হইতে কেদারবাবু বাধা দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিন্তু আমি ত ব্যস্ত নই মা! তোমাদের সমাজে থাক না দোষ, থাক না ত্রুটি—কিন্তু তুমি ত আছ। এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও খুঁজে পাব না।

আবার মৃণালের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, এমন করে আমাকে যদি তুমি এক শ'বার লজ্জা দাও বাবা, তা হলে এমনি পালাব যে, কিছুতেই আর আমাকে খুঁজে পাবে না, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে ম্লানমুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আমিও তোমাকে আজ বলে রাখছি মা, এই কাজটিই তোমাকে কিছুতে করতে দেব না। তুমি আমার চোখের মণি, তুমি আমার মা, তুমি

আমার একমাত্র আশ্রয়। এই অনাথ অকর্মণ্য বুড়োটার ভার থেকে ছুটি নেবার দিন যেদিন তোমার আসবে মা, সে হয়ত বেশী দূরে নয়, কিন্তু সে আমাকে চোখে দেখতে হবে না, তাও আমি বেশ জানি। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমার একটা কাজ এখনো বাকী রয়েচে, সেটা মহিমের সঙ্গে দেখা করা। কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্চে, একবার স্পষ্ট করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এমনও ত হতে পারে, সে বেঁচে নেই?

কেন বাবা, তুমি ও-সব ভয় করচ?

ভয়? বৃদ্ধের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কহিলেন, সন্তানের মরণটাই বাপের কাছে সবচেয়ে বড় নয় মা!

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর চেয়েও যে দুর্গতি পিতার চক্ষে বড় হইয়া উঠিযাছে, তাহার আভাসমাত্রেই মৃণাল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন এই সাধ্বী বিধবা মেয়েটির লজ্জাটা যেন ঠিক একটা মুগুরের মত কেদারবাবুর বুকে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাকী চুপ করিয়া নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে তেলের বাটিটা টানিয়া লইলেন।

আজ সকালবেলাটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের কিছু পর হইতেই মেঘলা করিয়া আসিতে লাগিল। কেদারবাবু এই মাত্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পশ্চিমের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়াছিলেন, সম্মুখে একটা পুষ্পিত পেয়ারাগাছ ফুলে ফুলে একবারে ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে অসংখ্য মৌমাছির আনন্দ-কলরবের আর অন্ত নাই। অদূরে লম্বা দড়িতে বাঁধা মৃণালের স্বহস্ত-পরিমার্জিত চিকন পরিপুষ্ট গাভীটি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া চরিয়া ফিরিতেছে এবং তাহার পিঠের উপর দিয়া পল্লীপথের কতকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাবা, তোমার চা-টা এইবার নিয়ে আসি গে?

কেদারবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, এর মধ্যে নিয়ে আসবে মা!

বাঃ—বেলা বুঝি আর আছে?

তিনি একটু হাসিয়া বালিশের তলা হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন, কিন্তু এখনো যে তিনটে বাজেনি মা!

মৃণাল কহিল, নাই বাজলো বাবা তিনটে; ও-বেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া হয়নি।

কেদারবাবু মনে মনে বুঝিলেন, আপত্তি নিষ্ফল। তাই বলিলেন, আচ্ছা আনো। মৃণাল মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, তুমি যে বড় বল, তুমি গরম চিঁড়ে বড্ড ভালবাসো?

কথাটা ত মিছে বলিনে মা!

তবে, তাও দুটি আনি?

তাও আনবে? আচ্ছা আনো গে, বলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জোর করিয়া একটু হাসিলেন। মৃণাল চলিয়া গেলে আবার সেই জানালাটার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াই দেখিলেন, সমস্ত ঝাপসা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; পরক্ষণেই পাঁচ-ছয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপটপ করিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া জামার হাতায় বৃথা জলের রেখা-দুটি মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানি শান্ত এবং সহজ দেখাইবার চেষ্টায় এমার্সনের খোলা বইটা চোখের সুমুখে তাড়াতাড়ি মেলিয়া ধরিলেন।

তাহার পাতার ভিতরে যাই থাক, মনের মধ্যে এই কথাটারই ছাপ পড়িতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য অজ্ঞেয় ব্যাপার এই সৃষ্টিটা! সংসারের দিনগুলা যখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিল, তখনই কি এই দীর্ঘজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সকল আয়োজন বাতিল করিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জন করিবার প্রয়োজন পড়িল; বেশ দেখিতেছি, আমার মানব-

জন্মের সমস্ত অতীতটাই একপ্রকার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—অথচ এ কথা বুঝিতেও ত বাকী নাই, এই সুদীর্ঘ ফাঁকি ভরিয়া তুলিতে এই একটা মাসই যথেষ্ট হইল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মৃণাল পাথর-বাটিতে চা এবং রেকাবিতে চিঁড়ে-ভাজা লইয়া প্রবেশ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া সেগুলি গ্রহণ করিতে করিতে কহিলেন, আজ খাওয়া যে আমার ভাল হয়নি তা এখন টের পাচ্ছি। কিন্তু দেখ মা—

না বাবা, তুমি কথা কইতে শুরু করলে সব জুড়িয়ে যাবে।

কেদারবাবু নীরবে চায়ের বাটিটা মুখে তুলিয়া দিলেন এবং শেষ হইলে নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি এই কামনাই কেবল করি মৃণাল, তুমি আসচে-বারে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাও। বুকে করে মানুষ করার বিদ্যেটা আমার খুব শেখা আছে মা, সেইটে যেন সেবার সারাজীবন ভরে খাটাবার অবসর পাই।

শেষ দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এই ধরনের আলোচনাকেই মৃণাল সবচেয়ে ভয় করিত। তাই তাঁহার অপরিস্ফুট আবেগের প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সহাস্যে কহিল, বা, বেশ ত বাবা, তোমার অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিও যেন একজন হই।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, অনেক নয় মা, অনেক নয়। কেবল তুমি একা—আমার একটি মেয়ে। একলা তুমি আমার সমস্ত বুক জুড়ে থাকবে। এবার যা কিছু তোমার কাছে শিখে যাচ্ছি, সেগুলি আবার একটি একটি করে আমার মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে আবার ঠিক এমনি করে বুড়ো-বয়সে সমস্তটুকু তার কাছ থেকে ফিরে নিয়ে পর-জন্মের পথে যাত্রা করব। বলিয়াই তিনি অলক্ষ্যে একবার চোখের কোণে হাত দিয়া লইলেন।

মৃণাল ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, তুমি কেবল আমাকে অপ্রতিভ কর বাবা! আমি কি জানি বল ত?

এই যে মা আমার খাওয়া হয়নি, আমি নিজে জানলাম না, কিন্তু তুমি জানতে।

ও ত ভারী জানা! যার চোখ আছে, সেই ত দেখতে পায়।

কিন্তু ওই চোখটাই যে সকলের থাকে না মৃণাল! বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি এই দেখে মা, ভগবান কোথায়, কবে আর কি উপায়ে যে মানুষের যথার্থ আপনার জনটিকে মিলিয়ে দেন, তা কেউ জানে না! এর না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন সম্পর্কের বালাই, না আছে সময়ের হিসাব। নিমিষে কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়—কেবল বুক ভরে যখন তাকে পাই, তখনই মনে হয়, এতকাল এতবড় ফাঁকাটা সয়েছিলুম কেমন করে?

মৃণাল আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক কথা বাবা, নইলে তোমার একটা মেয়ে যে এই বনের মধ্যে ছিল, এতদিন ত তার কোন খোঁজখবর রাখোনি।

কেদারবাবু কহিলেন, সাধ্য কি মা রাখি, তিনি যতদিন না হুকুম করেন। আবার হুকুম যখন দিলেন তখন কোথাও এতটুকু বাধল না, কিসে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। আজ লোকে দেখচে, এই ত কেবল একটা মাসের পরিচয়; কিন্তু আমি জানি, এ ত শুধু আমার বাসা-ভাড়ার হিসাব নয় যে, পাঁজির পাতার সঙ্গে এর মাসকাবারি গণনার মিল হবে! এ যেন কত যুগ-যুগান্তকাল ধরে কেবল তোমার ছায়াতেই বসে আছি—এর আবার দিন মাস বছর কি! বলিয়া তিনি আবার একটু থামিলেন।

মৃণাল নিজেও কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে দুঃখের চিতা নীরবে জ্বলিতেছিল, সে যেন কেমন করিয়া নিবিয়া আসিল বলিয়া; এবং ইহারই শেষ আভাসটুকু তাঁহার মুখের উপর যে দীপ্তিপাত করিয়াছে, সেই ম্লান আলোকে কোথাকার কোন্ সুগভীর স্নেহ যেন অসীম করুণায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না, মৃণালের আনতদৃষ্টি মেঝের উপর তেমনি স্থির হইয়া রহিল। এই নীরবতা কেদারবাবুই ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মৃণাল, আমি এক ধর্ম ত্যাগ করে যখন আর এক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তখন বাইরের কাছে না হোক অন্ততঃ নিজের কাছেও একটা জবাবদিহির দায়ে পড়েছি। সেটা এতদিন কোনমতে

এড়িয়ে গেছি বটে, কিন্তু আর বুঝি ঠেকাতে পারিনে। ধর্ম সম্বন্ধে এখন এই কথাটা যেন বুঝতে পারচি—

পলকের জন্য মৃণাল একটুখানি চোখ তুলিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই মা, ভয় নেই, আমি বারংবার তোমার নাম উল্লেখ করে আর তোমাকে সঙ্কোচে ফেলব না, কিন্তু এতকাল পরে এই সত্যটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি যে, লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম-বস্তুটিকে পাবার জো নেই।

মৃণাল তাঁহার অন্তরের বাক্যটি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সে কথা সত্যি হতে পারে বাবা, কিন্তু যে ধর্মটি আমি ভাল বুঝেছি, তাকে গ্রহণ করতে হলেই যে লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি করতে হবে, আমি ত তার কোন প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

কেদারবাবু বলিলেন, আমিও যে ঠিক একদিন পেয়েছিলুম তাও না। কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈ কি মৃণাল। কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ ত আমরা প্রীতির ভেতর দিয়ে, প্রেমের ভেতর দিয়ে করিনে। যাকে ত্যাগ করে যাই, তার সম্বন্ধে সেই যে মন ছোট হয়ে থাকে সে ত কোনকালেই ঘোচে না; সেইজন্যই ত আজ মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকেচি মা। কিন্তু তোমরা যা জন্ম থেকেই আপনা-আপনি অতি সহজেই পেয়েচ সে ভাল হোক মন্দ হোক তাকেই অবলম্বন করে চলেচ। তফাতটা একটু চিন্তা করে দেখ দেখি!

মৃণাল মৌন হইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিবার মত জবাবটা সে সহসা খুঁজিয়া পাইল না।

কেদারবাবু নিজেও মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, মা! আজ অনেকদিনের ভুলে-যাওয়া কথাও ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, কিন্তু এতকাল এরা কোথায় লুকিয়ে ছিল!

মৃণাল চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কার কথা বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, আমারি কথা মা। বড় হবার মত বুদ্ধিও ভগবান দেননি, বড়ও কখনো হতে পারিনি। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে মিশেই কাটিয়েচি, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য হয়ে গেছেন, তাঁদের উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেছি। তাঁদের সেই-সব কতদিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্ছে। তুমি বলছিলে মৃণাল, ধর্মান্তর-গ্রহণের মধ্যে ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষারেষি থাকবেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও ত এতকাল তাই বুঝেচি, তাই বলে বেড়িয়েচি। কিন্তু আজ দেখতে পেয়েছি প্রয়োজন ছিলই। আজ দেখতে পেয়েছি, হিন্দুদের মধ্যে যারা এই বলে অভিযোগ করে যে দেশে-বিদেশে তাদের মাথা আমরা যতখানি হেঁট করে দিতে পেরেছি, ততখানি খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও পেরে ওঠেনি—নালিশটা ত আজ আর তাদের মিথ্যে বলেও ওড়াতে পারিনে মা! বস্তুতঃ, বিদেশী বিধর্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর ত কেউ নেই।

মৃণাল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। বলিতে লাগিলেন, মৃণাল, রেষারেষি যদি নাই-ই থাকবে, তা হলে আমাদের মধ্যে যারা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি, সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শপদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্মের মন্দিরে, ধর্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নাবাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চকণ্ঠে কিসের জন্যে একথা ঘোষণা করবেন যে, দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধা-ঘাটে আসুক। মা ধর্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল-ঠোকায় আমাদের সমাজসুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম শ্রদ্ধায় তেমনি রুক্ষ হয়ে উঠত—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও একতিল কম পড়ত না, কিন্তু আজ জীবনের এই শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে, তা থাক, কিন্তু ধর্মের লেশমাত্রও কোনখানে থাকবার জো ছিল না।

মৃণাল ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল, বাবা, এ-সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্চ? তাঁরা সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার নমস্য! বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল। এই ভক্তিমতী তরুণীর নম্রনত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ যেন বিভোর হইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরে বাহিরে দাসীর আহ্বানে মৃণাল উঠিয়া চলিয়া গেলেও তিনি তেমনি একভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী কেন ডাকিতেছিলেন শুনিয়া খানিক পরে মৃণাল ফিরিয়া আসিতেই কেদারবাবু অকস্মাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, মৃণাল, এমনি পরের দোষ-ত্রুটির নালিশ করতে কি সারা জীবনটা আমার কাটবে? এর থেকে কি কোন কালেই মুক্তি পাব না মা?

মৃণাল কহিল, তোমার মশারির কোণটা একটু ছিঁড়ে গেছে বাবা, একবারটি সরে বসো না, ওটুকু সেলাই করে দি। বলিয়া সে কুলুঙ্গি হইতে সেলাইয়ের ক্ষুদ্র কৌটাটি পাড়িয়া লইতেই বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া একটা মোড়ায় গিয়া বসিলেন এবং ওই কর্মনিরত নির্বাক মেয়েটির আনত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে কোনদিকে মুখ না তুলিয়াই আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া কেদারবাবুর দুই চক্ষু নিতান্ত অকারণেই বারংবার অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ মার্জনা করিতে লাগিলেন।

সেলাই শেষ করিয়া মৃণাল কৌটাটি তাহার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলা তুমি কি খাবে বাবা?

প্রশ্ন শুনিয়া কেদারবাবু হঠাৎ একটা বড়রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার অশ্রুকরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও-বেলায় খাবার কথা ভাববার জন্যে এ-বেলায় ব্যাকুল হবার আবশ্যক নেই মা, সে চিন্তা যথাসময়েই হতে পারবে। কিন্তু তুমি একবার স্থির হয়ে বসো দিকি মা! একটু থামিয়া বলিলেন, এ অপরাধের আজই শেষ। আমার মুখ থেকে আর কখনো কারও নামে অভিযোগ শুনবে না মৃণাল। একটু থামিয়াই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার উপরে তুমি বিরক্ত হয়ো না মা, আমি ঠিক এর জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি।

তাঁহার সজল কণ্ঠস্বরে মৃণাল চকিত হইয়া বলিল, অমন কথা তুমি কেন বললে বাবা, আমি কি কোনদিন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েচি!

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, কখনো না মা, কখনো না। তুমি আমার মা কিনা, তাই এই বুড়ো ছেলের সকল অত্যাচার-উপদ্রবই সস্নেহে হাসিমুখে সয়ে আসচ। কিন্তু এতকাল পরে যে সত্যটা আজ বুকের রক্ত দিয়ে পেয়েচি, তাকেই কেবল তোমাকে দেখাতে চেয়েচি মৃণাল, পরের নিন্দা-গ্লানি করতে চাইনি। আজ যেন নিশ্চয় জানতে পেরেছি, ধর্ম জিনিসটাকে একদিন যেমন আমরা দল বেঁধে মতলব এঁটে ধরতে চেয়েছি, তেমন করে তাকে ধরা যায় না। নিজে ধরা না দিলে হয়ত তাকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মূর্তিতে যেদিন মানুষের চরম বেদনার উপর পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান, তখন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারা চাই। একটুকু ভুলভ্রান্তির ভর সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরে যান। কিন্তু, তার মত দুর্ভাগ্য আমার অতিবড় শত্রুর জন্যেও আমি কামনা করতে পারিনে মৃণাল।

যে প্রসঙ্গকে মৃণাল ক্রমাগত বাধা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, এ যে তাহারই ইঙ্গিত, ইহা অনুভব করিয়াই তাহার সঙ্কোচ ও বেদনার অবধি রহিল না, কিন্তু আজ আর সে যে-কোন একটা ছুতা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল না, নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ক্রমান্বয়ে বাধা পাইয়া কেদারবাবুর নিজের দৃষ্টিও এদিকে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু তিনিও কোন খেয়াল করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, মা, এ কথা বার বার বলেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না যে, তুমি ছাড়া এত বড় সংসারে আমার আপনার জন আর কেউ কোনদিন ছিল না; তাই বুঝি আমার শেষ-জীবনের সমস্ত বোঝা সমস্ত ভাল-মন্দ কি করে জানিনে, তোমার উপরে এসেই স্থিতিলাভ করেচে। যিনি সকল বিধি-ব্যবস্থার মালিক, এ তাঁরই ব্যবস্থা, আমি অসংশয়ে বুঝে নিয়েচি বলেই আর আমার কোন লজ্জা, কোন কুণ্ঠা নেই। গলগ্রহ বলে প্রথম আমার ভারী বাধ-বাধ ঠেকেছিল, কিন্তু আজ আমার মন থেকে তার সমস্ত বালাই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মৃণাল মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। কেদারবাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তবু কেমন বাধে মৃণাল, তবু কেমন গলা দিয়ে কথাটা কিছুতে বার হতে চায় না।

তবে থাক না বাবা—নাই বললে আজ তেমন কথা।

কেদারবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, আর থাকবে না—আর থাকলে চলবে না, আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সে সুরেশের সঙ্গেই—

এ সংশয় মৃণালের নিজের মনেও বহুবার ঘা দিয়া গিয়াছে, তাই সে শুধু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বহিয়া গেল, কেদারবাবু প্রবল চেষ্টায় যেন আপনাকে আপনি পরাভূত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, একবার মহিমের কাছে যেতে চাই মৃণাল, একটিবার তার মুখের কথা শুনতে চাই—শুধু এরই জন্যে আমার বুকের মধ্যেটা যেন অনুক্ষণ হুহু করে জ্বলে যাচ্চে। কিন্তু একাকী গিয়ে তার কাছে আমি কেমন করে দাঁড়াব?

মৃণাল তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া তাহার সকরুণ চক্ষু-দুটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের লজ্জিত ভীত মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, কেন বাবা তুমি একলা যাবে—যদি যেতেই হয় ত আমরা দুজনেই একসঙ্গে যাবো।

সত্যি যাবে মা?

যাবো বৈ কি বাবা। তা ছাড়া, তোমাকে একলা আমি ছেড়েই বা দেব কেন? তুমি যেখানেই যাও না, আমি সঙ্গে না গিয়ে কিছুতেই ছাড়ব না, তা বলে রাখচি। আমাকে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না বাবা, আমি কোথাও একটু বেড়াতে পাইনে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কোন কথা কহিলেন না, কেবল দুই করতল মুখের উপর চাপা দিয়া নিজের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া গেল, এই শুষ্ক শীর্ণ দেহখানির একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভেতরের অব্যক্ত বেদনায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃণাল নিঃশব্দে তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল, একটি কথা, একটি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ পর্যন্ত করিল না। একমাত্র কন্যার ঘৃণ্যতম দুর্গতিতে যে পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার তাহার কি-ই বা ছিল।

এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে পরে বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, মা!

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া মৃণালের বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু সে প্রাণপণে অশ্রু নিরোধ করিয়া সাড়া দিল, কেন বাবা?

সংসারে ব্যথার পরিমাণ যে এত বড়ও হতে পারে, এ ত কখনো ভাবিনি মৃণাল। এর থেকে পরিত্রাণের কি কোথাও কোন পথ নেই? কেউ কি জানে না?

কিন্তু বাবা, লোকে মৃত্যুর শোকও ত সহ্য করতে পারে!

কেদারবাবু বলিলেন, আমার পক্ষে সে মৃত, এই ত তুমি বলচ মা! এক হিসাবে তাই বটে। অনেকবার আমার মনেও হয়েছে—কিন্তু মৃত্যুর শোক যেমন বড়, তার শান্তি, তার মাধুর্য তেমনি বড়। কিন্তু সে সান্ত্বনার উপায় কৈ মৃণাল? এর দুঃসহ গ্লানি, অসহ্য লজ্জা আমার বুকের পথ জুড়ে এমনি বেধে আছে যে কোথাও তাদের নাড়িয়ে রাখবার এতটুকু ফাঁক নেই। বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বুকের উপর হাতখানি পাতিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, সন্তানের মৃত্যু যিনি দেন, তাঁকে আমরা এই বলে ক্ষমা করি যে, তাঁর কার্যকারণ আমরা জানিনে! আমরা—

মৃণাল হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, আমরাও তা হলে তাই করতে পারি? যে কেউ হোক না, যার কার্যকারণ আমাদের জানা নেই, তাকে মাপ করতেই যদি না পারি, অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার করে তাকে অপরাধী করে রাখব না।

বৃদ্ধ ঠিক যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি অপরের মুখের প্রতি একাগ্র করিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মৃণাল সলজ্জমুখে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, তা ছাড়া আমি সেজদার কাছেই শুনেচি বাবা, যে, সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে করলে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

কেদারবাবু উত্তেজনায় সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এ অপরাধও কি কেউ কোনদিন মাপ করতে পারে মৃণাল?

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি তেমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, কখনও নয়,

কখনও নয়। বাপ হয়ে তার এ দুষ্কৃতি আমি কোনমতেই ক্ষমা করব না। ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়—এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলে দিলাম।

মৃণাল ধীরে ধীরে বলিল, যোগ্য অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা, তাকে ক্ষমা বলা চলে না। তা ছাড়া ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায়, যে ক্ষমা করে, সে কি কিছুই পায় না বাবা?

বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মেয়েটির এই শান্ত স্নিগ্ধ কথাগুলি একমুহূর্তেই তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এমন করে ত আমি ভেবে দেখিনি মৃণাল! তোমার কাছে আজ যেন আবার এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলুম মা। ঠিক কথাই ত। যে গ্রহণ করে, লাভের খাতায় তাকে কি কেবল ষোল-আনা উসুল দিয়ে দাতার অঙ্কে শূন্য বসাতে হবে? এমন কিছুতেই সত্য হতে পারে না। ঠিক ঠিক! কার অপরাধ কত বড়, সে বিচার যার খুশি সে করুক, আমি ক্ষমা করব কেবল আমার পানে চেয়ে! এই না মা তোমার উপদেশ?

কেন বাবা, এই-সব বলে আমার অপরাধ বাড়াচ্চ?

তোমার অপরাধ? সংসারে তারও কি স্থান আছে মা?

মৃণাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ বুঝি মা আমাকে আবার ডাকচেন—আমি এখনি আসচি বাবা। বলিয়া সে দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মৃণাল উঠিয়া গেল, কিন্তু কেদারবাবু সেদিকে আর যেন লক্ষ্যই করিলেন না। কেবল নিজের কথার সুরে মগ্ন থাকিয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন, আমি বাঁচিলাম! আমি বাঁচিলাম মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে। দুর্গতির দুর্গম অরণ্যে যখন দু'চক্ষু বাঁধা, মৃত্যু ভিন্ন আর যখন আমার সমস্ত রুদ্ধ, তখন হাতের পাশেই যে মুক্তির এত বড় রাজপথ উন্মুক্ত ছিল, এ খবর তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারিত! ক্ষমার কথা ত কখনো ভাবিতেই পারি নাই। যদি কখনো মনে হইয়াছে, তখনি তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া সজোরে সগর্বে ইহাই বলিয়াছি, না, কদাচ না! মেয়ে হইয়া এত বড় অপরাধ যে করিতে পারিল, বাপ হইয়া এত বড় দান তাহাকে কোনমতেই দিতে পারি না। কিন্তু ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে কৃপণ, পিতা হইয়া যাহা তুই দিতে পারিস না, অপরে তাহা দিবে কি করিয়া? আর সে তোর কতটুকু বা লইয়া যাইবে? তোর ক্ষমার সবটুকু যে তোর আপন ঘরেই ফিরিয়া আসিবে। তোর মৃণাল-মায়ের এই তত্ত্বটাকে একবার দু'চক্ষু মেলিয়া দেখ্। বলিয়া তিনি ঠিক যেন কিছু একটা দেখিবার জন্যই দু'চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে প্রাণপণ-বলে কহিতে লাগিলেন, আমি ক্ষমা করিলাম, আমি ক্ষমা করিলাম! সুরেশ, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। অচলা, তোমাকেও ক্ষমা করিলাম! পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ যে-কেহ যেখানে আছ আমি সকলকে ক্ষমা করিলাম! আজ হইতে কাহারো বিরুদ্ধে আমার কোন অভিমান, কোন নালিশ নাই, আজ আমি মুক্ত, আজ আমি স্বাধীন, আজ আমি পরমানন্দময়! বলিতে বলিতেই অনির্বচনীয় করুণায় তাঁহার দু'চক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং হাত-দুটি একত্র করিয়া ধীরে ধীরে ক্রোড়ের উপর রাখিতেই সেই নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত হইতে পিতৃস্নেহ যেন অজস্র অশ্রুধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর কম্পিত ওষ্ঠাধর-দুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা! মা! তুই কোথায় আছিস—একবার কেবল ফিরিয়া আয়! আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি—মা, তোর সমস্ত অপরাধ, সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা লইয়াই আর একবার পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া আবার তেমনি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না, শুধু তুই আর আমি—

বাবা!

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়া মৃণালের মুখের পানে চাহিলেন, বোধ করি, একবার আপনাকে সংবত করিবার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালকের মত আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—মা! মা! আমার বুক ফেটে গেল। সবাই তাকে কত দুঃখ, কত ব্যথাই না দিচ্চে! আর আমি পারি না!

মৃণাল কিছুই বলিল না, শুধু কাছে আসিয়া তাঁহার ভূলুণ্ঠিত মাথাটি নীরবে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহার নিজের দুচোখ বাহিয়াও জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম ফাল্গুনের এই মেঘ-ঢাকা দিনটি হয়ত এমনিভাবেই শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ কেদারবাবু চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন, মৃণাল, মহিমকে চিঠি লিখলে কি জবাব পাওয়া যাবে না?

কেন যাবে না বাবা? আমার ত মনে হয় কাল-পরশুর মধ্যেই তাঁর উত্তর পাবো।

তুমি কি তাঁকে কিছু লিখেছ?

মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চিঠিতে কি লেখা হয়েছে, এ কথা বৃদ্ধ সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাইরে দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন, এখনো খানিক বেলা আছে, আমি একটু ঘুরে আসি। বলিয়া তিনি গায়ের কাপড়খানি টানিয়া লাঠিটি হাতে করিলেন, কিন্তু দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখ মা—

কি বাবা?

আমি ভয় করচি—না, ভয় ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবচি যে—

কিসের বাবা?

কি জানো মা, আমি ভাবচি—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর মৃণাল, আমরা যেতে চাইলে মহিম আপত্তি করবে?

এই ভয় এবং ভাবনা দুই-ই মৃণালের যথেষ্ট ছিল এবং মনে মনে ইহার জবাবটাও সে একপ্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, এখন সে খোঁজে আমাদের কাজ কি বাবা? তাঁর ঠিকানা জানলেই আমরা চলে যাবো—তার পরে সেজদা যখন আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, তখন দুনিয়ায় জানবার মত অনেক কথা আপনি জানা যাবে বাবা। সে অন্য কাউকে প্রশ্ন করতে হবে না।

কেদারবাবু মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, তা হলে সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মৃণাল কহিল, সত্যি। কিন্তু আমি ত তোমার সঙ্গে যাবো না বাবা, বরঞ্চ তুমিই আমার সঙ্গে যাবে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ আবার একটা কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ঠিক এমনি এক ফাল্গুনের অপরাহ্ণবেলায় এই বাঙলা দেশের বাহিরে আরও দুটি নর-নারীর চোখের জল সেদিন এমনি অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছিল; সুরেশ যখন শিলমোহর-করা বড় খামখানি অচলার হাতে দিয়া কহিল, এতদিন দিই দিই করেও এ কাগজখানি তোমার হাতে দিতে আমার সাহস হয়নি, কিন্তু আজ আমার আর না দিলেই নয়।

অচলা খামখানি হাতে লইয়া দ্বিধাভাবে কহিল, তার মানে?

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, দুনিয়ায় আমার সাহস হয় না, এমন ভয়ঙ্কর আশ্চর্য বস্তু আবার কি ছিল, এ ত তুমি ভাবচো? ভাবতে পারো—আমিও অনেক ভেবেচি। এর মানে যদি কিছু থাকে, একদিন তা প্রকাশ পাবেই। কিন্তু অনেক অপমান, অনেক দুঃখের বোঝাই ত সংসারে তুমি আমার কাছে অর্থ না বুঝেই নিয়েচ—একে তেমনি নাও অচলা।

অচলা শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এর মধ্যে কি আছে?

সুরেশ হাতজোড় করিয়া কহিল, এতদিন যা কিছু তোমার কাছে পেয়েছি, ডাকাতের

মত জোর করেই পেরেছি। কিন্তু আজ শুধু একটি জিনিস ভিক্ষে চাইচি এ কথা তুমি জানতে চেয়ো না।

অচলা চুপ করিয়া রহিল, ইহার পরে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে পর্দার আড়াল হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবুজী, এক্কাওয়ালা বলচে, আর দেরী করলে পৌঁছুতে রাত্রি হয়ে যাবে। পথে হয়ত ঝড়বৃষ্টিও হতে পারে।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, আজ আবার তুমি কোথায় যাবে? এমন সময়ে?

সুরেশ হাসিমুখে সংশোধন করিয়া কহিল, অর্থাৎ এমন অসময়ে। যাচ্ছি ওই মাঝুলিতেই। প্লেগের ডাক্তার কিছুতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ গ্রামগুলো একেবারে শ্মশান হয়ে পড়েচে। এবার পাঁচ-সাত দিন থাকতে হবে—আর কে জানে, হয়ত একেবারেই বা থেকে যেতে হবে। বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অচলা স্থির হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিজেও কিছু কিছু সংবাদ জানিত; সাত-আট ক্রোশ দূরে কতকগুলো গ্রাম যে সত্যই এ বৎসরে প্লেগে শ্মশান হইয়া যাইতেছে, এ খবর সে শুনিয়াছিল। শহর হইতে এতদূরে এই ভীষণ মহামারীতে দরিদ্রের চিকিৎসা করিতে যে চিকিৎসকের অভাব ঘটিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। সুরেশ বহু টাকার ঔষধ-পথ্য যে গোপনে দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, ইহাও সে টের পাইয়াছিল; এবং নিজেও প্রায় ভোরে উঠিয়া কোথাও-না-কোথাও চলিয়া যায়। ফিরিতে কখনো সন্ধ্যা, কখনো রাত্রি হয়—পরশু ত আসিতে পারে নাই, কিন্তু সে যে বাড়ি ছাড়িয়া, তাহাকে ছাড়িয়া, একেবারে কিছুদিনের মত সেই মরণের মাঝখানে গিয়া বাস করিবার সংকল্প করিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাই কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সে কেবল নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এই যে মহাপাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপ-পুণ্য মানে না, যে কেবলমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এত বড় সর্বনাশ অবলীলাক্রমে সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি সে যখনই চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণার বিষ হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তাহারই পানে চাহিয়া সমস্ত অন্তর তাহার বিষে নয়, অকস্মাৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ওই লোকটির ওষ্ঠের কোণে তখনও একটুখানি হাসির রেখা ছিল—অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু সেইটুকু হাসির মধ্যেই যেন অচলা বিশ্বের সমস্ত বৈরাগ্য ভরা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। মুখে তাহার উদ্বেগ নাই, উত্তেজনা নাই, এই যে মৃত্যুর মধ্যে গিয়া নামিয়া দাঁড়াইতে যাত্রা করিয়াছে—তথাপি মুখের উপর শঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই। তবে এই নিরীশ্বর ঘোর স্বার্থপরের কাছেও কি তাহার নিজের প্রাণটা এতই সস্তা! সংসারে ভোগ ছাড়া যে লোক আর কিছুই বুঝে না—ভোগের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মগ্ন রহিয়াও কি বাঁচিয়া থাকাটা তাহার এমনি অকিঞ্চিৎকর, এমনি অবহেলার বস্তু যে, এতই সহজে সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে এক নিমিষে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল? হয়ত না ফিরিতেও পারি! ইহা আর যাহাই হোক, পরিহাস নয়। কিন্তু কথাটা কি এতই সহজে বলিবার?

অকস্মাৎ ভিতরের ধাক্কায় সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল; হাতের কাগজখানা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, এটা কি তোমার উইল?

সুরেশও প্রশ্ন করিল, যা এইমাত্র ভিক্ষে দিলে অচলা, তাই কি তবে ফিরে নিতে চাও?

অচলা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আমি জানতে চাইনে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে দিতে পারবো না।

কেন?

কত তুচ্ছ এবং কতই না সহজ. ইহাকে যে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার একটিমাত্র সাক্ষী আজও আছে, সে কেবল মহিম। আজিকার এই যাত্রাই যদি তাহার মহাযাত্রা হয় ত সেই সঙ্গীহীন একান্ত নীরব মানুষটিই কেবল মনে মনে বুঝিবে, সুরেশ লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, ঘৃণায় নয়-- ইহকাল-পরকাল কোন কিছুর আশাতে প্রাণ দেয় নাই, সে মরিয়াছে শুধু কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।

চোখ-দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু সংবরণ করিয়া ফেলিল। বরঞ্চ মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি কারও জন্যেই মরতে চাইনে অচলা! চুপ করে নিরর্থক বসে বসে আর ভাল লাগে না, তাই যাচ্ছি একটু ঘুরে বেড়াতে। মরব কেন অচলা, আমি মরব না।

তবে এ উইল কিসের জন্য?

কিন্তু এটা যে উইল, সে ত প্রমাণ হয়নি।

না হোক, কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?

চলেই যে যাবো, আর যে ফিরব না, সেও ত স্থির হয়ে যায়নি!

যায়নি বৈ কি! এই বিদেশে আমাকে একেবারে নিরাশ্রয় করে তুমি—বলিয়াই অচলা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরেশ উঠিতে গিয়াও বসিয়া পড়িল। একটা অদম্য আবেগ জীবনে আজ সে এই প্রথম সংযত করিয়া লইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, অচলা, আমি ত তোমার সঙ্গী নই। আজও তুমি একা, আর সেদিন যদি সত্যিই এসে পড়ে ত তখনও এর চেয়ে তোমাকে বেশী নিরাশ্রয় হতে হবে না।

অচলার চোখ দিয়া জল পড়িতেই ছিল: সেই অশ্রুভরা দু'চক্ষু তুলিয়া সুরেশের মুখের প্রতি নিবন্ধ করিল, কিন্তু ওষ্ঠাধর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার পরে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সেই কম্পন নিবারণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, আমার কাছে আর তুমি কি চাও, আর আমার কি আছে? এবং বলিতে বলিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক্কাওয়ালা—

আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে সবুর করতে বল।

অনতিবিলম্বে সহিস আসিয়া জানাইল যে, গাড়ি তৈরী হইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ি কেন?

সহিস যাহা কহিল, তাহাতে বুঝা গেল, মাইজি ও-বাড়িতে বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু দাসী বলিতেছে, ঘরের দরজা বন্ধ এবং অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, ইহাই সে জানিতে চায়।

আচ্ছা, সবুর কর।

এ ঘরের ভিতরের দিকের কবাটটা খোলাই ছিল, ইহারই পর্দা সরাইয়া সুরেশ নিঃশব্দে তাহাদের শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তেমনি নিঃশব্দে অদূরে একটা চৌকির উপর উপবেশন করিল। এ কক্ষ তাহাদের দু'জনের, এখানে সে অনধিকার প্রবেশ করে নাই, কিন্তু ওই যে প্রশস্ত শুভ্র-সুন্দর শয্যার উপর সুন্দরী নারী উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে, উহার কোনটাই আজ তাহার মনকে সম্মুখে আকর্ষণ করিল না, বরঞ্চ পীড়ন করিয়া পিছনে ঠেলিতে লাগিল। তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই, সে কাঁদিতেই লাগিল এবং তাহারই প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টি রাখিয়া সুরেশ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুদিন হইতে নিজের ভুল তাহার কাছে ধরা পড়িতেছিল, কিন্তু ওই লুণ্ঠিত দেহলতা, ওই বেদনা—ইহার সম্মিলিত মাধুর্য তাহার চোখের ঠুলিটাকে যেন এক নিমিষে ঘুচাইয়া দিল। তাহার মনে হইল, প্রভাত-রবিকরে পল্লবপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনিই করিয়াছে। সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না; যে প্রস্রবণ বাহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা, তাই স্থূলটার প্রতি সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে

নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যেই তাহার পাওয়াটা আপনা-আপনি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আজ তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ একমুহূর্তে চূর্ণ হইয়া গেল। প্রাপ্তির সে অদৃশ্য ধরা হইতে বিচ্যুত করিয়া পাওয়াটা যে কত বড় বোঝা, এ যে কত বড় ভ্রান্তি, এ তথ্য আজ তাহার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিল। শিশিরবিন্দু মুঠার মধ্যে যে কি করিয়া একফোঁটা জলের মত দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠে, অচলার পানে চাহিয়া চাহিয়া সে কেবল এই সত্যটাই দেখিতে লাগিল। হায় রে, পল্লবপ্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কি করিয়া?

অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া ফেলিয়া ডাকিল, অচলা!

অচলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তেমনি নীরবে পড়িয়া রহিল। সুরেশ বলিল, তোমার গাড়ি তৈরি, আজ তুমি রামবাবুদের ওখানে বেড়াতে যাবে?

তথাপি সাড়া না পাইয়া বলিল, যদি ইচ্ছা না থাকে ত আজ না হয় ঘোড়া খুলে দিক। আমিও বোধ হয় আজ আর বার হতে পারব না। এক্কা ফিরিয়ে দিতে বলে দিই গে। বলিয়া সে বসিবার ঘরে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তথায় দশ-পনের মিনিট সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা নিজেই জানে না; হঠাৎ শাড়ির খসখস শব্দে সচেতন হইয়া সুমুখেই দেখিল অচলা। সে চোখের রক্তিমা যতদূর সম্ভব জল দিয়া ধুইয়া ধনী গৃহিণীর উপযুক্ত সজ্জায় একেবারে সজ্জিত হইয়াই আসিয়াছিল। কহিল, ওঁদের ওখানে আজ একবার যাওয়া চাই-ই।

এই সাজসজ্জা তাহার নিজের জন্য নয়, ইহা যে তথাকার আগন্তুক রাজ-অতিথিদের উপলক্ষ করিয়া, এ কথা সুরেশ বুঝিল, তথাপি এই মণিমুক্তাখচিত রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সুন্দরী নারী ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিস্ময়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, চাই-ই কেন?

রাক্ষুসী জ্বর নিয়েই কলিকাতা থেকে ফিরেছে—খবর পেলুম, জ্যাঠামশাই নিজেও নাকি কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন।

আসা পর্যন্ত তুমি কি একদিনও তাঁদের বাড়ি যাওনি?

না।

তাঁরাও কেউ আসেন নি?

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না।

রামবাবু নিজেও আসেন নি?

না।

এ বাটীতে আসিয়া পর্যন্ত সুরেশ প্লেগ লইয়া আপনাকে এমনি ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যে, গৃহস্থালী ও আত্মীয়তার এই-সকল ছোটখাটো ত্রুটি সে লক্ষ্য করে নাই। তাই কথা শুনিয়া যথার্থই বিস্ময়ভরে কহিল, আশ্চর্য! আচ্ছা যাও।

অচলা বলিল, আশ্চর্য তাঁদের তত নয়, যত আমাদের। একজনের জ্বর, একজন নিজেও অসুখে না পড়া পর্যন্ত আত্মীয়দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছিলেন। উচিত ছিল আমাদেরই যাওয়া।

আচ্ছা, যাও। একটু সকাল সকাল ফিরো।

অচলা একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমিও সঙ্গে চল।

আমাকে কেন?

অচলা রাগ করিয়া কহিল, নিজের অসুখের কথা মনে করতে না পারো, অন্ততঃ ডাক্তার বলেও চল।

আচ্ছা চল, বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ছাড়িতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

এক্কাওয়ালা বেচারা কোন কিছুই হুকুম না পাইয়া তখনও অপেক্ষা করিয়াছিল। নীচে নামিয়া তাহাকে দেখিয়াই অচলা খামকা রাগিয়া উঠিয়া বেহারাকে তাহার কৈফিয়ত চাহিল

এবং ভাড়া দিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দিতে আদেশ করিল। সে সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কাল--

অচলাই তাহার জবাব দিল, কহিল, না। বাবুর যাওয়া হবে না, এক্কার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠিয়া সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিতে যাইতেছিল, আজ অচলা সহসা তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিয়া পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল। গাড়ি চলিতে লাগিল, কেহই কোন কথা কহিল না, পাশাপাশি বসিয়া দু'জনেই দুইদিকের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাগানের গেট পার হইয়া গাড়ি যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তখন সুরেশ আস্তে আস্তে ডাকিল, অচলা!

কেন?

আজকাল আমি কি ভাবি জানো?

না।

এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উলটো। তখন ভাবতুম, কি করে তোমাকে পাবো; এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে।

এই অচিন্ত্যপূর্ব একান্ত নিষ্ঠুর আঘাতের গুরুত্বে ক্ষণকালের জন্য অচলার সমস্ত দেহ-মন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, তথাপি অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, আমি জানতুম। কিন্তু এ ত—

সুরেশ বলিল, হাঁ, আমারই ভুল। তোমরা যাকে বল পাপের ফল। কিন্তু তবুও কথাটা সত্য। মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ স্বপ্নেও ভাবিনি।

অচলা চোখ তুলিয়া কহিল, তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?

সুরেশ লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া জবাব দিল, বেশ, ধর তাই।

ওই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অচলা একেবারে নীরব হইয়া গেল! তাহার রুদ্ধ হৃদয় মথিত করিয়া কেবল এই কথাটাই চারিদিকে মাথা কুটিয়া ফিরিতে লাগিল, এ সেই সুরেশ! এ সেই সুরেশ! আজ ইহারই কাছে সে দুঃসহ বোঝা, আজ সেই-ই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে! কথাটা মুখের উপর উচ্চারণ করিতেও আজ তাহার কোথাও বাধিল না।

অথচ পরমাশ্চর্য এই যে, এই লোকটিই তাহার সীমাহীন দুঃখের মূল! কাল পর্যন্ত ইহার বাতাসে সমস্ত দেহ বিষে ভরিয়া গিয়াছে!

মেঘাবৃত অপরাহু-আকাশতলে নির্জন রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া এই দুটি নরনারী একেবারে নির্বাক্। সুরেশ কি ভাবিতেছিল সেই জানে, কিন্তু তাহার উচ্চারিত বাক্যের কল্পনাতীত নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম করিয়াও আজ নূতন ভয়ে অচলার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুরেশ নাই—সে একা। এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ আকুল, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া সে সংসারসমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যেই তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশী কেহ জানে না, তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। আর তাহার কেহ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে, কোথাও কেহ নাই; সংসারে সে একেবারেই সঙ্গ-বিহীন। এই কথা মনে করিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সহসা তাহার অশক্ত অবশ ডান হাতখানি খপ করিয়া সুরেশের ক্রোড়ের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া চাহিল। অচলা নিরুদ্বেগ-কণ্ঠ প্রাণপণে পরিষ্কার করিয়া কহিল, আর কি তুমি আমাকে ভালবাস না?

সুরেশ হাতখানি তাহার সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া কহিল, এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃসংশয়ে দিতে পারিনে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।

অচলা আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু করুণকণ্ঠে কহিল, তুমি আর কোথায়ও আমাকে নিয়ে চল—

যেখানে কোন বাঙালী নেই?

হাঁ। যেখানে লজ্জা আমাকে প্রতিনিয়তই বিঁধবে না—

সেখানে কি আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে অচলা? এ কি সত্য? বলিতে বলিতেই আকস্মিক আবেগে সে তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল।

অপমানে আজও অচলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তবুও সে ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি বলিল, হাঁ। এক সময় তোমাকে আমি ভালবাসতুম। না না—ছি—কেউ দেখতে পাবে। বলিয়া সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। কিন্তু হাতখানি তাহার মুঠার মধ্যে ধরাই রহিল, সে তাহারই উপর পরম স্নেহে একটুখানি চাপ দিয়া কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

গাড়ি বড় রাস্তা ছাড়িয়া রামবাবুর বাংলোসংলগ্ন উদ্যানের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিরাট ওয়েলার যুগলবাহিত বিপুলভার অশ্বযান সমস্ত গৃহ প্রকম্পিত করিয়া দেখিতে দেখিতে গাড়িবারান্দার নীচে আসিয়া থামিল।

জমকালো নূতন পোশাকপরা সহিসেরা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং সুরেশ নিজে নামিয়া হাত ধরিয়া অচলাকে অবতরণ করাইল। অচলার দৃষ্টি ছিল উপরের বারান্দায়। তথায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাক্ষুসীও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বহুদিনের পর চোখে চোখে হইতে দুই সখীর মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রামবাবু নীচেই ছিলেন, তিনি গায়ের বালাপোশখানা ফেলিয়া দিয়া আনন্দে সস্নেহ আহবান করিলেন, এসো এসো, আমার মা এসো!

এই পরিচিত কণ্ঠস্বরের ব্যগ্র-ব্যাকুল আবাহনে তাহার হাসিমাখা চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে নামিয়া আসিয়া বৃদ্ধের উপর নিপতিত হইল; কিন্তু তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ মহিম—তাহারই প্রতি চাহিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। চোখে চোখে মিলিল, কিন্তু সে চোখে আর পলক পড়িল না: সর্বাঙ্গে মণি-মুক্তা অচলার তেমনি ঝলসিতে লাগিল, হীরা-মানিকের দীপ্তি লেশমাত্র নিষ্প্রভ হইল না, কিন্তু তাহাদেরি মাঝখানে প্রস্ফুটিত কমল যেন চক্ষের নিমিষে মরিয়া গেল।

কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বৃদ্ধের ভুল হইল। অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে তাহাকে সহসা লজ্জায় ম্লান ও বিপন্ন কল্পনা করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অচলার আনত ললাট দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, থাক মা, তোমাকে পায়ের ধুলো নিতে হবে না, তুমি ওপরে যাও—

অচলা কিছুই বলিল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

রামবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, ইনি—

সুরেশ কহিল, বিলক্ষণ! আমরা যে এক ক্লাসের—ছেলেবেলা থেকে দুজনে আমরা—, বলিয়া সহসা হাসির চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, কি মহিম, হঠাৎ তুমি যে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পারিল না। মহিম মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

হতবুদ্ধি বৃদ্ধ সুরেশের মুখের প্রতি চাহিলেন এবং সুরেশও প্রত্যুত্তরে আর একটা হাসির প্রয়াস করিতে গেল, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িতে অকস্মাৎ গুরুতর শব্দ শুনিয়া দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা গোলমাল উঠিল; রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া। সে দুই-তিনটি ধাপ উঠিতে পারিয়াছিল মাত্র, তাহার পরেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার পথে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া অচলা এই কথাটাই ভাবিতেছিল, আজিকার এই মূর্ছাটা যদি না ভাঙ্গিত। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিবার বীভৎসতাকে সে মনে স্থান দিতেও পারে না, কিন্তু এমনি কোন শান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু—হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া ঘুমাইয়া পড়া—তার পরে আর না জাগিতে হয়। মরণকে এমন সহজে পাইবার কি কোন পথ নাই? কেউ কি জানে না?

সুরেশ তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, তুমি যে আর কোথাও যেতে চেয়েছিলে, যাবে?

চল।

এর পরে কাল ত এখানে মুখ দেখানো যাবে না।

কিন্তু তিনি ত কোন কথাই কাউকে বলবেন না।

সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। মহিমকে আমি জানি, সে ঘৃণায় আমাদের দুর্নামটা পর্যন্ত মুখে আনতে চাইবে না।

কথাটা সুরেশ সহজেই কহিল, কিন্তু শুনিয়া অচলার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তার পরে যতক্ষণ না গাড়ি গৃহে আসিয়া থামিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নির্বাক হইয়া রহিল। সুরেশ তাহাকে সযত্নে, সাবধানে নামাইয়া দিয়া কহিল, তুমি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর গে অচলা, আমার কতকগুলো জরুরী চিঠিপত্র লেখবার আছে। বলিয়া সে নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া অচলা ভাবিতেছিল, এই ত তাহার একুশ বৎসর বয়স, ইহার মধ্যে এমন অপরাধ কাহার কাছে সে কি করিয়াছে যেজন্য এতবড় দুর্গতি তাহার ভাগ্যে ঘটিল। এ চিন্তা নূতন নয়, যখন-তখন ইহাই সে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত এবং শিশুকাল হইতে যতদূর স্মরণ হয় মনে করিবার চেষ্টা করিত। আজ অকস্মাৎ মৃণালের একদিনের তর্কের কথাগুলি তাহার মনে পড়িল এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া সমস্ত আলোচনাই সে একটির পর একটি করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। নিজের বিবাহিত জীবনটা স্বামীর সহিত একপ্রকার তাহার বিরোধের মধ্যে দিয়াই কাটিয়াছে। কেবল শেষ কয়টি দিন তাহার রুগ্নশয্যায় স্বামীকে সে বড় আপনার করিয়া পাইয়াছিল। তাহার জীবনের যখন আর কোন শঙ্কা নাই, মন যখন নিশ্চিন্ত নির্ভর হইয়াছে, তখনকার সেই স্নিগ্ধ, সহজ ও নির্মল আনন্দের মাঝে অপরের দুর্ভাগ্য ও বেদনা যখন তাহার বড় বেশী বাজিত তখন একদিন মৃণালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিয়াছিল, ঠাকুরঝি, তুমি যদি আমাদের সমাজের, আমাদের মতের হতে, তোমার সমস্ত জীবনটাকে আমি ব্যর্থ হতে দিতুম না।

মৃণাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কি করতে সেজদি, আমার আবার একটা বিয়ে দিতে?

অচলা কহিয়াছিল, নয় কেন? কিন্তু থামো ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে পড়ি, আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না। ও মল্লযুদ্ধ এত হয়ে গেছে যে. হবে শুনলেও আমার ভয় করে।

মৃণাল তেমনি সহাস্যে বলিয়াছিল, ভয় করবার কথাই বটে। কারণ তাঁদের হুড়োমুড়িটা যে কখন কোন্‌দিকে চেপে আসবে তার কিছুই বলবার জো নাই। কিন্তু একটা কথা তুমি ভাবোনি সেজদি, যে, তাঁরা যুদ্ধ করেন কেবল যুদ্ধ ব্যবসা বলে, কেবল তাতে গায়ে জোর আর হাতে অস্ত্র থাকে বলে। তাই তাঁদের জিত হার শুধু তাঁদেরই, আমাদের যায় আসে না। আমাদের ত কোন পক্ষই কোন কথা জিজ্ঞেস করেন না।

অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু করলে কি হতো?

মৃণাল বলিয়াছিল, সে ঠিক জানিনে ভাই। হয়ত তোমারি মত ভাবতে শিখতুম, হয়ত তোমার প্রস্তাবেই রাজী হতুম, একটা পাত্রও হয়ত এতদিনে জুটে যেতে পারত। বলিয়া সে হাসিয়াছিল।

এই হাসিতে অচলা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমাদের সমাজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে বল, সে আমি জানি। কিন্তু আমাদের কথা না হয় ছেড়েই

দাও, যাঁরাই এই নিয়ে যুদ্ধ করেন, তাঁরা কি সবাই ব্যবসায়ী? কেউ কি সত্যিকার দরদ নিয়ে লড়াই করেন না?

মৃণাল জিভ কাটিয়া বলিয়াছিল, অমন কথা মনে আনলেও পাপ হয় সেজদি। কিন্তু তা নয় ভাই। কাল সকালেই ত আমি চলে যাচ্ছি, আবার কবে দেখা হবে জানিনে, কিন্তু যাবার আগে একটা তামাশাও কি করতে পারব না? বলিতে বলিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সামলাইয়া লইয়া পরে গম্ভীর হইয়া কহিয়াছিল, কিন্তু তুমি ত আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না ভাই। বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে তাই সকল বিচার-বিতর্কের বাইরে।

বিস্মিত অচলা প্রশ্ন করিয়াছিল, বেশ তাও যদি হয়, ধর্ম কি মানুষের বদলায় না ঠাকুরঝি?

মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্মের মতামত বদলায়, কিন্তু আসল জিনিসটি কে আর বদলায় ভাই সেজদি? তাই এত লড়াই-ঝগড়ার মধ্যেও সেই মূল জিনিসটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েছে। স্বামীর দোষ-গুণের আমরাও বিচার করি, তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদলায়—আমরাও ত ভাই মানুষ! কিন্তু স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাঁকে আর আমরা বদলাতে পারিনে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল, এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল, ওটা থাকবে বলেই আছে। ধর্ম যখন থাকবে না, তখন ওটাও থাকবে না। বেড়াল-কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই।

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, এত যদি তোমার সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন, তাঁদের এত সন্দেহ, এত সাবধান হওয়া তবু কিসের জন্যে? এত পর্দা. এত বাধাবাধি—সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এত জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝতুম পরীক্ষার অবকাশ থাকলে।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল চমকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, এ বিধি-ব্যবস্থা যাঁরা করে গেছেন, উত্তর জিজ্ঞাসা কর গে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ-মায়ের কাছে যা শিখেছি, তাই কেবল পালন করে আসচি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর করে বলতে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্মের ব্যাপার, পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থ-ই নিতে পেরেচে, তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনা-আপনি যাচাই হয়ে গেছে। বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়োমানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপ-গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশী ছিল না, কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল। এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তার পরে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, উপমাটা হয়ত ঠিক হবে না সেজদি; কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, বাপ তাঁর কানা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর সুরূপ ছেলে মুহূর্তের তরে হয়ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম তাতে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। যাবার সময়ে তাঁর সর্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান, এ ত তুমি জানো। কিন্তু নিজের পিতৃত্বের প্রতি সংশয়ে যদি কখনো তাঁর পিতৃধর্ম ভেঙ্গে যায়, তখন এই স্নেহের বাষ্পও কোথাও খুঁজে মেলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা আলাদা ভাই, আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ কথা আমার ভুলেও বিশ্বাস ক'রো না যে, স্বামীকে যে স্ত্রী ধর্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যত বড়, যত বৃহৎই কল্পনা করুক, পরীক্ষার চোরাবালিতে ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে। সে পর্দার ভিতরে ডুববে, বাইরেও ডুববে।

তাহাই ত হইল! তখন এ সত্য অচলা উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু আজ মৃণালের সেই চোরাবালি যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অহরহ রসাতলের পানে টানিতেছে, তখন বুঝিতে আর বাকী নাই, সেদিন কি কথাটা সে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নিরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা রাখিয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এই ছিল তাহার গর্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ-সকল তাহার কোন কাজে লাগিল না। তাহার বিপদ আসিল অত্যন্ত সংগোপনে বন্ধুর বেশে; সে আসিল জ্যাঠামহাশয়ের স্নেহ ও শ্রদ্ধার ছদ্মরূপ ধরিয়া। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ ও নির্বন্ধাতিশয্যে যে দুর্যোগের রাত্রে সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল, সেদিন একমাত্র যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত, সে তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম—যাহা মৃণাল তাহাকে জীবনে মরণে অদ্বিতীয় ও নিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেদিন তাহার বাহিরের খোলসটাই বড় হইয়া তাহার ধর্মকে পরাভূত করিয়া দিল। তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া, কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকেই চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়াছে; যে ধর্ম গুপ্ত, যে ধর্ম গুহাশায়ী, সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল, এই আবরণের মোহ কাটাইয়া আপনাকে নগ্ন করিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না, জ্যাঠামশাই, আমি জানি, আমার এতদিনের পর্বত-প্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমার সত্যকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না; জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবে না, তোমার সতী-সাধ্বী পুত্রবধূর ঘরের দ্বারও কাল আমার মুখের উপর রুদ্ধ হইয়া লাঞ্ছনা আমার জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। সে সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ংকর স্নেহ আমার সহিবে না। বরঞ্চ এই আশীর্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠামশায়, আমার এতদিনের সতী নামের বদলে তোমাদের কাছে আজিকার কলংকই যেন আমার অক্ষয় হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায় রে! এ কথা তাহার মুখ দিয়া সেদিন কিছুতেই বাহির হইতে পারে নাই!

আজ নিষ্ফল অভিমান ও প্রচণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার বারংবার রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং এই অখণ্ড বেদনাকে মহিমের সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টি যেন ছুরি দিয়া চিরিতে লাগিল।

এমন করিয়া প্রায় অর্ধেক রাত্রি কাটিল। কিন্তু সকল দুঃখেরই নাকি একটা বিশ্রাম আছে, তাই অশ্রু-উৎসও একসময়ে শুকাইল এবং আর্দ্র চক্ষুপল্লব দুটিও নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। সুরেশের জন্য দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু সে ঘরে আসিয়াছিল কিনা, ঠিক বুঝা গেল না। বাহিরে আসিতে বেহারা জানাইল, বাবুজী অতি প্রত্যুষেই এক্কা করিয়া মাঝুলি চলিয়া গিয়াছে।

কেউ সঙ্গে গেছে?

না। আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন, প্লেগে মরতে চাস ত চল্।

তাই তুমি নিজে গেলে না; কেবল দয়া করে এক্কা ডেকে এনে দিলে? আমাকে জাগালি না কেন?

বেহারা চুপ করিয়া রহিল।

অচলা নিজেও একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিল, এক্কা ডেকে আনলে কে? তুই?

বেহারা নতমুখে জানাইল, ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজনই ছিল না; কাল তাহাকে বিদায় দিবার সময় আজ প্রত্যুষেই হাজির হইতে বাবু নিজেই গোপনে হুকুম দিয়াছিলেন।

শুনিয়া অচলা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা নয়। কাল সন্ধ্যার ঘটনার সহিত ইহার সংস্রব নাই। না ঘটিলেও যাইত—যাওয়ার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করে নাই, শুধু তাহারি ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিল মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কবে ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন?

সে সানন্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, খুব শীঘ্র, পরশু কিংবা তরশু, নয় তার পরের দিন নিশ্চয়।

অচলা আর কোন প্রশ্ন করিল না। কাল সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া আঘাত কত লাগিয়াছিল, ঠিক ঠাহর হয় নাই, আজ আগাগোড়া দেহটা ব্যথায় যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই উপর রামবাবুর তত্ত্ব লইতে আসার আশঙ্কায় সমস্ত মনটাও যেন অনুক্ষণ কাঁটা হইয়া রহিল। তিনি কোন কথাই যে প্রকাশ করিবে না, ইহা সুরেশের অপেক্ষা সে কম জানিত না, তবুও সর্বপ্রকার দৈবাতের ভয়ে অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাকে আগলাইয়া সমস্ত চিত্ত যেমন হুঁশিয়ার হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই তাহার সকল ইন্দ্রিয় বাহিরের দরজার পাহারা দিয়া বসিয়া রহিল। এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল। রাত্রে আর তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া এইবার সে শয্যা আশ্রয় করিল। পাশের টিপয়ে শূন্য ফুলদানি চাপা দেওয়া কোথাকার এক কবিরাজী ঔষধালয়ের সুবৃহৎ তালিকাপুস্তক ছিল, টানিয়া লইয়া তাহারই পাতার মধ্যে শ্রান্ত চোখ-দুটি মেলিয়া হঠাৎ এক সময়ে সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া কোন্ এক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের রোগশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বামুনঘাটি মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বেহারা বলিয়াছিল, বাবু ফিরিবেন পরশু কিংবা তরশু কিংবা তাহার পরের দিন নিশ্চয়। কিন্তু এই তাহার পরের দিনের নিশ্চয়তাকে সমস্তদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিবার মত শক্তি আর অচলার ছিল না। এই তিনদিনের মধ্যে রামবাবু একদিনও আসেন নাই। তাঁহার আসাটাকে সে সর্বান্তঃকরণে ভয় করিয়াছে, অথচ এই না আসার নিহিত অর্থকে কল্পনা করিয়াও তাহার দেহ কাঠ হইয়া গিয়াছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ইতিমধ্যে পীড়া যে বাড়িতেও পারে, এ কথা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কেবল আজ সকালে ও-বাড়ির দরোয়ান আসিয়াছিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে পাঁড়েজির নিকট হইতেই বিদায় লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে কেন আসিয়াছিল, কি খবর লইয়া গেল, কোন কথা অচলা ভয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার পর হইতেই এই বাড়ি, ঘরদ্বার, এই-সব লোকজন সমস্ত হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, রঘুবীর, তোমার বাড়ি ত এই দিকে, তুমি মাঝুলি গ্রামটা জানো?

সে কহিল, অনেককাল পূর্বে একবার বরিয়াত গিয়েছিলাম মাইজী।

কতদূর হবে বলতে পারো?

রঘুবীর এদেশের লোক হইলেও বহুদিন বাঙালীর সংস্রবে তাহার অনেকটা হিসাব-বোধ জন্মিয়াছিল, সে মনে মনে আন্দাজ করিয়া কহিল, ক্রোশ ছয়-সাতের কম নয় মাইজী।

আজ তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো?

রঘুবীর ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে? সেখানে যে ভারী পিলেগের বেমারী।

অচলা কহিল, তুমি না যেতে পারো, আর কোন চাকরকে রাজী করিয়ে দিতে পারো? সে যা বকশিশ চায়, আমি দেবো।

রঘুবীর ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, মাইজী, তুমি যেন পারবে, আর আমি পারব না? কিন্তু রাস্তা নেই, আমাদের ভারী গাড়ি ত যাবে না। এক্কা কিংবা খাটুলি—তার কোনটাতেই ত তুমি যেতে পারবে না মাইজী।

অচলা কহিল, যা জোটে, আমি তাতেই যেতে পারবো। কিন্তু আর ত দেরি করলে চলবে না রঘুবীর। তুমি যা পাও একটা নিয়ে এসো।

রঘুবীর আর তর্ক না করিয়া অল্পকালের মধ্যেই একটা খাটুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং নিজের লোটা-কম্বল লাঠিতে ঝুলাইয়া সেটা কাঁধে ফেলিয়া বীরের মতই পদব্রজে সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ির খবরদারীর ভার দরোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যদের উপরে দিয়া কোন এক অজানা মাঝুলির পথে অচলা যখন একমাত্র সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া আজ গৃহের বাহির হইল, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার নিজের কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্নের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার বার বার মনে হইল, এই বিচিত্র জগতে এমন ঘটনাও এক দিন ঘটিবে এ কথা কে ভাবিতে পারিত।

ধুলো-বালির কাঁচা পথ একটা আছে। কিন্তু কখনও তাহা সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অস্পষ্ট, কখনও বা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুপ্ত, অবরুদ্ধ। গৃহস্থের সুবিধা ও মর্জিমত তাহার আয়তন ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া কখনো বা নদীর ধার দিয়া, কখনো বা গৃহপ্রাঙ্গণের উপর দিয়াই সে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। প্রথম কিছুদূর পর্যন্ত তাহার কৌতূহল মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। একটা মৃতদেহ একখন্ড বাঁশে বাঁধিয়া কয়েকজন লোককে নিকট দিয়া বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া সংক্রমণের ভয়ে তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়াছিল. ইচ্ছা করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিসে মরিয়াছে, ইহার বয়স কত এবং কে কে আছে। কিন্তু পথের দূরত্ব যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, বেলা তত পড়িয়া আসিতে লাগিল এবং কাছে ও দূর গ্রামের মধ্য হইতে কান্নার রোল যত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল ততই সমস্ত মন যেন কি একপ্রকার জড়তায় ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল।

বহুক্ষণ হইতে তাহার তৃষ্ণাবোধ হইয়াছিল, এখানেই কতকটা পথ নদীর উচ্চ পাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ঘাটের কাছে আসিয়া সে ডুলি থামাইয়া অবতরণ করিল এবং হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইবার জন্য নীচে নামিতেই তাহার চোখে পড়িল. গোটা-দুই অর্ধগলিত শব অনতিদূরে আটকাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের বীভৎস বিকৃতি তাহার মনের উপর এখন কোন আঘাতই করিল না। অত্যন্ত সহজেই সে হাত-মুখ ধুইয়া জল খাইয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহার খাটুলিতে বসিল। কোন অবস্থাতেই ইহা যে তাহার পক্ষে সম্ভবপর, কিছুকাল পূর্বে এ কথা বোধ করি সে চিন্তাও করিতে পারিত না।

ইহার পর হইতে প্রায় গ্রামগুলাই পরিত্যক্ত, শূন্য, কদাচিৎ কোন অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি ভিন্ন যে যেথায় পারিয়াছে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও শব্দ নাই, সাড়া নাই, ঘরদ্বার রুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন—মনে হয় যেন কুটীরগুলা পর্যন্ত মরণকে অনিবার্য জানিয়া চোখ বুজিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। এই মৃত্যুশাসিত নির্জন পল্লীগুলির ভিতর দিয়া চলিতে রঘুবীর ও বাহকদিগের চাপা-গলা এবং ত্রস্ত-ভীত পাদক্ষেপে প্রতিমুহূর্তেই অচলাকে বিপদের বার্তা জানাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভয়ই হইল না, ইহার সহিত তাহার যেন কোন আজন্ম পরিচয় আছে, সমস্ত অন্তঃকরণ এমনি নির্বিকার হইয়া রহিল।

এইভাবে বাকী পথটা অতিবাহিত করিয়া ইহারা যখন মাঝুলিতে উপস্থিত হইল তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। অচলার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, তাহাদের পথের দুঃখ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইবে। গ্রামের কৃতজ্ঞ নরনারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সংবর্ধনা করিয়া ডাক্তার সাহেবের দরবারে লইয়া যাইবে, তথায় রোগী ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আনাগোনায়, ঔষধ-পথ্যের বিতরণের ঘটায় সমস্ত স্থানটা ব্যাপিয়া যে সমারোহ চলিতেছে, তাহার মধ্যে অচলার নিজের স্থানটা যে কোথায় হইবে ইহার চিত্রটা সে একপ্রকার কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার কল্পনা কেবল নিছক কল্পনাই। তাহার সহিত ইহার কোথাও কোন অংশে মিল নাই বরঞ্চ যে চিত্র পথের দুই ধারে দেখিতে দেখিতে সে আসিয়াছে, এখানেও সেই ছবি! এখানেও পথে লোক নাই বাড়িঘর-দ্বার রুদ্ধ, ইহার কোথায় কোন্ পল্লীতে সুরেশ বাসা করিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়াই যেন কঠিন।

এই গ্রামে প্রত্যহই একটা হাট আজও বসে বটে এবং অন্য সময়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরাদমে চলিতেও থাকে সত্য, কিন্তু এখন দুর্দিনের বেচা-কেনা সারিয়া লোকজন

অপরাহ্নের বহু পূর্বেই পলাইয়াছে—ভাঙ্গা হাটের স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন পড়িয়া আছে মাত্র।

রঘুবীর খোঁজাখুঁজি করিয়া একটা দোকান বাহির করিল। বৃদ্ধ দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করিতেছিল; সে কহিল, তাহার ছেলেমেয়েরা সবাই স্থানান্তরে গিয়াছে, কেবল তাহারা দুইজন বুড়া-বুড়ী দোকানের মায়া কাটাইয়া আজিও যাইতে পারে নাই। সুরেশের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সন্ধান দিতে পারিল যে, ডাক্তার নন্দ পাঁড়ের নিমতলার ঘরে এতদিন ছিলেন বটে, কিন্তু এখনও আছেন কিংবা মামুদপুরে চলিয়া গিয়াছেন সে অবগত নয়।

মামুদপুর কোথায়?

সিধা ক্রোশ-দুই দক্ষিণে।

নন্দ পাঁড়ের বাড়িটা কোন্ দিকে?

বৃদ্ধ বাহির হইয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া একটা বিপুল নিমগাছ দেখাইয়া দিয়া কহিল, এই পথে গেলেই দেখা যাইবে।

অনতিকাল পরে ভীত পরিশ্রান্ত বাহকেরা যখন নিমতলায় আসিয়া খাটুলি নামাইল, তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। বাড়িটা বড়, পিছনের দিকে দুই-একটা পুরাতন ইঁটের ঘর দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশই খোলার। সম্মুখে প্রাচীর নাই—চমৎকার ফাঁকা। গৃহস্বামীকে দরিদ্র বলিয়াও মনে হয় না, কিন্তু একটা লোকও বাহির হইয়া আসিল না। কেবল প্রাঙ্গণের একধারে বাঁধা একটা টাটু-ঘোড়া ক্ষুৎপিপাসার নিবেদন জানাইয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সদর দরজা খোলা ছিল, রঘুবীর সাহস করিয়া ভিতবে গলা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল, পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের উপর সুরেশ শুইয়া আছে এবং কাছেই খুঁটিতে ঠেস দিযা একজন অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বসিয়া ঝিমাইতেছে।

বাবুজী!

সুরেশ চোখ মেলিযা চাহিল এবং কনুইয়ে ভর দিযা মাথা তুলিয়া ক্ষণকাল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, কে, বেয়ারা? রঘুবীর?

রঘুবীর সেলাম করিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভুর রক্ত-চক্ষুর প্রতি চাহিয়া তাহার মুখের কথা সরিল না।

তুই এখানে?

রঘুবীর পুনরায় সেলাম করিল এবং বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শুধু কেবল বলিল, মাইজী—

এবার সুরেশ বিস্ময়ে সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে পাঠিযেছেন?

রঘুবীর ঘাড় নাড়িযা জানাইল, না, তিনি নিজেই আসিযাছেন।

জবাব শুনিযা সুরেশ এমন করিযা তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইযা রহিল, যেন কথাটাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। তার পরে চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল, কিছুই বলিল না।

অচলা আসিয়া যখন নীরবে খাটিয়ার একধারে তাহার গায়ের কাছেই উপবেশন করিল, তখন কিছুক্ষণের নিমিত্ত সে তেমনি নিমীলিত-নেত্রে মৌন হইয়া রহিল, ভদ্রতা রক্ষা কবিতে সামান্য একটা 'এসো' বলিয়াও ডাকিতে পারিল না। শিশুকাল হইতে চিরদিন অত্যধিক যত্ন-আদরে লালিত-পালিত হইযা আবেগে ও প্রবৃত্তিব বশেই সে চলিয়াছে, ইহাদের সংযত করার শিক্ষা তাহার কোনকালে হয় নাই। এই শিক্ষা জীবনে সে প্রথম পাইয়াছিল, কেবল সেইদিন, যেদিন তাহার মুখের হাসিকে পদাঘাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া মহিম ঘরে চলিয়া গেল। সেদিন একনিমেষে তাহার বুকের মধ্যে নীরবে যে কি বিপ্লব বহিয়া গেল, সে শুধু অন্তর্যামীই জানিলেন এবং আজও কেবল তিনিই দেখিলেন ঐ শান্ত অচঞ্চল দেহটার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কতবড় ঝড় প্রবাহিত হইতেছে। সেদিনও মহিমের আঘাতকে সে যেমন করিযা সহ্য কবিয়াছিল, আজও তেমনি করিয়াই সে তাহার উন্মত্ত আবেগের সহিত নিঃশব্দে লড়াই করিতে লাগিল—তাহার লেশমাত্র আক্ষেপ প্রকাশ পাইতে দিল না।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, কিন্তু সংকেতের আহ্বানে মৃদুবাতি [illegible] বাহিরে চলিয়া গেলে, সেই শব্দে সুরেশ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল এবং কহিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ ?

অচলা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, না।

সুরেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, চিঠি না পেয়েই এসেছ, আশ্চর্য ! যাই হোক, এ ভালই হ'ল যে একবার দেখা হ'ল। বলিয়া একটা কথার জন্য তাহার আনত মুখের প্রতি একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নিজেই কহিল, আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল—খুব সম্ভব যতদিন বাঁচবে, এর জের মিটবে না, কিন্তু সমস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশী ভালবাসতে তা আমিও বুঝিনি, বোধ হয় তুমিও কোনদিন বুঝতে পারোনি ! না ?

কিন্তু অচলা তেমনি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল দেখিয়া সে আবার বলিল তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে, সে এই দেহটারই ধর্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম, তোমার দেহটাকে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না—কে জানে হয়ত সত্যিই কোনদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতো—হয়ত যা সর্বস্ব দিয়ে এমন করে চেয়েছিলাম, তাই তুমি একদিন নিজের ইচ্ছেয় আমাকে ভিক্ষে দিতে। কিন্তু আর তার সময় নেই ; আমি অপেক্ষা করবার অবসর পেলাম না। বলিয়া সে পুনরায় কনুইয়ে ভর দিয়া মাথা তুলিল এবং সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকের মধ্যে নিজের দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অচলার আনত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একজনের এক একাগ্র দৃষ্টি আর একজনের সমস্ত দৃষ্টিকে যেন আকর্ষণ করিয়া তুলিল—কিন্তু পলকমাত্র। অচলা তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া লইয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জার সহিত কহিল, এদেশ থেকে ত সবাই পালিয়েছে—এখানকার কাজ যদি তোমার শেষ হয়ে থাকে ত বাড়ি, কিংবা আরও কত দেশ আছে—তুমি চল, ডিহরীতে আর একদণ্ড টিকতে পাচ্চিনে।

সে আমার বেশী আর কে জানে ? বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নিঃশব্দে স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অনেক কষ্টে আজ সকালে দু'খানা চিঠি পাঠাতে পেরেছি। একখানা তোমাকে, আর একখানা মহিমকে। সে যদি না এর মধ্যে চলে গিয়ে থাকে ত নিশ্চয় আসবে, আমি জানি।

শুনিয়া অচলা ভয়ে, বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল, কহিল, তাকে কেন ?

সুরেশ তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেকদিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েছি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েছে। তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েছে। এত ধৈর্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই।

অচলার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, কিন্তু সে অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ বলিল, আমার চিঠির মধ্যে প্রায় সব কথাই লেখা আছে [illegible]

বিলম্ব হইতেছে—রঘুবীরের দেখা নাই। মাঝে মাঝে সে পা টিপিয়া উঠিয়া গিয়া দরজার মুখে দাঁড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া নাই। অথচ পাছে এই উৎকণ্ঠা তাহার কোনমতে সুরেশের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়েও সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল, খুঁটির কাছে মুনিয়ার মায়ের নাসিকা ডাকিয়া উঠিল—এমন সময় ক্ষুধিত পথশ্রান্ত রঘুবীর ভগ্নদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে জানাইল বেহারারা ডুলি লইয়া বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিল না।

অচলা সমস্ত ভুলিয়া বিকৃত-কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহারা কখন গেল? কোন্ পথে গেল? এবং কিজন্য গেল? আমাদের যা-কিছু আছে, সমস্ত দিলেও কি আর একখানা সংগ্রহ করা যায় না?

রঘুবীর অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই নিদারুণ বিপত্তি তাহারই অবিবেচনায় ঘটিয়াছে, ইহা সে জানিত; তাই সে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তবেই ফিরিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আরও একজন তাহারি মত নিঃশব্দে স্থির হইয়া শয্যার 'পরে পড়িয়া রহিল। এই চঞ্চলতার লেশমাত্রও যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। রঘুবীর চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে বলিল, ব্যস্ত হয়ে কি হবে অচলা, তাদের পেলেও কোনও লাভ হতো না। এই ভাল—আমার এই ভাল।

আর অচলা কথা কহিল না, কেবল সেই অনন্ত পথযাত্রীর তপ্ত ললাটে ডান হাতখানি রাখিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চারিদিকে জনহীন পুরী মৃত্যুর মত নির্বাক্ হইয়া আছে। বাহিরে গভীর রাত্রি গভীরতর হইয়া চলিয়াছে, চোখের উপর কালো আকাশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে—সেইদিকে চাহিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ইহার কি প্রয়োজন ছিল! ইহার কি প্রয়োজন ছিল!

এই যে তাহার জীবন-কুরুক্ষেত্র ঘেরিয়া এতবড় একটা কদর্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সংসারে ইহার কি আবশ্যক ছিল? দুনিয়ার সমস্ত জ্বালা, সমস্ত হীনতা, সকল স্বার্থ মিটাইয়া সে কি ওই রাত্রির মত আজই শেষ হইয়া যাইবে? তার পরে সমস্ত জীবনটা কি তাহার কুরুক্ষেত্রের মত কেবল শ্মশান হইয়া যুগ যুগ পড়িয়া রহিবে? এখানে কি চিতার দাহচিহ্ন কোনদিন মিলাইবে না? পৃথিবীতে ইহাও কি প্রয়োজনের মধ্যে?

কিন্তু এ কুরুক্ষেত্র কেন বাধিল? কে বাধাইল? এই যে মানুষটি তাহার সকল ঐশ্বর্য, সকল সম্পদ, সকল আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এমন একান্ত নিরুপায়ের মরণ মরিতে বসিয়াছে, এই কি কেবল এতবড় বিপ্লব একা ঘটাইয়াছে? আর কি কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না? কোথাও কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই?

কিন্তু সহসা চিন্তাটাকে সে যেন সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। কে যেন দুই হাত চাপিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিতে বসিয়াছিল। সেই সময় সুরেশও জল চাহিল। হেঁট হইয়া মুখে তাহার জল দিয়া আবার অচলা

স্থির হইয়া বসিল। তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, চোখ হইতে নিদ্রার আভাসটুকু পর্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দুটি শুষ্ক চোখ মেলিয়া আবার সে নীরব আকাশের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বহুদিন পূর্বে অনেক যত্ন করিয়া যে মহাভারতখানি শেষ করিয়াছিল—আজ তাহারই শেষ সর্বনাশ যেন তাহারই মনের মধ্যে ছায়াবাজির ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেখানে যেন কত রক্ত ছুটিতেছে, কত অজানা লোক মিলিয়া কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিতেছে—কত শত-সহস্র চিতা জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—তাহার ধূমে ধূমে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য একেবারে যেন আচ্ছন্ন একাকার হইয়া গিয়াছে!

কিছুক্ষণের জন্য সুরেশ বোধ হয় তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সাড়া ছিল না। কিন্তু এমন করিয়া যে কতক্ষণ গেল, কি করিয়া বাহিরে যে সময় কাটিতে লাগিল, কি করিয়া যে রাত্রি প্রভাতের পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেদিকেও অচলার চৈতন্য ছিল না। তাহার নিমীলিত চক্ষের কোণ বাহিয়া জল পড়িতেছিল, স্রস্ত হাতদুটি সুরেশের বালিশের উপর পড়িয়া, সে একান্ত-মনে বলিতেছিল, হে ঈশ্বর! আমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথার পরিবর্তে একে তুমি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লও; আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই—এত বড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি কত যে সহিয়াছি, সে ত তুমি জান—আর আমাকে বাঁচিতে দিয়ো না প্রভো! আমাকেও তোমার কাছে টানিয়া লও!

কথাগুলি সে যে কতভাবে কতরকমে মনে মনে আবৃত্তি করিল, তাহার অবধি নাই—অশ্রুজলও যে কত ঝরিয়া পড়িল তাহারও সীমা নাই।

মাইজী!

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে, অচলা চমকিয়া দেখিল, রঘুবীর কাহার যেন প্রবেশের অপেক্ষায় সদর-দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি রঘুবীর? বলিয়াই যাহার সহিত তাহার চোখে চোখে দেখা হইয়া গেল, সে মহিম। একবার সে কাঁপিয়া উঠিয়াই দৃষ্টি অবনত করিল।

দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য মহিমের পা উঠিল না, এখানে এমন করিয়া যে আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখন সুরেশ কেমন আছে?

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া বোধ হয় ইহাই জানাইতে চাহিল, সে ইহার কিছুই জানে না।

মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া মহিম সুরেশের ললাট স্পর্শ করিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সেই জ্যোতিহীন রক্তনেত্রের প্রতি চাহিয়া মহিমের গলা দিয়া সহসা স্বর ফুটিল না। তার পরে কহিল, কেমন আছ সুরেশ?

ভালো না—চললুম। তুমি আসবে আমি জানি—আমার সুমুখে এসে ব'স।

মহিম উঠিয়া গিয়া শয্যার একাংশে তাহার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, ডিহরীতে ডাক্তার আছে, আমার এক্কায় কোনমতে—

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, টানাটানি করো না, মরুভূমি পোষাবে না। আমাকে quietly যেতে দাও।

কিন্তু এখনো ত—

হ্যাঁ, এখনো হুঁশ আছে, কিন্তু মাঝে-মাঝে ভুল হচ্ছে। আমার জীবনটা গরীব-দুঃখীর কাজে লাগাতে পারলুম না, কিন্তু সম্পত্তিটা যেন তাদের কাজে লাগে মহিম। তাই কষ্ট দিয়ে এতদূর তোমাকে টেনে এনেছি, নইলে মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে কাব্য করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

মহিম নীরব হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, ও-সব আমি বিশ্বাসও করিনে, ভালও বাসিনে। একটা দিনের ক্ষমার প্রতি আমার লোভও নেই। ভাল কথা, একটা উইল আছে। অচলাকে আমি কিছুই দিইনি—আর তাকে অপমান করতে আমার হাতে উঠল না। তবে দরকার বোঝ ত সামান্য কিছু দিয়ো।

মহিম ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আর আমাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছো সুরেশ?

সুরেশ বলিল, ঠিক এই জন্যই যে, তোমাকে জড়ানো যায় না। যার লোভ নাই, যার ন্যায়ান্যায়ের বিচার—হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া কহিল, কিন্তু সারারাত তুমি বসে আছ অচলা—যাও, হাতমুখ ধোও গে। মুনিয়ার মা সমস্ত দেখিয়ে দেবে—যাও—

সে উঠিয়া গেলে কহিল, কেবল একটা জিনিসের জন্য আমার ভারী দুঃখ হয়। অচলা যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝোনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক! এমন সুন্দর জিনিসটি মাটি করে ফেললুম—না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে। কিন্তু কি আর করা যাবে! পিসীমাকে একটু দেখো শোকটা তাঁর ভারী লাগবে।

বৃদ্ধ মুনিয়ার মা ঔষধের শিশি লইয়া কাছে দাঁড়াইতেই সে উত্ত্যক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, না না, আর ঔষধ নয়। একটু জল দে। একটা নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলুম মহিম আমার দ্রুয়ারে আছে পারো ত পড়ো।

মহিম তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না, অধোমুখে শুনিতেছিল—এইবার চোখ তুলিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সুরেশ থামাইয়া দিয়া বলিল, আর না মহিম, একটু ঘুমুই। খাবার-দাবার সমস্ত যোগাড় আছে, কিন্তু সে ত তোমাদের ভাল লাগবে না। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

মহিম ক্ষণকাল চুপ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার শেষ অনুরোধ একটা রাখবে সুরেশ?

কি?

তুমি ভগবানকে কোনদিন ভাবোনি, তাঁর কথা

ও আমার ভাল লাগে না। বলিয়া সুরেশ মুখখানা বিকৃত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মহিম প্রাণপণে একটা অদম্য দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া নির্বাক্ হইয়া রহিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রামবাবু বাড়ি ছিলেন না। পরদিন বক্সার হইতে ফিরিয়া মহিমের চিঠি পড়িয়া বাহির হইতে মুহূর্ত বিলম্ব করিলেন না—সমস্ত পথ ঘোড়াটাকে নির্মম ছুটাইয়া আধমরা করিয়া তুলিয়া যখন মাব্দুলিতে পৌঁছিলেন তখন বেলা অবসান হইতেছে। পুলিশের দারোগা ভাবিয়া দোকানী স্বয়ং পথ দেখাইয়া নন্দ পাঁড়ের নিমতলায় আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এক্কা হইতে অবতরণকালে সসম্মানে ঘোড়ার লাগাম ধরিল। ইহারই কাছে খবর পাইয়া জানিলেন, অচলাও আসিয়াছে। সদর-দরজা খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে বাকী রহিল না। ঘণ্টা-দুই হইল সুরেশের মৃত্যু হইয়াছে! খাটিয়ার উপর তাহার মৃতদেহ আপাদমস্তক চাপা দেওয়া এবং অনতিদূরে পায়ের কাছে অচলা চুপ করিয়া বসিয়া।

অকস্মাৎ এই দৃশ্য বৃদ্ধ সহিতে পারিলেন না—মা গো! বলিয়া উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র, তার পরে তেমনি অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই আর্তকন্ঠ যেন শুধু তাহার কানে গেল, কিন্তু ভিতরে পৌঁছিল না।

মহিম বাটীর মধ্যে কাঠের সন্ধান করিতেছিল, ক্রন্দনের শব্দে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, সুরেশ এই কতক্ষণ মারা গেল রামবাবু। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, নইলে একলা বড় অসুবিধে হতো।

রামবাবু নীরবে চোখ মুছিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কি করিয়া ওই মেয়েটার চোখের উপর ঐ ভীষণ নিদারুণ কার্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার কুলকিনারা ভাবিয়া পাইলেন না।

মহিম কহিল, নদী দূরে নয়, রঘুবীর কিছু কিছু কাঠ বয়ে নিয়ে গেছে, আরও কিছু কাঠ পাওয়া গেছে—সেইটে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তিনজনেই ওকে নিয়ে যেতে পারবো। নইলে গ্রামে আর লোক নেই, থাকলেও বোধ হয় কেউ বাঙালীর মড়া ছোঁবে না।

রামবাবু তাহা জানিতেন। অচলার অগোচরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা দু'জন আর কে?

মহিম বলিল, রঘুবীরও হয়ত সাহায্য করতে পারে।

শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, না না, সে কিছুতেই হলে চলবে না। ব্রাহ্মণের শব আর কাকেও আমি ছুঁতে দিতে পারব না। নদী যখন দূরে নয়, তখন আমাদের দু'জনকেই যেমন করে হোক নিয়ে যেতে হবে।

বেশ তাই, বলিয়া মহিম পুনরায় ভিতরে গিয়া কাষ্ঠ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। রামবাবু সেই বারান্দার একপ্রান্তে মুখ ফিরাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার বয়স হইয়াছে ; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছেন, অনেক গভীর শোকের মধ্যে দিয়াও তাঁহাকে ধীরে ধীরে পথ চলিতে হইয়াছে। সুদুঃসহ দুঃখের সে করুণ সুর একে একে তাঁহার হৃদয়-বীণায় বাঁধা হইয়া গিয়াছে, আজিকার

এই ব্যাপারটা সেই তারে ঘা দিয়া যেন কেবলি বেসুরে বাজিতে লাগিল। একদিন এই সুরমাই জ্যাঠামশাই বলিয়া তাঁহার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—সে ছবি তিনি ভুলেন নাই। আজও তাঁহার পিতৃস্নেহ যেন সেই বস্তুটার লোভেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতে লাগিল। তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবেন তিনি জানেন না, তাহাকে প্রবোধ দিবার মত সংসারে কোথায় কি আছে তাহাও তিনি অবগত নন; তবুও তাঁহার শোকাতুর মন যেন কেবলি চাহিতে লাগিল, একবার মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, ভয় কি মা! আজও যে আমি বাঁচিয়া আছি!

কিন্তু সে সুর বাজিল কৈ? তাঁহার সে তৃষ্ণা মিটাইতে কেহ ত একপদ অগ্রসর হইয়া আসিল না! সুরমা যে তেমনি নীরবে, তেমনি দূরতম অনাত্মীয়ের ব্যবধান দিয়া আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিল!

দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, ইহাদের অনেক দুর্জ্ঞেয় বেদনা, নির্বাক্ মর্মপীড়ার পাশ দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, প্রচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিত মাঝে মাঝে তাঁহাকে খোঁচা দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন আপনাকে আহত হইতে দেন নাই—সমস্ত সংশয় স্নেহের আবরণে চাপা দিয়া, বাহিরের আকাশ নির্মল মেঘমুক্ত রাখিয়াছেন; কিন্তু আজ সদ্যবিধবার ওই একান্ত অপরিচিত নিষ্ঠুর ধৈর্য তাঁহার এতদিনের আড়াল-করা স্নেহের গা চিরিয়া কলুষের বাষ্পে হৃদয় যেন ভরিয়া দিতে লাগিল।

সূর্য অস্ত গেল। মহিম ওদিকের কাজ একপ্রকার শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, রামবাবু, এইবার ত ওকে নিয়ে যেতে হয়। অচলার দিকে ফিরিয়া বলিল, আলোটা জেলে দিয়েছি, তুমি মনিয়ার মার কাছে বসে থাকো, আমাদের ফিরতে বোধ হয় খুব বিলম্ব হবে না।

অচলা কোন কথাই বলিল না। রামবাবু আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মাথা নাড়িলেন। অচলার আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধ স্বর পরিষ্কার করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, মা, একথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর শেষ কর্তব্য ত তোমাকে করতে হবে। তোমাকেই ত মুখাগ্নি—বলিতে বলিতে তিনি হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অচলার শুষ্ক মুখ, ততোধিক শুষ্ক চোখ-দুটি বৃদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্তকাল স্থির হইয়া রহিল, তার পরে শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, মুখাগ্নির আবশ্যক হয় ত আমি করতে পারি। হিন্দুধর্মে এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে, তা আর আমি ব্যর্থ করতে চাইনে। আমি তাঁর স্ত্রী নই।

রামবাবু বজ্রাহতের ন্যায় পলকহীন চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, তুমি সুরেশের স্ত্রী নও?

অচলা তেমনি অবিচলিতস্বরে বলিল, না, উনি আমার স্বামী নন।

চক্ষের নিমিষে রামবাবুর সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের সেই মূর্ছা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার বিদ্যুদ্বেগে বার বার তাঁহার মনের মধ্যে আবর্তিত হইয়া সংশয়ের ছায়ামাত্রও কোথাও

অবশিষ্ট রহিল না। এ কে, কার মেয়ে, কি জাত—হয়ত-বা বেশ্যা—ইহাকে মা বলিয়াছেন, ইহার ছোঁয়া খাইয়াছেন—ইহার হাতের অন্ন তাঁহার ঠাকুরকে পর্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। কথাগুলো মনে করিয়া ঘৃণায় যেন সর্বাঙ্গ তাঁহার ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল এবং যে স্নেহ এতদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার মাধুর্যে করুণায় অভিষিক্ত রাখিয়াছিল, মরুভূমির জলকণার ন্যায় সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আভাস পর্যন্ত রহিল না।

কিন্তু কেবল তিনিই নন, মহিমও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে চকিত হইয়া কহিল, সে যখন হবার জো নেই রামবাবু, চলুন, আমরা নিয়ে যাই।

চলুন, বলিয়া বৃদ্ধ স্বপ্নচালিতের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিজের দুর্ঘটনার কাছে আর সমস্ত দুর্ঘটনাই একেবারে ছায়ার মত ম্লান হইয়া গিয়াছে—তাঁহার দুই কান জুড়িয়া কেবল বাজিতেছে—জাতি গেল, ধর্ম গেল, এই মানব-জন্মটাই যেন ব্যর্থ, বৃথা হইয়া গেল।

সুরেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেমন তেমন করিয়া সমাধা করিতে অধিক সময় লাগিল না। সমস্তক্ষণ রামবাবু একটা কথাও কহিলেন না এবং ফিরিয়া আসিয়া সোজা এক্কা প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন।

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি যাচ্ছেন?

রামবাবু কহিলেন, হাঁ। আমাকে ভোরের ট্রেনে কাশী যেতে হবে, এখন না বেরোলে সময়ে পোঁছুতে পারব না।

তাঁহার মনের ভাব মহিমের অবিদিত ছিল না এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যে তিনি কাশী ছুটিতেছেন, ইহাও সে বুঝিয়াছিল; তাই অতিশয় সংকোচের সহিত কহিল, আমি বিদেশী লোক, এদিকের কিছুই জানিনে। দয়া করে যদি এঁর কোন যাবার ব্যবস্থা—, কথাটা শেষ হইতে পাইল না। অচলাকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাবে বৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন—দয়া! আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু?

মহিম এ প্রশ্নের প্রতিবাদ করিল না। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, বোধ হয় দু-তিন দিন ওঁর খাওয়া হয়নি। এই মৃত্যুপুরীর মধ্যে ভয়ানক অবস্থায় ফেলে যাওয়া—

তাহার এ কথাও শেষ করিবার সময় মিলিল না। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্মগত সংস্কার আঘাত খাইয়া প্রতিহিংসায় ক্রূর হইয়া উঠিয়াছিল; তাই তীব্র শ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—আপনিও যে ব্রাহ্ম, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু মশাই, যত বড় ব্রহ্মজ্ঞানীই হোন, আমার সর্বনাশের পরিমাণ বুঝলে, এই কুলটার সম্বন্ধে দয়ামায়া মুখেও আনতেন না। বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, যাক, ব্রহ্মজ্ঞানে আর কাজ নেই—প্রাণ বাঁচাতে চান ত উঠে বসুন, জায়গা হবে।

মহিম নিঃশব্দে নমস্কার করিল। সর্বনাশের পরিমাণ লইয়াও স্পন্দন করিল না, প্রাণ বাঁচাইবার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিল না। তিনি চলিয়া গেলে শুধু বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল মাত্র।

সর্বনাশের পরিমাণ! তাই বটে!

ভিতরে বসিয়া গাড়ির শব্দে অচলাও ইহা অনুভব করিল। কেন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, একটা কথা পর্যন্ত বলিয়া গেলেন না, তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এতক্ষণ সুরেশের অনিবার্য মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া একটা অন্তরাল রচিয়াছিল, তাহাও নাই; এইবার মহিম অত্যন্ত সম্মুখে, অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু আর তাহার মন কিছুতেই সাড়া দিতে চাহিল না। নিজের জন্য লজ্জা বোধ করিতেও সে যেন ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

মহিম আসিয়া দেখিল, সে কেরোসিনের আলোটা সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, এখন তুমি কি করবে?

আমি? বলিয়া অচলা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল; শেষে বলিল, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই করব।

এই অপ্রত্যাশিত বাক্য ও ব্যবহারে মহিম বিস্মিত হইল, শঙ্কিত হইল। এমন করিয়া সে একবারও চাহে নাই। এ দৃষ্টি যেমন সোজা, তেমনি স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়া তাহার বুকের অনেকখানি যেন বড় স্পষ্ট দেখা গেল। সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই—যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধুধু করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই—একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।

উপদ্রুত, অপমানিত, ক্ষতবিক্ষত নারী হৃদয়ের এই চরম বৈরাগ্যকে সে চিনিতে পারিল না। একের অভাব অপরের হৃদয়কে এমন নিঃস্ব করিয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার সমস্ত মন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু নিজের দুঃখ দিয়া জগতের দুঃখের ভার সে কোনদিন বাড়াইতে চাহে না, তাই আপনাকে আপনার মধ্যে ধরিয়া রাখাই তাহার চিরদিনের অভ্যাস। পাছে এই বক্ষভরা তিক্ততা তাহার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে অন্যত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল; তার পরে সহজ গলায় বলিল, আমি কেন তোমাকে হুকুম দেব অচলা, আর তুমিই বা তা শুনতে বাধ্য হবে কিসের জন্য?

কিন্তু তুমি ছাড়া আর যে কেউ নাই, কেউ ত আমার সঙ্গে আর কথা কবে না! বলিয়া অচলা তেমনি একভাবেই মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহিম কহিল, এই কি আমার কাছে তুমি প্রত্যাশা কর?

বোধ হয় প্রশ্নটা অচলার কানেই গেল না। সে নিজের কথার রেশ ধরিয়া যেন আপনাকে আপনিই বলিতে লাগিল, তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না। আমি আর কি করব!

মহিম কোন জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু এই নৈরাশ্যের কণ্ঠস্বর এই নিরভিমান, নিঃসঙ্কোচ, নির্লজ্জ উক্তি আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এই সুর কানের মধ্যে লইয়া সে বাইরে প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাই ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়! আপনার ভারে সে আপনি ভারাক্রান্ত, আবার

তাহারি মাথায় সুরেশ যে তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির গুরুভার চাপাইয়া এইমাত্র কোথায় সরিয়া গেল, এ বোঝাই বা সে কোথায় গিয়া কি করিয়া নামাইবে ?

রঘুবীর অনেক পরিশ্রমে খবর লইয়া আসিল যে, ডিহরীর পথে ক্রোশ-তিনেক দূরে কাল সকালেই একটা হাট বসিবে, চেষ্টা করিলে সেখানে গো-শকট পাওয়া যাইতে পারে।

মহিমকে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে সঙ্কোচের সহিত জানাইল, নিজে সে এখনি যাইতে পারে, কিন্তু এ গ্রামে বোধ হয় কেহ ভয়ে আসিতে চাহিবে না। কিন্তু মাইজী যদি এই পথটুকু—

অচলা শুনিয়া বলিল, চল; এবং তৎক্ষণাৎ উঠিতে গিয়া সে পা টলিয়া পড়িতেছিল, মহিম হাত বাড়াইতেই সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে স্থির করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লজ্জায় বিতৃষ্ণায় মহিমের সমস্ত দেহ সংকুচিত হইতে লাগিল, নিজের হাতটা সে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, আজ না হয় থাক।

কেন ? এই যে তুমি বললে, এখানে থাকা উচিত নয়। আর ডিহরী থেকে গাড়ি আনিয়ে যেতেও কালকের দিন কেটে যাবে ?

কিন্তু তুমি যে বড় দুর্বল—

অচলা হাত ছাড়ে নাই, সে হাত ছাড়িল না। শুধু মাথা নাড়িয়া কহিল, না চল। আর আমি দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল যেতে পারব।

চল, বলিয়া মহিম রঘুবীরকে অগ্রবর্তী করিয়া যাত্রা করিল। সে মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া আপনাকে সহস্রবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহার শেষ হইবে কোথায় ? এ যাত্রা থামিবে কখন এবং কি করিয়া ?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ডিহরীর বাটীতে পৌঁছিয়া অচলা সেই মোটা খামখানি বাহির করিয়া বলিল, এই তার উইল। মহিম হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার মধ্যে সুরেশের চিঠি আছে। পত্রে কোন্ অচিন্তনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, কোন্ দুর্গম রহস্যের পথের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তদ্দণ্ডেই জানিবার জন্য মনের মধ্যে তাহার ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড ইচ্ছাকে সে শান্তমুখে দমন করিয়া কাগজখানি পকেটে রাখিয়া দিল।

অচলা কহিল, তুমি কি আজই ডিহরী থেকে চলে যাবে ?

হাঁ, এখানে থাকবার আর আমার সুবিধা হবে না।

আমাকে কি চিরকাল এখানেই থাকতে হবে ?

মহিম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও ?

অচলা কহিল, কাল থেকেই আমি তাই কেবল ভাবচি। শুনেচি, বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় আমি জানিনে,

কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু,—বলিতে বলিতেই তাহার বড় বড় চোখ-দুটি জলে টলটল করিতে লাগিল। এই প্রথম তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

মহিমের বুকে করুণার তীর বিঁধিল, কিন্তু সে কেবল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, আমিও জানিনে, তবে খোঁজ নিতে পারি।

কখনো তোমাকে চিঠি লিখলে, কি তুমি জবাব দেবে না?

প্রয়োজন থাকলে দিতে পারি। কিন্তু আমার গুছিয়ে নিয়ে বার হতে দেরি হবে—আমি চললুম।

অচলা তাহার শেষ দুঃখকে আজ মনে মনে স্বামীর পায়ে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়া সেখানেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি বাহির হইয়া গেলে চৌকাঠ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথে চলিতে চলিতে মহিম ভাবিতেছিল, রামবাবুর বাটীতে একমুহূর্তও থাকা চলে না, অথচ শহরের মধ্যে আর কোথাও একটা দিনের জন্য আশ্রয় লওয়া অসম্ভব। যেমন করিয়াই হোক, এ দেশ হইতে আজ তাহাকে বাহির হইতে হইবে, তা ছাড়া নিজের জন্য তাহার এমন একটা নিরালা জায়গার প্রয়োজন, যেখানে দু দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া শুধু কেবল খামখানার ভিতর কি আছে, তাই নয়, আপনাকে আপনি চোখ মেলিয়া দেখিবার একটুখানি অবসর মিলিবে।

অচলাকে তিলে তিলে করিয়া ভালবাসিবার প্রথম ইতিহাস তাহার কাছে অস্পষ্ট কিন্তু এই মেয়েটিকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম তেমনি উপমাবিহীন। আবার নিঃশব্দ সহিষ্ণুতার শক্তিও বিধাতা তাহাকে হিসাব করিয়া দেন নাই। তাহার গৃহ যখন বাহির এবং ভিতর হইতে জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে ঐখানে দাঁড়াইয়াই ভস্মসাৎ হইল—এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংসারে ছড়াইতে পাইল না। কিন্তু আজ তাহার শক্তির ডাক কেবল সহিবার জন্য পড়ে নাই—সামঞ্জস্য করিবার জন্য পড়িয়াছে। আজ একবার তাহার জমা-খরচের খাতাখানা না মিলাইয়া দেখিলে আর চলিবে না। কোথাও একটু নির্জন স্থান আজ তাহার চাই-ই চাই।

বাটীতে পৌঁছিয়া নিজের জিনিসপত্রগুলো সে তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইল, পাঁচটার ট্রেনের আর ঘণ্টা-খানেক মাত্র সময় আছে। রামবাবুর কাশী হইতে ফিরিতে সম্ভবতঃ বিলম্ব হইবে, কারণ যথার্থই তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়াছেন এবং তাহার পূর্বে জলস্পর্শ করিবেন না বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লওয়া চলে না। এই কর্তব্যটা সংক্ষিপ্ত পত্রে শেষ করিয়া দিতে সে কাগজ-কলম লইয়া বসিল। দুই-এক ছত্র লিখিয়াই তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ মুখের উগ্র উত্তপ্ত বিদ্রূপগুলাই তাহার মনে হইতে লাগিল; এবং ইহারই সহিত আর একজনের অশ্রুজলে অস্পষ্ট অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের কাতর প্রার্থনাও তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। তন্দ্রার মধ্যে বেদনার ন্যায় এতক্ষণ পর্যন্ত ইহা তাহার চৈতন্যকে সম্পূর্ণ জাগ্রত রাখিয়াও রাখে নাই, ঘুমাইয়া পড়িতে দেয় নাই, কিন্তু রামবাবুর সেই কথাগুলা যেন ধাক্কা মারিয়া চমক ভাঙিয়া দিল।

এই প্রাচীন ব্যক্তির সহিত তাহার পরিচয় বেশীদিনের নয়, কিন্তু ইঁহার দয়া, ইঁহার দাক্ষিণ্য, ইঁহার ভদ্রতা, ইঁহার অকপট ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার অনেক কাহিনী সে শুনিয়াছে—এইগুলি এখন অকস্মাৎ তাহারা রুদ্ধ চক্ষুতে যেন একটা সম্পূর্ণ অপরিদৃষ্ট দিক নির্দেশ করিয়া দিল।

এই বৃদ্ধ অচলাকে তাঁহার সুরমা-মা বলিয়া, কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই মেয়েটি ভিন্ন তিনি কখনো কোন পরগোত্রীয়ার হাতের অন্ন স্পর্শ করেন নাই, ইহাও মহিমের কাছে স্নেহচ্ছলে গল্প করিয়াছেন, সুতরাং সর্বনাশটা যে তাঁহার কোন্ দিক দিয়া পৌঁছিয়াছিল, ইহা অনুমান করা মহিমের কঠিন নয়; কিন্তু এখন এই কথাটাই সে মনে মনে বলিতে লাগিল, অচলার অপরাধের বিচার না হয় পরে চিন্তা করিবে, কিন্তু এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় একনিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম, এবং মানবজীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে, সে কোন্ সত্যবস্তু বহন করিতেছে? যাহা ধর্ম সে ত বর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা!

তাহার সহসা মনে হইল, তবে কি তাহার নিজের পলায়নটাও—কিন্তু চিন্তাটাকেও সে তেমনি সহসা দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া কলমটাকে তুলিয়া লইল এবং ক্ষুদ্র পত্র অবিলম্বে শেষ করিয়া স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ট্রেন আসিলে যে কামরার দ্বার খুলিয়া মহিম ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল, সেই পথেই একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক একটি বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া নীচে নামিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন, এ কি, মহিম যে?

মৃণাল পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সেজদা, যাচ্ছো কোথায়? বলিয়া উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিল মহিম গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে।

মহিম কহিল, আমি কলকাতায় যাচ্চি; সুরেশবাবুর বাড়ি বললেই গাড়োয়ান ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখানে অচলা আছে।

কেদারবাবু আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিম বলিল, সুরেশের মৃত্যু হয়েছে। অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।

মৃণাল তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুধু কহিল, পারবে বৈ কি, সেজদা। কিন্তু আমার সকল শিক্ষা ত তোমারি কাছে। আগ্রহই বল আর আগ্রহই বল, সে যে তার কোথায়, এ খবর সেজ্‌দিকে আমি দিতে পারব, কিন্তু সে ত তোমারই দেওয়া হবে।

মহিম কথা কহিল না। বোধ হয় নিজেকে সে এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রমণীর কাছ হইতে গোপন করিবার জন্যেই মুখ ফিরাইয়া রহিল।

গাড়ির বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মৃণাল বুড়ের প্রসারিত ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চল বাবা, আমরা যাই।

॥ উপন্যাস পাঠ ॥

এক

শরৎচন্দ্র ও তাঁর জগৎ

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতো তাঁর জীবনও কম চমকপ্রদ নয়। লেখক হিসেবে তিনি যতটা পরিচিত ছিলেন ব্যক্তি হিসেবে হয়তো তার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিলেন। জীবিতকালেই শরৎচন্দ্র হয়ে ওঠেন এক প্রবাদকল্প পুরুষ। জীবন-যাপনের শৃঙ্খলার মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা চলে না; রবীন্দ্রনাথের জীবনাচরণ পদ্ধতির সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের তুলনা হয় না। হয়তো কিছুটা মেলে মধুসূদনের সঙ্গে—কিন্তু সে মিল সামান্যই। প্রৌঢ় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনকে তুলনা করবার একটা চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু সেই রকমের বিচার-এর বিশেষ কোন ভিত্তি নেই। উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের বিন্যাসটাই আলাদা। বলা যেতে পারে, শৈশব থেকেই তিনি ভবঘুরে—মুসাফির। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র পরিচয়হীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে যাত্রা করেন বর্মা মুলুকে। যখন রেঙ্গুনে পেঁছোন তখন তাঁর পকেটে মাত্র দুটি টাকা। রেঙ্গুন একদিক থেকে শরৎচন্দ্রকে গৃহস্থ করেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এ ছাড়া রেঙ্গুন বাসের দিনগুলিতেই শরৎচন্দ্র প্রথম গভীর ভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পান। আর যে বঙ্গভূমিকে তিনি পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলেন তার প্রতি গভীর টান অনুভব করেন রেঙ্গুনের প্রবাস জীবনে।

বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন সাহিত্যানুরাগ এবং ভবঘুরে বৃত্তি আর দারিদ্র্য।

মতিলাল কখনো কখনো রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন, কোনো একটি চাকরী গ্রহণ করতেন, তারপর সাতটি সন্তানের কথা ভুলে সোজা

বাড়ি চলে আসতেন। মাতুলদের সাহায্যে এবং সান্নিধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা গিয়েছিল সতেরো বছর বয়সেই। সেই অনুরাগ পরবর্তী কালে গভীর প্রেমে পরিণত হয়।

শরৎচন্দ্রের বিচিত্র জীবনদৃষ্টে কেউ কেউ তাঁকে তুলনা করেছেন দস্তয়ভস্কির সঙ্গে। কেউ কেউ গোর্কি'র জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের tramp জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু গোর্কি'র জীবন দর্শনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবন ভাবনার ফারাকটা খুব সহজেই চোখে পড়ে।

গোর্কি যে জগতের মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন সেটা আদ্যন্ত disagree-র জগত। শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও অনাথ হয়েছিলেন বাল্যকালে, পলাতক জীবন যাপন করেছেন, সেই সূত্রে নানা মানুষ ও পরিবেশকে দেখেছেন। কিন্তু গোর্কি শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছে গেলেন সেই শিখরদেশটি শরৎচন্দ্র-এর পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব হয় নি।

মনে হয়, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী মিল রয়েছে চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-১৮৭০)। জীবিত কালে ডিকেন্স যে জন অভ্যর্থনা লাভ করেছেন তা এক কথায় ঈর্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এবং ডিকেন্সের জনপ্রিয়তার মধ্যেও এক ধরনের মিল লক্ষ্য করা যায়। এঁরা উভয়েই কোন এক প্রভাতে অনুভব করেছিলেন তাঁদের লোকপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে—হয়তো মনে মনে বলেছিলেন,

"I awoke one morning and found myself famous."

জনপ্রিয়তার নেপথ্যে অজস্র চোখের জল, ঘাম, রক্ত ঝরাতে হয়েছে ডিকেন্স এবং শরৎচন্দ্রকে। ঋণ শোধ করতে না পারায় ডিকেন্সের পিতাকে কারাবন্দী হতে হয়। পনেরো বছর বয়সে ডিকেন্স উকিলের কেরাণী বৃত্তি করেছেন, বিশ বছরে পার্লামেন্টের রিপোর্টার। কিছুকাল বোতলের গায়ে লেবেল এঁটেছেন, street singer হিসেবেও ডিকেন্সকে দেখা গেছে। ক্ষোভে, দুঃখে গ্লানিতে তথাকথিত সমাজপতিদের উদ্দেশে ডিকেন্স বলেছিলেন Feed before you moralise। অভাগীর স্বর্গের শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়।

শরৎচন্দ্র জন্মাবার ছয় বছর আগে ডিকেন্স গতায়ু হন। তথাপি ডিকেন্সের অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার জগতের যথেষ্ট মিল আছে। ডিকেন্সের নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন শরৎচন্দ্র। ডিকেন্সের মতো শরৎচন্দ্রও আত্মজৈবনিক। উপন্যাসের plot কিছুটা ঢিলেঢালা—উভয়ের-ই। অকারণ সিক্ততা, ভাববাদের চর্চা ও পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠা উভয়ের উপন্যাসেই আছে। প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি উভয়ের উপন্যাসকে রঙীন করেছে। নাটকীয়তা, হিউমার, আতিশয্য উভয়ের উপার্জন। গল্প ভালো হওয়া চাই এবং ভালো করে শেষ করা চাই—এ যেন উভয়ের মনের কথা। চড়া গলার বিদ্রোহী এঁরা কেউ-ই নন। উভয়েই বিতর্কিত শিল্পী এবং বহুজন স্বীকৃত শিল্পী। কিশোর জীবন নিয়ে একটু আলাদা করে

ভেবেছেন দুজনেই। শরৎচন্দ্রের চাইতে ডিকেন্সকে অনেক তরুণ মনে হয়। আদর্শবাদ উভয়ের মধ্যেই কাজ করেছে। ব্যাপকার্থে উভয়েই হিউম্যানিস্ট। শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের মতো তরুণের চালে চলেন নি—তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোথাও একটা প্রৌঢ়তা ছিল। এই প্রৌঢ়তা সম্ভবত আধা-ফিউডাল সমাজের দান। শরৎ-চন্দ্র ডিকেন্সের মতো উত্তাল সময়কে স্পর্শ করতে পারেন নি প্রথম দিকে। রেঙ্গুন থেকে পাকাপাকি ফিরে আসার পর তাঁর দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত। ঐ সময় থেকেই তিনি দ্বিজ হন—প্রকৃত অর্থে।

বারো তেরো বছর নির্বাসিতের জীবন-যাপন করেছিলেন শরৎচন্দ্র। বর্মা যাবার আগেই লিখেছিলেন 'মন্দির', পুরস্কারও পেয়েছিলেন—সে কথা শরৎ অনুরাগীরা জানেন। বর্মা গিয়ে লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। চাকরী, পড়াশুনো, প্রেম, বিবাহ, পুত্রলাভ, প্লেগ—এইসব নিয়ে তাঁর দিন কেটে যায়। দিন যাপনের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনো করেন। দর্শন, ইতিহাস, বায়োলজি, বোটানি—সবই তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। কিছুটা ডারুইন পড়েছিলেন, হাক্সলি, হর্বর্ট স্পেনসরও পড়েছেন তিনি। মনে হয় উপন্যাস নিয়ে শরৎচন্দ্র বেশী মগ্ন থাকতেন। ডিকেন্স ছাড়া জোলা, অস্টেন, হেনরি উড, মেরি করেলি শরৎচন্দ্রের প্রিয় ঔপন্যাসিক। কলেজ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছিলেন, রেঙ্গুনে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ।

রেঙ্গুন থাকাকালীন কয়েকবার কলকাতা এসেছেন, বন্ধুবর্গের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করেছেন। মূলত সেই বন্ধুগোষ্ঠীর অনুরোধে 'ভারতী'র পাতায় দেখা দিল 'বড়দিদি' (১৩১৪) এবার ফণীন্দ্রনাথ পাল 'যমুনা'র জন্য আদায় করতে থাকলেন একটার পর একটা রচনা। শরৎচন্দ্রকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে যে শূন্যতাটুকু ছিল শরৎচন্দ্র অবলীলায় সেটা ভরাট করলেন। বাংলা উপন্যাস এই প্রথম পেল একটি মধ্যবিত্ত মানুষের পরিচর্যা। মূলত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের চেতনায় যেমন মৃণাল সত্য, অন্নদাদিদি সত্য, তেমনি সত্য অচলা আর কমল। শরৎচন্দ্রকে অভিবন্দনা করেছেন অতি সাধারণ মেয়ে—অন্তঃপুরের তমোময় প্রদেশে যার বাস, যে ফরাসী জর্মান জানে না, শুধু কাঁদতে জানে; আবার শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন পড়ে শিহরিত হয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জাগ্রত শিল্পী। মধ্যযুগীয় মানসিকতা, তুচ্ছ সেণ্টিমেণ্ট ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও শেষদিকে শরৎচন্দ্র গুরুতর বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আধুনিকদের সমর্থন করেছিলেন। আধুনিকেরাও শরৎচন্দ্রের স্নেহাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রথের রশি' নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রথম যথার্থ রাজনৈতিক নাটকটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'কে পরোক্ষে সমর্থন করেছিলেন।

কথাসাহিত্য, বিশ্বাসের জগৎ :

১৯০৭—এই সময় থেকেই শরৎচন্দ্রের নাম সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯০১ নাগাদ শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি'-র লেখা সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন। আমাদের ধারণা এই সময়েই শরৎচন্দ্র দেবদাস, চন্দ্রনাথ, অনুপমার প্রেম, কাশীনাথ প্রভৃতি নানা উপন্যাসের প্লট মনে মনে ছকে রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের আগে দরদী, মরমী এইসব বিশেষণগুলো যুক্ত হলো চলমান শতকের প্রথম তিনটি দশকে। এই সময়ে তাঁর নামের শেষে ডি. লিট্. উপাধিটি যুক্ত হয়—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্র উচ্চারিত হতে থাকেন শরৎচন্দ্র।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসের জগৎটিকে চিনতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বলে ওঠবার জন্য প্রয়োজন হয় ভোরবেলাকার সল্‌তে পাকানোর কাজ। সেই কর্মকেন্দ্রের মর্মে প্রবেশ করতে হবে। মর্মে প্রবেশ করে দেখা যাবে সাতাশ বছর বয়সে (১৯০৩) শরৎচন্দ্র যখন বর্মামুলুকে পদসঞ্চার করলেন তখন তার মন ও প্রাণ আচ্ছন্ন করে আছে ভারতবর্ষের প্রথাবদ্ধ সমাজ। উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। চৌদ্দ বছর ছিলেন রেঙ্গুনে। রেঙ্গুন প্রবাসকে অজ্ঞাতবাস বলা যায়। শরৎচন্দ্র যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স আঠারো থেকে ছাব্বিশ তখন তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ভাগলপুর। সেখানকার প্রবাসী বাঙালী সমাজের সঙ্গে দেবানন্দপুরের সমাজ-জীবনের অথবা কলকাতার পার্থক্য ছিলই ছিল।

উনিশ শতকে যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিল তার বিস্তার ঘটেছিল মূলত শহরাঞ্চলে, গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। নাগরিক জীবনের দ্যুতি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপকে যে দীর্ঘকাল পরে বিলোড়িত করেছিল তার প্রমাণ তারাশঙ্করের গণদেবতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে বাংলার গ্রাম-জীবন যে কতটা অবিকম্পিত ছিল তার ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন চার্লস মেট্‌কাফ। শরৎচন্দ্র সেই অনড় অচল গ্রাম-জীবনের মধ্যে যুবক হয়ে উঠেছিলেন। 'সমাজধর্মের মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সেই মধ্যযুগীয় গ্রাম-জীবনকে 'পূজনীয়' বলে বিবেচনা করেছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান এটা ভুলে গেলে চলবে না। যৌথ পরিবারের মধ্যে তাঁর লালন ও বর্ধন, তরুণ জমিদারের সখ্য তিনি লাভ করেছিলেন। জীবনে পেয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-মমতা, ভালবাসা। কাজেই শরৎচন্দ্রের সত্তার গভীরে নিহিত ছিল প্রাচীনের প্রতি সমর্থন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে শরৎচন্দ্র রচনা করেন 'বিপ্রদাস', সেখানে দেখি আত্মসম্মানবোধদৃপ্ত নায়িকা শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছে আচারপরায়ণ পরিবারের প্রতি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। উনিশ শতকীয় জীবন-প্রত্যয়, মূল্যবোধ শরৎচন্দ্রের চেতনার শিকড়কে স্পর্শ করেছিল, প্রচণ্ড অভিঘাত সৃজন করেছিল। কৈশোরে তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে শরৎচন্দ্র আজীবন লালন করেছেন—

কখনো বিষয়ে, কখনো ফর্মে। ঘটনাপ্রসবী ঘটনা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ঘটনা পরম্পরার বিবরণ তা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আছে তেমনি আছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আমরা অন্য শরৎচন্দ্রকে দেখি। কৈশোর যৌবনের সেই মুগ্ধতা তখন অনেকটাই কেটে গেছে। 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে তখন শরৎচন্দ্র ঘোষণা করলেন: 'রোহিণীর মৃত্যু, আর্টের মৃত্যু।'

অতি তরুণ বয়সেই শরৎচন্দ্রের একটা প্রতিবাদী মেজাজ ছিল। তরুণ বিদ্রোহী রূপেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রবল স্বদেশানুরাগ ছিল, ভাবাবেগ ছিল, ছিল আপোষহীনতা। বিশ শতকের নয়, উনিশ শতকের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি দেখেছিলেন প্রথাবদ্ধ সমাজের নিষ্ঠুর রূপ। সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজ-কাঠামোর অনেক সদর্থক রূপের সাক্ষাতও তিনি লাভ করেছিলেন। সে কারণে শরৎচন্দ্র বারবার ফিরে গেছেন উনিশ শতকের গ্রামজীবনাশ্রিত মূল্যবোধ-এ। শেষ বয়সেও সেই মূল্যবোধের প্রতি তিনি আস্থা হারান নি।

'চোখের বালি' আত্মপ্রকাশের বছরে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে অবতরণ করলেন। অর্থাৎ বাঙালীর জাগরণ ও বিস্ফোরণ-এর সময়ে শরৎচন্দ্রকে দেশ ছাড়তে হলো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে জাগরণের অরুণিমা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যাহ্ন দীপ্তি দেখা গেল বিশ শতকের সূচনায়। আমরা 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'চোখের বালি'র যুগে উত্তীর্ণ হলাম। ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শরৎচন্দ্র বিদেশে পাড়ি দিলেন। ব্রহ্মপ্রবাসের ফলে শরৎচন্দ্রের অশেষ উপকার হয়েছিল বলা যায়। প্রবাসের নির্জনে আপন সত্তার সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি ঘটলো। শরৎচন্দ্র এমন একটা ভূখণ্ডে গিয়ে পড়লেন যেখানে লক্ষ্য করলেন সমাজবন্ধনের শৈথিল্য, নারীর ব্যক্তিত্ব সচেতন রূপ। নতুন করে ভাববার সুযোগ পেলেন শরৎচন্দ্র। অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে করতে যখন ক্লান্তিতে তিনি ভেঙে পড়তেন তখন হাতে উঠে আসতো 'চোখের বালি' 'নষ্টনীড়'।

- ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।
- সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ন আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না।
- এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।

কথাগুলি শরৎসাহিত্য পাঠের মূল্যবান চাবিকাঠি স্বরূপ। 'চোখের বালি' (১৯০৩)-র সূত্রে শরৎচন্দ্র খুঁজে পেলেন বিশ শতকের মূল্যবোধ, তার অভিধান। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে ক্রমে গভীর ভাবে দাগ কাটছে, ভূমিকম্পলেখ যন্ত্রের মতো কম্পিত হচ্ছে ব্যক্তির মন—শরৎচন্দ্র এটা দেখতে পেলেন 'নষ্ট নীড়-এ, 'চোখের বালি'তে। দেওয়ালের লিখন তিনি নির্ভুল ভাবে পাঠ করলেন। পত্র-পত্রিকা থেকে জানতে পারলেন কবিগুরু বিশ্বভারতী তথা পল্লী সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত। নীরবে নিভৃতে একলব্যের মতো সাধনা শুরু করলেন শরৎচন্দ্র। সৃষ্টি হলো 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'চরিত্রহীন' এবং 'গৃহদাহ'-র কিছু অংশ।

গৃহদাহ

শরৎচন্দ্র তাঁর সামাজিক চেতনার পরিচয় দিলেন 'পল্লীসমাজ'-এ, কিছুটা 'শ্রীকান্ত' এবং 'গৃহদাহ'-এ। তবে বড়ো মাপে প্রেমকথা বিস্তার করে ব্যক্তিত্বের সংকটকে-ই দেখাবার চেষ্টা করলেন বিশেষভাবে। ধীরে ধীরে যেন বুঝতে পারছিলেন কুন্দ বা রোহিণীর মৃত্যু সর্বজ্ঞ লেখকের অভিপ্রায়-নির্ভর মৃত্যু। এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলেও সমাজশক্তির ক্ষত নির্ণয়ে শিল্পীর ভুল হয় নি।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে (১৯০৩-১৯১৬) তখন বাংলাদেশে নানা গণ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। স্বৈরশাসন একটা ভয়ংকর জায়গায় উপনীত হয়েছে। দেশের যুবসমাজের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছে যুগপৎ উদ্যম এবং হতাশা। একটা যুগের অবসানে এবং একটা নতুন যুগের আবির্ভাব-লগ্নে অর্থাৎ সন্ধিপর্বে সন্ধ্যা নামে—প্রভাতও আসে। সেই লগ্নকে প্রত্যক্ষ করা যায় তরুণদের মধ্য দিয়ে। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থেকে এটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় তিনি ছিলেন প্রবাসী। পাকাপাকিভাবে ফিরে এলেন ১৯১৬-র মাঝামাঝি। নতুন মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখার সৌভাগ্য হলো। একজন সংবেদনশীল কথা-সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন—মানবচরিত্র পরিবর্তনশীল। তখন তাঁর বয়স ঠিক চল্লিশ।

নবযুগ লেখকের নব জয়যাত্রার পথ প্রস্তুত করলো। অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। উত্তাল সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকলেন সংবেদনশীল মন নিয়ে। আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণাকে দেখলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক শরৎচন্দ্রের অন্বিষ্ট হলো। আধুনিক জীবনের অস্থিরতাই প্রতিফলিত হয়েছে চরিত্রহীনে, বিশেষ করে গৃহদাহে, শেষপ্রশ্নে। শ্রীকান্ত ২য় পর্বের অভয়া শরৎচন্দ্রের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যাকে শরৎচন্দ্র এড়িয়ে গেছেন এমন কথা বলা যাবে না। ১৯২২ এবং ১৯২৩—এই দু-বছরে শরৎচন্দ্র রচনা করেছেন 'মহেশ', 'দেনাপাওনা'। ১৯২৬-এ প্রকাশিত হলো 'পথের দাবী'। রুশ বিপ্লবের একটা দূরাগত প্রভাব শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে দেখা যায়।

স্বীকার করতে হবে, শরৎচন্দ্র জটিল সমস্যার গহনে প্রবেশ করতে পারেন নি। তিনি মানিকের মতো নির্মম স্রষ্টাও হতে পারেন নি। স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভঙ্গ—এই দু'য়ের মধ্যে যে একটা ব্যবধান আছে সেটা শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করতে চান নি। তাই যুগ যখন মানবাস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়িত তখন শরৎচন্দ্র তাঁর নায়ককে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাগলপুরে। আধুনিক জীবনের তরঙ্গাভিঘাত শরৎচন্দ্রকে আন্দোলিত করলেও তাঁর সত্তার অতলান্তিক গভীরে তা নাড়া দিতে পারে নি। তথাপি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রৌঢ় শরৎচন্দ্র তরুণদের উৎসাহিত করে রচনা করেন সাহিত্যের রীতি ও নীতি' (বঙ্গবাণী, আশ্বিন) প্রবন্ধটি।

কল্লোলের কোলাহলের সঙ্গে কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজেকে যুক্ত করেন নি। অতি

আধুনিকদের গর্জন, আলোচিত নোংরা কথাকে শরৎচন্দ্র ভালো মনে গ্রহণ করেন নি। তাই শেষ প্রশ্নের কমল শেষ পর্যন্ত ঘর বাঁধার স্বপ্নই দেখেছে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের সদর্থক রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। ব্রাহ্মসমাজে পানুবাবুর মতো লোক থাকলেও পরেশবাবুর মতো সহৃদয় মানুষের অভাব ছিল না। ফলে রবীন্দ্রনাথ খুব নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করেছেন 'গোরা'য়। 'গোরা' উপন্যাসের ভক্ত-পাঠক শরৎচন্দ্র তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ব্রাহ্ম-ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনা উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সেই আলোচনার কোন শিকড় নেই, ক্ষীণ মূল আছে, আর আছে অতি দুর্বল কাণ্ড। শরৎচন্দ্রের মধ্যবিত্ত মানসিকতা ঘটা করে সমস্যার বোধন করে, তারপর সমাপ্তির নিটোল ঐক্য রচনা করতে পারে না। এর কারণ তাঁর চেতনার এক প্রান্তে যেমন 'পথের দাবী' সত্য, তেমনি সত্য 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। উনিশ শতক সম্পর্কে নষ্টালজিয়া যেমন তাঁর ছিল তেমনি তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক পালাবদলের সাক্ষী।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল উপাদান দুটি : এক, তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ; দুই, তাঁর সহানুভূতি। আবার এই উভয়ের সঙ্গে জড়িত সংস্কার ও ভাবাবেগ। সমকালের পল্লীসমাজে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, গ্রাম-সমাজের রুচি-সংস্কারের সঙ্গে সমাজপতিদের প্রাধান্যে সমাজ নামক ধারণাটিকে যেন তেন প্রকারেণ পরিচালনার ঈপ্সা। এতো তীক্ষ্ন ও নগ্নভাবে সমাজকে আগে কেউ দেখেন নি, তাকে বিশ্লেষণও করেন নি, তবে নির্মমতার সাক্ষীও কেউ ছিলেন না। নিম্নগামী স্নেহ, সমভাবের প্রেম যেমন অবলীলাক্রমে স্থান পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে, সেই সঙ্গে বঞ্চিত নারীর সমস্যায় ভরে উঠেছে তাঁর রচনা। নারীমনের আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার দিকগুলি এতো স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত যে সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া দুঃসাধ্য। সমাজের যূপকাষ্ঠে বলীপ্রদত্ত নারীদেরই সামনে এনেছেন শরৎচন্দ্র। আর আছে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম, পরস্ত্রী থেকে বারবণিতা, বাঈজী কেউ বাকি নেই সেখানে। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম সংস্কারাপন্ন মন নিয়েও বর্ণনায় ক্ষান্তি ছিল না তাঁর। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীকার করে নেওয়া ভালো তাঁর উপন্যাসের মূল উপাদানের দ্বিতীয়টি, তাঁর সহানুভূতির তীব্রতায় চরিত্রগুলি আর্দ্র করে রেখেছেন, তার ফলাফল যাই হোক্। তার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে শরৎচন্দ্র খুব তৎপর ছিলেন সে কথা অবশ্য বলা যায় না। কিরণময়ীর সমস্যার সঙ্গে রমার সমস্যার কোন মিল নেই। অমিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কমলেরও, তবু ফলাফলের দিক থেকে তার গরমিলও নেই। অভয়া বা অচলা যা চায় বা হতে চায় বন্দনা তা চায় না, কিন্তু পরিণাম কোনো ক্ষেত্রেই ভিন্ন নয়। সমাজ-সচেতন সহানুভূতিতে আপ্লুত লেখকের সমস্যাটা মূলত দ্বিধাজাত, কতকগুলি প্রচলিত ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত না করতে পারার সমস্যা। হিন্দু বিবাহ, হিন্দুধর্মীয় সংস্কার, নরনারী সম্পর্কে সনাতন ধারণা, কেন্দ্রমুখী নারী, কেন্দ্রচ্যুত পুরুষ—এর বাইরে শরৎচন্দ্রের পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাঁর

বিশ্বাসের জগৎ এক সসীম গণ্ডীতে আবদ্ধ। সমাজের মধ্যে নারী ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন করেছেন এমন এক লেখক যিনি নারীমনের সকল অলিগলির সংবাদ রাখেন। সমাজ থেকে বিযুক্ত নারী, তার অধিকার, তার সত্তা, তার নিজত্ব এগুলি খুব বেশি মূল্য পেতে দেখা যায় না। যিনি নিজে কবুল করেছেন বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা তাঁর রচনায় নেই, তাতে কেউ কেউ বিস্ময়বোধ করতে পারেন। রমার জন্য রমেশ, শ্রীকান্তের জন্য রাজলক্ষ্মী বোধকরি শরৎচন্দ্রের বিধাতাই সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমাজ তার মাঝখানে বিযুক্তিকরণের যে দেয়াল তুলে ধরেছে, তা অনতিক্রম্য। তবু শরৎচন্দ্র জানেন সমাজ-বহির্গত প্রেম আছে, সেই প্রেম দূরের ঠিকানা জানে, বেদনা-উত্তীর্ণ হয়ে মিলনের তাৎপর্য বোঝে।

নিষিদ্ধ-প্রেমের কথাকার উদ্দাম-প্রেমের বাঁধনহারা রূপ দেখাবেন রুচিশীল পাঠক তা প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু সংযমের নিগড়ে বেঁধে সমাজ হেন মূর্ত ধারণার মধ্যে বিসর্জিত করাকেও অনুমোদন করেন না। কী আনন্দ বা পরিতৃপ্তি পায় রাজলক্ষ্মী তার উপবাসে, শুচিবায়ুগ্রস্ততায়, সাবিত্রী তার সর্বস্ব পরিত্যাগে, কেন লেখকের এ ধরনের সমাধানের পথ বেছে নিতে হয় এসবের সদুত্তর পাওয়া যায় না। সুরেশের চুম্বনে অচলার ঠোঁট দুটি কেন বিছার কামড়ের মতো জ্বলে, কিরণময়ীর উন্মাদ হওয়া ভিন্ন কেন গত্যন্তর থাকে না, রমার কাশীবাস কোন্ সমস্যার সমাধান ঘটায়, জানতে ইচ্ছে করে। কমলের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় শিবনাথের সঙ্গে বিবাহ-শৈবমতে বলে বিশ্বাস করে, বন্দনার আবাল্য শিক্ষা, তার সংস্কার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। জীবনের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের দোলায় দোলায়িত শ্রীকান্ত, ঘর ও বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে উঠতে পারে না। সতীশকে কেন নিশ্চিত জীবনের আবাস থেকে মাধুকরী বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তারও উৎস শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসের জগতে নিহিত। অথচ অন্নদাদিকে ঘর ছাড়তে হয় কালিন্দী নদীর কূলের জন্যে বা গোষ্ঠ ও গোকুলের আকর্ষণে নয়, কেবল বঙ্কুর মা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে কেন পিয়ারীকে এর উত্তরও মেলে না উপন্যাসে। সতীত্ব বস্তুত কী এবং কেন, তার আকার আয়তন সম্পর্কে অনভিজ্ঞকে সেটুকুকে বজায় রাখতে গিয়ে যা কিছু ইহলৌকিক তাকে বিসর্জন দিতে হয়। দেহের শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসেই নারী পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয় পুরুষের কাছে। 'মৃণালের জাত বিচার করে গৃহদাহ উপন্যাসে সুরেশ বলে, 'বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত'-এতে আত্মশ্লাঘাও বোধ করে সুরেশ, বোধকরি তার স্রষ্টাও। 'দেখতে দেখতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল'—কীসের ক্রোধ? সতী হতে না পারার ক্রোধ কী? না হলে সে প্রত্যুত্তর কেন দেবে এই বলে, 'সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে, যারা মনে মনেও একবার কাউকে স্বামীত্বে বরণ করলে, সহস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এঁদের কথা ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি বলে জেনে

রাখবেন সুরেশবাবু।' মৃণালের জাতের হতে না পারায় দুঃখ নেই, তবে সতী হতেই হবে অচলার বক্ষপুটে এ ধারণা মহাকালের মতোই অক্ষয়। নইলে পরের পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র অচলার মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলতেন না, 'কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী জীবনের সতীত্ব যে কত বড় সম্পদ তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।' 'স্বামীর প্রতি কায়মন-নিষ্ঠাই যে সতীত্ব একথা তাহার অবিদিত ছিল না'। এত দোলাচলতা সত্ত্বেও অচলা পর্যন্ত তার হাত থেকে রেহাই পায় নি। এ সকল চরিত্রের স্রষ্টা সম্বন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক যখন বলেন, 'একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতি নিয়ামক হইবেন' তখন পরবর্তী পর্বের উপন্যাসের ভাগ্য যে খুব সুপ্রসন্ন একথা নিশ্চিতকরে বলা বোধ হয় কষ্টসাধ্য। যদিও স্বীকার করে নিতে বাধা নেই যে 'তিনি প্রেম-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।'

পল্লী-সমাজের বিশ্লেষক কী চেয়েছিলেন? কেবল ভাবাবেগ ও সহানুভূতি দিয়ে চরিত্র-সৃষ্টি তার মূলে শরৎচন্দ্র চিরকাল বেঁচে থাকবেন? 'শেষ প্রশ্ন' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়তো আছে কিন্তু সমাধান! ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক তা ছাড়া আর কিছুই নই।' সমাধান হয়তো লেখকের কাছে প্রার্থিত নয়, কিন্তু কেবলি সমস্যার পর সমস্যা তুলে ধরা, ইঙ্গিতটুকুও লেখকের ঈপ্সিত নয়। সমাজ-সংস্কারের দুরভিসন্ধি না থাকুক, সংস্কার শক্তির প্রয়োজনে রচিত চরিত্র ও পটভূমিকা 'দেশের হৃদয় যারে রাখিয়াছে ধরি' এমন লেখকের কাছ থেকে পাওয়া না গেলে অন্যত্র কোথায় তার অন্বেষণ করা যাবে? সকল লেখক জীবনের সকল দিকের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেন না, সত্য কথা। কিন্তু যে দিকটি আলোকিত হয়, তার মধ্যে সংস্কার মুক্তির পথনির্দেশ থাকবে এ আশা দুরাশা নয়। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসের জগৎটি কতদূর বিস্তৃত, সমাজ-জীবনের কোন্ কোন্ দিকগুলি এবং ঔপন্যাসিককে মনস্তাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া গেলে মনোজগতের কোন্ অংশগুলি যথার্থ রূপে প্রতীয়মান হবে তা জানার আগ্রহ থাকতেই পারে। টলস্টয় আদর্শবাদী ছিলেন। ঋষি ঔপন্যাসিকরূপে তাঁর খ্যাতিও বিশ্বজুড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বরূপে জীবনকে সমাচ্ছাদিত করতে চেয়েছেন, এতে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ প্রশ্ন ওঠে না। শরৎচন্দ্র উভয়ের আদর্শবাদের চেয়ে অগ্রসর হবেন, প্রত্যাশা যে সেটাই, নীতিবাদ তাঁর প্রার্থিত হোক্, তাতেও ক্ষতি নেই, তা তত্ত্বের বাহন না হয়ে বাস্তববাদীসম্মত হয়ে জীবনের ঊষর খণ্ড আর্দ্র করে তুললে কোনো প্রচারের প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষত যাঁকে পরবর্তী সাহিত্যের গতি নিয়ামক বলে ধরে নেওয়ার প্রসঙ্গ উঠেছে, তাঁর বিশ্বাসের জগৎ অপরের বিশ্বাসের কারণ হবে, এটা ভেবে নিলে তা খুব বেশি হবে কী?

চেতনার দুই দিগন্ত ঃ

মধ্যবিত্তের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরূপেই শিল্পী শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে হলে, তাঁর বিশ্বাসের জগৎটির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে এই কথাটি সবসময় মনে রাখা উচিৎ যে মধ্যবিত্তের সংকট শরৎচন্দ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। পারেন নি বলেই শিল্পী ব্যক্তিত্বের দোলাচল স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সৃষ্টিকেও স্পর্শ করেছে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র সৃষ্টিকে যদি খুব স্থূলভাবে রেঙ্গুন ও কলকাতা এই দু'টি ভূগোলে সংস্থাপিত করা হয় তাহলে একটা 'point of intersection' চোখে পড়ে। শুভদা, বিরাজ বৌ, অন্নদাদিদি, সৌদামিনীর কথামালায়, সেই সনাতন পাতিব্রত্যের জয়গাথা কীর্তন করেছেন যে শরৎচন্দ্র, তিনিই সুনন্দা, কিরণময়ী, সুমিত্রা, অচলা, কমলের স্রষ্টা—একথা ভোলবার নয়। বিশেষ করে অভয়ার কথা মনে পড়বে। অভয়া শরৎচন্দ্রের আধুনিক মনের প্রতিনিধি। বিপ্লবী নেত্রী সুমিত্রা নতুন কালের মানবী। 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল অসংখ্য প্রশ্নের জটিল গ্রন্থির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে বলেই বৃদ্ধ আশুবাবু চমকে ওঠেন। গিরিশের উপন্যাস, কমলের চলা পথে পা ফেলে। কমলের পাশে অন্নদা'দিদিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া অসম্ভব। এ যেন প্রথাহীনতার পাশে প্রথাবন্ধের অবস্থান। তবু শরৎ অনুরাগীকে মেনে নিতেই হয় অন্নদাদিদি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। সমালোচক আবেগ ব্যাকুল হয়ে বলেন—অন্নদা 'লিবারেল এডুকেশন'।

আসলে শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের সেই বিরল দ্বীপ, স্বতোবিরোধ যে দ্বীপের জমিনে-আশমানে। শুধু প্রেমচিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমাজ পর্যালোচনায়, সমস্যা নির্ধারণে, আর্থকাঠামোর বিচারে শরৎচন্দ্র সর্বদা সুচেতনার পরিচয় দিয়েছেন এমনটি বলা যায় না। তাঁর বোধের ভিতরে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বংশের সংস্কার যেমন কাজ করেছে তেমনি চলার বাঁকে বাঁকে তিনি পেয়েছেন চিরনতুনের পরিচয়। যেখানে সংস্কারাবদ্ধ গ্রামীণ জীবন, সেখানে শরৎচন্দ্র খুব স্বাভাবিক, যেখানে তার কল্পনা অনতিপরিচিত ভূগোলে সঞ্চরমান, সেখানে তিনি সংস্কারমুক্ত। তাই বলে হামসুনের মত শরৎচন্দ্র শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছেন এমন কথা বলা যায় না। দেবানন্দ-ভাগলপুর বাসের রক্ষণশীল স্মৃতি মুছে ফেলতে পেরেছেন শেষদিকে—এমন একটা উত্তরণের ছবি আমরা গড়তে পারি না শরৎ সমীক্ষায়। আবার এও দেখেছি এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শরৎচন্দ্র অভ্রান্তভাবে দেওয়ালের লিখন পাঠ করেছেন। 'অভাগীর স্বর্গ' বা 'মহেশ' গল্প তার-ই প্রমাণ।

পল্লীসমাজ (১৯১৬) শরৎচন্দ্রের স্মরণীয় সৃষ্টি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে-পরেই যে বাঙালী শিল্পী নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন, মধ্যসত্ত্বভোগী গ্রামীণ জমিদারদের মধ্যেও যে বিলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো, সেটা বুঝতে পারি 'পল্লীসমাজ' পাঠ করলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি বক্তব্যে আর একমুখী না থাকায় যথেষ্ট শিথিলবদ্ধ হয়ে উঠল।

আসলে যে সমাজ শরৎচন্দ্রের কাছে গল্প শুনেছে শরৎচন্দ্র সেই সমাজের আপোষ-কামী কথক। যুদ্ধ তিনি করেননি তা নয়, তার অস্ত্রে ধার ছিল না এমন কথাও বলা যাবে না—শুধু বলা যাবে ব্রহ্মাস্ত্র তিনি প্রয়োগ করেন নি। যে অস্ত্র প্রয়োগে সমাজ ওলট-পালট হয়ে যায়, এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়, সেই অস্ত্র শরৎচন্দ্রের কাছে মজুত থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত মরচে পড়ে নষ্ট হয়েছে। কিরণময়ীর প্রথম আবির্ভাব, তার তর্ক, অনঙ্গ প্রসঙ্গ যে আগুন তৈরি করেছিল, মেসের ঝি হয়েও সাবিত্রী যে শিখরে উঠেছিল, শরৎচন্দ্র নিজের হাতে সেই শিখরস্পর্শী অগ্নিশিখাকে নির্বাপণ করেছেন। উপেন্দ্রর চরণে উপনীত হয়েছে দুই রাগী যুবতী। সুর-লোকের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে সুরবালা।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি 'গৃহদাহে'র শরৎচন্দ্র অচলার মুখ দিয়ে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছেন, বৃদ্ধ কেদারবাবু মৃণালকে দেখে অভিভূত হয়ে বলেছেন—'..., না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভালমন্দ তর্ক তুলচি নে। কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে মলেও আমি মানবো না,......' [২৪-পরিচ্ছেদ]

বিধবাবিবাহকে অচলা বা কেদারবাবু সমর্থন করলেও মৃণাল সমর্থন করে নি। সুরেশ সমর্থন করেনি। যে সুরেশ মৃণালকে দেবী মনে করে সেই সুরেশের ভাষ্য আমাদের স্মরণে আছে ঃ

'বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত।'

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র সমর্থন করেছেন সুরেশকে—কেদারবাবুকে বা অচলাকে নয়। তাই একচল্লিশ পরিচ্ছেদে অচলার বয়স যখন একুশ মৃণালের কথা মনে পড়েছে অচলার। মৃণাল বলেছিল—'বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তি-তর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ 'ধর্ম'।' শরৎচন্দ্র মৃণালের 'ধর্ম'কে জিতিয়ে দিয়েছেন। তাই উপন্যাসের শেষে শিক্ষিতা ব্রাহ্মনারী অচলা মৃণালের আশ্রিতা।

'গৃহদাহ' (১৯২০) আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের দোলাচল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গৃহদাহ বড়ো মাপের উপন্যাস, উচ্চাভিলাষী রচনা। উপন্যাসের দুই প্রধান পাত্র উচ্চশিক্ষিত। একজন ডাক্তার, অপরজন এম. এ. এবং আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ—এটা ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা বিস্মিত হই তখন, যখন দেখি, দেশকাল সম্পর্কে, যুগের সংকট সম্পর্কে এরা নিদারুণভাবে নিশ্চুপ। সুরেশ কলকাতা শহরে কোনো রোগী নিয়ে ব্যস্ত নয়, মহিমের চিকিৎসা সে নিজে করে না, মাঝে একবার ছুটে গেল ফয়জাবাদে মাঝুলিতে গেল একইভাবে প্লেগের চিকিৎসা করতে।

মহিম যে দরিদ্র এ কথা উপন্যাসের শুরুতে এবং শেষে জানা যায়। সুরেশের মুখেও তা বারে বারে কথিত হয়েছে। অথচ মহিম নিজে এ ব্যাপারে বিকারহীন

ভাবে নীরব। তার ঘরে যে কোন অভাব আছে এটা কোন সময়েই বোঝা গেল না। অচলার কাছ থেকে আংটি পাবার পর মহিম সৌজন্যসূচক কোনো কথা বলে না। রাজপুর নামক গ্রামটির প্রতি তার গভীর টান একবারের জন্যও ধরা পড়ে না। সমাজপতিরা মহিমের কাছে যথারীতি আসেন, গায়ে পড়ে উপদেশ দেন—মহিম পিতৃবন্ধুদের উপদেশ নিয়ে কোনো সংকটে পড়ে না, সংগ্রাম করে না। সমাজপতিরা ধীরে ধীরে চলে যান ব্যর্থ মনোরথ হয়ে। এই ধরনের চিত্র গভীরতর অর্থে কোন উত্তরণ ঘটায় না। 'পল্লীসমাজে' যে বিশ্বাসযোগ্য ছবি আমরা পেয়েছিলাম তার সঙ্গে গৃহদাহের চিত্র মেলে না। সম্ভাব্য বিষয়েও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠারও একটা ব্যাপার থাকে ; গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছেন।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের অভিকেন্দ্রে আছে ব্রাহ্ম-হিন্দু ধর্ম বিতর্ক। শরৎচন্দ্র অচলাকে ইচ্ছে করেই ব্রাহ্ম দলভুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য দোলাচল ব্যাখ্যার স্বার্থে। অচলা যে ব্রাহ্ম নারী এই কথাটি বারংবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সুরেশ, রাক্ষুসী, রামবাবু—সকলেই তৎপর। তৎপর অচলাও। অচলা ব্রাহ্মধর্মের যেমন সপক্ষতা করেছে তেমনি বিপক্ষতাও। রামবাবুর সামনে অচলা ব্রাহ্মপিতার ছবিটি ম্লান হতে দেয়নি, কিন্তু অচলা যেখানে একা আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত সেখানে শরৎচন্দ্র অচলাকে অবলম্বন করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ৩৬ পরিচ্ছেদে আছে—'যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিমের শয্যা বা তব্মুলবাস কোনটাকেই কাহারও কামনার বস্তু বলিতে সে শুনে নাই। সেখানে প্রত্যেক চলাফেরা, মেলামেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে ;……'

ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন আজ অনেকটা অতীতের ব্যাপার, আমাদের কাছে সেই আন্দোলনের কিছু স্মৃতি আছে. কিছু পরিসংখ্যান আছে, পড়ে আছে কিছু ধূসর পাণ্ডুলিপি—তাও সঙ্গোপনে, নির্জনে। এতদ্সত্ত্বেও আমরা মানি ধর্মান্দোলনের সবটাই অমূলক নয়, আঁধি নয়। সেই আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিধা থাকলেও প্রাণময়তা ছিল, একটা ছন্দ ও স্পন্দ ছিল। জাগরণ ও বিস্ফোরণের সময় যে reformation চলেছিল, তারই পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মসমাজ। আমাদের মধ্যযুগীয় ঘুমঘোর যে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল, ব্রাহ্ম আন্দোলন তার স্মারক। এই সমাজে 'পানুবাবু'র সংখ্যাটাই বেশি ছিল এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, পরেশবাবুর সংখ্যা কম ছিল এমন কথাও শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ কালের মন্দিরাকে তুলে নিয়েছিলেন 'গোরা'য়। তাই সেখানে 'গোরা'র আর্যামি ধিক্কৃত, পানুবাবুর আচরণ শাসিত। বিবাহের ব্যাপারে শালগ্রামশিলা যে খুব একটা জরুরী নয়—মহাকবির এইটাই ছিল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত—১৯১০-এর পক্ষে নিশ্চয় ঐতিহাসিক।

শরৎচন্দ্র গৃহদাহে কেদারবাবুকে খাটো করেছেন। মৃণালের কাছেও হেরে গেছেন কেদারবাবু। কেদারবাবুর এই পরাজয় সর্বস্ব লেখকের ইচ্ছাক্রমে ঘটেছে। হিন্দুধর্মের মধ্যেও যে উদারতা আছে গলায় ঝোলানো কয়গাছা সুতোর মূল্য যে খুব একটা কম নয় এটা প্রমাণ করবার জন্য শরৎচন্দ্র গৃহদাহের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। বলতে বাধা নেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের ইতিবাচক দিকটি সংস্কারবদ্ধ শরৎচন্দ্র দেখতে পাননি। উপন্যাসের সূচনায় ব্রাহ্মধর্মকে যে শরৎচন্দ্র জিতিয়ে দিয়েছিলেন শেষে তাকেই হারিয়ে দিয়েছেন। হারিয়ে দিয়েছেন বলেই অচলা মৃণালিনী হতে পারেনি ; মৃণাল কমলমুখী হয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞান কি রকম ছিল তা জানবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য থাকতেই পারে। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা (১৪ই আগস্ট, ১৯১৯) একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ এ ব্যাপারে আলোকপাত করে।

'একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূরে থেকে শুনতেই ব্রাহ্ম মহিলারা উচ্চ-শিক্ষিতা।······অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সংকীর্ণতায় ভরা। বস্তুতঃ এঁদের মতো সংকীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাংলাদেশে আর নেই······ব্রাহ্মমেয়েদের হাতে আমি কোনদিন কিছু খাই নে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দুজনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে।······এটাও দেখেছ বোধ হয় ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোঁনা গলায় কথা কয়ে যতদূর চলে। কেবল চার-পাঁচটি মেয়েকে দেখেছি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী।'

হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাতের বিষয়টি খুব সামান্য বিষয় নয় রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে। সাহিত্যে সংঘাত অর্থে সামাজিক সংকটের প্রতিফলন। সেই সামাজিক সংকটটি কী এবং তা কতদূর পর্যন্ত তখন পরিব্যাপ্ত ছিল তা অন্বেষণ করে সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করতে না পারলে সম্পূর্ণ চিত্রটি আমরা পাই না। প্রয়োজনবিধায় তার প্রতি দৃষ্টিদান করা যেতে পারে। এখন দেখা দরকার ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের আচার ও বিধির মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবের কারণ কী? শুধু সাহিত্যে নয় সমগ্র জাতীয়জীবনে পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় ও মানসিকতার পরিবর্তনে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ তথা রেনেসাঁসের আগমনজনিত কারণে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মের বহিরাবরণে মানুষেরা প্রয়োজন-অতিরিক্ত মনুষ্য-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন এবং জাতিত্বের সংকীর্ণতা বুদ্ধিদৃপ্ত হিন্দুদের আঘাত করেছিল। যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ সাধন অপেক্ষা মানুষের অধিকার হরণ করে, প্রতি পদক্ষেপে মিথ্যে অনুশাসনে মানুষকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করে গুটিকতক সমাজপতিদের অঙ্গুলি হেলনে তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা মুশকিল। এই বর্বরপ্রথা ও ঘোরতর পৌত্তলিকতার পাশাপাশি আশ্রয়দাত্রী মুসলিম ধর্ম ও খ্রীস্টধর্ম নির্যাতিত হিন্দুদের ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিয়েছিল। বিশেষত শিক্ষিত সমাজে,

বলা ভালো ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে খ্রীস্টধর্ম সংস্কারমুক্তির বার্তা ঘোষণা করেছিল। হিন্দুত্বের গোঁড়ামি থেকে মুক্তি এবং খ্রীস্টধর্মের আপাত সার্বজনীনতা আকর্ষণের বস্তু হয়ে পড়েছিল, সেখান থেকেই উদ্ভব উদারপন্থী ভারত পথিকের পৌত্তলিকতাবিরোধী ব্রাহ্মধর্মের। এর বিস্তার ঘটেছিল পরবর্তীদের সংস্কার মুক্তির মধ্য দিয়ে। তাই 'নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী চরিত্র গড়িয়া তোলা, এবং পরিবার ও সমাজের সকল সম্বন্ধকে নিয়মিত করা—ইহাই তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন'। রামমোহনের উদ্দেশ্যের পেছনে কারণ হিসেবে নিম্নধৃত অংশটি প্রণিধানযোগ্য : 'বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজী নবীশেরা নূতন নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় সমাজে একটা প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য আনিয়া ফেলেন ; আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম ও সমাজনীতির বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের বন্যায় সমাজকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হন। ইহারই মধ্যে যাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য ও ধর্মবুদ্ধি বলবতী ছিল, তাঁহারা স্বদেশের প্রচলিত ধর্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া খ্রীষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ত্রিবিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করে ব্রাহ্মধর্ম।' লক্ষণীয় যে সমসময়ের ধীমান প্রগতিশীল মানুষের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রাঙ্গণ শক্তি ও সৌরভে ভরে উঠেছিল।

কেশবচন্দ্র সেন তৎকালীন বঙ্গসমাজে এক প্রতিষ্ঠানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে প্রতিষ্ঠান কোনো সমাজের, কোনো ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর সংগঠন গঠন নৈপুণ্য তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা করে রেখেছিল। প্যারীমোহন সেনের এই দ্বিতীয় পুত্র কেবল ব্রাহ্ম সমাজের অহংকার বিশেষ ছিলেন না, তাঁকে কেন্দ্র করে ধর্মমতনির্বিশেষে মুক্তমনের যুবশক্তি এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে সমাহিত হতেন। হিমালয়ফেরৎ দেবেন্দ্রনাথ যেমন এই নবীনের শক্তি ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন, নিজেকে সঁপে দিলেন ব্রহ্ম-উপাসনায়, তাঁর আধ্যাত্মিক পরিবর্তন উদ্ভাসিত করে তুলল-ব্রাহ্ম-সমাজের আকাশ-বাতাস, তেমনি কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবে যুগ্মবেণীর সৃষ্টি হলো। গিরিশৃঙ্গ থেকে ফিরে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের নোতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল, তাঁকে তিনি বিজড়িত করলেন ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলকামনায়। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন, 'এমন সুন্দর ভাষায় এবংপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন। কিছু না হইলে ভাষার দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর পাঠ্য'। দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য-সুষমায় এক শ্রেণীর মানুষ সাড়া দিলেন, এই মানুষেরা তাঁর দীর্ঘ দিনের মানসিক চিন্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, হিমালয় প্রত্যাগত ঋষির সেই উচ্চতা উচ্চতম স্তরে উন্নীত হতে মানুষের সংখ্যা গেল বেড়ে, শ্রেণীর পরিধি বিস্তৃত হল। আবার এর সঙ্গে সংযুক্ত হলো যৌব-শক্তির উৎস কেশবচন্দ্র, স্মর্তব্য, যৌবশক্তি সচেতন ও বিবেচনা-প্রসূত হলে তা দল মতের সীমাকে অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়, কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবে,

তাঁর ভাষা ও কার্যকলাপে সীমা-উত্তীর্ণ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নোতুন ভাবের উন্মেষ দেখা দিল। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এক অখণ্ড ভাবধারা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি-প্রগতির নোতুনরূপ দেখা দিল। তৈরি হলো ব্রহ্মবিদ্যালয়, উদ্দেশ্য যুবসম্প্রদায়ের কর্মশিক্ষা। বস্তুত পক্ষে দেবেন্দ্রনাথের বাংলা ও কেশবচন্দ্রের ইংরেজি বক্তৃতা প্রধানতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত যুবক মনে কেশবচন্দ্রর আকর্ষণ তীব্রতর ছিল, রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে কট্টর হিঁদুয়ানির প্রবক্তা গোরা ও তার নিত্যসহচর বিনয়কে এই আকর্ষণেই সমাজে আনা-গোনা করিয়েছেন, 'গৃহদাহ' 'গোরা' উপন্যাসের বহু অনুসরণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের সমাজে মহিমকে এনে তুলেছেন, না হলে গোরা বিনয়ের কাছে সুচরিতা-ললিতা ও মহিমের কাছে অচলা এত কাছের মানুষ হয়ে উঠত কিনা প্রশ্ন থেকে যায়।

আবার 'গোরা' উপন্যাসে হিন্দু ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতের চিত্র পাই। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের মতো ব্রাহ্মধর্মও কেবশচন্দ্রের মতো ব্যক্তিদের হারিয়ে আচার সর্বস্ব পরাণুকরণ (ইংরেজি ভাবধারা ও খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরক্তিজাত) মোহে আবিষ্ট হয়েছিল। বরদাসুন্দরী বা পানুবাবুর মতো চরিত্রের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ বোধ করেছিলেন এই কারণেই। ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টির মূলে বহু প্রেরণা-ই কাজ করেছিল, হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, সহ-মরণ প্রথা গৃহীর ধর্ম থেকে আচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত ধর্ম, ঊনবিংশ শতকের জাগ্রত বিবেকের কাছে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে অবশ্যই অপারগ ছিল। আর 'ব্রাহ্মসমাজের ঘোষিত নীতি—ব্রাহ্মধর্ম সর্বাংশে গৃহীর ধর্ম'। রামমোহন তাঁর বেদান্তসংক্রান্ত আলোচনায় এ কথা খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে কেবলমাত্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার নেই, যে কোনো সংসারী গৃহস্থ প্রকৃত জিজ্ঞাসু হলে তা স্বচ্ছন্দে অর্জন করতে পারে। উত্তরকালে এই সাধারণ সূত্রটিকে সম্প্রসারিত করে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে সম্পূর্ণ 'গৃহীর ধর্মরূপে গড়ে তুলেছিলেন'। আবার ব্রাহ্ম সমাজকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মীয় ও সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদের সুহৃদ গোষ্ঠীর সঙ্গত সভা নাম দেখে 'সঙ্গত' সভা প্রতিষ্ঠা করলেন, সুকুমার রায়ের তৈরি 'ব্রাহ্ম যুবসমিতি'; 'যুবসমাজ' সংগঠনও সুকুমারের সৃষ্টি—এ সকল সংস্কৃতিসম্পন্ন বোধের প্রকাশ আর পাঁচটা ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে ব্রাহ্ম-ধর্মকে পৃথক করে রেখেছিল। এই উদারতার পাশাপাশি 'ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্মপ্রত্যয় ও নীতিদর্শনের মধ্যে বিধির চেয়ে নিষেধরই যেন প্রাবল্য। একজন ব্রাহ্মের ধর্মবিশ্বাসের লক্ষণ কি কি—এই প্রশ্নের উত্তরে সেকালে প্রথমেই শোনা যেত প্রকৃত ব্রাহ্ম শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানে না, প্রতিমা পূজা করেন না, মদ বা সিগারেট সেবন করেন না, ইত্যাদি এক রাশি নিষেধবাক্য। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম জীবনদর্শন বলতে যে ঠিক কি বোঝায় সে বিষয়ে একজন সাধারণ পর্যায়ের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই সমস্যা যে কেবল সমাজের তদানীন্তন যুবগোষ্ঠীকেই ভাবিয়েছিল তা নয়, প্রবীণদের মধ্যেও এই নিয়ে ভাবনা ও বিতর্কের অন্ত ছিল না'।

এমন কী মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সমন্বয়সূত্রটি শেষ পর্যন্ত বজায় রইলো না। ‘নবীন ব্রাহ্মগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কার্যতঃ উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করে প্রায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তবে দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধির গভীরতায় সংকীর্ণতার স্পর্শ লাগেনি বলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যবিধ হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ সমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’ হলো।

শিবনাথশাস্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ভাদ্র (ইংরেজী সন-বাংলা তারিখ মেশানো) রামমোহন রায় কোলকাতার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাইরের বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিদিন বিদেশীয়ের উপাসনাতে যাতায়াত না করে নিজেদের উপাসনার জন্যে কমল বসুর বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মোপসনা শুরু হল। প্রথমে দুজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করতেন। তারপর উৎসানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করলে সঙ্গীতের শেষে সভাভঙ্গ হত। এখান থেকে শুরু হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাতের। হিন্দুসমাজে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। হিন্দু কলেজের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা ও আলোচনার সূত্র ধরে সামাজিক বিপ্লব শুরু হলো। জনজীবন থেকে সে সংঘাত বাংলা সাহিত্যেও দেখা দিল।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বহু ব্রাহ্ম-চরিত্র পাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার সময়ের অনেকাংশ জুড়ে হিন্দু-ব্রাহ্ম যুগের বিরোধের চিত্র আছে, পৌত্তলিকতা ও তার বিরোধিতা বেশ কিছু আগে থেকেই এ-দেশে চলে আসছিল। ডিরোজিয়োর শিষ্যরা একদিকে, অন্যদিকে নবউত্থায়মান ব্রাহ্ম-সমাজ। যে সমাজ হিন্দু-ধর্মের সংকীর্ণতা ও গণ্ডিবদ্ধতা থেকে মুক্তিত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল তার মধ্যেও যে শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার এসে জুটেছিল তা লক্ষ্য করা গেছে, আবার ব্রাহ্মত্বকে কেউ খ্রীস্টধর্মের ভারতীয় সংস্করণে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এইসব নানান চিন্তা ও ভাবধারার সম্মেলনে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম বিষয়টি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্রটি যাঁকে বেশ মনোযোগী দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের ব্রহ্মভাবনাসংক্রান্ত ব্যাপারে, স্বভাবমত তিনি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, উদার-দৃষ্টির মানবিকতাবোধই তাঁর প্রার্থিত, তাঁর জগৎ। ফলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। তাঁর ‘যুবকবন্ধু’

কেন রবীন্দ্রনাথকে তাই' পুস্তিকা ছাপতে বাধ্য হয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ব্রহ্ম-সমাজে তাঁকে নিয়ে যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তার পেছনে ব্রাহ্ম-মানসিকতা বহুলাংশে কাজ করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা নিয়ে যিনি প্রবন্ধ লেখেন তার মনের দ্বন্দ্ব বা দ্বিধার ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'রবীন্দ্রনাথের বলবার কথা ছিল ব্রাহ্মধর্ম…ধর্ম হিসাবে নিশ্চয়ই হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র কেননা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের কতগুলি মূল নীতিকেই তা অস্বীকার ও বর্জন করেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের এক অভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক বিকাশ রূপেই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। মুক্ত ও সার্বভৌমিক দৃষ্টি সত্ত্বেও হিন্দু সমাজগত কোনো ব্রাহ্ম জাতিগতভাবে হিন্দুই থাকেন যেমন হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত কোনো খ্রীস্টান হিন্দু খ্রীস্টান থাকেন বা কোনো মুসলমান হিন্দু মুসলমান থাকেন।' রবীন্দ্রনাথের ধর্মের ব্যাখ্যা সাধারণ ব্যাখ্যার সঙ্গে পার্থক্যে অবস্থিত, তাই বোঝার ভুল অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাতের বিষয়টি গোরা উপন্যাসে আছে, পানুবাবুর মতো মানুষেরা কেন এর প্রতিনিধিত্ব করেন এ প্রশ্ন সন্দীপের মতো মানুষদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরোহিত বলতে কারো কারো আপত্তির মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের মূলার্থ পরেশবাবুর মধ্যে নিহিত। গোরা তাঁর হিন্দু তথা লোকজীবনের সংস্কার পেরিয়ে আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছলে পরেশবাবুকে বলে, 'আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেইজন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান নি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।' এ মানুষটির মানবতাবাদীরূপ ঋষিকবিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রাহ্ম সমাজেরই একজন হয়ে কবি অতি ব্রাহ্মিকতার বিরুদ্ধাচারণ করেন, কোনো অতিশায়ী মনোভাব বা ক্রিয়াকলাপের বিরোধী কবি চিরকাল, অন্তুদের দেখলে তা ভোলবার উপায় থাকে না। আবার অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কন করেও রবীন্দ্রনাথ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন, বরদাসুন্দরীর সঙ্গে পাঠকের প্রথম দর্শনের দিনটি উল্লেখযোগ্য, 'পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁহার বয়স অল্প নহে কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় যে বিশেষ যত্ন করিয়া সাজ করিয়া আসিয়াছেন। বড়ো বয়স পর্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো কাটাইয়া হঠাৎ একসময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খস্‌খস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশি খট্‌খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোনটা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন।' অপরদিকে পরেশবাবু রামায়ণ গীতা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করতেন বলে হারানবাবুর আপত্তি, শাস্ত্রচর্চা ও অন্যান্য বিষয়ে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করে পরেশবাবু চলেন নি। আবার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হারানবাবুকে গোরা প্রভৃতি মানুষের আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে দ্বিধাহীন চিত্তে জানান, লেখাপড়া গভীর হচ্ছে না। খৃস্টকে গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষের ধর্মবোধ পূর্ণতালাভ করবে না—ম্যাজিস্ট্রেটের এই ধারণাকে 'সে এক হিসাবে সত্য' বলে হারানবাবু মনে করেন।

পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের কোনো পদ গ্রহণ করেন নি, আনুষ্ঠানিক এই দিকটি বরাবর এড়িয়ে চলেছেন। পানুবাবু একে দুর্বলতা মনে করলেও, পরেশবাবু ঈশ্বরের সচল অচলরূপে সৃষ্ট মানুষের দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে নিজেকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্ম সংক্রান্ত ধারণাটি খুব স্পষ্ট ছিল না বলে ব্রাহ্ম-চরিত্রগুলি অস্পষ্টতা নিয়েই হাজির হয়েছে। 'পরিণীতা' উপন্যাসের গিরীন, মানবতাবাদী লেখকের যে-কোনো চরিত্র হতে পারত। তবে হিন্দুর জাতিগত সংকীর্ণতার তুলনায় অন্য ধর্মের উদারতা এখানে দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি তিনি। হিন্দুধর্ম কেবল মানুষের জাত নেবার জন্য উদ্যত। অনাগত যৌবনে বিবাহ দেওয়া যেমন স্বাস্থ্যসম্মত নয়, তেমনি বিগত যৌবনার বিবাহও ঈপ্সিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত এই ধারণাটি নারীর বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় নি, তাই ললিতার বিবাহের জন্য তার মামার উৎকণ্ঠা ও সম্বলহীনতার প্রতিকার বিবাহ করে বিধবা হয়ে তার ফিরে আসার মধ্যে নিহিত। 'পরিণীতা' উপন্যাসে এই স্পষ্টোক্তি ছিল যুক্তিবাদ সম্মত। পাশাপাশি ব্রাহ্ম সমাজের এক্ষেত্রে উদারতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কেননা ব্রাহ্ম সমাজের উদারতা এখানে নঞর্থক পদ্ধতিতে এসেছে, হিন্দুধর্মের অনুদারতা দেখাবার জন্যেই ব্রাহ্ম মত এখানে উন্নত ধারণার বাহক হয়েছে। 'পরিণীতা' উপন্যাসে মনোরমা ভাই গিরীনকে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন হিন্দুসমাজ প্রসঙ্গ, 'ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।' ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে এ ধরনের সরাসরি সহজকথা শরৎ-সাহিত্যে বেশি একটা নেই। 'দত্তা' উপন্যাসের দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে হিন্দু-ব্রাহ্ম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। গিরীনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে বিলাসবিহারী। তার ক্রোধ, উপস্থিত বুদ্ধির অভাব, ব্রাহ্ম-ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, অসহিষ্ণুতা ব্রাহ্ম-সমাজের মৌলিক ধারণাগুলি থেকে পৃথক ক্ষেত্রে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়। লোভ ও আত্মম্ভরিতায় তাকে ব্রাহ্মধর্মের আচার্যের প্রতি কটু উক্তি করতে দেখা যায়। বিলাসবিহারীর পিতা রাসবিহারী অত্যন্ত ধূর্ত, কিন্তু স্বভাবত মিষ্টভাষী, কাজ হাসিলের জন্যেও তাকে মিষ্টভাষী সাজতে হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথায় ও কাজে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তার আসক্তি এবং আনুগত্য গোপন থাকে নি। 'গৃহদাহে'র কেদারবাবুর সঙ্গে রাসবিহারীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেদারবাবু অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। তিনি রাসবিহারীর মত নন। কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মত্বে আমাদের বিশ্বাস হয় না। এই ব্যক্তি এগ্জামিনার পড়েন, টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন ভার মুক্ত হলে বায়োস্কোপ দেখতে ছোটেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে বা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে' যে-সব তেজোদীপ্ত ব্রাহ্ম চরিত্রের দেখা আমরা পেয়েছি, কেদারবাবু তাদের কেউ নন। পেটি বুর্জোয়া প্যাটার্নে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ বিন্যস্ত।' রাসবিহারী তাঁর আচরণে চারিত্রিক বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছেন, এখানে বক্তব্যকে পেশ করতে পারলে শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্ম-ধারণা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া যেত, কিন্তু যখন দেখি ব্রাহ্মধর্মের আচার্য বিজয়া ও নরেনের বিবাহ শালগ্রামশিলা নিয়ে সম্পন্ন করছেন, তখন আচার্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞতা দৃষ্টিকটু-ভাবে ধরা পড়ে। হিন্দুধর্মের প্রথা ব্রাহ্মধর্মের ক্রিয়া-কর্মে প্রয়োগ করার ঘটনাটিও

তথ্যসম্মত নয়। বিনয়-ললিতাকে নিয়ে 'গোরা' উপন্যাসে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, উদার ব্রাহ্ম পরেশবাবু কিন্তু বিনয়ের বিবাহ নিয়ে গোলমেলে বক্তব্যে সন্তুষ্ট হন নি, বিনয় যে অবিবেচনাপ্রসূত পারম্পর্যবিহীন পথে হিন্দু বিবাহকে নিয়ে যাচ্ছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আত্মপ্রচার বিমুখ পরেশবাবু ব্রাহ্ম ধর্মের আচার সর্বস্বতা ও তরঙ্গ সৃষ্টিকারী ব্যাপারে অনিচ্ছুক থাকায় ব্রাহ্মসমাজের কোনো পদ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে এসেছেন, ব্রাহ্মসমাজ কোনো যোগ্যতর পদে তাঁকে আসীন করলে লাভবান হবার সুযোগ ছিল।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের ব্রাহ্মবিদ্বেষের সঠিক কোনো কারণ বোঝা যায় না। বন্ধু মহিম ব্রাহ্ম মহিলার প্রেমে পড়েছে, অতএব তাকে উদ্ধার করা দরকার, তার ধারণা এঁরা শিকারী জাতের জীব, এই ধারণারও কোনো মূল নেই, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে স্রষ্টার মতোই তার ধারণা অস্বচ্ছ, ব্রাহ্মদের সে দুচোখে দেখতে পারে না, ব্রাহ্ম মেয়েদের সম্পর্কে বন্ধুকে বলেছে, 'কি আছে ওদের' ঐ শুক্‌নো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ ক'রে ক'রে গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পড়ছে ব'লে ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্য্যন্ত এমন চিঁ চিঁ করে যে শুন্‌লে ঘৃণা হয়।' কেদারবাবুর শান্ত-নিরীহ আচরণ তাকে বিচলিত করে, তবু তার ধারণা থেকে সে সরতে চায় না, 'ইনি যত ভালই হোন, ব্রাহ্মও বটে! সুতরাং ইঁহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম।' অথচ অচলার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পর্বেই তার মুখে শুনি, 'ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে অনেক অনেক উপরে'—পাশাপাশি বাক্য দুটি রাখলে একই ব্যক্তির স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উক্তি বলে ধরে নেওয়া কষ্টকর।

গৃহদাহের ট্র্যাজেডির স্বরূপ

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যে ধারণা অ্যারিস্টটল থেকে নিকল পর্যন্ত আমাদের দিয়েছেন, তা মূলত নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশেষত উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে, গ্রীক ট্র্যাজিডি থেকে বড়ো জোর সেকস্‌পীয়র পর্যন্ত তার গতি, তা দিয়ে আধুনিক নাটক বিবেচনা করতে গেলে ট্র্যাজেডির মহৎ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করা দুরূহ। অ্যারিস্টটলের ধারণা ট্র্যাজেডি হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সম্পূর্ণ, পরিমিত আয়তন বিশিষ্ট ঘটনামূলকতার অনুকরণ। ট্র্যাজেডি কেবল 'imitation of an action that is serious' তা-ই নয়, তা 'complete and of certain magnitude' আর 'in language embellished with each kind of artistic ornament', যা কাহিনী সূত্রে সৃষ্টি করবে 'pity and fear effecting proper purgation of these emotions'। কাল ও প্রয়োজনে ট্র্যাজেডির মহিমা ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করেছিল; কেননা মহত্ত্বের যে স্বরূপ কাহিনী ও চরিত্রে প্রাপ্তব্য তার অভাব দেখা দিয়েছিল, আর সেটা খুবই স্বাভাবিক। নাটক থেকে ট্র্যাজেডি সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আপন পক্ষ বিস্তার করেছে; তার ফলে ট্র্যাজেডির গাঢ়তা ক্রমাগত তরলীকৃত হয়েছে, যুগোপযোগী করে ট্র্যাজেডি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কাব্যে, কথাসাহিত্যে। কথা সাহিত্যের আঙ্গিনা বিস্তৃত, সেখানে অহরহ নানান ঘটনার অনুকরণ চলেছে, কখনো গুরুত্ব পাচ্ছে কাহিনী অংশ, কোথাও তা হ্রস্ব আকার ধারণ করছে, কোথাও অধিকতর রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে চরিত্রকে, চারিত্র্য প্রাধান্যের ফলে ট্র্যাজিডির স্বরূপ বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, চরিত্রের অন্তর্গূঢ় জটিলতা ও তজ্জনিত সংকট ঘনীভূত হয়ে চলেছে। বিশেষত কথাসাহিত্যে, তার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট, উপন্যাসে চরিত্রের সঙ্কট ও মহিমার স্খলন ঔপন্যাসিকদের প্রধানতম বর্ণীতব্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। হয় তো এটাই আধুনিকতার লক্ষণ। উপন্যাসের বিশালতম আকৃতিতে বর্ণনা তথা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েছে, কাহিনী অংশ সেখানে সামান্যই, চরিত্রের মধ্যকার অন্তর্দাহ ট্র্যাজিক স্বরূপকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে—কাহিনী অপেক্ষা চরিত্রই বড়ো হয়ে, উঠছে, উপন্যাসকার কেন, পাঠকের চোখেও প্রত্যক্ষ হচ্ছে 'character is destiny'।

ট্র্যাজেডির চরিত্র কেমন হবে? অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না মহৎ চরিত্রেই ট্র্যাজেডি সম্ভব। অধ্যাপক নিকল এর সঙ্গে সহমত হন নি। যদি মহৎ চরিত্রের কোনো ত্রুটি জনিত রন্ধ্রে ট্র্যাজেডির বীজ রোপিত হয়, তাহলে অবিমিশ্র মহৎ সে চরিত্রকে বলা যায় না, আবার একথা তো স্বীকার করতেই হয় মনুষ্য চরিত্র যদি একান্তভাবে মহত্ত্বেই সম্পূর্ণ, তাহলে তার সঙ্গে দেবচরিত্রের পার্থক্য কোথায়? মানুষ তো দোষ-গুণে মানুষ, মহত্ত্ব একমাত্র হলে সে দেবতা, আর দুর্বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করলে তার পশুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে কারণে নিকলের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য, 'Of tragic dramas in which the hero is utterly flawless there are but few examples and such as exist seem to show that Aristotle was right in recognizing this

character as unsuitable for tragedy।' ভালো-মন্দে মিশ্রিত চরিত্র তো বটেই অতি মন্দের পক্ষেও ট্র্যাজেডির প্রাণ সঞ্চার সম্ভব, '**Wickedness on a grand scale resolute and intellectual, may raise the criminal above the common place and invest him with a sort of dignity. There is something terrible and sublime in mere will-power working its evil way dominating its surroundings with a superman energy**।' বিশ্লেষণের বিষয় এই, ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হবার পেছনে কোনো যৌক্তিক পথ চরিত্র গ্রহণ করেছে কিনা, কেবল চরিত্রের গুণাগুণের ওপর তা নির্ভর করে না, গুণাগুণের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘটনার চলমানতা এবং অনিবার্যতা লক্ষণীয়। অবস্থা ও ঘটনার ওপর চরিত্রের ক্রিয়াকর্ম অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে চরিত্র মহৎ কিংবা দুর্বৃত্ত এই বদ্ধমূল ধারণাটি মনে না রেখে ঘটনার পরিণতির সঙ্গে তার কাজের সঙ্গতি সাধনের দিকটিই দ্রষ্টব্য। পরিবেশের নানান প্রভাব চরিত্র ও ঘটনার ওপর পড়তে বাধ্য, তার দ্বারা চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, সেই নিয়ন্ত্রণ কতোদূর পর্যন্ত গ্রাহ্য বিবেচনার বিষয় মুখ্যত তা-ই। আবার সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, সমাজের সঙ্গে পরিবেশের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত ঘটতে পারে, তার ফলে দেখা দিতে পারে মহতী বিনষ্টি। ট্র্যাজেডিও জটিলতার সঙ্গী হতে পারে, ব্যক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি তার তীব্রতা ঘটনা বা পরিবেশগত জটিলতা থেকে অধিক হতে বাধ্য। অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষিত কালের সারল্য সমাজদেহ থেকে বহুকাল মুছে গেছে, দীর্ঘ যাত্রা পথে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, চরিত্র জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, সমস্যার জট ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, তাই সবচেয়ে পরিবর্তন এসেছে চরিত্রে, তার সূক্ষ্মতা একান্তভাবেই কালের দান, সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মানব জীবনেও দ্রুতি এসেছে, তার ফলে সরলরৈখিক পদ্ধতির রেশ মাত্র আর দেখা যাচ্ছে না। আধুনিক কালের সাহিত্য বিশ্লেষণে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার। পূর্বেকার মতো জীবন বিস্তীর্ণ নয়; কিন্তু গভীরতায় তা কোনভাবেই উপেক্ষণীয় নয়।

এই ক্রমঃপরিবর্তনের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যে জনপ্রিয়তম এবং আদরণীয় লেখকের উপন্যাসের ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে বৃহৎ বা মহৎ ভাবনা না-ও, পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নিজ সৃষ্ট সমস্যার গুহাকে প্রত্যক্ষ করে এই প্রতীতিতে পৌঁছন যায়, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির পথ ধরে সাধারণ বুদ্ধিজীবীর জীবনে ট্র্যাজেডি কী ভাবে ঘনীভূত হতে পারে। বাঙালী হৃদয় রহস্যে ডুব দেওয়া লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তৃতির সঙ্গে সহানুভূতিকেই সঙ্গী করেছেন, তাই হৃদয়সর্বস্বতার বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের লেখকের অভিযোগ সর্বাংশে সত্য বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। হৃদয়সর্বস্বতা বা আবেগ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে লেখক শরৎচন্দ্রের কাছে গভীরতাসঞ্চারী ট্র্যাজেডি প্রাপ্তব্য কিনা তাতে সংশয় জাগতে পারে। বেদনার বিহ্বলতা লেখককে মুহ্যমান করতে পারে কিন্তু তা কতখানি অন্তর্গূঢ় বেদনাকে প্রকাশে সক্ষম হবে প্রশ্নটা সেখানে থেকে যায়। দুই বন্ধুকে পাশাপাশি রাখার উৎস হয়তো রবীন্দ্রনাথ, এমন কী দুই বন্ধু-পত্নীকে নিয়ে ট্র্যাজিক ঘটনা ও পরিণতিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে, কিন্তু এই অনুকরণ কতদূর অনুসরণযোগ্য এই

জিজ্ঞাসা সোচ্চার হতে পারে। কার ট্র্যাজেডি এবং কোন ঘটনা ও প্রেক্ষিতে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে—তাও জিজ্ঞাসা। অথচ ট্র্যাজিক রস যে অব্যাহত তাতে তো সন্দেহ নেই। ট্র্যাজেডি গৃহ দাহের, না গৃহীর? বস্তুত পক্ষে গৃহ তো উপন্যাসে অক্ষত অবস্থানে দেখতেই পাওয়া গেল না। না, রাজপুরের মেটে বাড়ি, তার সংলগ্ন পড়ুয়াদের সামান্য ব্যবস্থার প্রসঙ্গে কথা উঠছে না। 'গৃহ'টি কোথায়? উদাসীন ও জীবন-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ মহিমের মেটে ঘর আছে, কিন্তু গৃহ নেই। তার দাহের প্রশ্ন কোথায়? গৃহবাসনা একান্তভাবেই নারীর, সেই নারী এখানে অচলা, অচলা গৃহমুখী এমন প্রমাণ উপন্যাসে পাওয়া গেল না। তাঁর নীড়ের আকাঙ্ক্ষা আদৌ ছিল কিনা মহিম ও সুরেশের মধ্যে দোলাচলতায় তার হদিশ মেলে নি, হয় তো ট্র্যাজেডির বীজ রোপিত হয়েছে এখান থেকেই। জীবনসঙ্গী নিরূপণেই তার যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এক পুরুষবর্ম থেকে অন্য পুরুষবর্মে আঘাত প্রাপ্ত হতে হতে জীবনের উত্তপ্ত কাল অবসিত হয়ে গেল। গৃহের আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হবার সুযোগই পেল না। যার জন্যে নারীর সাধনা, অচলার সাধনা। কোলকাতার ধনীগৃহের তলানিতে বসবাস করবার সময়েও গ্রাম রোমান্টিক শব্দ হিসেবে এসেছে, রাজপুরের সেই গ্রাম বা গৃহ তার আশ্রয়ের বস্তু হয়ে ওঠেনি, গ্রামে ঢুকে গ্রামীণ পরিবেশ ও আজন্ম লালিত রুচির বৈপরীত্যে দাঁড়ালো বঙ্গরসিকতা গৃহের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকে নিস্পৃহ করে রেখেছে, তার পর স্বেচ্ছায় সেই সাবের আসন পরিত্যাগ, একবার পরিত্যাগ করে নোতুন করে তাকে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য কর্ম, অচলারও সাধ্য হয় নি গড়ে তোলবার সেই হর্ম্যদে। সুরেশ পরবর্তী কালে তাকে আসবাব দিয়েছে, বাসস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে কিন্তু গৃহ দিতে পারে নি, গৃহ তো কেবল ইট কাঠে আবদ্ধ নয়, তার গূঢ়ার্থেই তার সম্পূর্ণতা। মহিম এর স্বাদ জানে না। ভোগী সুরেশের কাছে বৃহত্তর জীবনের অর্থ অস্পষ্ট, নিজেকে চিনতে বেলা বয়ে গেল অচলার। এই ত্রিকোণের গৃহ কোথায়। এই গৃহহীনতা ট্র্যাজেডির মৌল কেন্দ্র।

মহৎ চরিত্রের অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া 'গৃহদাহ' উপন্যাসে ট্র্যাজেডিকে সম্ভব করেছে বলে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। এখন অন্বেষণ প্রয়োজন মহৎ চরিত্র বা চরিত্রসমূহের। মহৎ চরিত্র হিসেবে লেখক প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মহিমকে। মহিমের অটল গাম্ভীর্য ও নির্লিপ্তির মধ্যে কোথায় লুকোনো তার মহত্ত্ব খুঁজে দিশে পাওয়া যায় না। সে কেবল মহৎ লেখকের জবানিতেই, তার নিষ্ক্রিয়তা তার নির্লিপ্ততা তার মহত্ত্ব প্রকাশের সুযোগ দেয় নি। সে স্বল্পবাক, স্বল্পভাষী কোনো মানুষের গুণ হতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের বাক্যও যদি অনুচ্চারিত থেকে যায় তাহলে তার সঙ্গে বাকহীনের পার্থক্য কোথায় নিরূপণ দুরূহ। মহত্ত্ব দৃষ্ট হতে হয়, তার পর সেই মহত্ত্ব গ্রহণীয় হলে তার পতনজনিত বেদনার মধ্য দিয়ে ট্র্যাজিকরস পরিবেশিত হওয়া দরকার, মহিমের মধ্যে তার দেখা পাওয়া যায় নি। যে সময়গুলিতে মহিমের সক্রিয়তা পতনোন্মুখ অচলাকে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারত, সেই মুহূর্তে মহিম স্থানুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মাঝুলি থেকে ফেরবার সময় অচলার পা টলে পড়ে যাচ্ছিল, স্বাভাবিক সৌজন্যে মহিম তার হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল, যে হাতের ওপর ভর করে তার দাঁড়াবার কথা

বহু বিস্মৃত বহর পরে সেই হাতের নাগাল সে পেয়েছিল, এক অর্থে নিজেকে সমর্পণের যে আকাঙ্ক্ষা সুরেশের আগমনের পূর্বে থেকে সে লালন করে এসেছিল অন্তরে সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ ঘটতে চলেছিল, অথচ নিজ হাতে অচলার হাত দেখে মহিম ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। দশম পরিচ্ছেদে সুরেশ মহিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্য না করে কেদার বাবুকে নিয়ে গাড়ি করে চলে গেলে অচলা তার নামাঙ্কিত কাগজটি পাঠানোর পর দেখা হতে অচলা বললো, 'তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্যে রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্চো কি ব'লে? —এ কথার পরও 'মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।' এবং 'মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেলিঙটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।' মহিমের জীবনের ভাবনা কী? কী নিয়ে তার ব্যস্ততা? এর উত্তর মহিমের কার্যাবলী থেকে প্রকাশ পায় নি, অথচ সুস্পষ্ট-ভাবেই বিবাহের পূর্বে অচলা সুরেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছে, মহিমও অবহিত ছিল কেদারবাবু একবার যেখানে টাকার গন্ধ পেয়েছেন, সেখানে যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ জলাঞ্জলিতে তার দ্বিধা থাকবে না। এমন কী মা মরা একমাত্র মেয়েটিকে বিসর্জনেও তার আপত্তি দেখা দেবে না। তথাপি মহিমের তৎপরতা দেখা যায় নি। হৃদয় যদি তার থেকে থাকে তা খুঁড়ে সে বেদনা জাগিয়েছে। নিজ অপরাধ বা নিষ্ক্রিয়তার ফল ভোগ নিজেকেই করতে হয়। যার সেদিকেও খেয়াল থাকে না, সে কেবল অপরের পীড়নের কারণই হয়ে থাকে। ঘর পুড়ে গেলে নিজের বা স্ত্রীর শরীর ও মন কোনোটির প্রতিই তার অভিনিবেশ দেখা যায় নি। অচলার গয়নার বাক্সটা যাতে অক্ষত থাকে এবং অচলার হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় এর বাইরে তার ভাবনার কিছু ছিল না। অথচ অচলা তখনই বলেছে, 'আমার গলায় ছুরি দিলেও এখানে একলা রেখে তোমাকে, আমি যেতে পারব না।' এতেও কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে নি মহিমের। গয়না বাক্স হাতে তোলা নয়, হাতটুকুর স্পর্শই তখন প্রার্থিত ছিল অচলার। তীব্রতর মনোমালিন্যের পর দুঃখের দিনে যে পরিচয়, যে মিলন তার চেয়ে তীব্রতম সখ্য তো হতেই পারে না। যে তার ভালোবাসার এক মাত্র অবলম্বন, যে নিজেকে তার আদলে তৈরী করতে উদ্যত, তার স্খলনের সমূহ সম্ভাবনার মুহূর্তে তাকে দূরে না ঠেলে কাছে টেনে নিলে তাকে পতন থেকে উর্দ্ধে তোলা সম্ভব হত, মহিমের চিন্তায় তার স্থান নেই। মহিমই পারত তাকে গৃহিণী-সচিব-সখী-প্রিয়শিষ্যা করে গড়ে তুলতে, তা না করে আসন্ন ট্র্যাজিক পরিণতিকে সে ঘনীভূত করে তুলেছে।

মহিম যদি যত্নপর হয়ে অচলাকে গড়ে নিতে চাইত, তাহলে সুরেশের উপস্থিতি তার পক্ষে হয় তো অগ্রাহ্য করা সম্ভব হত। গৃহদাহের পর অসুস্থ অবস্থায় অচলার সেবা গ্রহণ করে তার যা উপলব্ধি হয়েছিল, একটি নারীকে সম্পূর্ণ ভাবে জেনে আগেই তার ওপর অধিকারের ব্যাপারটি তার বোধের মধ্যেই থাকতে পারত। প্রায় আরোগ্য হয়ে উঠবার সময় অচলার এনে দেওয়া দুধ খেয়ে 'মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করে নি, কিন্তু কি জানি, যখনি জ্ঞান হ'তো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম। কেবলি

মনে হ'তো হয় ত এদের এত কষ্ট, এত অসুবিধে হচ্ছে—এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন ক'রে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতে-বাঁধা এম্‌নি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দান আমাকে শুধতেই হবে। আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ'। অসুস্থতার দুর্বল মুহূর্তে মহিম যেকথাগুলি উচ্চারণ করেছে তা তার সাময়িক উপলব্ধি মাত্র। নতুবা তখনো পর্যন্ত নিজের কী প্রয়োজন সে কখনো বলে নি, তার সুখ দুঃখ ভালোবাসা সমস্তই তার একার, নিজের সুখ দুঃখের ভাগ কাউকে দেয় নি, সুখ দুঃখ বা ভালোবাসার বিনিময় না ঘটলে সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। পদে পদে ভুল বোঝাবুঝি ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। নিজের অজ্ঞাতে অপরের বেদনার কারণ হয়, উপন্যাসটির ট্র্যাজেডির মূলে যে মহিমের মহৎ দান আছে সে-ও একই কারণে একে দোষ বলি, পাপ বলি তা মহিমের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বটে, কিন্তু এতে যে অন্যের নিশ্চিত পতন ঘটে যেতে পারে মহিমের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, এ এক জাতীয় উপেক্ষা, সে উপেক্ষার স্বরূপ হয়তো জানে না, তা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে ধীমান মহিমের পক্ষে তা কতখানি অজ্ঞানকৃত সংশয় জাগা স্বাভাবিক। ট্র্যাজেডি যে সংঘটিত হয়েছে তা সম্পর্কগত, উভয়ত, তাতে শুধু অচলার নীড় পোড়ে না, মহিমের জীবনের তন্ত্রীও যে ছিন্নমূল হয়, নিজের বিবর থেকে বেরিয়ে এলে তা মহিমের অজ্ঞাত থাকত না।

উপন্যাসের ট্র্যাজেডির মূলকেন্দ্রে সুরেশকে দেখতে পাওয়া যায়। দরিদ্রবন্ধু মহিমের প্রতি ছিল ভালোবাসা। সে কোমল হৃদয়ের মানুষ অথবা দুর্বল চিত্তের, অল্পকথাতেই তার চোখে জল আসত, মারোয়ারী ছেলেদের দেখাদেখি সে পিঁপড়েকে সুজি খাওয়াতো, দু দুবার মহিমকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, ডাক্তারী পাশ করেছিল বিপুল অর্থ থাকার কারণে। তাকে অধিকাংশ সময়ে ডাক্তারী করতে না দেখে অন্য ভূমিকায় দেখতে পাওয়া গেছে, তবে একবার ফয়জাবাদে অন্যবার মাঝুলিতে প্লেগের চিকিৎসার জন্যে তাকে তার ডাক্তারী বিদ্যা ব্যবহার করতে দেখা যায় তবে তার মধ্যে প্রথমবার অচলাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার আশা পরিত্যাগে বাধ্য হবার পর এবং পরের বার অজ্ঞাতবাসে মহিমের সঙ্গে দেখা হবার পর। বন্ধুকে বিয়ে করে জীবন্মৃত হয়ে বাঁচবার অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা যে ব্রাহ্মদের সে দেখতে পারে না তার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্যে সশরীরে অচলাদের বাড়ি এসে হাজির হয়ে প্রথম দর্শনেই মূর্চ্ছা যাবার দশায় পৌঁছে উৎকট প্রেম নিবেদনে তার কোমলতা, বন্ধুপ্রেম ইত্যাদির কোনোটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বুদ্ধির অগম্য মহিমের অটল গাম্ভীর্য অচলার মনকে টানলেও নাগালের বাইরের মন বিকর্ষণের কারণও হতে পারে, তাই দস্যুতা সত্ত্বেও অতিশীঘ্র একজাতীয় অন্তর্গূঢ় আকর্ষণ অচলা সুরেশের প্রতি বোধ না করে পারে নি, মহিমের ট্র্যাজিক বোধ আছে কিনা তার গাম্ভীর্য ভেদ করে জানবার উপায় থাকে না, তবে প্রথম আগমনের দস্যুতা থেকে অচলা-সুরেশ উভয়ের জীবনের ট্র্যাজিডির শুরু। আসলে গৃহদাহ উপন্যাসে যে ট্র্যাজিক রস উৎপন্ন হয়েছে তা পাত্র-পাত্রীদের দ্বারা সৃষ্ট, অচলা তার প্রথমতমা, তার সঙ্গে সাযুজ্যে বর্তমান সুরেশ। এলোমেলো ঝড়ের মতো বারবার সুরেশের আগমনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে অচলার জীবনের সকল সংযোগ। প্রথম আবির্ভাবে, অচলা-মহিমের প্রথম দাম্পত্যে রাজপুরে আবার সুরেশেরই

বাড়িতে তার ঝড় তোলা মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে। আপাত সারল্যের সঙ্গে কপটতা, লুব্ধতা এবং অর্থে স্ফীত গৌরবে সে মাথামাখি হয়ে গেছে। যৌবনের উগ্রতায় তার বোঝায় ভ্রান্তি এসেছিল, ভালোবাসা যে পণ্য নয় এবং তা জোর করে ছিনিয়ে নেবার বস্তুও নয় বুঝতে বুঝতে জীবন-অপরাহ্ণে এসে পৌঁছেছিল। তার কার্যকলাপ কখনো সঙ্গতিবিহীন কখনো সঙ্গতিসূচক তার ঈপ্সা ও লোভের। পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনে বন্ধুর বাগদত্তাকে আলিঙ্গন, তার অসহায় বৃদ্ধপিতাকে ঋণ মুকুবের জন্য নিঃশর্তে অর্থদান—যেমন দুই মেরুর ব্যবধান আনে, যখন 'সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল, কি তোমার গর্ব্ব করবার আছে অচলা ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ্! তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও ক'রো না' তার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর তার প্রথম দিকের ব্যবহার '···ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কিনা, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে'—এবং তার পরের আবেগতাড়িত আচরণ দ্বৈধ-ব্যক্তিত্বকে যেন প্রকাশ করে, তেমনি এই দ্বৈধতার মধ্যে অচলাকে দোলায়িত দেখি সমস্ত উপন্যাস জুড়ে।

এই দোলায়মানতায় কে বেশি রসদ জুগিয়েছে বলা মুস্কিল। পরিশীলিত অচলা অবশ্যই সুরেশের মধ্যে কোমলতার আস্বাদন পায় নি, তবু পুরুষচিত্তের জবরদস্তি দেখেছিল, অচলার নারী মন হয়তো এরই জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, না হলে শরীর-মনের নানান উৎপীড়ন আকর্ষণ জিইয়ে রেখেছিল কী করে? ফ্রয়েড বলেছেন, 'Tenderness is inhibited sexuality'—এই পরিশীলন ছাড়াও আকর্ষণ সাধ্য। অথবা ফ্রয়েড যাকে বলেছেন, 'sexual love is a modified economic relation' তারও অর্থভেদ হতে পারে। আবার ধীরে ধীরে অচলার অনাবিষ্কৃত লোকটি দেখাবার চেষ্টায় রত ছিল সুরেশ, তা-ও মনে হওয়া স্বাভাবিক। মনের unconscious স্তরে ঘুমন্ত বাসনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল সুরেশ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই এসে সুরেশ জানায় তার অনুরোধেও মহিম অচলার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, তার কারণ দরকার। এতদিন মহিমের এই আচরণ, উদাসীনতা, নিস্পৃহতা বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি অচলার জীবনে, কিন্তু অবদমিত আবেগকে প্রকাশ করেছে অচলা কুণ্ঠা না রেখেই, 'দরকার! দরকার! চিরকাল তাঁর মুখে এই কথাই শুনে আসছি—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্বস্ব!' এবং প্রসঙ্গত সুরেশের উক্তি 'আমার ভয় হয়, যে-পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনি কি সুখী হতে পারবেন?' সুরেশ মহিম থেকে অচলাকে বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে বলেছে কিনা জানা নেই, কিন্তু ফলোদয় একই। আবার সুরেশ অচলার সম্বন্ধ মহিম টের পেয়েছে প্রসঙ্গে সুরেশ যখন বলে, 'নইলে এত দিনে সে আস্ত। পোনর-ষোল দিন কেটে গেল ত!

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ নিয়ে উনিশ দিন। এই 'উনিশ দিন' শব্দ দুটি মহিমের প্রতি তার ভালোবাসার ইঙ্গিতবহ। তাছাড়া দশম পরিচ্ছেদে মহিমের উপস্থিতির দিনে বাতাস পেয়ে কেদারবাবু খুশি হয়ে যখন বলেন, 'তবু ভাল, পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হ'ল'—তখন 'সেই বাতাসেই তাহার

(সুরেশের) সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল' ও অচলার মহিমকে বলা 'এ ছাড়া এ বেলা ত তোমার চা সহ্য হয় না' এবং 'একটুখানি সবুর কর, আমি লাইম-জুস দিয়ে সরবৎ তৈরী করে আনাই' সুরেশের দিক থেকে হৃদয়-কুসুমের সৌরভ ও উত্তাপ মহিমের দিকে বাড়িয়ে দেয়। খুব কাছাকাছি সময়ে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরে সুরেশকে তার বলতে বাধে না, '···সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও —যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।' নিজের অন্তর্গত অভীপ্সা অচলার কাছে স্পষ্ট ছিল না, তাই এক ভ্রান্তি থেকে অন্য ভ্রান্তিতে সে জড়িয়ে পড়েছে। এই ভ্রান্তিসমূহের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের ট্র্যাজেডিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন্‌টি তার কাছে সত্য তাই নিরূপণ করে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এরজন্য পারিবারিক পরিবেশ যেমন দায়ী, তেমনি পরিবেশ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করাবার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী সে কখনো হতে পারে নি। স্বার্থপর পিতার ঋণ, তার ইচ্ছার কাছে আত্মাহুতি দান, ভালোবাসা দান করে উদাসীনতার গভীর চোরাবালিতে নিজেকে নিমজ্জিত করে তোলায় ব্যস্ত মহিম, উদ্দাম প্রকৃতির সুরেশের সঙ্গে পাল্লা মেলানোর অসম্ভাব্যতা অসংখ্য জট বাড়িয়ে তুলেছিল অচলার মধ্যে। মহিমের সঙ্গে পাঠকের যখন পর্যন্ত দেখা হয় নি, কেবল শরৎচন্দ্রের লেখনীতেই তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন থেকেই আসর জাঁকিয়ে বসে আছে সুরেশ দুর্নিবার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যমণি হয়ে। তাই ঔদাসীন্য ও উদ্দামতার কাছে যুগপৎ ছোটাছুটি করে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠতে দেখা যায় অচলাকে। এত অস্থিরতার পিঞ্জরে সে আবদ্ধ, তার থেকে বাইরের আকাশে পক্ষ বিস্তারের সুযোগই তার ঘটেনি। দুই বন্ধুর মধ্যে অহরহ ফিরে যাওয়ার কারণ অন্বেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছন মুশকিল। প্রস্তুয়মান ঘটনা তাকে এই বিপর্যয়ে এনেছে না তার বীজ তার মধ্যে পূর্ব থেকেই সঞ্চিত ছিল। 'গৃহদাহে'র সামগ্রিক বিপর্যয়ের অধিকাংশ ত্রুটি এসেছে অবশ্যই অচলার দিক দিয়ে, মহিমের ক্রোড়ে বসে সুরেশের, সুরেশের সান্নিধ্যে থেকে মহিমের চিন্তা সে সরিয়ে দিতে পারে নি। এই দৌর্বল্য থেকে সে নিস্তার পায় নি কাহিনীর শেষ পর্যন্ত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অচলা যে দুর্বলচিত্ত তার প্রধান, তার অব্যবস্থিত মনোভাব। যে-অব্যবস্থিত-চিত্ত পিতার সে দুহিতা, সেই পিতার সঙ্গে তার আর এক জায়গাতেও মিল—বিলম্বিত কর্তব্যবোধ' 'এইজন্য বলি অচলা মহৎ চিত্তের অধিকারিণী নয়। সে নির্বোধ। ইংরাজিতে যাকে বলে silly, তার এ চারিত্র্য উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ'।

মহিমের অসুস্থতার সময় মনে হয়েছিল সংশয়ের এ-দুয়ারটুকু সে পার হয়ে এসেছে। সেবার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সে ফিরে পেয়েছে। তবু সম্পূর্ণ রোগমুক্তি তার ঘটে নি। তাই 'মাঝে মাঝে বিকট ভয়ে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কিনা।' মৃণালের সঙ্গে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে সুরেশের প্রতি ঘৃণার মনোভাব আনবার চেষ্টা করেও সফলকাম হয় নি, যে ভ্রান্তি থেকে কোলকাতায় সুরেশের বাড়িতে মহিমের সেবায় উত্তীর্ণ হল বলে মনে হয়, সেই দিনগুলির মধ্যে মহিমকে নিয়ে পশ্চিমের যাবার সময় মহিমের অসুখে ও নানান মানসিক অবস্থার বিপাকে

বিপর্যস্ত সুরেশকে সে তাদের সঙ্গী হতে অনুরোধ জানানোর মধ্য দিয়ে ভ্রান্তির পুনরাবির্ভাব ঘটিয়েছে। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নিজের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত ও ট্র্যাজেডিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের ট্র্যাজেডি ব্যক্তির হলে তা সুরেশের নয়, সে ইচ্ছাকৃত পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে, এর পরিণতিও তার অজ্ঞাত নয়, মহত্ত্বের সঙ্গে সে অন্যপথে চলেছে চিরকাল, এক অর্থে সে-ও নির্বোধ, নারীর মন সহস্রবর্ষের সাধনার ধন—লুব্ধের সে জ্ঞান থাকবার কথা নয়, মৌহূর্তিক সুখটাই তার কাছে সর্বস্ব, তার জীবনের বিপর্যয় (?) ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করে না, নারীমন যে সহজলভ্য নয় হয়তো সে জ্ঞানটিই প্রকটিত করে। আর যে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন ও সুখে বিগতস্পৃহ তার ট্র্যাজেডির সুযোগ কোথায় ? যার ভালো-মন্দের বহিঃপ্রকাশ নেই, তার মনে দ্বন্দ্বের অবকাশও কম, অন্যের দ্বন্দ্বের বা দুঃখ-বেদনার কারণ হতে পারে মাত্র। এ দ্বন্দ্ব, এ ট্র্যাজেডি এককভাবে অচলার। আর ট্র্যাজেডির আয়োজনকে সম্পূর্ণ করতে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে গেছে—এতে অংশ নিয়েছে স্বয়ং অচলা সর্বাগ্রে, সুরেশ ও মহিম একে একে, মৃণাল তার অজানিতে, গ্রাম্য সারল্যে ট্র্যাজেডির খেলার অন্যতম খেলুড়িতে পরিণত হয়েছে। আর কেদারবাবুর ভূমিকা নেহাৎ ছোট করে দেখা চলে না, বহুলাংশে তিনিই উৎস, তাঁর স্বার্থপরতা, তার স্বার্থের কাছে অপরের সুখ-সুবিধা খড়কুটোর মতো ভেসে চলে গেছে। বীজ রোপনকারীর প্রথমতম তিনিই, অচলাকে ক্রমাগত সেইদিকে ঠেলে নিয়ে গেছেন, অনিচ্ছায় নয়, সচেতনভাবে, কারো উদ্দামতা, কারো নির্লিপ্তি, কারো অব্যবস্থিতচিত্ততা, কারো স্বার্থসিদ্ধি, কারো সারল্য উপন্যাসটির ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী। ঘটনাসমূহ মনুষ্যসৃষ্ট মনুষ্যচালিত এবং তার সমন্বয়ে বিষাদান্তক পরিণতি সংঘটিত হয়েছে। যে-কোনো বেদনাই ট্র্যাজেডি নয়, সত্যকথা। তবু সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের মহতী বিনষ্টি ট্র্যাজেডির দিকেই যে চালিত সে-কথাও স্মর্তব্য। 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রসঙ্গে এ কথাগুলি বিস্মৃত হবার উপায় থাকে না। অচলার মানসিক দুর্বলতা ও একজাতীয় মানসিক ভারসাম্যহীনতা উৎকটরূপে উপন্যাসে দেখা দিয়েছে মনে রেখে ·সা যায়, এর বর্ধিতকরণে সহায়তা করার ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেনি আলোচ্য উপন্যাসে।

তিন

গৃহদাহের আধুনিকতা

সাহিত্যে আধুনিকতা নিয়ে নানামুনির নানামত। আধুনিকতা শব্দটিই আপেক্ষিক। এককালের যা আধুনিকতা পরবর্তীকালে তা প্রগতিপন্থী। তবু সাহিত্যের কালজয়িতার কারণে আধুনিকতার একটি সার্বজনীন দিক আছে। এমন রচনাব তো অভাব নেই যা অনায়াসেই যুগকে উত্তীর্ণ হতে পারে। সে-অর্থে আধুনিকতার সংজ্ঞাও সঙ্কোচনের অপেক্ষা রাখে। সময় ও কালের সংঘাতেই আধুনিকতার সৃষ্টি হয়। এই সংঘর্ষ পুরাতনের সঙ্গে নবীনের অথবা নবীনের মধ্যকার সংঘাতের মধ্যে আবদ্ধ। এই সংঘাতের মধ্য থেকেই আধুনিকতার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁককেই বলতে হবে মডারন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে'। এই 'মর্জি' শব্দটির সহায়তায় আধুনিকতার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। আসলে যা কালের হয়েও কালের বন্ধনকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে, যা সত্য কাল-নিরপেক্ষভাবে। তবে সাধারণভাবে সাহিত্যের এজাতীয় সংজ্ঞা ধ্রুপদী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। ধ্রুপদী সাহিত্যের কালও গত, তার পরিবেশও নেই। যুগের প্রয়োজনে ধ্রুপদী সত্যতার যোগ্য অনাগতকালের পদধ্বনি কোনো সাহিত্য-রীতি'ব মধ্যে শ্রুত হলে তাকেই আজ আধুনিক বলে চিহ্নিত করা যায়। তথাপি 'যুগের প্রয়োজন' ও 'যুগের আধুনিকতা' শব্দযুগ্ম লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে রেনেশাঁস কালের আবিলতাকে ধুয়ে নোতুন প্লাবন এনেছিল, সেই আধুনিকতা নোতুনযুগের আধুনিকতা—যা প্রবাহিত হতে হতে বিংশশতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পেঁৗছে ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এর অংশভাগী, এব অন্যতম পুরোধা, মধুসূদন সূচনা-পর্বের প্রধানতম পুরোহিত; বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজগত পরিবেশগত সংস্কার বোধ সত্বেও, তিনি বাংলা উপন্যাসের প্রথম ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদৃপ্ততার উদ্বোধকও বটেন, ক্রমাগত তা বিস্তাব লাভ কবেছে হৃদয়-মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যবিধানকারী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ১৯০৩-কে রবীন্দ্র-উপন্যাসের নদীর সামনে চলতে চলতে বাঁক ফেরার কাল বলে ধরে নিলে, 'গোরা'য় মনুষ্য-ধর্মের উদ্বোধনের সঙ্গে বোধির ধারা প্রবর্তনের কাল (১৯১০); 'চোখের বালি' থেকে শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের মধ্যে ব্যবধান দশ বছরের, উভয় স্রষ্টার বয়সের ব্যবধান পনের বছরের। তবে দশ বছরের, ব্যবধানে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়-ধর্মের আধিপত্য দশ পেরিয়ে সম্পূর্ণ তেত্রিশ বছর কাল বিস্তৃত ছিল। হৃদয় থেকে মস্তিষ্কে যেতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন'-এ তবু কিছু বাগাড়ম্বর দ্বারা ভিন্নপথের পথিকের পক্ষে মৌলভূমি-বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবপর হয় নি। আসলে যুগের তাড়না লেখকের মধ্যে আসতে বাধ্য, তখন নিজের আধিপত্যের অঞ্চলটি ভুলে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। প্রশ্ন জাগতেই পারে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে, 'একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন'। সন্দেহের কিছুমাত্র থেকে গেলেও শরৎ-

নির্দেশিত বস্তুবাদিতা অর্থাৎ যা যথাযথ, 'কল্লোলে'র উত্তরাধিকার তার মধ্য থেকেই বর্তেছিল, তবু 'কল্লোল' চেয়েছিল বিদেশী রচনার দিকে, বিদেশী পদ্ধতির দিকে, অনেকে গ্রাম্য-জীবনের কথা বললেও মুখ্যত তাঁরা ছিলেন শহরমুখী, শরৎচন্দ্রীয় সমাজ একান্তভাবেই গ্রামীণ সমাজে নিবদ্ধ। তাই শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রগতি-প্রতিবন্ধকতা এখান থেকেই এবং শেষও এখানে। আধুনিকতা, সমাজ-অস্বীকৃত প্রেম, নারীর সতীত্ব সম্পর্কিত অটুট ধারণা, পতিতাদের সমাজে স্থান-এর পাশাপাশি নারীর দৈহিক শুচিতা, সংকীর্ণ হিন্দুত্ববোধ, প্রচলিত ধারণার প্রতি একজাতীয় আনুগত্য, সংস্কার-মুক্তিতে অপারগতা শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাস-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলত সমাজমধ্যস্থ অনাচার-কুসংস্কার এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিধি যেমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের লেখনীতে, তেমনি শুধুই সমকালের সমাজের পশ্চাদগামিতার ছবিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি, লেখকের কাছে সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশী নই, কিন্তু এর থেকে ত্রাণের পথের ইঙ্গিতটুকু প্রার্থিত থেকে যায়। তাঁর পূর্বে বস্তুর যথাযথরূপ, প্রকৃত গ্রাম্যসমাজের চেহারা অন্য কারো রচনায় এতো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি বলেই, শরৎচন্দ্রের কাঁধে ভারটা একটু বেশি হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা শরৎচন্দ্রে তাঁর নিজখাতে প্রবাহিত হয়েছিল। বাংলা উপন্যাসের রবীন্দ্র-নির্দেশিত আধুনিকতা, পরবর্তী লেখকের ওপর আরো বিস্তৃতরূপ হিসেবে বর্তাবে, এমন আশা দুরাশা নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করে এইরকম সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন, শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত ধারণার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল, তবু খেদ তাঁর এখানেই, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়'। অথচ রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন, তাঁর আরব্ধ কাজ শরৎচন্দ্রেরই করণীয় ছিল, রবীন্দ্র-আধুনিকতা যদি শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা হতো, তবে 'কল্লোলে' এলোমেলো বোহেমিয় ব্যবহার লুপ্ত হয়ে তা আধুনিকতম হতে পারত। শরৎচন্দ্রও সেপথে পা বাড়ালেন না প্রয়োজন অনুসারে, অথচ দেখার ও দেখবার প্রবণতা, ক্ষমতা তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল, 'কল্লোল' যে নানা পথ পরিক্রমার দিকে ঝুঁকেছিল, তা পান্থবৃত্তিতে পরিসমাপ্তি লাভ করত না। 'শরৎচন্দ্রের লঘুকরণের হাত থেকে উপন্যাসকে পুনরায় রবীন্দ্র-সম্মত জীবনচর্যার দুরূহ পথের সন্ধানে ব্রতী করে তোলার দায় ছিল এঁদের'। কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে আবেগবেই পাথেয় করলেন 'কল্লোলে'র প্রতিনিধিস্থানী লেখকেরা। বাস্তববোধের আস্ফালন 'কল্লোলে'র ছিল, শরৎচন্দ্র পথটি দেখিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব মেজাজে, সেটুকুকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার পন্থাপদ্ধতি খোঁজবার কোন দায় ঘটায় নি কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে, ফলে এতবড় সম্ভাবনার অংকুরে বিনষ্ট হবার পথ প্রশস্ত হলো। কেন এই পরিণতি এর পেছনে কারণ অনুসন্ধান করলে বিস্মিতই হতে হয়, লুকাচ যেমন ভাবে দেখছিলেন এখানে তার দেখা মিলবে, 'It is no way surprising that the most influential contemporary school of writing should still be committed to the dogmas of 'modernist' anti-realism'।

সমাজ-অস্বীকৃত প্রেম সংস্কারযুক্ত শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁর আধুনিকতার এখানেই শুরু, তাকে ধরে রাখবার

আয়ুধ ভেঙে যায়, যখন দেখি একনিষ্ঠ সতীত্ব বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধাবোধ বাংলার উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করছে। এই দ্বিধার পাহাড়টি আজন্মকাল তিনি সরিয়ে দিতে পারেন নি। এর কারণ দৈহিক শুচিতা সম্পর্কে তিনি মোহমুক্ত হতে পারেন নি। শরীরী প্রেমের যন্ত্রণাকে তিনি দেখাতে কসুর করেন নি, তবু বৈঁচির ফুলের মালা দিতে যে কিশোরী তার প্রাণমন ঢেলে এক কিশোরে মধ্যে 'পুরুষ'কে প্রত্যক্ষ করেছিল সে পরবর্তীকালে প্রেমাস্পদকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দেবদাসীর চেয়ে ওপরে উঠতে পারে নি, বঙ্কুকে প্রাচীর খাড়া করে অন্য সম্পর্কের মধ্যে দেহ-সম্পর্কটি কোণঠাসা করে দিয়েছেন লেখক, সতীত্বের চেয়ে নারীত্ব যে বড়ো তার দেখা মেলে নি। নিম্নগামী স্নেহে প্রেমাস্পদকে ঘিরে রা তে হবে এ কেমন ধারা যুক্তি 'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম' মন অবশ্যই প্রধানতম, তবু শরীর? শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। তাই তাদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে 'মতো' শব্দটি কেমন যেন বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠেছিল। 'গৃহদাহে'র সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে এক ঝড়-বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে রামবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অচলাকে সুরেশের শয়নগৃহে আসতে হয়েছে। তখন অচলার 'মনে পড়িল, এম্‌নি এক জল-ঝড় দুর্দ্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামিহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দ্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে।...বাহিরের মত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।' সুরেশের আচরণে লুব্ধতা উপন্যাসের প্রথম থেকেই. অচলার ব্যাধভীত হরিণীর দশাপ্রাপ্তি পরিচয়ের স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে পুনরায় অচলাকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে অজস্র চুম্বনে অভিভূত করে ফেলার পরিণাম আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকে পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল। 'চরিত্রহীনে' অনেক গোঁড়ামিকে চূর্ণ হতে দেখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানেও অসম প্রেমের সম্পর্কে, কিরণময়ী ও দিবাকরের শরীর মিলন অসম্ভব বলেই শরৎচন্দ্র সেদিকে যান নি। 'সাহিত্যের রীতি নীতি' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন—

> "শারীর ব্যাপারমাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষের বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পরিচয় উঠে না'।

প্রচলিত সংস্কার এমন গভীর ভাবে তাঁর মধ্যে প্রোথিত যে তার থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। 'সতীত্ব' শব্দটাই তাঁর কাছে পুণ্যতার দ্যোতক, মনুষ্যত্বের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। একে বিচ্ছিন্ন করবার মন্ত্র শরৎচন্দ্রের জানা নেই। যদিচ তিনি বলেছেন, 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়' এবং 'সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে

না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?' শরৎচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে ধারণাটি এ ক্ষেত্রে জেনে নেওয়া ভালো। 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'গোটা-দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়—**idealistic** and **realistic**, আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লোক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী'। **Realistic** হওয়াকে তিনি দুর্নাম বলে মনে করলে তাঁর বাস্তববাদিতা সম্পর্কে ধারণা আমাদের ধাক্কা দিতে পারে। তবে তো প্রচলিত **idealistic** ধারণার পরিশোধকে তিনি পরিণত হয়ে পড়েন। অথচ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর কাল পর্যন্ত তাঁর মতো বাস্তবদর্শী অন্য কারো ভাগ্যে জুটেছে বলে মনে হয় না। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই জানতেন সমাজকে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখার তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, সমাজের সমস্যা, প্রত্যক্ষ বা রোগরূপ তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল না। সতীত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট কথাই তিনি বলেন না. পতিতা-সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টিই প্রথম গিয়ে পড়েছিল। তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো তাঁর পতিতারা ঘটনার শিকার, মূলত তারা সতী, অবস্থা বিপাকে তাদের অনাবিল আচরণ করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। তবু পতিতাকে উপন্যাসের পাতায় প্রশ্রয় দেবার কৃতিত্বকে খাটো করা যায় না। এর পেছনেও আছে বাস্তব-অভিজ্ঞতা ও মানব-সহানুভূতিশীলতা। শরৎ সাহিত্যের একদিকে মানবমন, মানবিকতা, মানুষের প্রতি সহানুভূতির তীব্রতা অন্যদিকে সমাজসত্তার নিয়ন্ত্রণ-শক্তি। সমাজসত্তার নিয়ন্ত্রণ শক্তি প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়ে সমাজ সচেতন লেখককে দ্বিধার পাথারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও তিনি বলেছেন, 'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু নিষ্ঠা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে' তথাপি তার পরিত্রাণ-স্বরূপ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্তি তাঁর নিজেরই অনেক সময় ঘটে নি—বিস্ময়ের ব্যাপার সেটাই। সতীত্ব ও বৈধব্য দুটি বিষয় তাঁকে প্রবল ভাবে ভাবিয়েছিল সত্য কথা কিন্তু সঙ্কোচের বিহ্বলতাকে চূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। দুটি সম্পর্কে প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন, এখানে তাঁর আধুনিক মনের প্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে যে কাজ শুরু করেছিলেন তাকে সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব শরৎচন্দ্রের অবশ্যই ছিল। কেন তিনি সেদিকে যান নি সেটাও প্রশ্ন, শরৎচন্দ্র যে বিধবা-বিবাহ কোথাও দেন নি, তা অন্যের পক্ষে বিস্ময়কর হতে পারে চিঠিতে নিজেই তা জানিয়েছেন। না হলে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত, রমা কিংবা রমেশের জন্য শোক প্রকাশ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। অন্য সমস্যা অর্থাৎ পতিতা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার কথা ব্যক্ত করেছেন জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাস প্রসঙ্গে পরিচয় পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়, 'এই উপন্যাসে যে—লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানি না'। কিন্তু 'সে-লোকযাত্রা' বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বম্ভরের উত্তম নামের বেশ্যাকে দেখে প্রেমে পড়াকে 'ভদ্দর লোকের লক্ষণে বাধে না' বলতেও দ্বিধা করেন নি। শরৎচন্দ্রের এ ক্ষেত্রে 'আমি কিছুই জানি না' বলবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, বলেনও নি এবং পতিতাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। প্রশ্ন একটাই পতিতারা 'পতিতা'র মতো আচরণ করেছে কিনা, অথবা 'কল্লোলে'র মতো পতিতা বিলাসে

পরিণত হয়েছে কিনা। শরৎচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না, তিনি প্রকৃত অর্থেই পতিতা-দের এনেছেন বাংলা সাহিত্যের আসরে, তবু মনে হয়েছে তারা গৃহস্থরও একজন, হৃদয়বৃত্তি ও সহানুভূতিতে আপ্লুত, শরীর অপেক্ষা মনের প্রতি আসক্তিই তাদের বেশি। সে যাই হোক না কেন অস্বীকৃত প্রেমকে যত্নের সঙ্গেই এঁকেছেন শরৎচন্দ্র, তা পতিতার ক্ষেত্রে হোক বা গার্হস্থ্যজীবনের বন্ধনীর মধ্যে হোক।

সমাজ অননুমোদিত প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনমুক্ত ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতে পারেন নি কিংবা চান নি, তাঁর সতীত্ব সম্পর্কিত ধারণা অক্ষত থাকার জন্যে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার দোলাচলতার মধ্যে দুই পুরুষ, স্বামী ও স্বামী-বান্ধব —একাগ্র প্রেম অপেক্ষা দ্বিমুখী ভালোবাসা স্বীকৃত হয়েছে। একবার মহিম একবার সুরেশ, একজনের কাছে প্রতিহত হয়ে অন্যের কাছে, অথবা একজনের মনের কাছা-কাছি বাস করে অন্যের জন্যে ব্যাকুলতা। মহিমের কাছ থেকে সুদূরে সুরেশের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে অচলা 'মনে মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি এবং কোথায় ছিল সুরেশ। ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোন দিন ভালবাসে নাই, সেই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল? আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না?' সুরেশের বিগতস্পৃহার পেছনে অচলার কাছ থেকে প্রাপ্তির ঘর শূন্যতা কারণ হিসেবে এলেও নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের বিষয়টি শরৎচন্দ্রের অন্তরে স্পষ্ট হয়েছিল। হিন্দুত্বের গৌরব বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দৌর্বল্য সকলের জ্ঞাত। রামবাবুর মুখ নিঃসৃত বাক্য, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় 'যিনি সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘর করিতে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ, আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে, আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে যত্নে তুলিয়া লইবে।' হিন্দুত্বের বিশ্বাসের সিদ্ধান্তটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে স্পষ্টরেখায় উৎকীর্ণ। যে কারণে অচলার পাশাপাশি মৃণালকে রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধু বৈপরীত্য সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য নয়। আপাতত মনে হয় অচলার সমগ্র সত্তার প্রতি লেখকের মনোযোগ অধিক, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে পলে পলে মৃণাল তার ব্যক্তিত্ব-বিস্তৃতির ভূমি একটু একটু সংগ্রহ করে প্রায় সমগ্র উপন্যাসটিকে দখল করে নিয়েছে। তাপ-উত্তাপ বিহীন মহিমকে ছেড়ে দিলে প্রায় উল্লেখ্য সমগ্র চরিত্রই মৃণালের আচার-আচরণে তার হিন্দুত্ব-বৈধব্য—তার ক্রিয়া-কর্ম, নিষ্ঠা, একাগ্রতায় উচ্ছ্বসিত। হরির মা থেকে সুরেশ-কেদারবাবু, মায় অচলাকে তার সর্বব্যাপী প্রভাবের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। এর মধ্যে তথা-কথিত ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী সুরেশ ও হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন কেদারবাবুর উক্তি সাধারণ প্রশস্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। নারীর অসহায়ত্ব ও তার সংযম তথা সমাজকর্তৃক সামাজিক-মানসিক নির্যাতনকে হিন্দুত্বের পুরুষ সমাজ যে খুব বড়ো চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল শরৎচন্দ্রও তার বাইরে নন। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-জাতিয়ত্ব নিয়ে অনেকেই নিন্দামুখর, কিন্তু তথাকথিত প্রগতিপন্থী শরৎচন্দ্রের রচনা ও মননের মজ্জায় মজ্জায় এ সংস্কারটি দৃঢ়মূল দরদী ও সহজ-জীবন-ব্যাখ্যাতার অন্তরালে

সে-তথ্য ঢাকা পড়ে গেছে। এখানে তাঁর জিৎ এবং এখান থেকেই তার প্রগতি-শীলতা ও আধুনিকতা পেয়ে যাওয়ার মূল্য।

তৎকালীন সমাজে সমাজ-অন্তর্ভুক্ত অন্যায়-অবিচার ও সত্যাসত্য তাঁর মতো আর কেউ দেখান নি। একে আধুনিক বলতেই হয়, বিশেষত 'গৃহদাহ' আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও বিবাহিত নারীর প্রেমের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত খুব স্পষ্ট। মূল ফল কী এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ জাগে। মহিম সবচেয়ে দুঃখের এবং সবচেয়ে অস্পষ্ট চরিত্র, জটিলতা-দ্বন্দ্ব-মানসিক সংকট জীবন যুদ্ধের সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দশা কোনোটিরই নাগাল পাওয়া যায় না। সে না সংসারের, না সমাজের, আবার তাকে outsider বলার চেয়ে মূর্খতা আর নেই। তাহলে সে কী? তার কিসের গাম্ভীর্য, সেই গাম্ভীর্যের অন্তরালে কি বিরাজমান তার নাগাল পাওয়া যায় না। অথচ উপন্যাসকারের সে প্রিয়তম চরিত্র, বহু চাপিয়ে দেওয়া মহত্ত্বের সে অধিকারী যা বিশ্বাসের সীমা লঙ্ঘন করে যায়। পছন্দ হোক্ আর না-ই হোক্ সুরেশকে অনেকটা স্পষ্ট করেই পাওয়া যায়, সে রক্ত-মাংসের মানুষ তাতে সন্দেহ জাগে না। অচলার দোলাচলতার মধ্যেও তার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য লেখক স্বয়ং এই দোলাচলতার শিকার, এ-ক্ষেত্রে আধুনিকতা একটু পিছু সরে যেতে বাধ্য হয়। জটিল মনস্তত্ত্বে উপন্যাসটি অভিনব, অন্তত অচলার দিক দিয়ে যা জট বিস্তৃত হয়েছে তা শরৎ-উপন্যাসে অভিনব। শেষ রক্ষা হলে তার অক্ষয় কীর্তি বাঙালি পাঠককে অনেক-খানি ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হতো। প্রথমত অচলার মানসিক সংকট ও তার থেকে উদ্ভূত ঘটনা বারংবার তার জীবনকে যেমন অনিশ্চিতের দিকে ধাবমান করেছে, তেমনি উৎকণ্ঠা ও অনিকেত আবেষ্টনীতে উপন্যাসকে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত শরৎচন্দ্র দুই বিপরীত প্রকৃতির পুরুষকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে একবার পাষাণের প্রাচীর গাত্রে, আর একবার উচ্ছ্বাস ও বৈরাগ্যের মিশ্রণে তৈরি উচ্ছ্বাসের নদীর গতিবেগে নিক্ষেপ করেছেন। দুটিই নারীর পক্ষে দুঃসহ। তৃতীয়ত যা তখনকার ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যকার নারীর মধ্যে প্রাপ্তব্য তা অচলার মধ্যে দেখা যায় নি। তার বুদ্ধির সন্দীপ্তির ছোঁয়া তার আগমনে, তার ক্রিয়া-কলাপে, তার পরিণামে ধরা পড়েনি। তার যা কিছু গৌরব তা প্রথম আবির্ভাবে লেখকের জবানীর মধ্যে, তার বিদ্যুৎ-চমক চোখে পড়ে না। তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভীরতার দেখা মেলে না, তার প্রেমে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে ওঠে না। হতে পারে প্রাণহীন প্রাণপুরুষকে ভালোবেসে দ্যুতির ছন্দের জন্যে তার কাঙালপনা ছিল, সুরেশের উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে তা সুপ্তি থেকে জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু সুরেশের অনেকটাই মিথ্যাচার, কপটতা, তরল এবং ঐহিক সুখের জন্য—'স্থির বুদ্ধির আভা' যার পাথেয়, সৌকুমার্য যার বাইরে থেকে অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবার কথা গুটিকতক সাজানো বাক্য, আচারে-আচরণে শৃঙ্খলা-হীনতা, পারম্পর্যবোধ রহিত তাকে শুধু আকৃষ্টই করে নি, প্রায় সারাজীবন-ব্যাপী আকর্ষণের চক্রে পাক খাইয়ে মেরেছে। বিবাহের পূর্বেকার সুরেশের আচরণ, ধূমকেতুর মতো রাজপুত্রের বাড়িতে আগমন, গৃহদাহ, অসুস্থ বন্ধুকে পশ্চিমে স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করেও অচলার একটা উৎকণ্ঠাকে সম্বল করে তাকে

গৃহের স্বাদ থেকে বঞ্চিত তো করেছেই উপরন্তু জীবনের পাক-পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে, সে জানে সুরেশের সমস্ত ঘটনাটিই পরিকল্পিত। যে তার জীবনের একমাত্র, স্বামী-বন্ধু—জীবনের অভ্রান্ত নির্দেশক তাকে মেরে ফেলার জন্য যে-কোনো হীনতম কর্মে তার হাত কাঁপে নি, তবু অচলাকে গণ্ডির বাইরে আসতে দেখি না। রামবাবুর কাছে লক্ষ্মী মেয়েটি সেজে থাকবার জন্যে ? কি আকাঙ্ক্ষায় সে বেঁচে আছে, শুধু সমাজের নারী বলে দোহাই দেবার কারণ খুব যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। আসলে তার মধ্যকার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভাব, ভালোবাসার গভীরতা-শূন্যতা তাকে উদ্দাম করে তোলে নি। সে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল নয়, শেষ পর্যন্ত সে শরৎচন্দ্রের 'সাধারণ মেয়ে'তে পর্যবসিত হয়েছে।

তবু 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাবলী অপেক্ষা তার নিরুচ্চার ভঙ্গি বিশ্বাসের মধ্যে স্থিত। তার উপায়বিহীন স্বরূপটিও আমাদের বোধগম্য হয়। শরৎচন্দ্রের সোশিয়োলজি বা বায়োলজি পড়ার সার্থকতা কমলে খুঁজে পাওয়া যায় না—আসলে সে রাজলক্ষ্মীরই জাত, নিত্য তার পোশাক পালটানো হয়েছে। সেদিকে দোলাচলতার মধ্যে আসীন, সিদ্ধান্তে বিচলিত অচলা ঘটনাস্রোতে পা বাড়িয়েও যথার্থ অর্থে ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ঠিক যে তার মধ্যে প্রত্যক্ষতার অভাব, একবার মহিমকে আঙটি পরিয়ে দেওয়া, কশাই বন্ধুর কাছে জবাই করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছাড়া, শেষ মুহূর্তের দুর্বলতা তার অভিজ্ঞতার থালির অপূর্ণতা প্রমাণ করে। যে কোনোদিনই বাবার অবাধ্য হয় নি বলে নিজে ঘোষণা করে তার পরিণতি আমাদের বিস্মিত করে না। বড় গলায় সুরেশকে মহিমের রাজপুরের মেটে বাড়ির কথা বলেছিল, অথচ কার্যকালে 'এমনি নিরানন্দ, নির্জন—মেটে বাড়ির ঘরগুলো যে এরূপ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার, জানালা দরজা যে এতই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য গৃহে জীবন যাপন করিতে হইবে উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামীসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্তে মায়ামরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল।' কল্পলোকে বসবাস করলে অথবা ভালোবাসা সম্পর্কে শোনা বা বইপড়া বিদ্যের দৌড় থাকলে এ রকম মায়ামরীচিকার শিকার হতে হয়। বাস্তববোধ না থাকার সঙ্গে সমাজ-সম্পর্কজাত বিবেচনাও তার মধ্যে কাজ করে নি। সুরেশের সঙ্গে সে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তারপর ঘটনাস্রোতেই সে গা ভাসিয়েছে, সুরেশের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও ভালোবাসা তার ছিল না, সমাজ নামক ধারণাটি তার মধ্যে যা কিছু সংঘাতের মূলে। সুরেশের সঙ্গে বাস, সহবাস সম্পর্কে তার উপলব্ধিও এ কারণে খুব বিস্ময়কর নয়, 'পিতার লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আরক্ত করিয়া দিল। শুদ্ধ মাত্র এ কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায় ?'

শুধু অচলার মধ্যেই নয়, সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেই ছিল মূলীভূত এক অসঙ্গতি। সুরেশকে ভালবেসে মহিমের প্রতি টান, মহিমের ক্রোড়ে বসে সুরেশের জন্য কর্ণমূল রাঙিয়ে বসেছে। শরৎচন্দ্র জানেন প্রেম একনিষ্ঠ না হলে ব্যক্তির,

সমাজের মহতী বিনষ্টি। তবু সমাজে এ বিনষ্টি আছে, তাই তাকে তিনি ব্যক্ত করেন। এখানে এই দেখানোর মধ্যে নিহিত শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা, উপন্যাসেরও। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে। ···এবার আর ফাঁদে পা দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আঁট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন প্রভাত-বাবুও দোষ খুঁজে না পান। 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ঐগুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। 'হরিনাম' যেই করুক লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি 'হরিনাম' গাইব। দেখি এতে কি হয়। ···একটা বড় উপন্যাস গৃহদাহ নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি···এতেও ঐ শিক্ষা কাজে লাগাব। ফাঁদে পা দেব না। বিরাজ বৌ নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ চৈ করে নিন্দে করবার সুযোগ পেল'—ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।' তাহলে শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহে' কী দিতে চেয়েছিলেন, আধুনিকতা ? কার ভয়ে তিনি ভীত ? সমাজের, সাধারণ মানুষের, সমালোচকের ? এই প্রশ্নগুলি থেকেই যায়। 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর মতো প্রায়শ্চিত্ত অচলাকে করতে হয় নি। তবু বাইরের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে নিরন্তর সংশয়ের মধ্যে তার দগ্ধীভূত হওয়া পরিমাণে বোধকরি অধিক দংশনের বিষয়। 'গৃহদাহ'-এ কিছু Immoral কাজ করবেন না—এমন ইচ্ছে বহন করেছেন শরৎচন্দ্র। Moral ও Immoral ব্যাপারটির সংশয়ের ঘোর কাটাতে তিনি পারেন নি, এখানেই তাঁকে অনাধুনিক করে দেয়। অচলার দোলাচলতার মূল খুঁজে পেয়েছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পিতার অস্থিত চিত্তের মধ্যে, মিশ্রণের বা দোলাচলচিত্ততার খুব ভালো একটা দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র বলে মন্তব্য করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায়। আসলে প্রাগ্রসর ও পশ্চাৎপদী ক্রিয়াকর্মের যুগ্ম-সম্মিলন ঘটেছিল শরৎচন্দ্রে, তাঁর সাহিত্যে নিশ্চয় আগন্তুক গৃহদাহ সেই দুই ক্রিয়াকর্মের প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসটিতে। এর প্রতি পদক্ষেপে উচ্চাবচতায় কণ্টকিত হতে হয় পাঠককুলকে সেকারণে। কেদারবাবু কোন ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক আদৌ কিনা এই সংশয় থেকে সুরেশের ব্রাহ্ম-বিরোধ কতখানি বাগাড়ম্বরের কতখানি স্বকপোলকল্পিত পাঠক তা বুঝতে পারেন না, বন্ধুকে দু' দুবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর সার্টিফিকেট গলায় ঝোলালেই, সদ্য মৃত্যু মুখ থেকে ফেরা বন্ধুকে গঙ্গাযাত্রা করানোর অধিকার তার বর্তায় কিনা, আর ভালোলোকত্বের পরিচয় পেলেও তার পত্নীকে অপহরণের ক্ষমতা জন্মায় কিনা সুরেশের অভিধানে তার কী নির্দেশ আছে জানতে ইচ্ছে করে, প্রশ্নটা ফিরে আসে তার স্রষ্টার কাছেও। দুঃখ হয় এই জন্যে, আয়োজন ব্যাপক ছিল, বাংলা উপন্যাসের পরিধি ব্যাপ্ত ছিল, আধুনিকতার বহু চিহ্নে সুসজ্জিত করার সম্ভাবনা ছিল সে কাহিনীর, উপন্যাসের তার মোহানাশূন্যতা বাংলা উপন্যাসের প্রগতির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সম্ভাবনা-ময় উপন্যাসের পরিণাম এ জন্যেই হতাশাব্যঞ্জক। এর থেকে কল্লোলীয়েরা গতি নিয়ামককে খুঁজে পাবেন কী ভাবে ? 'শরৎচন্দ্র কল্লোলীয় অতি-আধুনিকদের পূর্ব-সূরী নন। সম্পর্ক যেটুকু তা অতি ক্ষীণ। তরুণ অতি-আধুনিকদের সাহিত্য রচনায় তিনি যে একজন প্রত্যক্ষ উৎসাহদাতা এমনও নয়। অতি-আধুনিক তরুণদের অনেকেই ছিলেন ইংরেজি বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত, বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত, প্রবল ভাবে কলকাতা-অভিমুখী এবং নাগরিক পালিশের জন্য উন্মুখ

আর সেই তুলনায় শরৎচন্দ্র ছিলেন খানিকটা ঘর-পালানো, কলেজীয় বিদ্যার দিক থেকে অপাঙ্‌ক্তেয়, রেঙ্গুনের মিস্ত্রি পাড়ার মানুষ, হাওড়ায় বাজেশিবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসার পরেও অনেক দিক থেকেই গ্রামীণ, এবং বিশেষ ভাবে দেশজ।' বাংলা সাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আর শরৎ-চন্দ্রীয় 'সমাজ'-ও আজ নিশ্চিহ্ন। যে সমস্যা নিতান্ত এককালীন সমাজগত তার মূল্য কালোচিত ও সময়ানুগ, তবু মৌলিক প্রশ্ন সমূহ কাল নিরপেক্ষ। শরৎচন্দ্র এমন অনেক মৌলিক সমস্যা এবং চিরন্তন মূল্যবোধের আশ্রয়স্থল করে গড়ে তুলে-ছিলেন তাঁর উপন্যাসের পটভূমি, যার কিছু অবশ্যই তাঁরই দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যে প্রথম। নিষিদ্ধ প্রেম ও বহুকালের প্রচলিত সামাজিক প্রথার মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ নর-নারীর সমস্যা। তার পরিণতি যা-ই হোক তার কথা যে উচ্চার্য এবং তা দেখানো আধুনিক কথাশিল্পীর কর্তব্য তা তিনি ভুলে যান নি। কেমন করে সংস্কারের নিগড় ভেঙে আধুনিকতার কাল স্পর্শ করবে। সংস্কার চূর্ণ করবার আয়ুধ কেমন করে পাত্র-পাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে শরৎচন্দ্র তা জানতেন না, এ কথা বলা মূঢ়ের সমান। তবে তাঁকে বহু ক্ষেত্রে অনাধুনিক বলে প্রতীতি জন্মে এই জন্যে যে নোতুন করে গড়ে তোলার অস্ত্রে তিনি তাঁর নায়ক-নায়িকাদের সজ্জিত করতে পারলেন না যখন প্রথম মহাযুদ্ধের ক্লেদ-স্নান থেকে সদ্য উঠে-আসা য়ুরোপ ক্রমাগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্ন লগ্নের দিকে এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক বছর পূর্বে তাঁর তিরোধান ঘটেছে, কিন্তু ক্রান্তদর্শী লেখক তাঁর আসন্ন পদধ্বনি শুনতে পাবেন নিশ্চিত করেই বলা যায়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকালে নোতুন সূর্যোদয়ের আভাস তো ফুটে উঠে-ছিল, শরৎচন্দ্র সেই কালের দুর্দম প্রকৃতির মধ্যে জেগে ওঠা কালকে প্রত্যক্ষ করবেন না, সেটা ভাবতে বিস্মিত বোধ করা স্বাভাবিক। কেবল গ্রামীণ জীবনে সমাহিত থেকে বস্তুপুঞ্জের বর্ণনা দিয়ে বস্তুবাদিতার স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নয়। প্রত্যাশা তাঁর কাছে আরো বেশি এই জন্যে যে বহু পুঞ্জীভূত প্রথার বেড়ি ভাঙবার মতো পাত্র-পাত্রী তো তিনি মজুত করেছেন। দীপিতা অভয়া, বিদ্যুৎ চমকের কিরণময়ী সংশয়ের দুয়োর ভাঙবার অপেক্ষায় অচলা তাঁরই হাতের সৃষ্টি। তবু সম্পূর্ণতাই সাহিত্যের শেষ কথা, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো সমাপ্তি সেই অসম্পূর্ণতা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আধুনিকতার প্রতিবন্ধকতা বস্তুত এখানেই, অনেক জানা, অনেক দেখা জীবনের স্রোতোধারায় অন্বিত না হলে অপূর্ণতা বেদনা আসতে বাধ্য। কাহিনী ও চরিত্রের সম্ভাবনাও মরীচিকার মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। মরূদ্যানের সন্ধানী থেকে তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হলেন না, এ পরিতাপ বাংলা কথাসাহিত্য অপূরণীয়, 'গৃহদাহ' প্রসঙ্গে এ কথা সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা চলে।

চার
নামকরণ

'নামকে যাঁরা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই।' 'কাব্যের উপেক্ষিতা' আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যখন এইরকম উক্তি করেন তখন বেশ বুঝতে পারা যায় নামকরণের ওপর রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনিই আমাদের বুঝিয়েছিলেন—নামকরণ এমন হওয়া উচিৎ যার থেকে সৃষ্টি কর্মের চেহারাটা বোঝা যায়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাই তিনি বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে গ্রন্থের শিরোনাম করতে চেয়েছেন। শুধু সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে নয়, প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভিতরকার আহ্বানটির দিকে মনোযোগ রেখে নামকরণে বৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করে গেছেন নামকরণ একটা শিল্পায়ন। আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক উত্তরসূরীরা এই তথ্য ও সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিশে-র তরুণ শিল্পীরা, তিরিশের কবিসমাজ সকলেই নামের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন এমন কথা বলা যায়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলায়, ছাঁদ বদলায় এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন শরৎচন্দ্রও। তাই ১৯১৭-তে আমরা পেলাম 'চরিত্রহীন'। তারপর 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন'। মোটকথা শরৎচন্দ্রও নামকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর অনেক উপন্যাসের নাম বেশ তাৎপর্যবহ। 'চরিত্রহীন' তাই চরিত্রবানদের উপন্যাস, 'পথের দাবী'তে দাবী আছে যতটা ততটা পথসন্ধান নেই, 'শেষ প্রশ্নে' প্রশ্ন উঠেছে বিস্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে উত্তর-সমাধান। 'গৃহদাহ'-এ শরৎচন্দ্র নামকরণকে তাৎপর্যবাহী করতে চেয়েছেন। অবশ্য গৃহদাহের যে গৃহ অনেকটা সুরেশের জন্য নষ্টনীড়ে পরিণত হয়েছিল সমাপ্তি অংশে এসে তা আর পুরোপুরি নষ্ট-নীড় থাকে না। অচলা মহিমের হাত ধরে বলে—

'আর আমি দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল যেতে পারব'।

'নষ্টনীড়ে'র প্রণোদনা শরৎচন্দ্রকে সুতীব্র সংক্রমণে বিলোড়িত করেছিল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, দুই পুরুষ ও এক নারীর ভুলের জন্য একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। একটি বহু কাঙ্ক্ষিত নীড় ভুলের আবৃত্ত দশমিকে নষ্টনীড়ে পরিণত হল। সে কারণে ১৯-পরিচ্ছেদে আগুন লেগেছে। তার বিকিরণ দেখি সুরেশের চোখে মুখে, অচলার দ্বৈধ সত্তায়, মৃণালের লেখা কয়েকটি ছত্রে, মহিমের নির্লিপ্ত দার্শনিকতায়।

'প্রতিশোধ নেবার এই কি সময় পেলে ?'

'কিছুতেই ওর মধ্যে তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে অচলার এই উক্তি যেমন সত্য। তেমনি সত্য—

'তাহার মুঠোর মধ্যে তখনো সুরেশের কোঁচার খুঁট ধরা ছিল। তেমনি ধরা রহিল।'

শরৎচন্দ্র পরোক্ষে দেখিয়েছেন এই হল দাহের ইতিহাস। 'গৃহদাহ'টা আকস্মিক ঘটনা। গ্রামবাসীরা ঘরে আগুন দেয়নি। মহিম নয়, সুরেশও আগুন দেয়নি

ঘরে। 'যাকে ক্রাইম বলে, সে তুমি কোনদিন করতে পার না বলে আজও আমি বিশ্বাস করি' মহিমের এই মন্তব্য অমূলক নয়। আবার, 'তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে।' অচলার এই অভিযোগ তাৎক্ষণিক, এতে প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব।

'গৃহদাহ' পরিকল্পনা সর্বজ্ঞ লেখকের ব্যক্তিগত পরিকল্পনা। উপন্যাসের মাঝামাঝি জায়গায় মহিমের ঘর পুড়িয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র পূর্বের পরিচ্ছেদগুলির ঘটনাবলীতে একটা ছেদ টেনেছেন। উপন্যাসের ভূগোল বদল করেছেন। লক্ষণীয়, গৃহদাহে'র পরে পরেই মৃণালের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীকালে মৃণালকে আদর্শ কর্তব্যপরায়ণা নিঃসঙ্গ পল্লীবালা হিসেবে দেখানোর জন্যই শরৎচন্দ্র সম্ভবত মৃণালের স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। 'গৃহদাহ' পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে শরৎচন্দ্র তিন চরিত্রের নাটকীয় পরিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন।

শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন মহিমের গৃহ জতুগৃহ হয়েছিল তার বিবাহের কিছু আগে, বিবাহের অব্যবহিত পরে সুরেশের আগমনে, মৃণালের চিঠিতে, দাম্পত্য কলহে, সংগৃহীত সমিধে আগুন লেগেছে। মহিমের দীন কুটিরটিকে পুড়িয়ে শরৎচন্দ্র তার পাঠককে অত্যন্ত মোটা দাগে একটা ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে অনেকটাই সফল হয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র প্রথমত দেখাতে চেয়েছিলেন, গৃহ দাহের জন্য দায়ী অচলার মন। 'ঘরে-বাইরে'র প্রবর্তনা শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন বিমলার মত অচলাও মহিম ও সুরেশ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। অচলা কখনোই তার মনস্থির করতে পারে নি। কাজেই অচলার ভুলগুলো 'গৃহদাহে'র কারণ হয়েছে।

সুরেশের মৃতদেহ সৎকার করার পর মহিম অচলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন তুমি কি করবে?' স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অচলা বলেছিল 'আমি?...আমি ত ভেবে পাইনে'। আঠার থেকে একুশে উপনীত হয়েও অচলা তার 'আমি'কে চিনতে পারে নি। সুরেশের মতে সে ভালোবাসত মহিমকে। কিন্তু সেটা কখনই বুঝতে পারে নি অচলা। আমরা দেখেছি সুরেশ, তার বৈভব—মহিম, তার নীরবতা, তার দারিদ্র্য, মৃণালের চিঠি, রামবাবুর অনুরোধ সব মিলিয়ে অচলার জীবনটা কি রকম ঘুলিয়ে উঠল। এখন প্রশ্ন অচলার এই ঘোলাটে জীবন কি গৃহদাহের মূল ভিত্তি নয়?

শরৎ বিশেষজ্ঞ ড. নীলিমা ইব্রাহিম বলেন যে—'অচলা চরিত্রের দ্বৈত সত্তাকে অবলম্বন করেই এ উপন্যাসের আরম্ভ ও সমাপ্তি।'

উক্তিটি প্রসিদ্ধ এবং বহুজন মান্যও বটে। এই প্রসঙ্গেই সমালোচকেরা অচলার 'দোলাচলে'র কথা বারংবার বলেছেন। একাধিক পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র অচলার মধ্য দিয়ে, ঘটনার মধ্য দিয়ে আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে 'শ্যাম' ও কুল রক্ষার ভারসাম্য-হীনতাকে পাঠকের সামনে মেলে ধরতে চেয়েছেন। তর্জনী সংকেত করে অচলাকে দায়ী করেছেন। এর একটা বড়ো প্রমাণ—উপন্যাস গুটিয়ে আনবার সময় অচলা মৃণালকে মহিয়সী বলে ভাবতে শুরু করে, সুরেশের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দেখতে

পায় হিন্দুধর্মের ত্যাগ। আবার ৪৩-পরিচ্ছেদে সেই অচলাই মহিমের হতে ধরে উঠে দাঁড়ায়। বিয়ের দিন যে অচলা মনে মনে বলেছিল—'প্রভু, আর আমি ভয় করি নে,'—সেই অচলাই ৪৩-পরিচ্ছেদে মহিমের হাত ধরেছিল।

সরলভাবে এই পরিসংখ্যান দ্বারা দেখানো যায় যে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতি রয়েছে অচলার ভারসাম্যহীনতায়। কিন্তু ঘটমান সত্য, কোনো মানুষকে দায়ী করতে গেলে তার প্রামাণ্য দলিল রচনা করতে হয়। সাহিত্যের আদালতেও সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হয়। যান্ত্রিক ছকে দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু দোষ প্রমাণ করা যায় না। অচলা-নির্ভর 'গৃহদাহ' নামকরণটি তাই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। বাস্তবিক, উপন্যাসে অচলার জন্য কোনো গৃহ তৈরী করা হয়নি। যে 'গৃহ' আদৌ ছিল না তা দাহ হয় কি করে? অচলার জীবনের কোনো প্রভাত নেই, দিবস নেই, আছে শুধু অন্ধকার। তার কোনো অতীত দেখানো হয়নি। তার মনের সংস্কার, আধুনিকতা, বিকার, আত্মধিক্কার উপন্যাসে যা আছে তার সবটাই সর্বজ্ঞ লেখকের দখলে—অচলার জন্য আলাদা করে কিছু রাখা হয়নি। অচলা কখনও ক্ষতবিক্ষত হয়নি। রূপ নিয়ে, মন নিয়ে, মন জয় করা নিয়ে, পারিপার্শ্বিক নিয়ে, এমন কি অর্থ নিয়েও অচলাকে ভাবতে হয়নি। সত্তার গভীরে প্রত্যেক নারীর মধ্যে গৃহের একটা স্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে নারীর আহত মন সংসারে ওলট-পালট ঘটাতে চায়। অচলাকে স্বপ্নভাঙার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত হতে দেখি না কারণ দোলাচল বৃত্তির জন্যে অচলার মনে নীড় বাঁধার স্বপ্ন কখনোই প্রগাঢ় হয়নি। অচলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যমুখী হতে পারেনি, সে হতে পারে নি মরুভূমির ক্যাক্‌টাস। ফুল আর পাথরের মধ্যে সে ফুল চিনতে পারেনি। অচলা তাই শেষ পর্যন্ত না পেল সুরেশকে না পেল মহিমকে। সুরেশ তার কাছে প্রথমাবধি 'একটা ভয় একটা আতঙ্ক'; কখনো 'কসাই বন্ধু'। মহিমকে সে চিনল না। রাজপুর নামটা সে কানে শুনেছিল, মৃণালকে সে চিনত না। দুই মেরুর আকর্ষণে অচলা কেমন করে ছিন্নমূল হলো তার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস উপন্যাসে নেই। তার জীবনে মহিম ও সুরেশের ভূমিকার মূল্যায়ন লেখক করেন নি। সুরেশের প্রতি অচলার করুণা বা সহানুভূতি কেমন করে প্রেমে রূপান্তরিত হলো তার ব্যাখ্যা উপন্যাসে নেই।

মৃণালের প্রতি অচলার অহেতুক অবিশ্বাস সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। অথচ শরৎচন্দ্র মৃণালের চিঠিকে গৃহদাহের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করেন।

সুরেশ উপন্যাসের প্রথম দিকে অচলাকে শ্রদ্ধা করলেও শেষদিকে 'ভূতের বোঝা' বলে মাঝুলির দিকে এগিয়ে গেছে। অচলার মন নিয়ে সুরেশ অনুমাত্র ভাবেনি, মহিম অচলাকে করুণার পাত্রী বলে বিবেচনা করেছে, আশ্রয় খুঁজে দেওয়াকেই সে আশু কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছে। শেষ পর্যন্ত অচলার ভয়ংকর নিঃসঙ্গতায় উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসের কাহিনীতে মহিমের গৃহে আগুন লেগেছে। নামকরণের ব্যাপারে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও গৃহদাহ নামের প্রতীকী অর্থটিই সম্ভবত লেখকের অভিপ্রায় ছিল। গৃহ অবশ্য সে অর্থে অচলা-মহিমের হয়নি। উপন্যাসের পরিণামে গৃহ ভেঙ্গে যাওয়ার কথাও তাই সেভাবে উচ্চারিত হয় না। রবীন্দ্রনাথের

'ঘরে-বাইরে'র প্যাটার্নটি 'গৃহদাহে'-ও অনুসৃত। বন্ধুদ্বয় ও বন্ধু-পত্নীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের কাহিনী উভয় উপন্যাসের কথাবস্তু। 'ঘরে-বাইরে'র নামকরণটি রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বচিন্তার অভিব্যক্তি। বিমলা বাইরের অভিঘাতে ঘরের মূল্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। সমগ্র 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্ব বিমলার চিত্তে আলোড়ন তুলছে এবং অবশেষে নির্দ্বন্দ্ব হয়েছে, স্থিত হয়েছে। 'গৃহদাহ' নামকরণে শরৎচন্দ্র ঐ ধরনের একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অচলার দোলাচলতার মধ্যে 'গৃহদাহে'র বীজটি লেখক কাহিনীর শুরুতেই বপন করেছেন। কাহিনীর মাঝখানে—১৯ পরিচ্ছেদে মহিমের দেশের বাড়িতে আগুন লাগার বাস্তব ঘটনায় সেই বীজটির পুষ্টি সাধন হয়েছে। উপন্যাসের অন্তিম পরিণতিতে সুরেশের মৃত্যু, অচলার অসহনীয় অস্তিত্বের মধ্যে 'গৃহদাহে'র তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি পাঠকের মনেও সংক্রমিত। Doing এবং suffering-এর যে অভিজ্ঞতায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি হয়েছে তাতে উপন্যাসের নামকরণটি অর্থবহ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই। মৃণালের মুখে অচলার আশ্রয় পাবার একটা কথা শোনা গেলেও গৃহদাহের আঁচ থেকে পাঠক কখনই মুক্তি পায় না।

পাঁচ
চরিত্র চিত্রণ

আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির মূলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ। এ কথা বলার অর্থ হলো ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে কতখানি জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন তাঁর ওপর নির্ভর করে ঔপন্যাসিকের শিল্পদক্ষতা। একটা কথা প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, চরিত্রগুলি লেখকের সৃষ্টি ঠিকই কিন্তু সৃষ্ট হবার পর তারা আর লেখকের অনুগত থাকে না। চরিত্রের এই স্বাধীন সত্তা রক্ষা চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষের অন্যতম শর্ত। উপন্যাসের তত্ত্ব অনুযায়ী উপন্যাসে দু'ধরনের চরিত্রের সন্ধান মেলে: (১) জটিল (round); (২) সরল (flat) চরিত্র। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে জটিল চরিত্রের আবার দুটি শ্রেণী—অন্তর্মুখী (introvert) ও বহির্মুখী (extrovert)।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির অধিকাংশই চরিত্র-কেন্দ্রিক। চরিত্র সৃষ্টির নাটকীয়তা শরৎচন্দ্রের শিল্পসৃষ্টিকে একটা চিরকালীন মূল্য প্রদান করেছে। দু-একটা কালির আঁচড়ে শরৎচন্দ্র যে সব চরিত্র এঁকেছেন তা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে আজও। মনে পড়বে শ্রীকান্তের অভয়াকে, তার স্বামীকে, নন্দ-টগরের কথা আমাদের স্মরণে থাকবে চিরকাল। আর সেই জাহাজ ঘাটের বাবুটি—এইরকম অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন শরৎচন্দ্র।

গৃহদাহে মোট ছয়টি চরিত্র আলোচনার যোগ্য—উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ এদের ক্রিয়া-কলাপেই প্রবহমান। উল্লেখযোগ্য এই ছটি চরিত্রের মধ্যে রামবাবু সম্ভবত সরল চরিত্রের নিদর্শন—বাকীরা সকলেই জটিল চরিত্র। এর মধ্যে অচলা ও মহিম জটিল অন্তর্মুখী চরিত্র। মনস্তত্ত্বের দাবী মেনেই শরৎচন্দ্র অচলা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মৃণালের চরিত্রে বহির্মুখী ঝোঁক থাকলেও অন্তর্মুখী ঝোঁকটিও অস্পষ্ট নয়। তবে কেদারবাবু এবং সুরেশ উভয়েই বহির্মুখী চরিত্র।

॥ অচলা ॥

শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র সৃষ্টিমালায় অচলাকে একবার আঁকেন নি, অন্তত দু'বার এঁকেছেন। অচলার কথা মনে পড়লে আরেকটি মুখ মনে পড়ে। সেই মুখটি হলো 'শেষপ্রশ্নে'র কমল। শেষপ্রশ্নের কমল আসলে অচলার ভাব সম্প্রসারণ। গৃহদাহের এগারো বছর পর শেষ প্রশ্নের জন্ম। উপন্যাসের নায়িকা কমলের বাবা মা কেউই বেঁচে নেই। কমলের বিয়ে হয়েছিল এক ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে। তিনি বেঁচে নেই। কমলের শিক্ষাদীক্ষা গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য আদর্শে ভোগবাদী পিতার কাছে, ফলে কমল অনায়াসে বলতে পেরেছে:

"একদিন যাকে ভালবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" আবার,

"এ জীবনের সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু। সত্যি চঞ্চল মুহূর্তগুলি / সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।"

কমলের এই সব উক্তির মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ আছে। শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন 'শেষপ্রশ্নে' intellect-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করতে। বলেছিলেন, "শেষপ্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কিরকম হওয়া উচিত তার একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করছি।" আধুনিক সাহিত্যের আভাস—শুধু কথার কথা হয়ে থাকে নি, তাকে ফলিত সত্যে শরৎচন্দ্র প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এর সাক্ষী হয়ে আছে কমলের নিম্নোক্ত সংলাপ ঃ

"একদিন আশুবাবু স্ত্রীকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই। তাঁর কাছ থেকে পাওয়ারও কিছু নেই।"—প্রিয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই নির্মম দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ।

হিন্দু সমাজের বিধবার ব্রহ্মচর্যকে আধুনিকা কমল গৃহিণীপনার মিথ্যে অভিনয় বলে জেনেছে। তার মতে এই গৌরব ছাড়াই ভালো। কমল হরেনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম নির্মাণকে সমর্থন করে নি। তার প্রকাশ্য মন্তব্য ঃ

"পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন।"—পুরোন মূল্যবোধগুলি এইভাবে কমলের জীবনদর্শনে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

পূর্বসংস্কারমুক্ত, পুরনো মূল্যবোধের সঙ্গে আপোষহীন শরৎচন্দ্রের আধুনিকোত্তমা কমল শেষ পর্যন্ত তার শতদল বিস্তার করতে পারে না।—পুরোন মূল্যবোধেই আশ্রয় নেয়। ফলে কমল ভুলতে পারে না শিবনাথকে—

'তোমার ভালো হোক, তুমি ভালো থাকো এ আমি আজও সত্যি সত্যিই চাই।'

আবার অজিতকে কমল বলেছে ঃ

"ভগবান তো মানি নে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকেই তোমাকে আড়ালে রেখে একদিন যেন আমি মরতে পারি।"

কমলের এই উক্তির সঙ্গে 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীর উক্তির কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। মৃত কুন্দের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখী ঠিক এইরকম কথাই বলেছিল।

আধুনিক শরৎচন্দ্র কমলকে তিল তিল করে নতুন কালের মানচিত্রে উজ্জ্বল করেছেন, যদিও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। গৃহদাহের অচলাকেও শিল্পী আধুনিক নারী হিসেবেই উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

কমলকে আধুনিক কালের আলোকিত মঞ্চে তুলে ধরার জন্য শরৎচন্দ্র তাকে মাতৃহারা করেছেন, তার ক্রিশ্চিয়ান স্বামীর কথা বলেছেন, পাশ্চাত্য ভোগবাদী আদর্শের পৃষ্ঠপোষক মৃত পিতার কথা বলেছেন। শিবনাথ, অজিতকে দুই মেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি করেছেন অচলার ক্ষেত্রে। কমলের মতো অচলাও মাতৃহারা, কেদারবাবু নতুন ধর্মাদর্শের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই অচলা ব্রাহ্মনারী, সে সহজে পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছে। কমলের মতো অচলার জীবনটাও সরল নয়। কিন্তু কমলের ক্ষেত্রে যেমন অচলার ক্ষেত্রেও তেমনি শিল্পীর বধা চরিত্রের পক্ষে হানিকর হয়েছে।

গৃহদাহ উপন্যাসের শুরুতে শরৎচন্দ্র অচলার যে ছবি আমাদের সামনে তুলে

ধরেছিলেন তা সত্যই আকর্ষক। ছিপছিপে পাতলা গঠন, কপোল, চিবুক, ললাট মুখের ডৌল সুশ্রী, সুকুমার। চোখের দৃষ্টিতে স্থির বুদ্ধির আভা। এই অচলা শুধু সুরেশের ঘুম কেড়ে নেয় নি, সে পাঠকেরও ঘুম কাড়ানিয়া। অচলা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করেছে ভাবী স্বামীর বন্ধুকে। ভাবী স্বামী সম্পর্কে অচলার শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ছোট্ট একটি মন্তব্যে—

"তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।"

অচলা এই সময় একমুহূর্তের জন্যও সুরশকে কোনো রকম অসম্মান প্রদর্শন করে না। আঘাত দেওয়ার পরিবর্তে সুরেশের হাত দুটি ধরে অচলা শুভার্থীর প্রতি গভীর মমতা প্রদর্শন করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুরেশ অচলাকে ছিন্নমূল করে বুকের কাছে টেনে নেয়। বুদ্ধি-মতি অচলা এবারেও বিচলিত হয় না। সুরেশ ব্রাহ্ম বাড়িতে খাবে কি না—কেদার মুখুজ্যে এই প্রশ্ন করলে অচলা বলে—

"আমাদের ব্রাহ্মবাড়িতে খেতে হয়তো ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।"

এই উক্তিতে অচলার পরিপক্কতা আভাসিত। এই অচলার কাছে সুরেশ হেরে গেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সুরেশকে জিতিয়ে দেন। চতুর কেদারবাবু সুযোগ বুঝে (৭ম পরিচ্ছেদে) সুরেশের কাছে তার দুর্দশার কথা বলেন। সুরেশ জানলো কেদারবাবুর টাকার প্রয়োজন।

ঠিক হয়ে গেল সুরেশ পরের দিন দুপুরবেলা এইবাড়িতে খাবে। খোলা দরজা দিয়ে রাঙা আলো এসে পড়লো সুরেশের মুখে। ছাড়পত্র হাতে পেয়ে বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগে সুরেশ সরাসরি অচলাকে বিবাহের প্রস্তাব করে। অচলা সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। শূন্য হাতে সুরেশ ফিরে যাবার আগে শরৎচন্দ্র পুনরায় টাকার প্রসঙ্গ তোলেন, সুরেশকে ফিরে আসবার সুযোগ দেন এবং মন্তব্য করেন ঃ

"যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু কাহাকে ? কে সে ?"

অচলার দোলাচলের শুরু এখান থেকে। এই দোলাচলতার কারণে নবম পরিচ্ছেদে অচলা সুরেশের গাড়ীতে চেপে বসে। তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। আর দশম পরিচ্ছেদে মহিমের ডান হাত টেনে নিয়ে পরিয়ে দেয় সোনার আংটি—

"এইবার যা করবার তুমি করো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের সংবাদ—

অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে। অচলা বিমুখ করেছে সুরেশকে, সুরেশ ইতরভাবে অচলা ও কেদারবাবুকে আক্রমণ করে ফয়জাবাদে চলে গেছে।

এই পরিচ্ছেদেই আবার সুরেশের জন্য অচলার 'স্নেহের বেদনা' প্রকাশ পেয়েছে। ফয়জাবাদ থেকে ফিরে সুরেশ অম্লান বদনে অচলা-মহিমের বিবাহে যোগ দিতে এসেছে। বিবাহের আগে আগে গেছে (১৩ পরিচ্ছেদ) সুরেশের বাড়িতে। ফেরার সময়

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছে তার। ১৪ পরিচ্ছেদে অচলার বিয়ে হয়েছে শ্রাবণ মাসে। বিয়ের সময় স্বামীর পায়ের ওপর মনে মনে মাথা রেখে অচলা বলেছে—

'প্রভু, আর আমি ভয় করি নে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকি নে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রসাদ।'

মনে মনে এই কথা বললেও অচলা তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে নি। অচলার ভাগ্যবিধাতা অচলাকে বারবার টলিয়ে দিয়েছেন। রাজপুর গ্রামে সুরেশের পদচিহ্ন পড়েছে। নিলাজ হয়ে সুরেশ দাবী করেছে অচলাকে। অচলার দাম্পত্য জীবনের সূচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঐকসূত্র যোজিত হতে পারে নি। মৃণালের চিঠি, মহিমের গৃহদাহ, অচলার কলকাতায় চলে আসা, সুরেশের সঙ্গে তার লুকোচুরি, ডিহরী অবস্থান, সুরেশের ভালোলাগা, রাক্ষুসী-রামবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ, মহিমের অবস্থান ও আবির্ভাব—সবই অনিবার্যভাবে অচলার জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতিকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

অচলা দুটি পুরুষকে আকর্ষণ করেছে। অচলার প্রথম সাক্ষাৎ যখন আমরা পাই তখন সে অষ্টাদশী। মহিম নিজের বৌদ্ধিক সত্তার প্রেরণায় অচলাকে চেয়েছে—সে চাওয়ায় আবেগের প্রকাশ ছিল না। নারীর কাছে, কিন্তু বিশেষ করে একটি ১৮ বছরের মেয়ের কাছে আবেগের একটা মূল্য আছে। সুরেশের আচরণে যার মাত্রাহীন প্রকাশ। অচলার স্বাভাবিক নারী সত্তা এই আবেগের কাছে সাড়া না দিয়ে পারে নি। কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়ে, যে শিক্ষিতা, সংস্কৃতি-মনা এবং রুচিবান তার কাছে মহিমের বৌদ্ধিক সত্তাও কাম্য। এইভাবে অচলার মধ্যে জন্ম নিয়েছে দ্বিখণ্ড মানসিকতা। এক মানসিকতায় অচলা আবেগ-প্রবণ নারী—তখন সুরেশই তার কাছে কাম্য পুরুষ। অন্য মানসিকতায় সে সুরেশের আবেগ প্রবণতায় নীচতার প্রকাশ দেখে আতঙ্কিত—তখন সে মহিমের আশ্রয় খোঁজে। তার এই দুটো চাওয়া-ই সত্য।

'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে মাতৃত্ব ও নারীত্বের দ্বন্দ্বের সমাধান আনা করতে পারে নি—আত্মহত্যা আনার জীবনে অনিবার্য পরিণাম রূপে দেখা দিয়েছে। সুরেশের মৃত্যুতে অচলার জীবনে বাঁচার পথ কি খুলে গিয়েছে? মৃত্যু শয্যায় সুরেশ সেই ধরনের একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় নি। উপন্যাসের শেষে অচলার মহিমের হাত ধরে বলেছে 'যতদূর বল যেতে পারব'। কিন্তু এ যাওয়ার মধ্যে জীবনের ছন্দ নেই। মৃণালের আশ্রয় হয়তো সে পেয়েছে, কিন্তু সে তো আশ্রয়-ই, জীবনের স্পন্দন সেখানে ধ্বনিত হয় না। ডিহরীতে ঝড়-জলের রাতে সুরেশের সঙ্গে দেহ মিলনের পরে অচলার পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়—শিল্পী প্রত্যাবর্তনহীনতার জগতে অচলাকে পৌঁছে দেন। সেই ধূসর প্রাণহীন, চেতনাহীন জগতে অচলার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়—অচলার জীবনের ট্র্যাজেডি এটাই।

॥ অচলার দোলাচলচিত্ততা ॥

'গৃহদাহ' উপন্যাসের অভিনবত্ব, আধুনিকত্ব এবং বৈশিষ্ট্য দোলাচল-প্রবৃত্তির বাহক একটি নারী-চরিত্র। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির পরিচয় বহু পাওয়া গেলেও একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে পেণ্ডুলামের

মতো এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমনাগমন, নিজের হৃদয়কে খণ্ডিত করে তার কোটরে দুই পুরুষকে স্থান দিয়ে পরিপূর্ণ ঈপ্সার তৃপ্তি সাধন 'গৃহদাহ' ছাড়া অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। লেখকের চোখে দু'পুরুষের মধ্যে একজন মহিমান্বিত, অবশ্য লেখকের লেখনী বা জবানীতে, কার্য-কারণ সূত্রে নয়, সে আবেগ-আসক্তির গণ্ডির বাইরের মহিম। সে নায়িকা অচলার জীবনেরও কেন্দ্রবিন্দু, তবু লক্ষ্যচ্যুতি এ উপন্যাসের আরেকটি বিশিষ্টতা। সেকারণে অচলার আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা-পূর্তির মধ্যবর্তী রেখা খুঁজে পাওয়া, কেবলমাত্র পাঠকের পক্ষে নয়, অচলার নিজের পক্ষেও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। পাথরের দেবতাকে পুজো করতে করতে শরীর ও মন দুরেষানী হয়ে উঠেছিল তার, দেবতাটি যে পাথরের তাও অভ্যাসবশত বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো আবির্ভাব নারীর সুপ্ত বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। কিন্তু সব বাসনার ভারবহনের শক্তি তো সকলের মধ্যে অশায় না, তাই নিশ্চিতির আশ্রয় মহিমের কথাও এক লহমার জন্যে বিস্মৃত হতে পারে নি অচলা। মহিম সম্পর্কে তার মনোভঙ্গির মধ্যে কোনো যে ফাঁকি ছিল, সুরেশের আবির্ভাবের পূর্বে তা তার মনে হয় নি, কিন্তু অতৃপ্তি গোচরীভূত হতেই নিজের অন্তরস্থিত গৃহায়িত আকাঙ্ক্ষা আপন গতিতে বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম দিনে সুরেশের প্রবৃত্তির উন্মোচনের মধ্যে অচলা পাকে বাঁধা পড়েছিল, এ জট থেকে সুরেশের মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পারে নি। সমস্যাটি তার গুরুতর, উচ্ছ্বাস-উদ্দামতার পাশে নিরাবেগের পুরুষ একই সঙ্গে তার জীবননাট্যে আলোকবর্তিকা নিজে হাজির হয়েছে। শ্রদ্ধাযুক্ত ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসাও তার কাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়েছিল।

দোলচলতার সন্ধিলগ্নে, ইচ্ছা ও আবেগের দ্বিধায় প্রাবল্যের মুহূর্তে নিষ্পত্তির পথ চেয়ে দীর্ঘ অসাক্ষাতের পরে মহিমের আঙুলে আঙ্‌টি পরিয়ে দিয়ে, সে বলেছিল 'আমি আর ভাবতে পারিনে, এবার যা করবার তুমি করো।' এ ছাড়াও জানাতে ভোলে নি, 'তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে জবাই হবার জন্য আমাকে রেখে গেলে?' মহিমই তার সর্বস্ব, ঘটনাচক্রে ও দোলাচলতায় তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গত কারণেই মনে হয় গৃহ যদি দাহ হয়ে থাকে তা মহিমের রাজপুরের বাড়ি নয়, পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল অচলার ইহকাল, পরকাল। মাঝুলি থেকে ফেরবার সময় অচলা পা টলে পড়ে যাচ্ছিল, স্বভাববশতই সে মহিমের হাত ধরে ফেলেছিল, তার পূর্বে অভ্যাসের দাস বলেই মহিম তার হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। পতিতকে উদ্ধার করার পর হাত গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল মহিম, তার 'আজ না হয় থাক' শব্দচতুষ্টয়ের বিনিময়ে অচলা বলেছিল 'না চল। আর আমি দুর্বল নই, তোমার হাত ধরে যতদূরে যেতে বল, যেতে পারব।' 'আর' শব্দটি ইঙ্গিত করে মহিমই তার দুর্বলতার খণ্ডনের একমাত্র পাথেয়। প্রথম দিনে সুরেশের উৎকট আচরণের মধ্যেও সেই হাতটির প্রয়োজন ছিল, যা একান্তভাবে মহিমেরই। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঋণের হাত থেকে পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে মহিম থেকে সুরেশের কাছে তার আসতে হয়েছিল, এই সত্য মেনে নিয়েও বিস্ময় রোধ করা যায় না সুরেশের প্রতি আসক্তির অন্তঃপ্রবাহে। এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী মহিমের আত্মকেন্দ্রীভূত মনোভঙ্গি, মহিমের বাসনা কী, সে কিভাবে অচলাকে

তৃপ্ত করতে সক্ষম উভয়ের যৌথ জীবনের পরিণতি বা ভবিষ্যৎ কী—এ সম্পর্কে মহিমের গভীর উদাসীনতা। উপরন্তু যখন কেদারবাবুর সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে অচলা ব্যবহৃত হয়েছে, অকৃতজ্ঞ বন্ধু জেনে শুনে এক পবিত্র ভালোবাসাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, তখনও হাত বাড়িয়ে দেয় নি মহিম, অথচ দীর্ঘ বিরতির পর তার প্রত্যাবর্তনের সময় তার গোচরীভূত হয়েছিল সুরেশ তার একান্ত মানুষটিকে কেড়ে নিতে যাচ্ছে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, তখনও প্রতিকারের ইচ্ছে তার জাগে নি। পাখা চালকের সক্রিয়তা, বিকেলে চায়ের বদলে লাইম-জুস পরিবেশনের মধ্যে বিশ্বাস খুঁজেই শুধু পেয়েছে, এর পেছনে তার প্রেমাস্পদার অবস্থা ও ইচ্ছেকে সে বোঝবার চেষ্টা করে নি।

আবার বিবাহের পর অচলার কল্পনার গ্রাম ও বাস্তব গ্রাম্যজীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হচ্ছে না এ সত্যটি মহিমের চোখে পড়ে নি, প্রতি পলে জীবন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত নারী রত্নটির দিকে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল না, এরই মধ্যে সুরেশের অনাবৃত আবির্ভাব, মৃণালেব গ্রাম্য-সারল্যের মধ্যস্থিত প্রকৃত ঘটনা বুঝতে না পারার সময়েও সাহায্যের হাত বাড়াবার চাবিকাঠি মহিমের ছিল, তার অটল গাম্ভীর্যের (?) প্রাচীর ভেদ করে সে চাবি অচলার কাছে পৌঁছল না। চলমান ঘটনা তাকে মহিম থেকে বিচ্ছিন্ন করছিল, এরি মধ্যে গৃহদাহ, পিতার নানান নিচ সন্দেহ, রুচিহীনতা, সুরেশের প্রতি অশ্রদ্ধা, স্বামীর উদাসীনতা তাকে নিজের ক্ষুদ্র বিবরে পাঠিয়ে দেওয়ার কালেও মহিমের রোগশয্যায় সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, বরং স্বামীর রোগশয্যায় তার গ্লানির স্খালন ঘটেছিল। মহিম, যাকে ভালোবাসা প্রকৃতই কষ্টসাধ্য, যার ভালোবাসার স্বরূপও নির্ণয় দুরূহ, সে-ও একটু একটু করে নিজেকে মেলে দিয়েছিল, হয়তো অসুস্থতাই তার হৃদয়কে দুর্বল করেছিল। ভালোবাসা তো বিনিময়ের, পারস্পরিক, অচলার উজার করা ভালোবাসা থাকলেও তা সার্থকতার তীর্থে পৌঁছতে পারত না। (তবু মহিমের মুখে শুনি, 'বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোন দিন কোনো বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়িও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকেও যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম, সে তুমি, আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয়, আমার একটা দিনও কাট্‌বে না। ...মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কম করে নি, কিন্তু কি জানি, যখনি জ্ঞান হ'তো তখনই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ কর্‌তুম, কেবলি মনে হ'তো হয় ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্ছে—দয়ার ঋণ আমি কেমন ক'রে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু ভগবানের হাতে-বাঁধা এমনি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধতেই হবে? আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ।')

মহিমের প্রতি শুদ্ধ ভালোবাসা অচলার দিক থেকে একাভিমুখী হয়ে এলেও প্রত্যাশার অপেক্ষা না রাখলেও, সুরেশের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু নেপথ্যে চলে যায় নি, নইলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে বলতে পারত না, 'তোমার কখখনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল'। এই অসঙ্গতির হাত থেকে রক্ষা পায় নি বলেই অচলা তার দোলাচল বৃত্তি থেকেও রক্ষা পায় নি। (মহিমের প্রতি ভালোবাসার

মুহূর্তেও সুরেশের কথা সে বিস্মৃত হতে পারে নি, সুরেশের কাছে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে প্রতি পল-অনুপল মহিমের চিন্তাতেই চিত্তকে বিভোর রেখেছে। শরৎচন্দ্রের আদর্শ বিমলাই হোক বা আনা কারেনিনাই হোক্, অচলার অনেক আচরণই সঙ্গতিবিহীন বলে মনে হয় তার কার্যকারণ দেখে। প্রখ্যাত সমালোচক তার আচরণকে silly বলেছেন। এর উৎস তিনি খুঁজে পান পিতা কেদারবাবুর মধ্যে। কেদারবাবু সম্পর্কে তাঁর ধারণা 'পেটি বুর্জোয়া প্যাটার্নে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ বিন্যস্ত। আমরা তাঁর silly ব্যবহারের পটভূমিতেই অচলার দোলাচল বৃত্তির প্রজন্মগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাই' এবং 'অচলা যে দুর্বলচিত্ত তার প্রধান প্রমাণ তার অব্যবস্থিত মনোভাব, যে অব্যবস্থিত চিত্ত পিতার সে দুহিতা, সেই পিতার সঙ্গে আর এক জায়গাতেও মিল—বিলম্বিত কর্তব্যবোধ'। সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতার জায়গা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দ্বিধা কাটিবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারা। সুরেশ সম্পর্কে প্রথম দিন থেকে অবহিত হয়ে মহিমকে তার সম্পর্কে সজাগ করেও মহিমকে বোঝবার ক্ষমতা বলা চলে, সে প্রয়োগ করে নি। মহিমের অস্পষ্টতা, নিরাবেগ প্রবৃত্তি, পাষাণ-হৃদয়তুল্য কর্তব্যহীনতা দেখে, জেনে, বুঝে এবং সুরেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণার অধিকারিণী হয়েও মহিমের বাড়িতে অর্থাৎ শ্বশুর গৃহে সে বলে ওঠে, 'তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না, সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে বলো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না। আমি এখানে মরে যাবো। সুরেশবাবু আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করার জন্যে আমাকে তোমরা রেখে যেয়ো না।'

উক্তিটির মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে? সুরেশের কাজে লাগতে পারার জন্যে অচলাব্যাকুল—কাজে কর্মে ঘটনা ও তার মানসিকতার দিক থেকে তা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর 'যাকে ভালবাসিনে' শব্দদুটি উত্তেজক মুহূর্তের সংলাপ, অচলার চেয়েও সুরেশ তা বেশি জানে। কাহিনীর শেষাংশে সে কবুল করেছে মহিমকে যে অচলা এতো ভালবাসত তা সুরেশ বোঝে নি, অচলাও বোঝে নি। সুরেশের উপলব্ধির দিক থেকে তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু বাইরে থেকে যা-ই বোঝা যাক না কেন, ভালবাসার ব্যাপারে অচলার মনে দ্বিধার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে সুরেশকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে নি, এই দুয়ের টানাপোড়েনে তার নিজের জীবন যে ক্ষতবিক্ষত ও অনিকেত হয়ে উঠেছে বোধকরি silly ভাবনার জন্যেই তা বুঝতে পারে নি অচলা। ড. অজিতকুমার ঘোষ অচলার দোলাচল বৃত্তি প্রসঙ্গে একটি ঘটনার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে অচলার মানসিকতার সমগ্র রূপটি বুঝতে অসুবিধে হয় না, 'মহিম যখন গুরুতর অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য সুরেশের গৃহেই আসিল তখন অচলা প্রাণপণ সেবাশুশ্রূষার মধ্যে তাহার কল্যাণী নারী সত্তাটি উজাড় করিয়া দিল। মহিমকে ভালো করিয়া তুলিবার আনন্দে তাহার পতিনিষ্ঠ অন্তরটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নির্মল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশের সান্নিধ্যে এক নিষিদ্ধ আনন্দের মাদকতার জন্য তাহার চিত্ত লুব্ধ

হইয়া থাকিত। তাহার প্রতি সুরেশের গোপন ভালোবাসার নানা প্রকার পরিচয় পাইবার সময় সুরেশকে ক্ষমাহীন ধিক্কারের দ্বারা শাস্তি দিবার সংকল্প করিলেও এক নিষিদ্ধ অনুভূতির রোমাঞ্চস্পর্শে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন গান গাহিয়া উঠিত। স্বামীর সঙ্গে তাহার যখন জব্বলপুর যাওয়ার কথা ঠিক হইল তখন সুরেশের অপ্রতিরোধ্য অথচ অবাঞ্ছিত আকর্ষণ হইতে সে দূরে পালাইতে পারিবে এই আশ্বস্তিতে তাহার মন লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতই যেন উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্তেই আবার সুরেশের করুণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অশ্রুসজল মিনতি জানাইয়া বসিল। এমনিভাবে তাহার মনের একভাগ সুরেশকে পরিহার করিয়া চলিত এবং আর একভাগ তাহাকেই গোপনে গোপনে কামনা করিত।') আশ্চর্য এক চক্রব্যূহে আবদ্ধ অচলা নিজের অন্তর্গত স্বরূপ নিজেই বুঝতে পারে নি, নিজের রহস্য নিজেই উন্মোচিত করতে সক্ষম হয় নি; নিজের ক্রিয়াকর্মের সঠিক ব্যাখ্যাও তার অজানা রয়ে গেছে। নিজেকে একটু একটু করে গুছিয়ে সাজিয়ে নিতে যখন প্রযত্ন নিয়েছে, নিজেরই ভেতরকার অপর খণ্ড সেই প্রস্তুয়মান ইমারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে। মানুষ আশ্চর্য অসহায় নিজেরই কাছে অচলার সন্নিহিত হতে না পারলে সে সম্পর্কে ধারণা করা কষ্টসাধ্য হত। শিশুর খেলাঘর শিশু নিজের অজান্তেই মাঝেমধ্যে ধূলিসাৎ করে ফেলে, তার খেলার নিয়মই সেটা, অচলার সংসার কোনো নিয়মেরই বশীভূত হয় নি, ফলে জীবন, জগৎ, ভালোবাসা, সংসার, জাগতিক নিয়ম কোনোটিই কালোচিত ও সময়োচিত পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে চক্রটিকে সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি। (মানুষ তো মাটির ঢেলা নয়। প্রয়োজন অনুসারে কারো হৃৎপিণ্ড, কারো মস্তিষ্ক, কারো লাবণ্য, কারো বলিষ্ঠতা দিয়ে একটি অপরূপ মানব তৈরি করা যায় না। জীবনও তো গ্রহণ ও বর্জনের সাধারণ নিয়মের দ্বারাই পরিচালিত। সব ইহ-সুখ কোনো মানুষের করায়ত্ত হওয়া তো জীবন নয়। জীবন বহু বিচিত্র ও নানান কণ্টকে আকীর্ণ—এই বিচিত্রতা ও কণ্টক মেনে নিয়েই সমাজবদ্ধ মানুষকে চলতে হয়। উচ্চাবচ পথই প্রকৃত পথ। মসৃণতা কাম্য হতে পারে কিন্তু প্রাপ্য নয়, নিজ নিজ নিয়মে জগত প্রবাহিত, প্রবাহিত যা কিছু জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত।)

বহুধা বিভক্ত জীবনের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতেই হয়। তা হলেই মসৃণতা প্রাপ্তি ঘটে, না হলে বিনষ্টির সম্ভাবনা। (কী আকাঙ্ক্ষা ছিল অচলার কাহিনী প্রারম্ভে সে সম্পর্কে পাঠক অন্তত অবহিত নন, কী পেয়েছিল অচলা মহিমের মধ্যে সে প্রাক্‌কথনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, পরিচিত প্রথম মুহূর্তেই লেখকের বর্ণনা সূত্রে তার সাধারণ রূপ চোখে পড়ে, আড়ষ্টতা বিহীন সুরেশের সঙ্গে আচরণ; এই ঘটনার পূর্বের সুরেশ, এই মুহূর্তের সুরেশ, অচলা-মহিমের বিবাহের সম্ভাবনাসূত্রে সুরেশ এবং বিবাহ-অন্তে সুরেশ ক্রমাগতই বহুরূপী। তার ক্রিয়াকর্মের বিশ্বাস্য চিত্র নেই, ডাক্তার অথচ ডাক্তারী শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে দেখা যায় না, ফয়জাবাদে অর্থ দিয়ে, পথ্য দিয়ে, দেহ দিয়ে রোগীর সেবা সংবাদ জনৈক পত্র প্রেরকের মাধ্যমে জানতে পারা যায় এবং কাহিনী শেষে মাঝুলিতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—দুটি ক্ষেত্রেই অচলার কাছ থেকে প্রত্যাঘাত হয়েই ডাক্তারী শাস্ত্রের প্রতি তার আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়, প্রথম বার অচলাকে অর্থ দিয়ে

বশীভূত করতে গিয়ে মহিমের কাছে হেরে যাওয়া এবং দ্বিতীয়বার এতো আয়োজন করে মিথ্যে কথা ও ধোঁকা দিয়ে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার প্রস্তুতি সত্ত্বেও উপলব্ধি করতে পারা যে শরীর কাছে টেনে নারীকে পাওয়া অসম্ভব কেননা সে নিশ্চিত বুঝেছিল অচলার প্রকৃত ভালোবাসা মহিমের হৃদয়ের কাছাকাছিই ঘোরা-ফেরা করছিল। সুরেশের উপলব্ধি যাই হোক না কেন তার অচলাকে নিয়ে পশ্চিমের শহরে চলে আসার পেছনে অচলার প্রচ্ছন্ন আহ্বান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ থাকে না। সুরেশ কর্তৃক তাকে নিয়ে আসার সময় অসুস্থ স্বামীর প্রতি আচরণকে তীব্র ও ঘৃণাভরে ধিক্কার জানালেও, সে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে নি বা চায় নি তার পেছনে অনেক কারণের একটি অবশ্যই মহিমের প্রতি তার ভালোবাসার অভাব এবং মহিমের তার প্রতি ভালোবাসার বিশ্বাসের অভাব। মহিম অচলার ভালোবাসা বিষয়ে নিঃসংশয় হলে, অচলার ফিরে যাবার একটা আকুলতা দেখা যেত। কিন্তু সুরেশ-মহিম এই দ্বৈবধের মধ্যে তার দোলায়মানতা তাকে কোনো একটি জায়গায় স্থির হতে দেয় নি।

অচলা একটি ছিন্নভিন্ন জীবনের নাম। এই ছিন্নভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান কালে কাকে দায়ী করা যাবে? এখানে কোনো অদৃষ্টবাদের প্রভাব পড়ে নি বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও এতে প্রযোজ্য নয়, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রীয় রীতি অনুসরণ করেন নি। এর জন্যে দায়ী কতকগুলি ঘটনা এবং তা মনুষ্যকৃত, সে মানুষেরা মহিম-সুরেশ-অচলা। তবে মধ্যমণি অচলাই। মহিমের নিরাসক্তি বা কর্মোদ্যোগ-হীনতা, সুরেশের উচ্ছ্বাস বাহুল্য ও আত্মকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয়সুখানুভূতি অবশ্যই দায়ী, কিন্তু সবার মূলে নারীস্বরূপিণী অচলা, এক মহিমে তার তৃপ্তি নেই—তার আসক্তিহীন ব্যক্তিত্ব তাকে সম্পূর্ণতা দেয় নি। সুরেশের উন্মাদনা তার পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় ছিল না। দুয়ের মধ্যে যাচাই বাছাইয়ে নিক্তির ওজন সে করছিল। সুরেশের অর্থের সুবাদে নিরাপত্তা অপেক্ষা তার মধ্যে রক্ত-মাংসের আকাঙ্ক্ষার মানুষটি তার আকর্ষণের বস্তু ছিল, আবার মহিমের নিরাবেগ ব্যক্তিত্ব, অটল ধৈর্য তার কামনীয় ছিল—এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান খুব সহজসাধ্য কর্ম নয়, তা সম্ভবই বা কী ভাবে? দুয়ের দোষগুণে তৃতীয় মানুষ গঠন তো হাস্যকর। তবু এই হাস্যকর প্রচেষ্টায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল অচলা। দু নৌকায় পা রাখতে অভ্যস্ত অচলার পা থেকে দুটি তরণীই দূরবর্তী হয়ে গিয়েছিল। জীবন-নদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কারো মধ্যেই স্থিতির আস্বাদ সে পায় নি, পাওয়াও অসম্ভব। তার সতের বছর জীবন থেকে এই দোলাচলতা তাকে একটু একটু করে নিরাশ্রয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। নীড়ের আশ্রয়ও তার ভাগ্যে জোটে নি, নামে 'গৃহদাহ' হলেও গৃহের অবস্থান লক্ষণীয় নয়। গৃহবাসনা তার কতখানি প্রবল ছিল তার সন্ধান উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় নি। যাযাবরের মতো এক মানব হৃদয় থেকে অন্য মানব হৃদয়ে যাতায়াতে তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সুরেশের মৃত্যুর পর মহিমের দিকে যে সে তার দুর্বল হাতখানি বাড়িয়েছিল তার কারণ দুই পুরুষের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় তার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তার জীবন করুণ বেদনায় রসসিক্ত হয়ে

উঠেছিল, না মহিম, না সুরেশ কারোকেই ভালো মতো বুঝতে, পেতে সে পারে নি, অনিশ্চিত দোলনে, অস্থির চিত্তের দুলুনিতে সে জীবনের চলমান সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জীবনের অর্থ তার কাছে কখনো পরিষ্কার হয় নি, নিজের জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল তার।

॥ মৃণাল ॥

'গৃহদাহ' উপন্যাসের মৃণাল দরদী শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য সৃষ্টি। শুধু চরিত্র হিসেবে নয়, মৃণাল 'গৃহদাহে'র নানা কাটাছেঁড়া গ্রন্থিকে একটি সমগ্রতা দান করেছে—এই কথাটিও মনে রাখতে হবে। একসময়ে মৃণাল হয়ে উঠেছে অচলার চোখের বালি। আবার সমাপ্তি পর্যায়ে সেই মৃণাল অচলার পরমনির্ভর আশ্রয় হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র রামবাবুর বিপরীতে মৃণালকে স্থাপন করেছেন, কেদারবাবুর মনের জট-জটিলতা নিরসনে মৃণালের ভূমিকা কম নয়। শরৎ সাহিত্যে মৃণালের মতো সেবাপরায়ণা রমণীর সন্ধান প্রায় বিরল।

উপন্যাসের অন্তত দশটি পরিচ্ছেদে মৃণাল প্রসঙ্গ আছে। এর মধ্যে দু'টিতে সে অনুপস্থিত। তাকে আমরা প্রথম দেখতে পাই ১৪ পরিচ্ছেদে। মৃণালের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই বর্তমানে এই হাস্যময়ী মেয়েটি রাজপুর গ্রামের কেউ নয়। বছর পাঁচেক আগে প্রৌঢ় ভবানী ঘোষালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। মৃণাল মহিমের আত্মীয়াতুল্যা। মহিমের সঙ্গে তার কোনোরকম রক্তের সম্পর্ক নেই।

কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই মৃণাল প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে মহিমের অনেক কাছের মানুষ। অচলাকে দেখে সে বলে উঠেছে—

'তুমিই জিতেছ সেজ'দা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।'

রাজপুর-উত্তর পাড়ার মেটে বাড়ীতে এমন সানন্দা মেয়ের খোঁজ পেয়ে হরির মা'র ভালো লেগেছে। সে বলেছে—'এ মেয়েটি কে দিদি?' খুব আমুদে মানুষ।'

হরির মা মৃণালকে চিনলেও অচলা এই পাড়াগেঁয়ে তথাকথিত অসংস্কৃতা বঙ্গবালাটিকে সহ্য করতে পারে নি। মৃণালের রসিকতা, তার লীলাচাঞ্চল্য, তার স্বামী সম্পর্কিত ঠাট্টা (বাহাত্তুরে বুড়ো) অচলার শহুরে রুচিতে একটা বিষম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে—

মৃণাল কিন্তু এসবের তোয়াক্কা করেনি। সে একা দশহাতে সেজদি'র সংসার গুছিয়ে দিয়েছে। পাচককে ছুটি দিয়ে প্রবেশ করেছে হেঁসেলে। লক্ষ্মীর হাতের স্পর্শে মহিমের তুচ্ছ নিকেতন কয়েকদিনের জন্য হৈমপ্রভ হয়েছে।

মৃণালের গায়ে পড়া ভাবটি অচলার পক্ষে হজম করা শক্ত হয়েছে। অচলা লক্ষ্য করল, মৃণালের এই আচরণকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে মহিম। নিজের হাতে রান্না করে আদরের সেজদা মশায়কে খাইয়ে মৃণাল যেন কৃতার্থ হতে চাইছে। যাই যাই করেও শ্বশুর বাড়ী যাবার নাম করছে না। মৃণালের এই আচরণ অচলার কাছে দুর্বোধ্য অসহ্য।

অচলার হাতের রান্নাকে একরকম বর্জন ক'রে মৃণাল প্রস্থান করলে সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল 'সেজদি'র মনে। ১৯ পরিচ্ছেদে অচলা আবিষ্কার করল

সেই মর্মান্তিক চিঠি ঃ 'সেজদা মশাই গো, করছ কি ? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ দুটি ক্ষয়ে গেল যে !'

মৃণালের এই চিঠি অচলা-মহিমের দাম্পত্য জীবনের চিড়টিকে বৃহত্তর ফাটলে পরিণত করেছে। যদিচ আমরা জানি, পরে অচলাও জেনেছে মৃণাল সম্পূর্ণ নির্দোষ। মুমূর্ষ স্বামীর শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে মৃণাল হতবুদ্ধি হয়ে তার সেজদা মশাইকে পত্রে আহ্বান করেছিল।

মৃণালকে অচলা ভুল বুঝলেও, সেজদা মশাই বা সেজদিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে সে। বৃদ্ধা শাশুড়িকে একা ফেলে রেখে মৃণাল ছুটে এসেছে কলকাতায়। রক্তঋণ শোধ করতে এসেছে সে। সেবাপরায়ণা মৃণালকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন কেদারবাবু। প্রগল্‌ভ সুরেশ লাভ করেছে নতুন অভিজ্ঞতা :

'আমি কখনও এমনটি আর দেখিনি কেদারবাবু ! এমন মিষ্টি কথাও কখনও শুনিনি,… ।'

উপযাচক কেদারবাবু মৃণালের বিয়ের কথা ভেবেছেন। হিন্দুধর্মের হীরক কঠিন সংযম রক্ষার সংস্কারকে নিন্দা করেছেন। অনুরূপভাবে মৃণালের বিয়ের কথা ভেবেছে অচলা এবং এ ব্যাপারে সে সুরেশকে উৎসাহী হতে বলেছে। সুরেশ মৃণালকে মলিন করতে চায়নি। সে সতীধর্মের গুণগান করেছে।

মৃণালকে আমরা এরপরে পেয়ে যাই ৩০ পরিচ্ছেদে। অচলাকে লেখা মৃণালের পত্র পড়ে কেদারবাবু অচলা-সুরেশ, মহিমের অবস্থান আঁচ করতে পারেন। অসুস্থ কেদার এবার চলে যান মৃণালের আশ্রয়ে। আত্মদীক্ষিতা মৃণালকে দেখে কেদারবাবু চরিত্রের বিবর্তন ঘটে। মৃণালের উদারতা, তার ধর্মবিশ্বাস, সেবাপরায়ণতা, ক্ষমাধর্ম বৃদ্ধ কেদারকে নতুন করে উজ্জীবিত করে।

'আজ যেন নিশ্চয় জানতে পেরেছি, ধর্ম জিনিসটাকে একদিন যেমন আমরা দলবেঁধে মতলব এঁটে ধরতে চেয়েছি তেমন করে তাকে ধরা যায় না।'

[৩৯ পরিচ্ছেদ]

'আমি বাঁচিলাম ! আমি বাঁচিলাম মা, আমাকে তুমি বাঁচাইয়া দিলে।'

[৪০ পরিচ্ছেদ]

ভারতবর্ষের অন্যপ্রান্তে বসে ৪১ পরিচ্ছেদে অচলা বুঝতে পেরেছে, মৃণালের সংস্কারের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। মৃণাল বলেছিল—

বিয়ে জিনিসটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার চলে, তার মতামত যুক্তিতর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে তাই সকল বিচার বিতর্কের বাইরে।'

এরপরেও মৃণাল বলেছিল যে—

'ধর্মের মতামত বদলায় আসল জিনিসটি বদলায় না। মূল জিনিসটি সকল জাতির ক্ষেত্রে এক। স্বামী মেয়েদের কাছে ধর্ম—তাই তিনি নিত্য। জীবনে মরণে।'

যথা সময়ে মৃণাল কেদারবাবুর সঙ্গে ডিহরীতে চলে আসে এবং সেজদা'র শিষ্য হিসেবেই অচলার জন্য সে আশ্রমের কথা ভাবে।

(উপন্যাসে মৃণাল চরিত্রের দর্পণে উদ্ভাসিত হয় একাধিক মুখ। মৃণালের মধ্য দিয়ে আমরা মহিমকে দেখতে পাই, অচলার সন্দেহাতুর মনের বিম্বন ঠিকরে পড়ে সেই আয়নায়; সুরেশ চরিত্র ব্যাখ্যার সহায়ক হয় মৃণাল। কেদার মুখুজ্যের মতো তথাকথিত ব্রাহ্ম মানুষেরা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় ফিরে আসতেন তা প্রমাণ করার জন্য মৃণাল চরিত্রটি যথেষ্ট। আবার উপন্যাসে মৃণালের ছবিটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়ার জন্যই মহিমের মতো আমরাও রামবাবুকে মেনে নিতে পারিনা।

মৃণাল চরিত্র সৃজনে শরৎচন্দ্রের সাফল্য সর্বাধিক হলেও একটা বড়ো রকমের বিসংগতি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। ৩০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মৃণাল চরিত্রটির যেরূপ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর সেখানে মৃণাল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি। সেই 'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদির মতো প্রাচীন সংস্কারে লালিতা স্নেহময়ী বঙ্গবালা। এরই দিকে তাকিয়ে সুরেশ অভিভূত হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিশেষ করে ৩৮—৪১-এ আমরা দেখতে পাই মৃণাল চরিত্রের রূপান্তর। মৃণাল এখন কেদারবাবুর অনুদার ধর্মমতের বিরোধিতা করেছে। অচলাকে ক্ষমা করতে বলেছে সে। এই মৃণাল এম. এ. বি. এল. মহিমের শিষ্যা। এই মৃণাল সুদূর রাজপুর গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে সেজ'দিকে উদ্ধার করতে। কিন্তু অচলার সঙ্গে এই মৃণালের কোনো পরিচয় নেই। সে যে মৃণালকে দেখেছে সেই মৃণাল বিধবা বিবাহকে 'বেড়াল কুকুরের অনাচার' মনে করে; সেই মৃণাল সতীসাধ্বী নারী। সে বিশ্বাস করে ধর্ম এক, আসল জিনিস স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, যা জন্ম জন্মান্তরের। আসলে শরৎচন্দ্র প্রথমত অচলার বিপরীতে মৃণালকে জয়ী করবার জন্য, দ্বিতীয়ত কেদার-রামবাবুর সংকীর্ণতাকে আঘাত করবার জন্য দুই মৃণালের সৃষ্টি করেছেন। ফলে চরিত্রটি কিছুটা স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত।)

॥ সুরেশ ॥

যে কোনো কারণেই হোক, 'গৃহদাহে' সুরেশ চরিত্রের বিস্তার ঘটেছে। অচলার ঘোরতর লজ্জার কারণ হয়েছে সে। সংরাগদীপ্ত সুরেশের আদল খুঁজে পাওয়া যায় চরিত্রহীনে'র সতীশের মধ্যে। 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপের ছায়া সুরেশে আভাসিত কিন্তু সন্দীপের বাক্‌চাতুর্য, সূক্ষ্ম রসবোধ, ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি, সম্মোহন ক্ষমতা সুরেশের অনায়ত্ত। তার আবেগ, অভিমান, গায়ের জোর, অসংযম, অশ্রুসিক্ত আঁখি সবই একটু মোটা তুলিতে আঁকা। 'গোরা' উপন্যাসের নাম চরিত্রের মতো সে বন্ধুকে বাঁচাতে এসেছিল। পরে অবশ্য মহিমের চাইতে অচলাকে রক্ষা করাই সে আশু কর্তব্য হিসেবে জেনেছে। ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তার একটা বিরূপ ধারণা ছিল। সেটা অনায়াসেই কেটে গেছে অচলাকে দেখার পর। নেশাগ্রস্তের মতো তার দেহমন টলতে শুরু করেছে। পঞ্চম দিনের সাক্ষাতেই সুরেশের দুর্বলতা প্রকট হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুরেশ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি। ব্রাহ্ম বিদ্বেষী সুরেশ ব্রাহ্ম বাড়িতে খেতে রাজী হয়েছে। তারস্বরে সুরেশ আত্ম-বিজ্ঞাপন জারি করেছে। 'জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থান কালের অতীত।'

ভালো লাগত সুরেশকে দিন ঘণ্টা দিয়ে মাপতে না পারলেই, আরো ভালো হত যদি সত্যই সে ভূমিকম্পের মতো আগ্রাসী হতো সর্বস্তরে। কিন্তু অচলাকে হরণ করায় ভূমিকম্পের আভাস নেই—নীচতার প্রকাশ আছে।

সত্যি বলতে কি, সুরেশের অন্তিম পরিণতির জন্য আমাদের ততটা সহানুভূতি জাগে না। কারণ এই চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। সাহিত্যে অসম্ভবও বিশ্বাসযোগ্যতা পায়, আবার সম্ভাব্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। সুরেশের ক্রিয়া-কর্মে বিশ্বাসযোগ্যতার ছাপ অস্পষ্ট।

একটা সময়ে সুরেশ হঠাৎ একেবারে বিনা ভূমিকায় অচলাকে দাবী করে বসেছে। তার আগেই মহিম সম্পর্কে সে বলেছে—

'যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাই নি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন?'

ট্র্যাজিক পরিণাম যার নিয়তি তার মুখে এ ধরনের বালকসুলভ উক্তি বেমানান। কিংবা—'তোমাকে পাব না মনে হলে আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত টলতে থাকে।' অচলার বিবাহের পরেও সুরেশ ভিখারীর মতো অচলা-ভিক্ষা চেয়েছে। মহিমের ছয়নলা পিস্তল দেখে সে ভয় পেয়েছে। তার ভালবাসার মধ্যে আমরা কোনো রকম জাদু দেখিনি—যা দেখেছি তা হল কাপুরুষ-সুলভ জোর। শরৎচন্দ্র সুরেশকে উদার এবং মহৎ করে দেখাবার জন্য তিনটি সূত্র ব্যবহার করেছেন :

ক. অর্থের জোর।

খ. বালকসুলভ চাপল্য ও চোখের জল।

গ. ফয়জাবাদ—মাঝুলি তথা পরোপচিকীর্ষা।

যখনই সুরেশ হেরে গেছে বা হারতে যাচ্ছে, তখনই এই তিনটি সূত্রের একটি প্রযুক্ত হয়েছে। সুরেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে শরৎচন্দ্র আভাসে-ইঙ্গিতে অন্তত তিনবার দেখিয়েছেন। সুরেশ কেদার মুখুজ্যের ভাবী জামাতা হওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে টাকা ধার দেওয়ার সূত্রে। অচলা বিবাহের আগে সুরেশের বৈভব দেখে চমকে গেছে। মৃত্যুর আগে সুরেশ মহিমের দারিদ্র্যকে একরকম উপহাস করতে ছাড়েনি। খাবার বেলায় সে বলেছে—

'সেটা তোমার দারিদ্র্যের সঙ্গে এমনি ঘুলিয়ে উঠল যে—যাক!'

সুরেশের শক্তি, তার করুণা, বন্ধু বাৎসল্য উপন্যাসে উচ্চারিত হলেও অনালোকিত। অচলাকে হরণ করার সময়ে সুরেশ এসব কথা বেমালুম ভুলে গেছে। শরৎচন্দ্র পঞ্চমুখে বললেও অচলা সুরেশকে প্রাণ থেকে আহ্বান করে নি। সুরেশের মনে হয়েছে অচলা ছলনাময়ী, পাষাণ প্রতিমা (৩৮ পরিচ্ছেদ)। অচলাকে অপহরণ করার পরমুহূর্তে সুরেশ হিস্টিরিয়া রোগীর মত ঠকঠক করে কেঁপেছে। তার মুখে যা এসেছে সে তাই বলেছে।

"আমি ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপপুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করিনে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্বনাশের কথাই ভাবি।"

"ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাড়কাক কখনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়।"

"আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি।"

এরপরে সুরেশের আচরণ কোনো জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেনি। সুরেশ একবারের জন্যও অচলার 'পরে তার দাবী জানাতে পারেনি। এক সময়ে অচলা সুরেশকে দেখে 'ব্যাধ ভীত হরিণীর' মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে ছিল। ৩৮ পরিচ্ছেদের পর সুরেশ অচলাকে একা ফেলে ডিহরীর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর আকস্মিকভাবে অচলাকে একা পেয়ে গেছে। অজস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করেছে সুরেশ অচলাকে। আর সেই ঝড়জলের রাত্রে অচলার সঙ্গে দেহমিলনের সর্বনাশটি ঘটিয়েছে। এরপরেই অচলা তার কাছে হয়ে উঠেছে 'ভূতের বোঝা'। আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে সুরেশ। মৃত্যুর মধ্য দিয়েও সে আত্মপ্রচার চেয়েছে। ফয়জাবাদের কর্মকাণ্ডের পর সে হয়েছিল সংবাদপত্রের শিরোনাম, এবারেও সে সকলকে টেক্কা দিতে চেযেছে একইভাবে। অচলার হাতে উইল তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি, মৌখিকভাবে সে জানিয়েছে—টাকা সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে। এ হল 'নার্সিসাসের' একটা দিক। সুরেশ মহিমকে ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছে অচলার দেহ আর নিজেকে।

শরৎচন্দ্র বলেছেন সুরেশ 'ডাক্তার'—উপন্যাসে তার বিশেষ পরিচয় নেই। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন সুরেশ যুবক—আমরা দেখেছি সময়ে সুরেশ শিশুও বটে, প্রৌঢ়ও বটে। শরৎচন্দ্র বলেছেন সুরেশ হিন্দু, সুরেশও বলেছে এ কথা। কিন্তু অচলাকে সুরেশ বলেছে—সে নাস্তিক; রামবাবুর চোখে সুরেশ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ। মৃত্যুর আগে সুরেশ দাবী করেছে—অচলাকে সে চিনতে পেরেছে। আমাদের ধারণা বিপরীত। রমণীকে বুঝে ওঠবার মন সুরেশের ছিল না। উপন্যাসে সুরেশ অসংখ্য কথা বলেছে। সে কথাগুলোর মধ্যে বস্তুভার বিশেষ ছিল না। ডাক্তার সুরেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দেশকালের কোনো পরিচয় সাধন করেন নি। সুরেশের যে ছবিটা খুব বড়ো হয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত, সেটি হল—উচ্ছৃঙ্খল ধনীর দুলালের চিত্র। উড়তে উড়তে, ওড়াতে ওড়াতে ফুরিয়ে যাওয়াই যার স্বভাব। অবশ্য নববাবুদের বিলাসের মধ্যেও কিন্তু একটা শিল্প থাকে, বেহিসেবী খরচের মধ্য দিয়ে একটা মানুষকে চেনা যায়—সুরেশের আচরণের মধ্যে দেবদাস সুলভ সেই দুরন্ত ভূমিকা কোথায়! সুরেশ অচলার অমল ধবল পালটিকে শেষপর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, নিজেকে 'নষ্টনীড়ে'র অমলের মতো অম্লান রাখতে পারেনি।

॥ মহিম ॥

সুরেশের মতো ছড়ানো চরিত্র না হলেও মিতবাক্ মহিম উপন্যাসের নায়ক। তারই ঘর পুড়েছে, অপহৃতা হয়েছে তার স্ত্রী—অচলা। শরৎচন্দ্র মহিমকে উপন্যাসের পাতায় স্বল্পালোকিত করলেও সেই স্তিমিত দীপালোকে আমরা প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষকে পেয়ে যাই। সূচনাবধি মহিম পাঠকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। কেদার মুখুজ্যে বা সুরেশ মহিমের দারিদ্র্য বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করলেও মহিমের অটল গাম্ভীর্য ক্ষুন্ন হয় না। অচলা জানে, মহিম মিথ্যা বলে না। মহিম আর যাই হোক 'কসাই' নয়। অচলা এও জানে, মানুষ'টা স্বল্পভাষী, কাজ নিয়ে মত্ত। তাই পরম নিশ্চিন্তে অচলা মহিমের ডান হাতে সোনার আংটি পরিয়ে দিয়েছে। তারপর দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেলে সে মহিমকে বিয়ে করেছে। শরৎচন্দ্র এই পর্যন্ত মহিম চরিত্রের ভাবমূর্তিকে অম্লান রেখেছেন।

বিবাহের পর মহিম চরিত্রটি অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। নববিবাহের রাগিনী যা একদিন শহর কলকাতায় তার মনে ঝংকার তুলেছিল, তা হঠাৎ রাজপুরে এসে উবে গেছে। মহিমের মধ্যে নববিবাহিত পুরুষের আচরণ আমরা দেখি না। শরৎচন্দ্র এই সুযোগে কাহিনী-কেন্দ্রে টেনে এনেছেন সুরেশকে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে সুরেশ যখন আসে তখন সবে মৃণাল বিদায় নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুলকালাম চলছে। এই ঝড়ের পর আকাশ প্রসন্ন হওয়ার ইঙ্গিত না দিয়েই শরৎচন্দ্র সুরেশকে নিয়ে এসেছেন। সুরেশের আগমনে অচলা-মহিমের নতুন বিবাহিত জীবনে আবর্ত উঠেছে। বালিকার মতো অচলা বলেছে—'আমাকে তোমরা নিয়ে যাও সুরেশবাবু, যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করবার ইচ্ছা এতটুকু নেই।' শরৎচন্দ্র এই পর্যায়ে মহিমকে করে তোলেন নিষ্প্রাণ পাথরের মতো কঠিন-হৃদয়। ফলে চরিত্রটি তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়। মহিম সুরেশকে রেখে বেরিয়ে যায়, ঘরে ফেরে; অসংলগ্নভাবে পিস্তল বার করে, কখনো লাঠি গাছটা তুলে ধরে—কোনো ব্যাপারেই তেমন উৎসাহ দেখায় না। তাই বলে সে একেবারে নিরাসক্ত এমনও নয়, তার গতিবিধির কথা যদু জানতে পারে, অচলা জানতে পারে না। এই সময়ে সুরেশকে দখলে পেয়ে অচলা ভারসাম্য হারায়। মহিম তাকে পাঁক ঘাটতে নিষেধ করে। একটা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি হয়, মহিমের কাছে ফের যায় অচলা—সঙ্গে সঙ্গে সুরেশও। 'আমি সত্যিই তোমাকে যেতে দিতে চাইনে'। মহিমের এই উক্তির মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। শরৎচন্দ্র মহিমকে ফাঁকি দিলেন মৃণালের চিঠি ব্যবহার করে। এর পরেই মহিমের ঘর পুড়ে গেল।

মহিম চরিত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে তার অসুখকে কেন্দ্র করে।

'অচলা ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ'। স্বল্পভাষী মহিমের এই একটি উক্তি তাকে বিশাল মাত্রা দিয়েছে। 'গৃহদাহে'র অব্যবহিত পরে মহিম বাড়ুয্যে মশাই ও তার সাঙ্গো-পাঙ্গদের বলেছিল—

'আমি যাঁকে ঘরে এনেচি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই; না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে।'

এই উক্তিটিও মহিমের চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচায়ক।

সুরেশের বাড়ীতে অচলা ও মহিম সর্বপ্রথম সত্যিকারের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। দম্পতি খুঁজে পেয়েছিল সামঞ্জস্য ও সমাধানের পথ। কিন্তু এই পর্যায়ে মহিম তৎপর হতে পারে নি।

তাই বলে মহিম হেরে গেছে এমন কথা বলা যাবে না। উপন্যাসে তার জয় হয়েছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম রামবাবুর সমালোচনা করেছে—'যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্তনারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এত বড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চণ্ডল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম?

মহিমের এই সমীক্ষা প্রগতিশীল। মহিম 'গৃহদাহে'র স্বল্পরেখ চরিত্র হয়েও এইখানে সে সকলকে অতিক্রম করেছে। সমীক্ষা সে করেছে নিজেকে নিয়েও। নিজের পলায়নটা তার নিজের কাছেও মন্দ ঠেকেছে।

শরৎচন্দ্র সুরেশকে নিজের হাতে একবার দেবতা করেছেন, একবার পিশাচে পরিণত করেছেন, পুনরায় দেবতা করার চেষ্টা করেছেন। ফলে চরিত্রটি ভারসাম্য হারিয়েছে। মহিমের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। মহিম দেবতাও নয়, পিশাচও নয়—মৃণালের মত সচল আশ্রয় নয়। কিন্তু মুস্কিল এই, শরৎচন্দ্র মহিমের কোনো পূর্বইতিহাস রচনা করেন নি, 'অচলাকে তিল তিল ভালোবাসবার ইতিহাস' মহিমেরও মনে পড়ে না—আমরাও দেখিনা। দুঃখের বিষয়, অচলা অভিযোগ করে বলেছে—'মহিমকে সে চেনে না।' শরৎচন্দ্র এম. এ. বি. এল. মহিমকে যেমন কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করেন নি, তেমনি রাজপুরের সঙ্গেও। যে দারিদ্র্য নিয়ে সুরেশ খোঁচা দিয়েছে মহিমকে, সেই দারিদ্র্যের ছবি শরৎচন্দ্র প্রকট করেননি। আমরা দেখেছি রাজপুরে যদু চাকর আছে, রান্নার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ আছে এবং মহিমের জন্য কাজের অভাব নেই। সুরেশের বেলায় যেমন, মহিমের ক্ষেত্রেও তেমনি চরিত্রের সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবনের তেমন যোগ নেই। সমাজ মহিমকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, মহিম নিজেই হয়ে গেছে স্ব-শাসিত সংস্থা বিশেষ। মহিমের আগে-পরের ইতিহাস যোজিত হলে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হতো।

॥ কেদার মুখোপাধ্যায় ॥

('গৃহদাহ' উপন্যাসে কেদার মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় শুধুমাত্র অচলার পিতা হিসেবে নয়, উপন্যাসের সুডোল-বৃত্তে কেদারবাবুর একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। পিতা হিসেবে তিনি অচলাকে মহিম বা সুরেশের সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে ছেড়ে দেননি। বরং লক্ষ্য করা যায়, এক রামবাবু ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি ছোট বড় চরিত্রের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। শরৎচন্দ্র অচলার ভাগ্যলিপির সঙ্গে, উপন্যাসের সমাপ্তির সঙ্গে, কেদারবাবুকে লগ্ন করেছেন।)

পিতা হিসেবে, একজন বয়স্ক মানুষ হিসেবে, শ্বশুর হিসেবে কেদারবাবু, অচলার কাছে, সুরেশের কাছে, মহিমের কাছে অনেক ক্ষেত্রে ছোট হয়ে গেছেন। এমনকি মৃণালের কাছেও কেদারবাবু নতুন দীক্ষা পেয়েছেন। কেদারবাবুর এই সীমাবদ্ধতাদৃষ্টে চরিত্রটিকে তুচ্ছজ্ঞান করলে আমরা মারাত্মক ভুল করে বসবো। কারণ 'গৃহদাহে'র সবচেয়ে সজীব চরিত্রটির নাম কেদারবাবু। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'কেদারবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ।' সত্যই তাই কেদারবাবুর মধ্য দিয়ে খুঁজে পাই শরৎচন্দ্রকে তাঁর স্বরূপে। যেখানে 'ইনটেলেক্ট'-এর বলকারক আহার্য শরৎচন্দ্র প্রস্তুত করেন, যেখানে দেখি তিনি জোর করে অতি আধুনিক হতে চান, যেখানে তিনি বেরিয়ে আসেন তাঁর বিশ্বাসের জগৎ থেকে, সেখানেই তাঁর 'মোটর চলা কলম' থমকে যায়। শিল্পী অনেক যত্নে ও শ্রমে টীকা যোজনা করেন, টিপ্পনী যোগ করেন, মাতামাতি দাপাদাপির চিত্র থাকে অনেক —কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় সেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে না। বোঝা যায়, সকলের সব কিছু সাজে না, তবলায় পাখোয়াজের বোল ওঠে না। বলা বাহুল্য, কেদারবাবুর পাশে অচলা-মহিম-সুরেশকে অনেক সময়ই বিবর্ণ দেখায়। কেদারবাবুর যোগ রয়েছে মাটির সঙ্গে, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে, অতীতের সঙ্গে, ভবিষ্যতের সঙ্গেও। তার আচরণের মধ্যে কোনো বিসংগতি নেই—শুধু দোষ বা

শুধু গুণ নেই। অর্থাৎ কেদারবাবু একরঙা চরিত্র নয়। 'গৃহদাহে'র আর কোন চরিত্রে এতো বৈচিত্র্য নেই। 'গৃহদাহে'র অন্যান্য চরিত্রের সমস্যা মাত্র একটি; কেদারবাবুর সমস্যা একাধিক। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কন্যা বিবাহের সমস্যা। সুরেশকে নিয়ে কেদারবাবু অচলার বিয়ের আগে এবং পরে দুই রকমের সমস্যায় পড়েছেন—মহিমকে নিয়েও কেদারবাবুর সমস্যা বড় কম নয়। অচলার ভবিষ্যত সম্পর্কেও কেদারবাবুকে ভাবতে হয়েছে। মৃণালের কাছে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তার জন্মান্তর ঘটেছে এমন কথা খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়। শরৎচন্দ্র অচলার সমস্যা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কেদারবাবুকে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসেবে রূপায়িত করেছেন।)

(কেদারবাবুর চরিত্রের সঙ্গে সুরেশের প্রথম দেখা হয় ৩য় পরিচ্ছেদে। সুরেশ মহিমের অনুপস্থিতিতে, অচলার অনুপস্থিতিতে মহিমের মেটে বাড়ীর কথা বলায়, তার দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ তোলায়, কেদারবাবুর মাথার আকাশ ভেঙে পড়েছে। তিনি সুরেশের মতোই অস্থির হয়ে কন্যার উদ্দেশে বলেছেন—

'মহিমের ব্যাপার'টা শুনেছ মা? আমরা ভেবে মরছিলাম সে আসে না কেন? ঐ শোন! ইনি পরম বন্ধু বলেই ত কষ্ট করে জানাতে এসেছিলেন, নইলে কি হত বল ত? কে জানত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী।' কেদারবাবুর এই প্রতিক্রিয়া ভদ্রজনোচিত না হলেও আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার মূলে আঘাত করে না। অবশ্যই গোরা উপন্যাসের পরেশবাবুর সঙ্গে কেদারবাবুকে তুলনা করলে চলবে না; কেদারবাবুর মধ্যে দেখি পানুবাবুর অস্থিরতা। সতেরো-আঠারো বছরের একটি মাতৃহারা মেয়ের পিতা এই কেদারবাবু; নানা দিক থেকেই ঋণগ্রস্ত, পাত্র হিসেবে মহিমকে মনে মনে তাঁর পছন্দ নয়—এই অবস্থায় সুরেশের কথাগুলো তার মনে ধরেছে। এটা মেনে নিয়েই কেদারবাবুকে বিচার করতে হবে।)

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুরেশের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে 'বড় লোকের ছেলে' সুরেশকে নিজের দখলে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন কেদারবাবু।) সুরেশের সামান্যতম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেদারবাবু একটা বড়ো রকমের চাল চেলে দিয়েছেন:)

'একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও এক তিল বিশ্বাস হয় না, আর একটা মানুষকে হয়ত দুঘণ্টা কাছে পেয়েই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্যন্ত সঁপে দিতে পারি। মনে হয় যেন জন্ম জন্মান্তরের আলাপ,—শুধু দু'ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে কেদারবাবু জানান তাঁর ব্যবসাটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তার নামে গুটি পাঁচ ছয় ডিক্রী জারির ভয়ে আহার বিহার বিষময় হয়ে উঠেছে, এছাড়াও আছে কিছু খুচরো ঋণ। সব মিলিয়ে মোট তিন-চার হাজার। এর পরেই কেদারবাবু 'উচ্চ-অঙ্গের হাস্য' করে বলেছেন—

'বাড়িটা আমি ত সঙ্গে নিয়ে যাব না। যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদেরই দুজনের থাকবে।'

কেদারবাবুর এই ইঙ্গিত পেয়ে সুরেশ অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হয়েছে। সে সরাসরি অচলাকে (কেদারবাবুর ইচ্ছাটাকে মাঝখানে রেখে) বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। কথা দিয়েছে অচলাকে না পেলেও আগামী পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবে।

অচলার মুখে সুরেশের এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনে যারপরনাই আরামে এবং আনন্দে কেদারবাবুর দেহটা ক্ষণকালের জন্য শিথিল হয়েছে।

৯ পরিচ্ছেদে দেখতে পাচ্ছি, কেদারবাবু হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। গোলদিঘির কাছাকাছি এসে—'হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন।'

সুরেশ কহিল, তোমার বাবার শরীরটা আজকাল বেশ ভাল মনে হয়।

অচলা সেইদিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, হাঁ, সে আপনার দয়ায়।

অচলা সুরেশকে ব্যঙ্গ করেই হোক বা কৃতজ্ঞতাবশেই হোক একথা বলার পর কেদারবাবুর অভিপ্রায় মতো সুরেশকে সম্মতি দান করেছে—

'আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।' অচলার এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তীকালে নাকচ হয়ে গেলেও অচলার ভাগ্য বিপর্যয়ে কেদারবাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অচলা সুরেশকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল, কেদার মুখুজ্যের বাড়ীতে আসার কোনো পথ খোলা ছিল না তার সামনে। কিন্তু কেদারবাবু ঋণ ভিক্ষা করে, সূক্ষ্মভাবে প্রশ্রয় দিয়ে সুরেশের আসার পথটা সুগম করে দেন। এবং এই সূত্রেই অচলার জীবন অন্যদিকে বাঁক নেয়।

১০ পরিচ্ছেদে কেদারবাবু 'এস মহিম। সব খবর ভাল? এইভাবে উষ্ণ সম্বোধন করলেও সুরেশের ব্যস্ততাকে মর্যাদা দেবার জন্য মহিমকে সরাসরি ফিরে যেতে বললেন—'আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—।'

অচলার দেওয়া আংটি পরে পথে যেতে যেতে মহিম ভাবে টাকার গন্ধ কেদারবাবুকে সুরেশমুখী করেছে। পরদিন অপরাহ্ণে মহিম আসে, ফিরে যায়। পর পর দু'দিন তাকে ফিরতে হয়। তৃতীয় দিনে মহিম আর ফেরে না, সে অচলা, সুরেশ ও কেদারবাবুর মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। কেদারবাবু মহিমকে 'পুরুষসিংহ' হয়ে উঠতে বলেন। উন্নতি করতে বলেন, তারপর সংসার ধর্মের নাম করতে বলেন—'নিজের উন্নতি কর, কৃতী হও, তারপরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।' কেদারবাবু মহিমের উপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, বলেন—অন্য কোনো বাপ হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি শান্তিপ্রিয় লোক, কোনোরকম হাঙ্গামা ভালো বাসিনে। মিষ্টিকথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। স্থিতধী মহিম অচলার আংটিটা দেখাতেই পরিস্থিতির বদল হয়। ফলে ১২ পরিচ্ছেদে কেদারবাবু রাজি হয়ে যান অচলার সঙ্গে মহিমের বিবাহে এবং সুরেশের নির্লজ্জ অপমানের বিরুদ্ধে খুব একটা গর্জে উঠতে পারেন না। শুধু বলেন—'এমন জানলে আমি কি ওকে বাড়ি ঢুকতে দিতুম।'

তথাপি কেদার মুখুজ্যে সুরেশকে বাড়ী ঢুকতে দেন, ফয়জাবাদের ঘটনায় সুরেশকে তিনি অন্য চোখে দেখেন। সুরেশকে দেখে এবার একটু লজ্জাও পেয়ে যান কেদারবাবু।

অচলার বিবাহের পর কেদারবাবু সুরেশকে আর স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সুরেশের প্রতি অচলার দুর্ব্যবহার, ব্যক্তিগত ঋণ, সুরেশকে হাতে হাতে কিছু ফিরিয়ে না দেবার গ্লানি কেদারবাবুকে পীড়িত করে। ফলে বাড়ীতে

থেকেও অনেক সময় তিনি সুরেশকে দেখা দিতেন না। কিন্তু যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেদিন বাধ্য হয়ে সুরেশের শরণাপন্ন হন। সুরেশ এই সংবাদটি মূলধন করে রাজপুরে যায়।

রাজপুর থেকে সুরেশের সাথে অচলা বাপের বাড়ীতে ফিরে এলে কেদারবাবু সুরেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি হ্যাণ্ড-নোট লিখে দেন। সুরেশ সেই হ্যাণ্ডনোট অচলাকে যৌতুক দেবার চেষ্টা করে। এবারে কেদারবাবু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। 'অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেচি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না বলে দিচ্ছি।'

মোটামুটিভাবে এইখানেই কেদারবাবুর চরিত্রের সফল ভূমিকা শেষ হয়েছে। তবে কেদারবাবুকে শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করেন নি। মৃণালের সঙ্গে কেদারবাবুর চরিত্রটির আশ্চর্য সমীকরণ ঘটিয়েছেন—মৃণালকে বিয়ে দেবার জন্য কেদারবাবু হিন্দুধর্মের প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। আবার মৃণালের সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে কেদারবাবু পল্লীকে ভালবেসেছেন। ব্রাহ্মধর্মের সংকীর্ণতাকে নিন্দা করেছেন। কেদারবাবু পল্লীগ্রামের কৃষকদের দেখে নতুনভাবে জেগে উঠতে চেয়েছেন, প্রাচীন সভ্যতার গুণগান করেছেন। এবারে কেদারবাবু বুঝেছেন 'মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখি জলচর সে জন্মেই সাঁতার দেয়।'

ঘৃণায়-লজ্জায়-ক্ষোভে অচলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কেদারবাবু। কারণ অচলা ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়—মুখে একথা বললেও ভিতরে ভিতরে কেদারবাবুর একটা অস্থিরতা ছিল, একটা যন্ত্রণা ছিল। অচলাকে তিনি ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। মৃণাল অচলাকে ক্ষমা করতে বলে কেদারবাবুকে যন্ত্রণামুক্ত করে। 'আমি ক্ষমা করিলাম, আমি ক্ষমা করিলাম। সুরেশ তোমাকে ক্ষমা করিলাম। অচলা তোমাকেও ক্ষমা করিলাম।' একথা বলতে বলতে সাময়িক মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন কেদারবাবু। শরৎচন্দ্র এই সুযোগে আমাদের সামনে কেদারবাবুর চরিত্রের সম্পূর্ণ অবয়বটি প্রত্যক্ষ-গোচর করেছেন। এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি কেদারবাবুর বাইরের পরিচয় এবারে প্রবেশ করলাম অন্তরে। ৪০ পরিচ্ছেদের কেদারবাবু সম্পত্তি নিয়ে, অর্থ নিয়ে, বায়োস্কোপ নিয়ে আর ভাবিত নন, এখন তিনি পিতা—মাতৃহারা অচলার পিতা: 'আমি তোকে পৃথিবীতে আনিয়াছি, আমি তোকে বুকে করিয়া বড় করিয়াছি—মা তোর সমস্ত অপরাধ সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা লইয়াই আর একবার পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আয় অচলা, আমি বুক দিয়া তোর সকল ক্ষত, সকল জ্বালা মুছিয়া লইয়া তেমনি করিয়াই মানুষ করিব। আমরা লোকালয়ে আসিব না, ঘরের বাহির হইব না, শুধু তুই আর আমি—।'

কেদারবাবুর চরিত্র সৃষ্টি ও নির্মাণের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে দিয়েছেন। 'গৃহদাহে'র এই একটি চরিত্রের মধ্য দিয়েই আমরা সমকালীন মধ্যবিত্ত মানুষের চূড়ান্ত সংকটকে প্রত্যক্ষ করি। কেদারবাবু মধ্যে দেখি এক ঋণজর্জর কন্যাদায়গ্রস্ত শহুরে পিতাকে। তাঁর চিন্তার এক কোটিতে ব্রাহ্মসমাজ তথা নগর সংস্কৃতির প্রভাব, স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাস ও নতুনকালের প্রতি গভীর আস্থা; অন্য

মেরুতে কেদারবাবু ব্রাহ্মণ সন্তান, অর্থলোভী-গভীরতর অর্থে প্রাচীন সভ্যতার প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত। সুরেশকে নিয়ে কেদারবাবুর আদিখ্যেতা, মহিমের প্রতি তার বিরাগ যেমন সত্য—তেমনি সত্য অচলার প্রতি, মৃণালের প্রতি তার অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ। দেবোপম চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি—কেদারবাবু তেমনটি নয়, আদর্শ শ্বশুর, আদর্শ পিতা, আদর্শ অধমর্ণ—এ তিনের কোনোটাই কেদারবাবু নয়—নয় বলেই কেদারবাবু শরৎচন্দ্রের স্মরণীয় সজীব সৃষ্টি।

॥ **রামচরণ লাহিড়ী** ॥

ডিহরীতে নামার অব্যবহিত পরে অসুস্থ সুরেশের চিকিৎসার জন্য অচলা যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সে সময় রামচরণ লাহিড়ী অশেষ উপকার করেন। অচলা—সুরেশকে তিনি পলাতক নবদম্পতি বিবেচনা করে আপন গৃহে স্থান দেন। রামবাবু বাড়ীতে অবস্থানকালে অচলা জানতে পারে ইনিই বীণাপাণি ওরফে রাক্ষুসীর শ্বশুর। অচলার সৌভাগ্য—ক্রমে আবার রাক্ষুসীর সঙ্গে দেখা হয়। রাক্ষুসী-রামবাবুর মধ্যদিয়ে শেষদিকের উপন্যাস নাটকীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। শরৎচন্দ্র কৌশলে রাক্ষুসীকে সরিয়ে দেন। পুরোভাগে আনেন রামবাবুকে।

শরৎচন্দ্র, রামচরণ লাহিড়ীর ধন্দ বা ভ্রান্তিবিলাসকে, তার আর্যামিকে, তার অকারণ অবারণ পিতৃস্নেহকে ব্যবহার করে 'গৃহদাহ' পরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন। বীণাপাণি পটলডাঙ্গায় চলে গেলে জনহীন পুরীতে অচলা যখন তার নিজের বিড়ম্বনা নিয়ে ভাবিত, ঠিক সেই সময়ে রামবাবু অচলার হাতের রান্না খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছেন। অচলা পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছে সে ব্রাহ্ম—রামবাবু বিশ্বাস করেন নি। অচলা বলেছে তার বাবা ব্রাহ্ম—একথা শুনে রামবাবু একটু দমে গেলেও সুরেশের গলার যজ্ঞোপবীত দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন। একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের মতো নিজেকে মহৎ করবার জন্য রামবাবু অচলাকে বলেছেন—'মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয়, (সাহেবদের) আমাদেরও ছিল, আজও আছে।'

৩৪ পরিচ্ছেদে অচলার সঙ্গে ঝগড়া করার ছুতোয় রামবাবু তাকে জরিপ করতে আসেন। ইচ্ছে করে অচলার সঙ্গে বিতর্ক করেন, যাতে এই মেয়েটির বেদনার উপশম হয়। বৃদ্ধ রামবাবুর চোখে ধরা পড়েছিল অচলার শূন্যতা, তার অস্বস্তি। রামবাবু অচলার কাছে মহৎ হবার চেষ্টা করেন। মনে মনে যা বিশ্বাস করেন না সেটাই বলে ফেলেন :

'কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষইবা কি, ধীরে ধীরে যখন সে হীন হয়ে যাবে, তখন সে সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েই সে সান্ত্বনা লাভ করে।'

রামবাবু অচলা-সুরেশকে হিন্দুমতে বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি জানেন এমন ব্রাহ্ম অনেক আছেন, যারা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন এবং অল্প স্বল্প অনাচার করেন ; মেয়ের বিয়ের সময় হিসাবের গোল করেন না। প্রসঙ্গ বদল করার জন্য, দম্পতির জীবনে হারিয়ে যাওয়া ছন্দটুকু ফিরিয়ে আনার জন্য,

রামবাবু অচলাকে সুরেশের বাড়ী কেনার কথা বলেন। অচলা কপাট বন্ধ করলে তিনি দাসীর হাত থেকে মালসা নিয়ে সুরেশের পরিচর্যায় ব্যস্ত হন।

ইতোমধ্যে খবর পাওয়া গেল রামবাবুর বাড়ীতে রাজমাতা, রাজপুত্র, রাজপুত্র-বধূ, গার্জেন টিউটর প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটবে। কাজেই অচলাকে রামবাবুর অনুরোধে সুরেশের সঙ্গে নতুন বাড়ী দেখতে যেতে হলো। সুরেশ-অচলা গাড়ীতে উঠলে রামবাবু লক্ষ্য করলেন, সুরেশের সীমাহীন প্রেম। সেখানে অর্থের দম্ভ নেই। রামবাবুর মারাত্মক ভুল হল। এই ভুলের মাশুল দিতে হল অচলাকে, সুরেশকে, মহিমকে।

শরৎচন্দ্র বলেছেন (৩৭ পরিচ্ছেদ)—'এই বৃদ্ধ লোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দুধর্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুশী হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে লুকোচুরি, ইহার সৌন্দর্য, ইহার মাধুর্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারি মুগ্ধ করিত।

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে কিছুটা ধন্দ আছে, কিছুটা সত্যও আছে। শরৎচন্দ্র যেখানে রামবাবুকে নিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে গিয়েছেন সেখানেই ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা রামবাবুর দ্বিধা শিল্পীর ব্যক্তিগত দ্বিধার কারণেই অস্পষ্ট। কিন্তু রামবাবু যেখানে প্রেমের লুকোচুরি ও সৌন্দর্য উপভোগে রত সেই অংশে তিনি সত্য এবং সজীব চরিত্র।

নতুন বাড়ীতে অচলার কান্না দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন নি রামবাবু। তার মনে পড়েছে আর একটি মুখের কথা ; 'তুমি আমার সেই সতী লক্ষ্মী মা, অনেককাল আগে কেবল দুদিনের জন্য আমার কোলে এসেই চলে গিয়েছিলে—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বুকে ফিরে এসেছ—আমি যে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম সুরমা।'

এ বাড়ীতে আসবার সময় রামবাবু মনে মনে ভেবেছিলেন গিয়ে দেখবেন, অচলার মুখখানা আর আগের মতো অভিমানে ছলছল নয়, কাজের ছুতো করে সে কোথায় হারিয়ে যাবে, তারপর অসম্ভব গম্ভীর মুখে হাতের মিষ্টি এনে মিছিমিছি ঝগড়া করতে বসবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে অচলা। তাই শত কাজের মধ্যেও বৃদ্ধ ছুটে গিয়েছিলেন মায়ের হাসিমুখটি দেখবার জন্য।

গিয়ে দেখলেন বিপরীত। ঝড়জলের রাতে সুরেশের বাড়ীতে আটকে গেলেন তিনি। বৃদ্ধের কর্তব্যবোধ সজাগ হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন সুরেশের নির্জন শয়ন মন্দিরে যে কোনোরকমে অচলাকে পাঠিয়ে দেওয়াই হবে পিতার কর্তব্য। রামবাবু জানলেন তিনি কৃতার্থ। আমরা দেখলাম, একটি ট্র্যাজিক নাটকের শীর্ষ মুহূর্ত।

৪০ পরিচ্ছেদে, ফেলে আসা নবম পরিচ্ছেদের জের হিসেবে, একই রকমের পরিস্থিতি উদ্ভাবনের জন্য শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেন রামবাবুকে। মহিমকে দেখে অচলা টলতে টলতে ওপরে চলে যায়, সুরেশ বলে—'হঠাৎ তুমি যে—।' রামবাবু কিছু বুঝে ওঠবার আগেই, 'দেখিলেন—অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া।' এরপর রামবাবুকে আমরা পেলাম ৪৩ পরিচ্ছেদে :

তুমি সুরেশের স্ত্রীর নও ?

না, উনি আমার স্বামী নন।

অচলার মুখে এই কথাটি শোনার পর বৃদ্ধের মন ক্লেদাসিক্ত হয়ে গেছে। তাঁর স্নেহ, শ্রদ্ধা সবকিছুই মুহূর্তে উবে গেছে :

এ কে, কার মেয়ে, কি জাত—হয়ত বা বেশ্যা—ইহাকে মা বলিয়াছেন ইহার হাতের অন্ন তাঁহার ঠাকুরকে পর্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে রামবাবু কাশী যাত্রা করেছেন।

রামবাবুর দিকে তাকিয়ে মহিমের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেছে। কারণ, 'যাহা ধর্ম সে ত বর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই।'

অনেকাংশে রামচরণ লাহিড়ী শরৎচন্দ্রের নৈরাত্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'নির্মম সৃষ্টি', শরৎচন্দ্র রামবাবুর মধ্য দিয়ে তার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। অচলা-সুরেশের জন্য রামবাবুর স্নেহ; সেবা, উদ্বেগ, তাদের উভয়ের লুকোচুরি গড়ে ওঠবার অবকাশ সৃজনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয় বললে কম বলা হয়। বয়স্ক পুরুষের অন্তরে অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বেদনা জমা হয়ে থাকে, অনেক স্মৃতি, অম্লমধুর রসবোধ আর ব্যর্থতা একটা বয়স্ক পুরুষের বুকে বাসা বাঁধে। সেই বাসায় কিছু ভুল থাকে, স্থূল ধারণা থাকে, বিষয়বুদ্ধি থাকে—এসবের বাইরেও থাকে কিছু—আমরা তাকে বলি ঐশ্বর্য। রামবাবুর মধ্য দিয়ে আমরা একজন প্রৌঢ়ের ইত্যাকার অস্তিত্বের নানা মহলকে পেয়ে যাই। আমাদের সৌভাগ্য উপন্যাসে রামবাবু ভারসাম্য হারান নি। শরৎচন্দ্র রামবাবুকে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবান হিন্দুরূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। রামবাবু কথা রাখেন নি। তাই শেষ পৃষ্ঠায় মহিমের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র রামবাবুর ধর্মকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়ে একটা বড় রকমের প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং নিজেকে বিতর্কের বাইরে রেখেছেন।

॥ নায়ক-বিচার ॥

'একটি উপন্যাসে মুখ্য-গৌণ দুজাতীয় চরিত্রেরই সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। চরিত্র মুখ্য হলেই, তা কেন্দ্রিয় চরিত্র হয় না, যাকে আবর্তিত করে উপন্যাস পথ পরিক্রমা শুরু করে, যে উপন্যাসের বিস্তৃতি দান করে এবং পরিণতির নিশ্চিত লক্ষ্যে উপন্যাসকে পৌঁছে দেয় তাকেই নায়ক বলে অভিহিত করা চলে। সাধারণ-ভাবে উপন্যাসে এই রীতিটাই প্রচলিত।' এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়, কোনো কোনো উপন্যাসে দ্বৈত নায়কত্বের সমস্যা দেখা দেয়, মধুসূদনের মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এ এই সমস্যা আছে, মেঘনাদ না রাবণ নায়ক কে ? কবির উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না এই চিন্তার মুহূর্তে মেঘনাদের পাশাপাশি লঙ্কেশ্বর স্বয়ং এসে দেখা দেন। প্রসঙ্গের ইতি টানার জন্য কেউ কেউ দ্বৈত-নায়ক আখ্যা দিয়ে পার পেতে চেয়েছেন। এভাবে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' প্রতিস্পর্ধী দুই চরিত্র নায়কত্বের দাবিদারিত্ব করে, যাকে লেখকের স্পৃহনীয় বলে মনে হয়, তার মধ্যে প্রাণের সাড়া মেলে না ; অথচ নায়কের সংজ্ঞায় একটি প্রধানতম শর্ত

হলো তার কর্মকুশলতা, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার তৎপরতা, যা বুঝিয়ে দেয় এর প্রাধান্য কোনো ঘটনা, উপকাহিনী বিনষ্ট তো করতে পারেই না, বরংচ উপন্যাসের সমগ্রতার মধ্যে সে ভাস্বর হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে দীপ্যমান। মনে রাখা দরকার উপস্থিতির দৈর্ঘ্যে কোনো চরিত্রের গুরুত্ব মাপা চলে না, সময় এখানে কখনোই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে সক্ষম হয় না। কাহিনীর শুরু, তার বিস্তার এবং তার মুখ্য উপপাদ্য বিষয়ে কার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি, কাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস আবর্তিত এবং কাকে বিসর্জন দিলে কাহিনীর অঙ্গহানির সম্ভাবনা এবং কে কাহিনীর মৌলভূমিতে দাঁড়িয়ে—লক্ষণীয় এগুলি। এতদ্বিষয়ে যুক্তির পারম্পর্য রক্ষা করে একটি স্থির নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হতে পারলে নায়ক চরিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। চরিত্রটির আপাত সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার ওপরে তার গুরুত্ব নির্ভরশীল নয়, বাইরের মত্ততা, প্রবল-প্রাণচঞ্চলতা দিয়ে তার ওপর নায়কত্বের গুরুভার চাপানো সম্ভবপর নয়। এমন হওয়া বিস্ময়কর নয় কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহে চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম, অথচ কাহিনীর উপরিতলে তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই, প্রায়শই তাকে নেপথ্যাচারণ করতে দেখা যায়। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিদান ছাড়া চরিত্রটির গভীরতা পরিমাপযোগ্য নয়। সমস্যা-সংকুল ও জটিলপন্থী চরিত্রের নায়কত্বের প্রশ্নে এসকল বিষয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়কের উৎস-সন্ধানে আলোচিত যুক্তি সমূহ গুরুত্ব সহকারে বিচার করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। 'গৃহদাহে'র অনেক সমস্যা ও ঘটনার মর্মমূলে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যা, দুই নায়কত্ব, স্বভাবজনিত কারণে দুই প্রধান পুরুষ চরিত্রের বৈপরীত্য, দুই বন্ধুপত্নীকে ঘিরে আবর্ত, তাতে নীড় নষ্টের সম্ভাবনা। এর মধ্যে ঐক্যের দিকটি হলো, নায়িকা নিয়ে সমস্যাহীনতা, 'ঘরে বাইরে'র বিমলার সঙ্গে কোনো নারীচরিত্র একাসনে এসে বসে নি যার জন্য নায়িকা নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা গ্রাম্যজীবনধারার সঙ্গে চির অপরিচিতির ফলে এবং খুব সাধারণ ঈর্ষার কারণে মৃণালকে নিয়ে সমস্যায় পৌঁচেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি কোনো সমস্যাই নয়, অচলার নায়িকার ভূমিকা এককভাবে তারই। বরংচ অচলার জীবনে উৎকট সমস্যার রূপ নিয়ে এসেছে দুটি পুরুষ চরিত্র, দুটিই মুখ্য চরিত্র; একজন স্বামী—তার অধিকারের প্রশ্ন, অপরজন সামগ্রিকভাবে 'পুরুষ', তার তাপ-উত্তাপ নিয়ে উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চটিকে আলোড়িত করেছে। নিজেকে আপাতত মহিমের কাছে সমর্পণ করে ক্ষান্ত হয়েছে বলে মনে হওয়ার মুহূর্তেই প্রবল আকর্ষণ-বিকর্ষণের গোলক ধাঁধায় তৃষিত মন সুরেশের প্রতি ধাবিত হয়েছে। একটি আঙটি রূপকের মতো তার জীবন আলোড়িত করে, অঙ্গুরীয়ের দংশনের কথা কালিদাসের কাব্য থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে, শকুন্তলা অঙ্গুরীয়ের হেলনে-দোলনে শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ের রাজধানীটিকে ফেরৎ পেয়েছে, কেননা প্রণয় ব্যাপারে কুশলী দুষ্মন্ত প্রেমের মর্যাদাটি জানেন, গ্রহণ যতটা করেন, সমানুপাতে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ উপলব্ধি করেন। অচলাকে বেচারী বলা যায়, কেননা উপযুক্ত পাত্রে অঙ্গুরীয়রূপে হৃদয়-অর্ঘটি দিয়ে দিলেও তা গ্রহণকারীর গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা বিচার করে দেখেন নি।

তাই তার একটি মাত্র সদর্থক ক্রিয়ার সকর্মতা বিফলে চলে গেছে। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদেই অচলার অঙ্গুলি স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে অচলার জীবনে স্থায়ী আসনে বসার ইচ্ছায় সুরেশ প্রবল হয়ে ওঠে, এই ইচ্ছা নিষ্কাম প্রেমিক মহিমের উদাসীনতায় নিজের অনুকূলে কাহিনী ও নারীকে নিয়ে আসার পথ সুগম করে দেয়। অচলার জীবনে এবং উপন্যাসে মহিমের প্রতিস্পর্ধীর আসনে সুরেশকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ অচলাই করে দেয় এবং সুরেশ তার সদ্ব্যবহারে বিলম্ব করে না। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নায়কত্বের সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে।

তবু প্রশ্ন জাগে সক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠাই নায়কত্বের একক সম্ভাবনায় আসীন কিনা। চাঞ্চল্যই একমাত্র গ্রহণীয় বস্তু, কখনোই তা সত্য হয়ে দেখা দেয় না। আসলে চাঞ্চল্য জট বৃদ্ধিতেই শুধুমাত্র সহায়কের ভূমিকা নেয়। সেই জট থেকে নিজেকে এবং পরিপার্শ্বের চরিত্রসমূহকে রক্ষা করবার মন্ত্র তার জানা থাকবার কথা নয়। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের ভূমিকাটি এইরূপ। বন্ধুকে উদ্ধার করবার আবেগ-চাঞ্চল্যে সে কেদারবাবুর বাড়ি ঢোকে, যেন মনে হয় তার জন্যে চক্র-ব্যূহ রচিত হয়েই ছিল, নিজের আবেগ দিয়ে কোমলমতি, বাস্তব-অভিজ্ঞতাশূন্য অচলাকে উন্মনা করে দেয়, নিজের অবস্থাও অভিমন্যুর মতো, অর্থের প্রাচুর্যে ও লোভের তাড়নায় অচলাকে কুক্ষিগত করবার জন্যে সকল প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করে, কেদারবাবুর অর্থলিপ্সা অজ্ঞাত থাকে না, এই রন্ধ্রপথ ধরে এবার তার যাত্রা শুরু, লক্ষ্য অচলার শরীর, এদিকে 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী', ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে সুরেশ, বিরুদ্ধ চরিত্রের দ্বৈতলীলায়, বাবার লোভের কাছে আত্মসমর্পণের করুণদৃশ্যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সুরেশের নিকটবর্তী হয়। মহিমের দেখা না পেলে সুরেশের নিজ হাতে খোঁড়া বিবরেই তার প্রবেশ ঘটত, ছন্দপতনের মতো মহিমের আবির্ভাব, মহিমকে দেখে নিজের অন্তরের ছবি ও প্রকৃত ঈপ্সা তার দৃষ্টি গোচর হয়, পরিণাম পরিণয়। তৎসত্ত্বেও সুরেশের কাছে যে অনেক কিছু গচ্ছিত থেকে গিয়েছিল, তা টের পাওয়া যায় রাজপুরে অনাহূত সুরেশের আবির্ভাবে, তবে মৃণাল সম্পর্কে ধাঁধা তাতে ইন্ধনের কাজ করেছিল, সব মিলে অচলার মানসিক উদ্‌ভ্রান্তিকে উলঙ্গ করে দেয়। কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন, অল্পসময়ের ব্যবধানে অসুস্থ মহিমকে নিয়ে সুরেশের স্বগৃহে ফেরা, প্রত্যাবর্তন জনিত কারণে নিরত আত্মগ্লানিতে ভুগছিল, স্বামীর অসুস্থতা তাকে মহিমের কাছে স্বচ্ছন্দ নৈকট্য এনে দিল, তদুপরি মৃণালের বৈধব্য, তার সেবাপরায়ণতা কোমল ভারতীয় নারীর চিরন্তন সত্যতা ছাড়া আর কিছু নয় সেই উপলব্ধিতে অচলার উন্নীতাবস্থা, তার নিজের জীবনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়, সেবার মধ্য দিয়ে এই সত্যে তার পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে নায়কের ঘটনায় পুনঃপ্রবেশ ঘটে যায়। তবু মনুষ্য-চরিত্র বড়ো বিচিত্র, বিশেষত নারীর মন। মহিমের অসুস্থতা অচলা-মৃণাল-সুরেশ সবাইকে অসুস্থ করে দেয়, বাঙালি ঘরের সেবার মহিমাই তাই, নিজের শরীরের কাহিল অবস্থা অচলার জানা ছিল না, কিন্তু দৃশ্যমান হলো সুরেশের দিকে তাকিয়ে, তাও এতদিনের সেবার মুহূর্তে নয়, যখন সুরেশের বিশ্রামের কাল সমুপস্থিত, পুরনো শরীর ফিরে আসার সম্ভাবনা, সুরেশের কাছে ফেলে রাখা অতৃপ্তির কথা নিজের অজ্ঞাতসারেই মন থেকে মুছে আসে অচলার। পুনরায়

ত্রিকোণে গিঁঠ পড়ে। বন্ধুপ্রীতি, সাধারণ সম্ভ্রমবোধ, কর্তব্যের তাগিদের সকল উৎস দূরে সরে যায়, জেগে ওঠে শারীরী-অতৃপ্তির 'পুরুষ' সুরেশ, পূর্ব মুহূর্তে হয়তো তার মধ্যে কপটতা ছিল না তার কর্তব্যের পরিশ্রমে, কিন্তু নিছক সৌজন্য বলে একে না ধরে আমন্ত্রণ বলে মনে করে তার কপটতার ঘুমিয়ে-পড়া মানসিকতা চাঙা হয়ে ওঠে।" অতএব হে বন্ধু বিদায়, তবে তৎমুহূর্তে নয়, যাত্রার মধ্য পথে, যার সুলুক সন্ধানে যে মাংসলোভী জীবের মতো ঘোরাফেরা করছিল একসময় অথচ হালে পানি জোটে নি, এবার তার সদ্ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। অচলার মধ্যমণি হয়ে থাকবার চেষ্টায় সে কসুর করে না। ভাগ্যের মতো, না বিদ্যা, না পৌরুষ—নারীমনের কাছে কিছুই সাধ্য নয়, আবার অসাধ্য নয়। অচলার নিকট থেকে নিকটতর হলো বলে মনে করেছিল সুরেশ ; প্রেম, সে তো স্থাবর-অস্থাবরে নয়, মূর্খ নারীলোভী সে খবর রাখে না। শরীরে গহনা, গৃহে আসবাবপত্র স্তূপীকৃত হচ্ছিল বটে, হৃদয় নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল ক্রমাগত। একরাত্রি রামবাবুর অবস্থানে সুরেশের শয্যাপার্শ্বে অচলা আসতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু এ কোন্ শরীর, আতপ-কোমল নয়, উত্তর মেরুর বরফের শীতলতা। এ কী শুধু সংস্কার বোধের জন্য, অচলার এতদিনের অভিজ্ঞতায় তা কিন্তু মনে হয় না।

মহিম যে তার সর্বস্ব ডিহরীতে পা দেবার পূর্বেই অচলা বুঝেছিল, তবু দোলাচলচিত্ততা তখনও প্রকৃত সত্যের সন্ধান তাকে দেয় নি। সুরেশ, কেবল সুরেশময় জীবন, তবু আশার মতো জেগে আছে মহিম। শুধু পতিব্রাত্য, ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্তের হিন্দুধর্মের স্বামী-সম্পর্কে ধারণা নয়। আসলে চকমকি পাথর দেখেই তাকে সোনা বলে ভুল করেছিল অচলা। মূল সোনাটিকে অসুস্থ অবস্থায় ট্রেনের কামরাতেই বিসর্জন করা হয়েছিল। একথা অবশ্য মনে হতেই পারে যে, মহিমের সঙ্গে এলে সুরেশের জন্য তার হৃদয়ের অর্ধাংশ আকুলি-বিকুলি করত, অস্বীকার করবার উপায় নেই। তথাপি উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়ে সুরেশের উপস্থিত সত্ত্বেও শরীরী কারণে না হলেও মহিম শুধু কাহিনী সর্বাংশে নয়, অচলার মনোজগতে অনুক্ষণের সঙ্গী হয়ে নয়, সুরেশের সমগ্র সর্বনাশের মূলেও উপস্থিত থেকেছে। কোনো এক লহমার জন্যে সুরেশের মহিমকে ভুলে যাবার উপায় ছিল না। এ তো দরিদ্র মহিম নয়, অযাচিত দানের মহিমার মধ্যে তৃপ্তির অনুভব নয়, মহিমের বধ্যভূমি অচলার হৃদয়, তার ইহকাল-পরকাল। মহিম শরীর দিয়ে শরীর টানে নি, জোরজবরদস্তি করেনি, অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্য সামান্যতম ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নি। তার নীরবতা এত ভয়াবহ সুরেশের জীবনে হতে পারে, এ যে, কল্পনার অগম অতীতে। নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা, স্পৃহা-হীনতা, নিজের কর্তব্য বোধের নিগড়ে বাঁধা মানুষ দুই নারী-পুরুষের জীবনে নিজের আসন এতখানি দৃঢ়তর করে তুলতে পারে—এর চেয়ে বিস্ময় আর কী হতে পারে! কি সেই রণকৌশল সুরেশ তা জানে না। যুদ্ধে যে অংশ গ্রহণই করল না, যুদ্ধাসক্তির প্রকাশমাত্র যার মধ্যে নেই, মৃত্যুঞ্জয় বীরের আসনটি তার জন্যে অবশিষ্ট রইল কেমন করে, নারী-মনস্তত্ত্বের অধিকারী না হতে পারে সুরেশ, কিন্তু নিজের সম্পর্কে ধারণাটি পর্যন্ত যে তার সঠিক নয়—এই উপলব্ধি বাস্তবিক বোধের

অতীত। তাই জীবনের সায়াহ্নে এসে সে বলেছে, 'আমার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হ'ল—খুব সম্ভব যতদিন বাঁচবে, এর জের মিটবে না, কিন্তু মস্ত ভুল হয়েছিল এই যে, মহিমকে তুমি যে এতটা বেশি ভালবাসতে তা আমিও বুঝি নি, বোধহয় তুমিও কোন দিন বুঝতে পারো নি! না?' এ কারণেও বটে এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির তাড়নায় বাল্যকাল থেকে মহিমকে দেখে, জেনে, চিনে তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি-বিষয়ে মহিমকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত অচলাকে সে বলেছে, 'এখন তাকেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। ছেলেবেলা থেকে সংসারের মধ্যে অনেক দিন অনেক গ্রন্থিই পাকিয়েছি, আর তাদের খোলবার জন্যে এই মানুষটিকে চিরদিন আবশ্যক হয়েছে! তাই আজও তাকেই আমার ডাক দিতে হয়েছে। এত ধৈর্য্য পৃথিবীতে আর ত কারও নেই!'

সমস্ত ঘটনা, সকল চরিত্রের আচরণ, অন্তত মূল চরিত্র সমূহের, একটি ব্যক্তির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, সে মহিম। সুরেশের শেষ মুহূর্তে অকপট বিশ্বাসের প্রতীক সে, সর্বস্বান্ত অচলার সকলি, ক্রমাগতই তার দিকে সকল অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়। উপন্যাসটির সে প্রথম, উপন্যাসটির সে মধ্যলগ্ন, অন্তিমও সে। তার অদৃশ্য উপস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত 'গৃহদাহ' নামক উপন্যাসটি। সুরেশের উচ্চাভিলাষ, অস্থির আচরণ; অচলাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, প্লেগের ভয়াবহতার কাছে নিজের শরীর বিসর্জন, খুব আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই, তবু তাকে প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু বলে উপন্যাসে অবহিত করা চলে না। সকল সর্বনাশের মূল ও হেতু সে, তবু মহিমকে সে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। সে সরব, মহিমের মতো নিষ্ক্রিয় প্রেমিক বা প্রধান অংশভাগকারী সে নয়, তার সরবতা, তার উচ্ছল ছোটাছুটিই মাত্র পাঠকের চোখে পড়ল, সে যে লক্ষ্যহীন মঞ্চে, অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করল খুব সতর্ক পাঠক ছাড়া, সন্ধানী দৃষ্টি ছাড়া চোখে পড়বার মতো নয়। তবু এরি মধ্যে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকল মহিম। গৃহদাহের পর, যাকে ভালোবাসে না তার ঘরে থাকতে অনীহা প্রকাশ করে পরপুরুষের হাত ধরে যে গ্রাম ছেড়ে শহরে এলো, মহিমের অসুস্থতার সংবাদে তার পদপ্রান্তে এসে তাকে মূর্ছিত হয়ে পড়তে হল, কাহিনীর শেষাশেষি চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে বহুকাল বাদে মহিমকে দেখে সুরেশ স্বাভাবিক হবার ভঙ্গি করলেও, 'একটা গোলমাল উঠিল; রামবাবু ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, অচলা উপুড় হইয়া পড়িয়া'—এ অবস্থা ছাড়া অচলার উপায় ছিল না, দীর্ঘ অবকাশের পর মহিমের অসুস্থতার সময়ের মতো সে মূর্ছিত হল।' অথচ এদিন জমকালো পোশাক পরে গাড়ি থেকে সুরেশের হাত ধরেই তাকে অবতরণ করতে হয়েছিল।' গাড়ি ও জমকালো পোশাকটিই শুধু ব্যবহারযোগ্য সুরেশের, সবচেয়ে মহার্ঘ যে বস্তু, সেই হৃদয়টি কিন্তু মহিমের জন্য গচ্ছিত রয়ে গেল, মহিমের দৃষ্টিতে সেটুকু ছিল কিনা বোঝা গেল না, কেননা গাম্ভীর্য নামক বস্তু দিয়ে গঠিত তার শরীর-মন। তথাচ এ সকল নিয়ে, নানান আপাত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি তার জন্যে নির্দিষ্ট। স্বভাবতই তাকে নায়কের স্থানটি দিতে আপত্তির কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'পাশাপাশি দুটি প্রায় সমমাপের, সমান যোগ্যতা বিশিষ্ট চরিত্র অবস্থিতির মধ্যে

নায়কত্বের স্থান নির্ণয় করা বাস্তবিক কষ্টসাধ্য। আবার উপন্যাসের মূল আকর্ষণ যে নারী চরিত্র—তার দুপাশে চরিত্র দুটি নিয়ত আবর্তিত হলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত স্থান গ্রহণকারীকে খুঁজে বের করা সামান্য কথা নয়। এ কথা গুলি উচ্চারণের সময়েও কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের কায়া গঠনে, প্রয়োজনের তাগিদে একটি চরিত্রকে অধিকতর মূল্য দিতে হয়। 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রথমাবধি বিশ্লেষণ করলে সে চরিত্র হিসেবে মহিমকেই বেছে নিতে হয়। দ্বৈত-নায়কত্বের আপাত দৃশ্যমানতা কিন্তু প্রকৃত চরিত্র-স্বরূপকে চিহ্নিত করে না। মাত্র সামান্য কটি পরিচ্ছেদে তাকে দেখা যায়, নীরব, অনুত্তেজিত; প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বাক্যও সে ব্যবহার করে নি, প্রতিবাদের সরবতা তার মধ্যে লক্ষণীয় নয়। কারো ওপর খবরদারির কোনো স্পৃহা তার নেই, নিজের কোনো সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেবার জন্যে সে ব্যগ্র নয়, তবু তাকে কখনো অগ্রাহ্য করবার উপায় থাকে না। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তার প্রভাব উপন্যাসে সমানভাবে আপতিত হয়েছে, তার স্থান যে উপন্যাসে সকলের ঊর্ধ্বে—এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উচ্চারিত হবার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। সুরেশ ক্রমাগত তার নায়কত্বের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরত্বে অবস্থান করে তার মনে, অচলার মনে, এমন কী লেখকের মনোজগতে মহিমের নামের পতাকাটি উড্ডীয়মান দেখতে পাওয়া, তাই বিজয়রথ আসে অনায়াসে, সাবলীলতার সঙ্গে, কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই নিজের ভূমিকাটির অধিকার তার ওপরে এসে বর্তায়, এ সকল ঘটনা, পরিবেশ, পরিস্থিতি, কাহিনীর ক্রমঃপরিণতির মধ্য থেকে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে নায়কের শিরোপা মহিমের মাথায় চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে দ্বিমত হবার অবকাশ থাকে না।'

ছয়

গঠন-কৌশল

'সাধারণভাবে লেখক এবং বিশেষভাবে উপন্যাস-লেখকের মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, এক শ্রেণী মনোগত ভাবনা ও কাহিনীকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে রচনার পারিপাট্যের বিষয় নিয়ে ভাবনায় নারাজ ; অন্য শ্রেণীভুক্ত লেখক বিষয় বা কাহিনীর প্রাধান্যকে অগ্রাহ্য করে নিপুণ গঠনে অভিলাষী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একধরনের অপূর্ণতা আছে। তিনিই লেখক হিসেবে শ্রেষ্ঠ যিনি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে আগ্রহী, কাউকে অবহেলা করতে রাজী নন। তিনি জানেন বিষয়বস্তু যেমন তাঁর বর্ণীতব্য, তেমনি তাকে পাঠকের কাছে দৃঢ়পিনদ্ধ করে পৌঁছে দিতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সফলকাম হতে পারে না। দৃষ্টি সেদিকে রেখে কায়াগঠনে প্রযত্ন নিতে পারলে বিষয় ও রচনারীতির যুগ্মবেণী সৃজিত হতে পারে।' অধিকাংশ বঙ্গভাষার লেখক সেদিকে যান নি বলে রচনার স্বাদুতার সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হয় নি। 'গঠনের পরিপাট্য অনেকাংশেই লেখকের নিজের মর্জি বা মেজাজের ওপর নির্ভরশীল, তাঁর সাহিত্য জীবন, তাঁর রচনার ধারা, তাঁর চিন্তার একনিষ্ঠতা, তাঁর স্বভাব, বক্তব্য বিষয়ে তাঁর একাভিমুখিতা তাঁকে গঠনেও উৎসাহী করে তুলতে পারে। শৃঙ্খলাহীন ব্যক্তিত্ব, শৃঙ্খলাহীন বিষয় সম্পর্কে ধারণা রচনাকেও বিশৃঙ্খল করে তোলে। ব্যক্তিগত রুচির প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য মনন ও ভাবাবেগের কথা।' যে লেখক মননের কারবারী, মননকে উপস্থাপিতকরণে তদ্গতপ্রাণ, তাঁর রচনায় মুন্সীয়ানা সহজেই চোখে পড়ে। কাহিনী, উপকাহিনী, কেন্দ্রগত বিষয়, উপন্যাসের পরিধি-বিস্তৃতি এক লয়ে এক তালে সম্পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সহজেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়, মুখ্য কাহিনী, তাকে সহায়তা দিয়ে নিটোল উপন্যাস-বৃত্ত রচনার নির্মিতি। এখানে থাকে না কোনো সংশয়, কোনো জিজ্ঞাসাও। কোনো দুর্বলতা প্রত্যক্ষ হয় না, দুর্বলতাকে গুপ্ত রেখে পাঠকের নয়নরঞ্জক বিষয়-কাহিনী বাস্তবায়িত হয়। Forster বলেছেন, 'Sometimes a plot triumphs too completely. The characters have to suspend their natures at every turn, or else are so swept away by the course of Fate that our sense of their reality is weakend"—বাস্তব সম্পর্কে ধারণার দুর্বলতা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে অথবা কাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে কাহিনীর প্রতি গতি চরিত্রগুলি তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আত্মগোপনের মধ্য দিয়ে ঘটতে পারে। যে-লেখক মূলত আবেগধর্মী, ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করেও আবেগের কারণে কাহিনী উপকাহিনীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করে যেতে পারে অনায়াসে।

'বাংলা উপন্যাসের প্রত্যুষ-লগ্নে এই দুর্বলতা দেখি না বঙ্কিমী মনন-প্রাধান্য ও সৃজনশীল পারিপাট্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথে শিথিলতা আছে তবে হৃদয় ও মনন অঙ্গাঙ্গী বলে, অতিকথন সত্ত্বেও কোনো কোনো উপন্যাসে নিপুণতার সঙ্গবাহী।' কয়েকটি ছোটগল্প পরিবেশনের অনবদ্য প্রয়োগ-কৌশলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা পেতে পারে, তার উদাহরণ 'চতুরঙ্গ'। ত্রয়ীর তৃতীয় জন, 'শরৎচন্দ্র' এরকম

দাবী রাখতে পারেন না। তার কারণ বহুবিধ হলেও কেন্দ্রগত বিষয় একটিই ; তাকে আবেগ বলেই চিহ্নিত করা যায়। 'গৃহদাহে'-র মতো বুদ্ধিদীপ্ত, 'চরিত্রহীনে'র মতো সমাজ জিজ্ঞাসামূলক, 'শেষপ্রশ্নে'র মতো তার্কিক উপন্যাসেও আশানুরূপ সাফল্য আসে নি, যে সংযমের প্রশ্নে উপন্যাস আপন মহিমায় গরীয়ান তা অপেক্ষা আবেগ প্রাধান্য পাওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি কাহিনী বিন্যাসে নিশ্চিত প্রত্যয়ের অভাবে সম্ভাবনার সমূহ বিনষ্টি ঘটেছে।' এর ওপর মূলকাহিনী ও উপকাহিনীর সংজ্ঞা নির্ণয়ে দুর্বলতাও প্রকট। 'নিশ্চিত রূপে 'গৃহদাহে'-র মূল কাহিনী মহিম-অচলা-সুরেশ-কেন্দ্রিক। অল্প সময়ে কিন্তু গুরুত্ব বিচারে রামবাবুর কাহিনীটিও তুচ্ছ নয়, আর সমগ্র উপন্যাসে উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তার দাবী মিটিয়েছে মৃণাল-কাহিনী। উপকাহিনী অবশ্যই ক্ষুদ্র কাহিনী নয়, তার শক্তির ওপরে মূল কাহিনী দণ্ডায়মান। কাহিনীর সমস্যা ও সংকট অনুযায়ী তার বিকাশ লক্ষণীয়। পরিমাণ ও পরিসরের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তার একক দায়িত্ব যে উপন্যাসে কতখানি হতে পারে আলোচ্য উপন্যাসের মৃণাল তার উদাহরণ। বিবাহের পর মহিম-অচলার জীবনে সে শুধু প্রবেশই করে নি, প্রচ্ছন্নভাবে 'গৃহদাহে'র প্রস্তুতি রচনা করেছে। তার উচ্ছলতা নয়, আবেগ, স্পষ্টভাবে ভালোমন্দকে প্রকাশ করার মতো চরিত্র দুটি খুঁজে পাওয়া যায় না উপন্যাসে।' ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব বাস্তব-জীবন-অভিজ্ঞতাশূন্য অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির খানিক বীজ যেন তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে স্বয়ং অচলা। ভালোবাসা ও সন্দেহ সেক্সপীয়র থেকে শরৎচন্দ্র—বহু রচনাকারের বিষয়বস্তু, দুইকে আলাদা করা দুরূহ, অথচ নিগূঢ় ভালবাসার উত্তাপে সন্দেহ বাষ্প হয়ে উবে যেতে পারে। সন্দেহ এমনই কালান্তক, একবার হৃদয় মধ্যে প্রোথিত হলে তা তুষের আগুনের মতোই নয়, বল্মীকের মতো কুরে কুরে খেয়ে জীবনকে অসার করে দিতে পারে। 'আলোচনা উপকাহিনীর মৃণালের দিক থেকে শুরু করা যায়। রাজপুরের বাড়িতে ঢুকে অচলা সম্পর্কে গ্রাম্যরীতির প্রথম উক্তি তার মহিমের কাছে প্রথম তূণীরটি নিক্ষেপ করেছে, '…না—তুমিই জিতেচ সেজদা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।' এবং এটাকে যথার্থ অর্থেই মহিমের ঠাট্টা বলে বর্ণনা করায় '…অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, ঠানদি, মাইরি বলচি ভাই, তামাসা নয়। আচ্ছা, তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ করেছিলেন কি না।' সুরেশের আগমনজনিত নানান সমস্যায় কণ্টকিত চিত্ততার মধ্যে তারিখহীন মৃণালের পত্রখানি, 'সেজদা মশাই গো, করছ কি ? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ দুটি ক্ষয়ে গেল যে' দাবানলের আয়োজন সম্পূর্ণ করলো। অচলার তখনও অজ্ঞাত মৃণাল ব্যক্তিত্বটির কাহিনী মধ্য লগ্নে ও অন্তিমে কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত মহিমের অসুখ তার বৈধব্য ও নিষ্ঠা সহযোগে সেবাপরায়ণতা, সম্বলহীন বৃদ্ধ কেদারবাবুর অন্ধের যষ্ঠি এবং কাহিনী শেষলগ্নে পাথর-প্রতিম মহিমের শরীর (মন ?)-বর্মে বাধা পেয়ে ফিরে আসে অচলার আর্ত-প্রশ্ন '…শুনেচি বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয়, আমি জানি নে কিন্তু এ দেশে কি তেমন কিছু…।' কাহিনী পরিসমাপ্তির কাছে এসে মহিম বলেছে, '…অচলা

আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে'—অন্তিম বাক্য সংযোজনের সময়েও শরৎচন্দ্র মৃণাল-উপকাহিনীকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দেন। মূল কাহিনীর স্রোতের সঙ্গে সে স্বতোৎসারিত প্রবাহে বহমান হয়েছে, মূল কাহিনীর তাৎপর্যও বেড়ে উঠেছে সেকারণে।'

'উপকাহিনীর মৌল প্রবণতা হলো আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে মূল কাহিনীকে সম্পূর্ণ স্ফুটতর করে তোলায় সহায়তা করা, বিস্তার দান করা এবং পরিপূর্ণতার দ্যোতনা আনয়ন করা। মৃণাল-কাহিনী সার্থকভাবে সে উদ্দেশ্য সফল করেছে।' তার অসীম প্রয়োজনীয়তা কাহিনীর ক্ষেত্রে বিস্মৃত হবার উপায় থাকে না। সে অনুপ্রবেশকারিণী নয়, সহজেই তার আসন পাকা রয়েছে, স্বচ্ছন্দ তার গতায়ত, অনায়াস নৈপুণ্যে কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ—সকল কিছুর মধ্যে আপনাকে সে বিস্তার দান করতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই চরিত্রটির ও উপ-কাহিনীর তাৎপর্য সম্পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। সেজন্য শরৎচন্দ্রকে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সংযোগ রক্ষায় সহায়কের ভূমিকায় মৃণালকে দাঁড় করানো সহজসাধ্য হয়েছে। এ সমস্যা বিষয়গত নয়, কাহিনীগত—বিষয়গত সমস্যা স্তূপ আছে উপন্যাসে, কিন্তু কাহিনী বা কায়াগত সমস্যা স্বচ্ছন্দ করেছে মৃণাল-উপকাহিনী। পার্সি লুবক বলেন, 'The Novelist, I am supposing, is faced with a situation in his story where for some good reason more is needed than the simple impression which the reader might have formed for himself, had he been present and using his eyes on the spot.' 'মৃণাল-কাহিনী যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। সংযোগসূত্রে কাহিনী বয়ানেও তা প্রয়োজনে এসেছে অনেকখানি এবং পর্যাপ্ত রূপে।' অথচ সামগ্রিক ভাবে প্লট-নির্মিতিতে শরৎচন্দ্র organic plot অপেক্ষা loose plot-এর দিকেই ঝুঁকেছেন।

' Loose-plot শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাসে প্রাধান্য পাবার কারণ কাহিনীর আরোহণ পদ্ধতি তাঁর উপন্যাসে অনুসৃত হয়নি বলে। যুক্তিও ধারাল অস্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে নি।' বন্ধনের সূত্র গ্রথিত করবার প্রয়োজন লেখক খুব অনুভব করেছেন, এমনও মনে হয় নি। 'কাহিনীর পরিসর তিনটি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ চব্বিশ পরগণার গ্রাম রাজপুর, শহর কলকাতা, পশ্চিমের আরেক শহর। কাহিনীর বিস্তারের পক্ষে তা কিন্তু যথেষ্ট, তবে দীর্ঘতার বিপদও আছে, সে বিপদ যথার্থ-ভাবে দিনের ঐক্যসাধন করা। শিথিল-গঠন উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ঐক্যের ক্ষেত্র রচনা করা দুরূহ, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সামগ্রিক পটভূমিকা সঙ্গত কারণেই ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভবপর হয় নি। যদিচ আকস্মিক বা নাটকীয় চমকের সুযোগ উপন্যাসে প্রচুর আছে, তার সদ্ব্যবহার লেখক করেছেন অক্লেশেই তথাপি শুধু নাটকীয় উপাদানের এ হেন বিস্তৃতির মধ্যে মেল বন্ধন কষ্টসাধ্য। কাহিনী ও বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যে অন্তত 'গৃহদাহে' বিস্ময়-সূচক। তবে বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সংযোগসূত্র রচনা করা সাধারণের কর্ম নয়। জটিলতা আছে বিষয়ে, চরিত্রে, চরিত্র সমূহের আচার-আচরণে, কর্ম-পদ্ধতিতে।

তবে অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটির আয়তন বিপুলকায় না হলে যথেষ্ট, কাহিনীর কেন্দ্র-পরিধির মধ্যে ব্যবধান-ও পরিমিত নয়, তবু ত্রিকোণ প্রেমের রহস্যময়তা উপন্যাসে আগাগোড়া অব্যাহত রয়েছে, তার সঙ্গে প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্বকে খাটো করা চলে না।'

নিজের রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এতটাই বিশ্বাস ছিল যে তিনি শিশির ভাদুড়ীকে বলেছিলেন কুকুরের গলায় তাঁর বই ঝুলিয়ে দিলেও লোকে পড়বে। কাজেই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে শরৎচন্দ্র কোন মন্ত্রে পাঠককে বশ করেন; তাঁর শৈলীর রহস্যটি কোথায়? তাঁর উপন্যাস শিল্প হয়ে ওঠে কেমন করে?

ফলে শরৎচন্দ্রের মতো লোকবরেণ্য শিল্পীর শিল্পচেতনা আমাদের সন্ধিৎসার বিষয় হতেই পারে।

শরৎচন্দ্র উপন্যাসের দেহ বা প্রকরণ সম্পর্কে নানা সময় নানা কথা বলেছেন। একটু পরিণত বয়সে তিনি অনুজপ্রতিমকে পত্রে নির্দেশ দিয়েছেন—'লেখার বিদ্যে' শিখতে হয়। হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায় তাকে সংযতভাবে প্রকাশ করতে হয়। ১৯২৬-এ তিনি এ কথা বলেছেন দিলীপ কুমার রায়কে। কিন্তু ১৯১৩-র সেপ্টেম্বর মাসে ফনীন্দ্রনাথ পালকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন—উদ্দেশ্য পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত—'ছাড়িতে পারি না।' এরই পাশাপাশি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) লেখা পর্বে বলেছেন, 'অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।' প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি আলোচনা সভায় (বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র) শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, আমি আগে কতকগুলি চরিত্র ভেবেনি, পরে প্লট চলে আসে। শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা-বলীতে আছে—

'আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।'

শরৎ শতবার্ষিকীতে ড. অমলেন্দু বসু তাঁর একাধিক আলোচনায় এবং প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র শেষের কয়েকটি অধ্যায় রচনা করে অনায়াসে প্রথম অধ্যায় রচনায় মনোযোগ দিতে পারতেন। এটা যে পারতেন তার প্রমাণ 'চরিত্র-হীন'। 'চরিত্রহীন'-এর রচনা কালে শরৎচন্দ্র আগের'টা পরে এবং পরের'টা আগে লিখেছেন। অথচ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দেন—রচনায় অধ্যায় ভাগ করতে হয় এবং আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত। যে শরৎচন্দ্র মনে করেন আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র, সেই শরৎচন্দ্র 'well made novel' রচয়িতার মতো কাহিনীকে পিছিয়ে দেন অন্তত তিন মাস (চরিত্রহীন), কখনো পাঁচ বছর (গৃহদাহ), কখনো পঁচিশ বছর আগে (দত্তা)।

'নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের স্বকীয় উদ্ভাবন আছে, তবে প্রথম দিকে আছে মান্য আদর্শের অনুসরণ। মান্য আদর্শ মানে, সেই প্রথম পুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বগ লেখকের প্রবল প্রতিপত্তি।' এতে উপন্যাসের শিল্প কোনো পৃথক পরিচর্যা পায় নি। শরৎচন্দ্রের প্রথমদিকের উপন্যাসে craftmanship-এর বিশেষ

হদিশ মেলে না। ফলে আমরা পেয়ে যাই চরিত্রহীন রচয়িতাকে, যিনি প্রায় নব্বইভাগ আত্মনিষ্ঠ। 'শরৎচন্দ্র চরিত্রগুলিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন। ফলে উপন্যাসটির গঠন হয়েছে শিথিল। তবে তীব্র আত্মপ্রত্যয় থাকার জন্য প্রেক্ষণ বদল হয়েছে ; উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলো—জ্যামুক্ত ধনুকের মতো তীব্র বেগে আন্দোলিত হয়েছে। এটা অবশ্যই প্রকরণের কোনো সুডোল কারুকার্য নয়—প্রবল ব্যক্তিত্বের বলবেগ থেকে এর উৎপত্তি।'

'আসলে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রকরণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চাভিলাষী হতে পারেন নি।' রীতিমত গল্প বলার ঝোঁক তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তাই বার বার তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিঃশব্দ তর্জনী দ্বারা সঞ্চালিত হয়েছেন। আবার 'চোখের বালি'র তন্নিষ্ঠ পাঠক বুঝতে পেরেছিলেন প্রয়োজন বিবৃতির, বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ ; বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারেন নি। কারণ 'শরৎচন্দ্রের মন ও চরিত্রের গঠন বিশ্লেষণ পন্থার বিরোধী। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ নাটকীয় জীবনের মতো তাঁর উপন্যাসের গঠন ও নাট্যধর্মী।' তিনি বারবার বলতেন—নাটক আমি লিখতে পারি, সংলাপের জন্য আমাকে ভাবতে হয় না। এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। উপন্যাস শিল্পী শরৎচন্দ্র বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেও উপন্যাসের কায়া বিষয়ে মধ্যগারীতির জনয়িতা। সেই মধ্যগারীতির নাম—নাট্যরীতি। 'চরিত্র এবং কাহিনীকে শরৎচন্দ্র ব্যাখ্যা করেন নাটকের ব-কলমে। 'গৃহদাহে'র কথাই ধরা যাক। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে বাষ্পীয় শকট দুর্যোগের রাত্রে অনেকক্ষণের জন্য থামে। এক সময় বিমনা হয়ে যায় অচলা। সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ঘুম অন্ধকারে সুরেশের আহ্বানে সে নেমে পড়ে ট্রেন থেকে। এলাহাবাদ মনে করে অচলা। কিন্তু না, নেমেছে সে মোগলসরাই জংশনে। কিছু একটা বুঝে ওঠবার আগেই—'বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল'। এইটাই হলো শরৎচন্দ্রের বিস্ময়কর উদ্ভাবন। এই নাট্যশৈলীর সহায়তায় শরৎচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখে যান।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসকে ঘটনার দাসখত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, ব্যক্তিত্বের সমগ্রতাকে অবয়ব দেওয়ার জন্য অন্তঃশীলাকে খুঁজে ছিলেন, আবর্ত মোহানার দিকে তার সঞ্চরণ লক্ষ্য করি। 'শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বের সমগ্রতার অনুসন্ধানে কদাচিৎ ব্যাপৃত থেকেছেন। ফলে শরৎ-উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেক সময় অপরিবর্তনীয় থাকে—উত্তরণ ঘটে না। মৃত্যু পথ যাত্রী সুরেশ ডিহরীতে কিছুটা শান্ত সমাহিত হলেও তার কোন রূপান্তর ঘটে না। ধনগরিমার অহঙ্কার তার ঘোচে না। তাই মৃত্যুর সময়ে বার বার সে ধনগরিমার প্রতীক-স্বরূপ উইলটি অচলার দিকে বাড়িয়ে দেয়।'

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের সপ্রশংস স্বীকৃতি আছে গৃহদাহের গঠনকৌশল প্রসঙ্গে—'গঠন কৌশলের দিক দিয়া এই উপন্যাস অদ্বিতীয়।'

'প্রাথমিক বিচারে 'গৃহদাহে'র কায়াবিন্যাস আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি গৃহদাহের ঘটনামালা তীরের মতো ছুটেছে। ঘটনাপ্রসবী ঘটনা 'গৃহদাহ'কে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ৪৪-টি পরিচ্ছেদ পড়তে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না।' শরৎচন্দ্র বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারেন নি যে, তিন চার বছরের

কাহিনীকে তিনি এত দ্রুত শেষ করে দিয়েছেন। 'গৃহদাহ যখন তৃতীয় পরিচ্ছেদে পা দেয় তখন অচলার বয়স সতেরো-আঠারো; ডিহরীতে কাহিনী যখন শেষ হয় তখন অচলার বয়স একুশ। শরৎচন্দ্র তিন বছরের কাহিনীকে সাজিয়ে নিয়েছেন তিনটি অঙ্কের মধ্য দিয়ে—গৃহদাহ যেন একটি তিন অঙ্কের নাটক। নাটকের মতো সাজিয়ে নেওয়ায় শরৎচন্দ্র খুব সহজে বিবৃতি বা বিশ্লেষণকে ছুটি দিয়েছেন। তার বদলে উপন্যাসে আছে কয়েকটি অভাবিত situation।' কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে :

এক. গাড়ি বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল ; সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া উভয়েই একসঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সম্মুখেই মহিম দাঁড়াইয়া এবং নিমেষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল। [৯ পরিচ্ছেদ]

দুই. মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া [অচলা] কহিল, আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। ···আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি করো। [১০ পরিচ্ছেদ]

তিন. সেলাই করিতে করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, বাবা, সুরেশ-বাবুর ব্যাপাবটা পড়লে ?
অচলার মুখে সুরেশের নাম ! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন। [১২ পরিচ্ছেদ]

চার. একি, সুরেশ যে ! এস এস, বাড়ির ভেতরে এস। ভাল ত ? [১৬ পরিচ্ছেদ]

পাঁচ. দুঃখ কি পাও অচলা ?
অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, আমি কি পাষাণ সুরেশ বাবু ? [১৬ পরিচ্ছেদ]

ছয়. মাত্র একটি ছত্র। বার, তারিখ নাই, মৃণাল লিখিয়াছে—সেজ'দা মশাই গো, করছ কি ? পরশু থেকে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে তোমার মৃণালের চোখ-দুটি ক্ষযে গেল যে !
বহুক্ষণ অবধি অচলার চোখের পাতা নড়িল না। [১৯ পরিচ্ছেদ]

সাত. অচলা জিজ্ঞাসা করিল, প্রায় দশ বাবো দিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগ-ছিলেন। এ খবরটাও আমাকে দেওয়া কোন দিন তুমি আবশ্যক মনে করো নি ?

মহিম জবাব দিতে চাহিল, কিন্তু কি করিয়া কথাটা গুছাইয়া বলিবে ভাবিতে ভাবিতেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

এমন উদাহরণ 'গৃহদাহ'-তে অসংখ্য আছে। পরিস্থিতি সৃজনের দিক থেকে শরৎচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'মানুষের জীবনের নিয়তির ভূমিকাকে অভ্রান্ত করে দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছেন প্রাকৃতিক পট। মনে পড়বে সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদটিকে। এই পরিচ্ছেদের শুরু হয়েছে—'পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সেই মলিন আকাশ তলে সমস্ত সংসারটাই কেমন একপ্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। এইভাবে যে পরিচ্ছেদের শুরু সেই পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র লেখেন—এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দিনের রাত্রিই একদিন তাহাকে স্বামিহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চিরদিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে।' এরও পরে আছে—

'বাহিরে মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।'

'শরৎচন্দ্র শোননদের পার্শ্বর্তী সুদূর বিস্তীর্ণ ধু-ধু মরুবালুরাশির সঙ্গে অচলার জীবনকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবন্ধ কবেছেন। স্মরণীয় অচলার বিয়ে হযেছে ভরা বর্ষায়—শ্রাবণে।' ক্ষান্তবর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্যপথ দিয়ে পালকি চড়ে অচলা যখন স্বামিগৃহে উপনীত হলো; শরৎচন্দ্রের ভাষায়—'তাহার নব বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল'।

'গৃহদাহে'র ছকটি এইরকম: ১৯+১৮+৭: ১ থেকে ১৯-তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে সুরেশ মহিমের সখ্য, সুরেশের সঙ্গে অচলার পরিচয়, মহিম অচলার বিবাহ, সুরেশের পরার্থপরতা, তার অন্ধ অচলামোহ, সেবা পরায়ণতা, আকস্মিক রাজপুরে আগমন, গৃহদাহ।

২০ থেকে ৩৭ পরিচ্ছেদে উপনীত হওয়ার পথে যে ঘটনাগুলি ঘটে তা হল—অচলা-সুরেশের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, কেদারের বিস্ময়, মহিমের নিমোনিয়া, রোগমুক্তি, মৃণালের আবির্ভাব ও প্রত্যবর্তন, জব্বলপুর যাত্রার উদ্যোগ, মোগল সরাইতে যাত্রাভঙ্গ, ডিহরীতে স্বামী-স্ত্রী রূপে সুরেশ ও সুরমার সহাবস্থান রামবাবুর একান্ত অনুরোধে ও ব্যক্তিগত আবিষ্টতায় সুরেশের কামানলে অচলার আত্মদান। ৩৮ থেকে ৪৪-র প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি হলো—সুরেশের মোহ ও বৈরাগ্য, মহিমের উপস্থিতি—ডিহরীতে, মাঝুলিতে সুরেশের মৃত্যু, রামবাবুর সহানুভূতি ও ঘৃণা, অচলার দুঃসহ শূন্যতা মৃণাল-কেদারের আগমন।'

'গৃহদাহে' দেখি ঘরের মধ্যে ঘর। দু'তিনটি পরিচ্ছেদেব পর ঘটনা দ্রুত লয়ে এগিয়েছে। কেদারবাবুকে এবং অচলাকেও ইতরভাবে আক্রমণ করে সুরেশ যখন প্রস্থান করে তখন মনে হয় সে আর ফিরবে না। কিন্তু ঘটনা তাকে ফিরিয়ে আনে। অসুস্থ মহিম আশ্রয় পায় তারই বাড়ীতে। সেখানে আসে মৃণাল; ছুটে যায় অচলা। শরৎচন্দ্র এই সুযোগে মৃণাল-অচলার তৌলন আলোচনা সেরে নেন। সুরেশের বাড়িতে থাকাকালে জব্বলপুর যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। অচলা তাদের সঙ্গে সুরেশকে যেতে বলে। সুরেশ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পরক্ষণেই সুরেশকে আমরা পেয়ে যাই স্টেশনে। অচলার সঙ্গে গাড়ীতে পরিচয় হয় রাক্ষুসী নামে যে মেয়েটির সঙ্গে ডিহরীতে তারই সঙ্গে আবার দেখা হয় অচলার।

অচলা রাক্ষুসীর শ্বশুরে বাড়ীতে আশ্রয় পায়। এরপর কাহিনীকে টেনে নিয়ে যান রামবাবু। আর রাক্ষুসী চলে আসে কলকাতায়। ভাগ্যের কি পরিহাস—ঐ রামবাবুর বাড়ীতে গৃহশিক্ষক মহিম পদার্পণ করে। তাই বলি, উপন্যাসটি যেন মালার মতো বৃত্তাকার। সেই মালা বিনি সুতোর নয়, ঘটনা পরম্পরায় গ্রথিত।

'অকথিত বাণী, অগীত গানকে শরৎচন্দ্র ভরাট করেছেন কাহিনী দিয়ে। গৃহদাহ যেন একটা কাহিনী চিত্রের উপাদান খণ্ড সৃষ্টি। ইচ্ছে মতো এই উপাদান থেকে চিত্রনাট্য প্রস্তুত করা যায়। একটা বড়ো মাপের কাহিনীচিত্র প্রস্তুত করতে গেলে চিত্রনাট্যকারকে যে সব উপাদান দিয়ে সহায়তা করতে হয়, গৃহদাহ'তে তার ঘাটতি নেই। এইখানেই গৃহদাহে'র গঠন সাফল্য, তার শক্তি বা জোর—কিছুটা আকস্মিকতা ও আতিশয্য সত্ত্বেও।'

সাত

ভাষা ও সংলাপ

কোনো উপন্যাস যতই তাত্ত্বিক বা সারল্যের প্রতীক হোক্ না কেন, তাকে নিখুঁত-ভাবে পরিবেশন করবার জন্য আঙ্গিকের পারিপাট্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তাকে খরস্রোতা নদীর মতো হতে গেলে তার বাহন হবে উপযুক্ত ভাষা ও সংলাপ। মুখ্যত এ দুটিই বক্তব্যের যথাযথ প্রকাশের সহায়ক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। যিনি যত উপযোগী ভাষার ব্যবহারে যোগ্যতা সম্পন্ন, সংলাপ যাঁর বক্তব্যকে স্থির-নিশ্চিত ক্ষেত্রে উপনীত করতে পারে লেখক হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ততখানি। ভাষা-সংলাপের বুদ্ধির দীপ্তিতে ঔজ্জ্বল্যপ্রাপ্ত হতে পারে, হৃদয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পারে, তার জন্য অলঙ্করণ ও ভাষার অতি সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন না-ও হতে পারে। যিনি মরমী লেখক, তাঁর ছান্দসিক হবার প্রয়োজন নেই, আলঙ্কারিক হবার আবশ্যকতা নেই। শরৎচন্দ্র দুটি অস্ত্র নিয়ে সাহিত্যে এসেছিলেন, একটি তাঁর সহানুভূতির অসীম ক্ষেত্র, দ্বিতীয়টি তাঁর অভিজ্ঞতার সসীম ক্ষেত্র. তাঁর দরকারই হয় নি ভাষার বিদ্যুতের চমকের, এমনতরো গতিসম্পন্ন, সরল গদ্য খুব কম লেখকই বাংলা সাহিত্যে লিখতে পেরেছেন, F. L. Lucas-এর সঙ্গে একমত পোষণ করা যায়, 'The vital importance for style, is seldom realised by the general public'—সাধারণ পাঠক শরৎ-সাহিত্যের উপভোক্তা যিনি রচনা-রীতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েই বিষয়ের উপলখণ্ডবিহীন উপন্যাসের ধারা-প্রবাহে এগিয়ে চলে যান। এই সহজতা গঠনের সৌকর্যের পরিপন্থী হতে পারে, কিন্তু সরলকথা সরল-পদ্ধতিতে বলতে পারার মধ্যে একজাতীয় বাহাদুরি আছে। সেটাই তার আকর্ষণীয় গুণ। বঙ্কিমী ওজঃগুণ হয়ত সেখানে লভ্য নয়, সমাস-বদ্ধ গভীরভাবসম্পন্ন শব্দের উচ্চনাদ দেখা দিতে না পারে, ভাবের উন্নীতরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর না হলেও জটিলতা বিবর্জিত কাহিনীর উপযুক্ত ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারের ভাষা হওয়াই স্বাভাবিক। লেখকের লক্ষ্য এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য, একজন ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য কী? কেমন করে তিনি জয় করে নিতে চান পাঠকের হৃদয়, সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক অস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় ভাষা—সাধাবণভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের লক্ষ্যবস্তু পাঠকের হৃদয় নামক শারীরী অংশ, মস্তিষ্কের জটিলতার তিনি খুব পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই সাধু গদ্যে লিখলেও তৎসম শব্দ বাহুল্যে ভারাক্রান্ত করতে চান নি তাঁর উপন্যাসকে। বিষয় সাধারণ গৃহীর, ভাষাও তৎরূপ সরল ও অনায়াস-নৈপুণ্যে ভরপুর। তবে তুলনা-মূলকভাবে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কাহিনী তথা নায়িকার মনোজগত জটিল, 'চরিত্রহীনে'র মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি বা 'শেষপ্রশ্নে'র তাত্ত্বিকতা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছে, সন্দেহ নেই। এর মধ্যে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী কথা ও কাজে জটিলতা এবং 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের বাগাড়ম্বর বাদ দিলে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের বক্তব্য ও আচরণে অতিরেক, উচ্ছ্বাস বাহুল্য, সংযমহীনতাকে বিযুক্ত করে দিলে ভাষা সংযত, সুরেশের সঙ্গে অবশ্য কেদারবাবুর অসংলগ্ন আচরণ

খানিকটা নৈকট্যের সৃষ্টি করে। মহিম স্বল্পভাষী, অচলা প্রথমাংশে সংযত ভাষা-ভঙ্গির নিদর্শন রেখেছে, সুরেশের আকর্ষণের প্রাবল্যে এবং রাজপুরে মহিমের ঘর-বাড়ি বা সেখানকার গ্রাম্য আচরণে হতাশ বোধ করে তার স্বভাবের প্রতিকূল তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী ভাষা ব্যবহার করেছে। একে একদিকে তার দোলাচলচিত্ততার বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করা যায়, অন্যদিকে তার কল্পনার বেলুনটি বায়ুশূন্য হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ার অন্যনাম বলে চিহ্নিত করলে দোষের হয় না। চাতুরী দিয়ে তাকে অসুস্থ স্বামীর কাছ থেকে বিচ্যুত করলে যে উষ্ণবাক্যবাণে সে সুরেশকে বিদ্ধ করেছে, তা সময়োপযোগী বলে মনে হয়। সুরেশের মৃত্যুর পর তার মুখাগ্নি করতে অস্বীকার করার মধ্যে রামবাবু তথা সমগ্র সমাজকে তার অবরুদ্ধ মনের অর্গল খুলে দেওয়ার মুহূর্তে তার ভাষা রামবাবু প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিস্ময় বলে মনে হলেও, তার গ্লানি মুক্তির পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিতে হয়। এ-সকল ক্ষেত্রেই ভাষা-বয়নের নিপুণ শিল্পী শরৎচন্দ্রের দক্ষতা ধরা পড়ে। অবশ্য একই সঙ্গে স্মর্তব্য যে অচলা চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের দ্বিধা ছিল বলে সংলাপের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে, ভাষা প্রয়োগ অনেক সমালোচকের গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অচলার চরিত্র-কল্পনা লেখককে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার আরেক প্রমাণ 'গৃহদাহ' উপন্যাসের ভাষা। প্রায়ই দেখা যায় 'বিবর্ণ হইয়া গেল' 'কালি হইয়া গেল' ইত্যাদি বর্ণনায় অচলা বা সুরেশের স্বাভাবিক বর্ণচ্যুতির ছবি ফুটে উঠেছে। এই বর্ণচ্যুতি যেন চরিত্র দুটিতে নৈতিক জগতের যে-ব্যত্যয় ঘটিয়েছে তারই প্রতিরূপ।'

এই প্রতিরূপের সাক্ষ্যের কথা মনে রাখলে উপন্যাসের কয়েকটি মুহূর্তের ভাষা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক বর্ণনায় সাতিশয় মনোনিবেশ শরৎচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না। ঘটনা নিচয়ের মধ্য দিয়ে ভাষা প্রয়োগের কথা তিনি চিন্তা করেছেন। অচলার দুর্যোগপূর্ণ জীবনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক প্রতিরূপ ব্যবহার করেছেন, যা অন্য উপন্যাসে তেমন লভ্য নয়। সতীত্বের মুখোস খসে পড়ায় রামবাবুর অনুরোধে সুরেশের শয্যাপার্শ্বে সে রাত্রিতে অচলা যেতে বাধ্য হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র এইভাবে ঃ 'বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।' 'গাঢ় অন্ধকারে'র প্রসঙ্গ আরেক বারও এসেছে, যেখানে নিষ্ঠাবান হিন্দু রামবাবু প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করে জানালেন ভট্‌চার্যিমশাই এসেছিলেন এবং তাদের (সুরেশ-অচলার) স্বামী-স্ত্রীর নামে সঙ্কল্প করে নারায়ণকে তুলসী দিচ্ছিলেন, তা কাল শেষ হবে, অচলাকে কষ্ট করে পরের দিন একটু বেলা পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে, এ বাড়িতেই নারায়ণ নিয়ে এসে পুজো করে যাবেন, অচলাকে কোথাও যেতে হবে না। এই অবস্থায় অচলাকে রামবাবু খুব প্রফুল্ল ও সহজ দেখলেন না, অচলা জানাল তাঁকে অর্থাৎ সুরেশকে বললে উপবাস-টুকু সেই করবে। 'কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অনুভব করিল না, কিন্তু শুধু অন্তর্যামী ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।…বাইরে

অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই দুটি স্তব্ধ, মৌন, লজ্জিত নারীর বক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।' সুরেশের নৈকট্যের রাত্রির অনুরূপ আর একটি বর্ণনা আছে উপন্যাসে : 'বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃংখল ঝড়-জল তেমনি ভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার নিকট এ-সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।'

উপন্যাসের মূল সমস্যা যে সংশয়ের নিজ সৃষ্ট ফাঁদ অচলা তৈরী করেছিল, কাহিনীর খানিক অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সে নিজেকে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে। সুরেশের উন্দাম প্রকৃতি, মহিমের অন্তর্গূঢ় প্রকৃতি জীবনের এক সন্ধি-ক্ষণে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুকৌশলে ধীরে ধীরে নায়িকা তথা উপ-ন্যাসটিকে নিয়ে গেছেন লেখক, সূত্রের সংযোগহীনতা অবলম্বহীন ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত করেছে অচলাকে, খুব স্পষ্ট অথচ সাবলীলতার সঙ্গে তাকে বর্ণনা করেছেন শরৎচন্দ্র, 'যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কাহাকে? কে সে? মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দায় লেখকের ওপর বর্তেছে, সহজতায় তা উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। ইতোপূর্বে কাহিনীর প্রায় শুরুতেই সুরেশ মহিমকে একমাস অচলার সঙ্গে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছিল, তার নিগূলিতার্থ অচলার উক্তির মধ্য দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে, '…বোধহয়, আপনি ভেবেছিলেন পুরুষ মানুষের ভুলতে একটা মাসই যথেষ্ট সময়। তার বেশি হওয়া সঙ্গত নয়।' এর উত্তরে সুরেশ যা বলেছে তাতেও তার মনের দর্পণটি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে, 'আঘাতটা সুরেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, আমি চিরদিনই নির্বোধ। হয় ত এমনই কিছু একটা মনে ক'রে থাক্‌ব। তা ছাড়া আরও একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে আমার ছিল, আমি শপথ করেছিলুম এই একটা মাসের মধ্যেই কোথাও পাত্রী স্থির ক'রে মহিমের বিয়ে দেব। যেমন করেই হোক্‌ তাকে আটকাতেই হবে। আমার বন্ধু হয়ে, সে যে একটা নারীর মোহে নিজেদের সমাজ ছেড়ে চ'লে যাবে, এ যেন কিছুতেই না ঘট্‌তে পারে।' এই সুরেশই পিতার সামনে অচলার নারীত্বের লাঞ্ছনার কারণ হয়, মহিমের মনোজগত থেকে অচলাকে দূরে সরাতে অক্ষম হয়ে নিজের গায়ের জ্বালা মেটাতে বহু অসঙ্গত উক্তি করেছে, কাহিনীর মধ্য ও শেষের দিকে। মহিমের কাছ থেকে অচলাকে ছিনিয়ে আনা যে কতবড়ো ভুল সে উপলব্ধি তার বিলম্বে এসেছে। তাই অচলার অভিযোগ, 'তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে।' কথার সঠিক প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি, বরংচ কোথায় তারা যাচ্ছে তার উত্তরে, 'বোধহয় আমরা সশরীরে নরকেই যাচ্চি' এবং গৃহদাহের হোতা বলে তাকে চিনতে পারায় ক্রোধে জ্বলে উঠে বলেছিল, 'ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড়কাক কখনো ময়ূর হয় না

অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজতো, সে মৃণাল, তুমি নয়! তুমি অসূর্য্যস্পশ্যা হিন্দুর ঘরের কুল-বধূ নও এতটুকুতে তোমাদের জাত যাবে না' এবং 'এ এমন কি অপরাধ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর বলেছিলে, একজন পর-পুরুষকে ভালবাস—সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল ব'লে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চ'লে আস্তে চেয়েছিল—এবং এলেও তাই; স্মরণ হয়? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস ক'রে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আস্তে সেধেছিলে মনে পড়ে?'

বিষয় অনুযায়ী সমগ্র উপন্যাসে সংলাপ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কোমল সহানুভূতিসম্পন্ন উচ্ছ্বাস-আনন্দময়, সংযত বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে তীক্ষ্ণ আক্রমণাত্মক সংলাপ উপন্যাসের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। মনে রাখা দরকার এ উপন্যাসের কাহিনী অংশ যৎকিঞ্চিত, উপন্যাসের স্রষ্টার সর্বসময় তা মনে ছিল, নিটোল কাহিনী সৃজনে শরৎচন্দ্রের চিরকালীন আগ্রহ, তাকে ভাষা ও সংলাপ বাড়িয়ে তোলেন প্রয়োজনানুসারে। দুয়ের মধ্যে একটি ঐক্য রক্ষা করা তাঁর স্বভাবজাত। কিন্তু 'গৃহদাহে'র ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে, কাহিনী হ্রস্ব, বিষয় অভিনব, মুখ্যত তিনটি চরিত্রের কথোপকথন, জীবনাচারণের মধ্য দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে। বিষয়-নির্বাচনে শুধু অভিনবত্ব নয়, সাহসিকতার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন, এই সাহসিকতার জন্য স্বভাবজ সংলাপ পরিত্যাগ করতে হয়েছে লেখককে। স্নিগ্ধ-কোমলা প্রকৃতি থেকে অভিজ্ঞতার রুক্ষ রৌদ্র ও ধূলিকণায় সর্বদেহ আবৃত হয়েছে অচলার, রূঢ় হয়েছে বাক্‌-ভঙ্গি, কঠোর হয়েছে আচরণ ও জীবনবোধ। বঞ্চনার ঘটনাচক্র উত্তীর্ণ হবার শক্তি তার মধ্যে ছিল না। অভিমন্যুর মতো সুরেশের লোভাতুর-কৌশলী ব্যূহচক্রে সে আবদ্ধ হয়েছে কিন্তু, নিষ্ক্রমণের পথ তার জানা ছিল না। কিংবা খুঁজে বের করতে অসমর্থ হয়েছে। ফলে পর্বতের ওপরে জমে থাকা নিষ্ক্রমণে ব্যর্থ জলরাশির মতো উৎসেই দীর্ঘক্রোধে ফুঁসেছে, পর্বতগাত্র ফাটিয়ে জীবনের সমভূমিতে আছড়ে পড়ার উপায় নির্ধারণ করতে পারে নি। উপন্যাসে সে হয়েছে সংকটের মধ্যমণি—এ সংকট ছিন্ন করতে না পারলেও সংকট-জনিত মনোভঙ্গিকে বাতিল করা যায় নি। এরই জন্য তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাক্যের তীক্ষ্ণতায়। এ কথা সত্য তীক্ষ্ণবাক্য প্রয়োগ করে সমগ্র জীবন মানুষের চলতে পারে না। মানুষ অচল পদার্থ নয়, তাছাড়া জীবনের ক্ষেত্র বিশেষে আচরণের পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সে কারণে ক্লিন্নতার ছদ্মবেশ অপসারিত করার জন্য রামবাবুর সঙ্গে তার কথোপকথন তাকে পূর্বের সারল্যে পৌঁছে দিয়েছে। বিবাহের আগে পিতা-পুত্রীর সহজ-বাক্‌-ব্যবহার তাকে স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ করেছে। তবে এই সংশয়ময় জীবন অসহনীয় তার কাছে, রামবাবুর সঙ্গে আলাপ-চারিতায় কোনোক্রমেই ব্রাহ্ম-পরিবারের স্বল্পভাষিতা, সংযত জীবনবোধ অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয় নি। তবু সংশয়ের বদ্ধ ঘরে গ্লানিমুক্তির মন্দ-মধুর বাতাস বয়েছে। তাই তার কাছ স্পৃহনীয়, রমণীয় মনে হয়েছে। একদিন অচলাকে রামবাবু চারটি ডাল-ভাত ফুটিয়ে রাখতে অনুরোধ করলে অচলা বিপন্ন বোধ করে। 'এই পরম নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখন আহার করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র।' স্বপাকে তাঁর অভ্যাস ছিল, সেই মানুষ রান্নার ভার অচলার ওপর অর্পণ করলে তার পক্ষে সঙ্কুচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কী বলবে স্থির করতে না পেরে বলে ফেলল অচলা, 'কিন্তু আমি ভাল রাঁধতে জানি নে। আমার রান্না আপনারও পছন্দ হবে না।' সুরেশও তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তার বেদনা উপলব্ধি করলো। 'এই বৃদ্ধের সংস্কার, তাহার হিন্দু আচার ভাল হোক, মন্দ হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে বাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা অচলার অগোচরে নাই, এবং এই ভদ্র নারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন কথার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিতেছে না, ইহা তাহার শ্রীহীন পাণ্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ-হাত ধোয়ার অছিলায় দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল।' অনেক সাহস সঞ্চয় করে পরে সে রামবাবুকে জানায়, 'কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন' বলে শেষবার এড়াবার চেষ্টা করেছিল, এর চেয়ে আর কোন্ বাক্য যথোপযুক্ত হবে, এ বিষয়ে মনস্থির করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পরে পরবর্তীকালের ঘটনা চিন্তা করে সে বলেছিল, 'আচ্ছা জ্যেঠামশায়, কোন দিন যদি জানতে পারেন, জোর ক'রে যার হাতে আজ ভাত খেয়েছেন, তার চেয়ে নীচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন কি করবেন? প্রায়শ্চিত্ত? আর, শাস্ত্রে যদি তার বিধি পর্যন্ত না থাকে, তাহলে?' সেই আক্ষরিক 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি রামবাবুর জন্যে অবশিষ্ট ছিল। সুরেশের মৃত্যু হলে, 'স্ত্রীর শেষ কর্তব্যও তোমাকেই করতে হবে। তোমাকেই মুখাগ্নি…' এটুকু বলে কেঁদে উঠলেন। এরপর আবার অচলাকে স্পষ্টোক্তি করতে হলো, 'হিন্দুধর্ম্মে' এর যদি কোন সত্যকার ফল থাকে, তা আমি ব্যর্থ করতে চাই নে। আমি তাঁর স্ত্রী নই'। ছলনা অচলার অঙ্গের ভূষণ নয়, ঘটনা-চক্রে তাকে সমাজ-অননুমোদিত জীবনাচরণ করতে বাধ্য করেছিল, তার উপায় কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু রামবাবুর পক্ষে তা সহজ হল না, শরৎচন্দ্রের ভাষা-ব্যবহার এখানে রামবাবুর মনোজগতের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক 'চক্ষের নিমেষে রামবাবুর সমস্ত ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল। তাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সে দিনের সেই মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার বিদ্যুৎবেগে বারবার তাঁহার মনের মধ্যে আবর্তিত হইয়া সংশয়ের ছায়ামাত্রও কোথাও অবশিষ্ট রহিল না। এ কে, কার মেয়ে, কি জাত—হয় ত বা বেশ্যা—ইহাকে মা বলিয়াছেন, ইহার ছোঁয়া খাইয়াছেন—ইঁহার হাতের অন্ন তাঁহার ঠাকুরকে পর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। কথাগুলি মনে করিয়া যে সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার ক্লেদাসিক্ত হইয়া গেল, এবং যে স্নেহ এতদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার, মাধুর্য্যে করুণায় অভিষিক্ত রাখিয়াছিল, মরুভূমির জলকণার ন্যায় সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আভাস পর্য্যন্ত রহিল না।'

দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলো এই জন্য যে উপন্যাসের সঙ্কটময়কালে ভাষা ও সংলাপে শরৎচন্দ্রকে যে অতি সংযমের সঙ্গে সমস্ত পরিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করতে হয়েছিল এটি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাধারণভাবে সংলাপ রচনায়, সে বেদনার মুহূর্তের হোক্ আনন্দের বিহ্বলতায় হোক, শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত, কিন্তু অচলার

চরিত্র এবং তার পরিপার্শ্ব কাহিনীর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও জটিল হয়ে উঠেছিল, সেকারণে তার উপযুক্ত ভাষা ও বর্ণনা, সংলাপ সৃষ্টিতে তাঁকে চরমোৎকর্ষে পৌঁছতে হয়েছিল। সাধারণভাবে তিনি প্রাকৃতিক বর্ণনায় খুব উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু এ উপন্যাসে প্রকৃতির একটা ভূমিকা থেকে গেছে, যেখানে ভাষা পৌঁছতে অসমর্থ, সেখানে প্রকৃতির মত্ততাকে শরৎচন্দ্র আশ্রয় করে, সম-সময়ের মনোজগতের বার্তা প্রকাশ করেছেন। এ রকম ক্ষেত্রে অন্য উপন্যাসে খুব বেশি সময় তাঁকে পড়তে হয় নি। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী মনোজগতের ভাষা, এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে তাঁকে ব্যবহার করতে হয়েছে, এতেও তিনি সার্থকতা দেখিয়েছেন। মনোজগত পাত্র-পাত্রীর জটিল হয়ে গেছে ফলে ভাষা একাভিমুখী। তীক্ষ্ণ এবং আবেগ-বিবর্জিত হয়েছে—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আবেগধর্মিতার ক্ষেত্রে এ-ও অতিরিক্ত সংযোজন সন্দেহ নেই।

আট
ঋতুরঙ্গ

একথা ঠিক, লীলাময়ী প্রকৃতি মানব নিরপেক্ষ। মানুষ মুগ্ধ নয়নে বার বার ফিরে তাকিয়েছে সেই অবাধ অগাধ সাম্রাজ্যের দিকে। অরণ্যের ঘুম ভাঙিয়েছে মানুষ, আবিষ্কার করেছে 'আরণ্যক' সৌন্দর্য। ধ্রুপদী কবি-শিল্পীরা ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সৃষ্টিকর্মের মাঝখানে সমস্ত অনাসৃষ্টির হেতু—প্রকৃতিকে আহ্বান করেছেন। এর কারণ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষের কথা ভাবা যায় না। আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে প্রকৃতির লগ্নতা আছে। এটা একান্তভাবের সত্য।

রোমাণ্টিক কবি-শিল্পীরা প্রকৃতির নিবিড় সত্তাকে বিশেষভাবে অনুভবের সামগ্রী করলেন। বুঝতে পারলেন, ঋতুরঙ্গের মধ্যে আছে প্রাণ হিল্লোল—life of life। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বুঝতে পেরেছিলেন একটা মহৎ সৃষ্টির জন্য নিঃশব্দ প্রকৃতির কাছ থেকে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে। অকটু অসহিষ্ণু হয়ে তিনি বলেছেন—মানুষ মানুষের জন্য কী করেছে ?

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী কবিশিল্পীরা পাশ্চাত্ত্য রোমাণ্টিক কবি-শিল্পীদের প্রকৃতি ভাবনাকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। কবিতায় যিনি রোমাণ্টিকদের মতো নিসর্গ লক্ষ্মীর ধ্যান করলেন তাঁর নাম বিহারীলাল চক্রবর্তী। অবশ্য বিহারীলাল যতটা মুগ্ধ হলেন ততটা অরূপ রতন সন্ধানী হলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখি প্রকৃতির রূপধ্যান। 'আহা কি দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না।' Return to nature তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, রোমাণ্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় সাধিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি আছে 'কপালকুণ্ডলা' থেকে 'রাজসিংহ' পর্যন্ত। একাধিক প্রবন্ধে নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্কিমের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে নিসর্গ প্রকৃতিকে চরিত্রের সমতুল মর্যাদা দিয়েছেন ; হয়তো বা বেশী-ই দিয়েছেন। কিন্তু নিসর্গ প্রকৃতি বা ঋতুরঙ্গকে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়তি সমীহ করেন বলেই কোনো একটা জায়গায় হঠাৎ প্রকৃতি হয়ে ওঠে উপন্যাসের সম্ভ্রান্ত অতিথি। প্রকৃতি ও মানুষের সফল দ্রবীভবনের ক্ষেত্রে বঙ্কিম নিজেই যেন একটা প্রাচীর তুলে দেন। সেই প্রাচীরের এ প্রান্তে মানুষের কোলাহল, অপর প্রান্তে অফুরান নীল, ফিকে গাঢ় হরেক রকম নীল, ওপরে নীলাকাশ, সামনে অনন্ত নীল আর মানুষের চোখে নীললোহিত ঝড়। বঙ্কিম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শীলিত হয়েছিলেন, আবার তিনি 'ভট্টপল্লীর' খুব কাছের মানুষ। সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্কিমের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এবং দর্শনেও। বঙ্কিম জানতেন, সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতি জড়, অথচ এই প্রকৃতিই জগৎ প্রসবিনী, নানা রূপরঙ্গিনী, সর্বাঙ্গ সুন্দরী। একদিকে প্রকৃতি নির্মম, দয়াহীনা, ক্লেশদায়িকা—অপরদিকে সর্ব-মঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা। সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যে আভাস চৈতন্যে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের মুগ্ধতাকে খুব সহজে হৃদয়ঙ্গম করে রূপ-সাগরে ডুব দিলেন। প্রকৃতি-স্তরের পরিবর্তে প্রকৃতির গহনে ডুব দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি চিত্র অংকন করেছিলেন, তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ গাইলেন গান—ঋতুরঙ্গের গান। এবং ব্যক্তিগত সেই গান, সাহিত্যের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো এক প্রযত্নে গড়ে ওঠা জিনিস। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতিকে রাজ অতিথির মর্যাদা দিয়েছিলেন, 'পোলবাহিনী'র তন্ময়ীভূত পাঠক রবীন্দ্রনাথ জীবনরঙ্গের সঙ্গে ঋতুরঙ্গকে একাকার করে দিলেন। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে চরিত্রের দোসর হয় একটা রক্তিম প্রভাত, শরতের প্রসন্ন আকাশ, হেমন্তের বিষণ্ণ বিকেল, বর্ষার সানন্দ দুপুর। প্রভাত সূর্য দেখে যে চরিত্র জীবনের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে আবার বর্ষা ঘনঘোর সন্ধ্যার ভ্যাপসা গরমে সে-ই স্ত্রীর কণ্ঠরোধ করে চিরদিনের মতো। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির উদার অঙ্গনকে মানুষের বিরলচিন্তার আয়তক্ষেত্র করেন, আবার অমারাত্রিকে জীবনের সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে সমীভূত করে দেন। অবলীলায় করেন, অবহেলা দিয়ে গোঁজামিল দেন না। বেশ বুঝতে পারি লেখবার সময়ে ঋতুরঙ্গের অয়নচক্র, রচনার সঙ্গে অলক্ষ্যে অন্বিত হয়ে গেছে। কবিকে গলদঘর্ম হতে হয়নি।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই মহান উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। 'শ্রীকান্তে' নয়, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে। শ্রীকান্তে'র প্রকৃতি মানুষের সমান্তরাল কোনো বিষয়, 'গৃহদাহ'তে প্রকৃতি অলক্ষ্যচারিণী, কৌতুকময়ী। সে প্রকৃতি সর্বার্থসাধিকা নয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে দ্রবীভূতা। কোনো যান্ত্রিক ছককে নথিভুক্ত করে শরৎচন্দ্র ঋতুরঙ্গশালার দুয়ারে উপস্থিত হয়েছেন বলে মনে করি না। বরং বলা যায় ঋতুরঙ্গশালার মাঝখানে বসে গৃহদাহ রচনা করেছেন শিল্পী। উপন্যাস লাভ করেছে এক আশ্চর্য মণ্ডন কলা।

ভরা গ্রীষ্মে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শুরু, সমাপ্তি ফাল্গুনের অপরাহ্নে। কোনো এক গ্রীষ্মের দুপুরে সুরেশ অচলাকে বুকের উপর সজোরে টেনে নিয়েছে (পরিচ্ছেদ ছয়); আর বাংলাদেশের বাইরে কোনো এক ফাল্গুনের অপরাহ্নে সুরেশ সেই অচলার হাতে তুলে দিয়েছে শিলমোহর করা বড়ো একখানি খাম। মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নের মধ্যে কি নিঃসীম ব্যবধান। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সুরেশ ব্যাধের মতো ছুটে এসেছিল হরিণ নয়না অচলার দিকে; বসন্তে সে অনুভব করেছে—ডাকাতের মত জোর করে পাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। রাত্রির নক্ষত্র ফলকে সুরেশ মৃত্যুর আমন্ত্রণলিপি পাঠ করেছে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র প্রকৃতিকে প্রথম ব্যবহার করেছেন সপ্তম পরিচ্ছেদে। মধ্যাহ্ন আহারের পর সুরেশ আত্মগ্লানিতে আধমরা হয়ে গেছে। অন্তরে-বাইরে সে তখন পুড়ছে। তার ঘুম এলো না। একটু বেলা পড়ে এলে সে উঠে বসে সামনের জানালাটা খুলে দিয়েছে। এইসময় কেদারবাবু ঘরে আসেন। বলেন—

'আঃ গরমটা একবার দেখছ সুরেশ।'

পরক্ষণেই পাখাওয়ালাদের প্রসঙ্গ তোলেন, সুরেশকে একটু তোয়াজ করতে থাকেন। শিল্পী শরৎচন্দ্র এই অবসরটুকুর মধ্যে খুব সহজে গ্রীষ্মের দাবদাহকে চরিত্রের অন্তর্লীন-সত্তার সঙ্গে একীভূত করে নেন।

১৪ পরিচ্ছেদের আকাশ বাতাসে শ্রাবণের সিক্ততা। এই পরিচ্ছেদে অচলার বিয়ে হয়েছে।

'তাহার পরে শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সংকীর্ণ কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্যপথ দিয়া পালকি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামিগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল।'

কোনোরকম মন্তব্য করাটা এখানে বাহুল্য বিবেচিত হবে। তবে সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য বলা যায়, শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক বিষণ্ণতাকে এক্ষেত্রে চরিত্রের উপর আরোপ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদে সেই একই ব্যাপার। 'প্রভাতের প্রথম আলোকে স্বামীর মুখের প্রতি চোখ পড়িবা মাত্র অচলার বুকের ভীতরটা হা হা —রবে কাঁদিয়া উঠিল।'

শরৎচন্দ্র যেন বলেন একটি অপরাহ্ন, একটি রাত্রি স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করেছিল একটি প্রভাত তা মুছে দিল। মানুষের জীবনে প্রকৃতির এই অনিবার্য সংক্রমণকে অস্বীকার করা যায় না।

২২ পরিচ্ছেদে অচলা ফিরে এসেছে বাপের বাড়ীতে। সে কিছুতেই আগের মতো নিজেকে সহজ করতে পারছে না। কেদারবাবুর কাছে নয়, সুরেশের কাছে তো নয়-ই। এমনি করে কেটে গেল আট-দশ দিন। তখন শীতকাল। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে ঝড়িয়া পড়িতেছিল এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতে ছিল।'

২৪ পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র আমাদের জানিয়ে দেন—'শীতটা বেশী পড়িয়াছিল।' একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে এর উপরে। মৃণাল এই শীতে তার বুড়ি শাশুড়ির কথা ভেবে সুরেশের কাছে ছুটি চেয়েছে। এক্ষেত্রে শীতের উল্লেখে কোনো বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়নি। কিন্তু ২৪ পরিচ্ছেদ যে আসলে গৌরচন্দ্রিকা সেটা বুঝতে পারি ২৬ পরিচ্ছেদে উপনীত হয়ে। এখানে অচলা অবাক হয়ে দেখছে তার গায়ে সুরেশের চাদর। বলা বাহুল্য সেই চাদরের গায়ে লেগে আছে এক অদৃশ্য পুরুষের ভালোবাসার রঙ। শীতকাল—নরনারীর বসনাবৃত ভালোবাসাকে যেন এখানে প্রকাশ্য করে দিয়েছে। এই পরিচ্ছেদেই আছে, জব্বলপুর যাত্রার দিন—'টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।' ২৭ পরিচ্ছেদে সেই বৃষ্টির আর বিরাম হয়নি। সেই অবস্থায় ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ভীষণ অজগরের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দে। ২৮ পরিচ্ছেদে সেই সর্বনাশা রাতে জলের ঝাপটার সঙ্গে অচলার চোখের জল একাকার হয়ে গেছে। 'বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল···উচ্ছৃঙ্খল ঝড়জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল,···।'

শরৎচন্দ্রের সংযোজন ঃ

বাইরে যে মন প্রকৃতি উন্মত্ত তেমনি নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে প্রলয়ের গর্জন।

২৯ পরিচ্ছেদে আছে শীতের একটি প্রসন্ন প্রভাতের ছবি। ঝড়জলে স্নাত 'নির্মল প্রভাত ঝলমল করছে। ভিন্ন পরিবেশে অচলার নতুন জীবন শুরু হল—প্রকৃতি তারই ইঙ্গিতবহ।

পরিচ্ছেদ ৩১-এ আছে শীতের অপরাহ্নের ছবি আর শোণ নদের তীর। সুদূর বিস্তীর্ণ বালুময় ধূ-ধূ করিতেছিল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অচলা। বুঝতে পারা যায় অচলা ও সুরমার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। এই একই পরিচ্ছেদে কোনো এক শীতের সকালে রামবাবু লক্ষ্য করেছেন দম্পতি বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন কক্ষ থেকে। তার মনে খটকা লেগেছে।

৩৬ পরিচ্ছেদে আছে সুরেশ প্রাণপণে তার নতুন বাড়ী সাজাচ্ছে। বৃদ্ধ রামবাবু সুরেশের এই কর্মকাণ্ড দেখে মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন। রাত্রি একপ্রহরে সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ তার মনের দোসর হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র এইখানে টিপ্পনী যোগ করে বলেছেন—যাদের দেখার কথা তাদের জীবনে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য কোনো নব-রাগিণীর সঞ্চার করল না। গভীর অমারাত্রির মাঝখানে তাদের জীবন তমোময়। এই সজল কারুণ্যটুকু উৎপাদন করার জন্যই এখানে জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ উঠেছে।

৩৭ পরিচ্ছেদের শুরুতে আছে—'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন'। এই পরিচ্ছেদের বড় সংবাদ, অচলা সুরেশ নতুন বাড়ীতে উঠে গেছে এবং সুরেশের ইচ্ছায় পতঙ্গবৃত্ত অচলা আত্মসমর্পণ করেছে। শরৎচন্দ্র সুগভীর সামঞ্জস্য ও সংযম রক্ষা করে গোটা ব্যাপারটি প্রাকৃতিক পটের সাহায্যে সংকেতময় করে তুলেছেন। 'বহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল,—সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।'

৩৮ পরিচ্ছেদে মৃণাল কেদারবাবুর স্নানের জন্য জল গরম করেছে। অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদেও কালজ্ঞাপক হয়েছে শীত। কিন্তু ৪০ পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পারি —ফাল্গুনের অপরাহ্নে বাংলাদেশের বাইরে দুই নরনারী চোখের জলে ভাসছে সুরেশ অচলার হাতে তুলে দিয়েছে শিলমোহর করা বড় খাম।

গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত পর্যন্ত যে সানুপুঙ্খ ঋতুরঙ্গের ছবি শরৎচন্দ্র আমাদে উপহার দেন তাতে কোনো বাড়তি প্রসাধন নেই। হয়তো একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তিনি ব্যবহার করেছেন, জলের মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে মেঘ, টিপি-টিপি বৃষ্টি দাপাদাপি, মাতলামি—কিন্তু কখনোই এই সব পুনরুক্তিকে যান্ত্রিক মনে হয় নি শব্দগুলো অনেকসময় শিহরণ তুলেছে আমাদের মনে, আমাদের চেতনাকে নাড়া দিে যায় ধূ-ধূ বালির চর আর শোণ নদী। নদীর জলে অশ্রুর প্রতিফলন, ধূ-ধূ চ মনের শূন্যতার প্রতীক। শরৎচন্দ্র নিসর্গ প্রকৃতি ব্যবহারে সুরেশের মতো প্রগল হননি, কেদার মুখুজ্যের মতো অতি সাধারণ স্তরে নেমে আসেন নি। উপন্যাসে ঘটনামালা টান-টান একটি বছরের মধ্যে বেঁধেছেন। এই ইস্পাত কঠিন বন্ধ 'গৃহদাহ' উপন্যাস আকর্ষণীয় হয়েছে।

নয়

প্রেমের ত্রিকোণ ঃ ঘরে বাইরে ও গৃহদাহ

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বহুস্থলেই রবীন্দ্র-আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত। বহু রচনার উৎসও রবীন্দ্রনাথ তবে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিমাণে তাত্ত্বিক, শরৎচন্দ্র তা থেকে মুক্ত, তবুও তিনি অনেক প্রাচীন বিশ্বাসের মোহ কাটাতে পারেন নি। এমন অনেক বিষয় শরৎচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন, যা তার পূর্বের উপন্যাসকারদের হাত থেকে পাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। প্রত্যক্ষতা ও বহুদর্শনের সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু তার বিনিময়ে যা পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট বলে অনেক সময় মনে হয় না, এখানেই তাঁর সীমাবন্ধতা দৃষ্টি ও সৃষ্টির। রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু কিছু আহরিত তাঁর উপন্যাসে, কাল, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব কাহিনীর মৌল বিষয়বস্তু, তবু পার্থক্য কম নয়। 'গৃহদাহ' শব্দে 'নষ্টনীড়ে'র কথা মনে পড়ে, মহিম-সুরেশ গোরা-বিনয়, নিখিলেশ-সন্দীপ শচীশ, শ্রীবিলাসকে মনে পড়িয়ে দেয়। গোরা-বিনয় বলতে ব্রাহ্ম-হিন্দুধর্মের সংঘাত ও সংশয় বিস্মৃত হওযা যায় না। আবাব তাদের স্রষ্টা গভীরতার মূল থেকে সমকালেব ধর্মীয় সংকটকে উপলব্ধি করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন অক্লেশে, স্রষ্টা শরৎচন্দ্রও 'গৃহদাহে' হিন্দু-ব্রাহ্মত্বের মধ্যকার নানান সমস্যা আনবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু দূর থেকে দেখা, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং হিন্দুত্ব সম্পর্কে মিথ্যামোহ সত্যদ্রষ্টার ভূমিকায় তাঁকে নিয়ে যেতে পারে নি। অথচ রবীন্দ্রানুসরণের মধ্য দিযে কাহিনীর মৌলকেন্দ্রে হিন্দু-ব্রাহ্মত্ব আনতে কসুর করেন নি শরৎচন্দ্র। 'গৃহদাহ' অনুসরণের ক্ষেত্রে এখানেই সীমাবন্ধ নয়। প্রেমের ত্রিকোণ রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণটি 'গোরা' থেকে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত এসে পেঁাচেছে। 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে ত্রিকোণ প্রেম ও সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যুগ্মবেণী সৃষ্টি করেছে। কোনটি কাব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে প্রশ্ন না উঠলেও ঘর ও বাইরের মধ্যকার প্রসঙ্গ দাম্পত্য প্রেমের ঘর ও বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ও মৌলিক তত্ত্ব সীমা-অসীম ও রূপ-অরূপের তত্ত্বের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নায়কদ্বয় সমকালীন রাষ্ট্রিক চেতনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে নি, সন্দীপ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গী তার জীবন ও কর্মধারার কেন্দ্রভূমি রাজনীতি, নিখিলেশের মর্মমূলে বৌদ্ধিক প্রেরণা ও অর্জিত বিদ্যা ও বোধিতে রাজনীতি তথা দেশপ্রেম বিষয়ে অটুট একটি ধারণা ছিল যা বাইরে রাজনীতি প্রবাহে দাম্পত্য-সঙ্কটে বিন্দুমাত্র চিড় খায় নি। বোধের ধারণাটি এতো গভীরে প্রোথিত কোনো বিপর্যয় বা বাইরের উত্থান-পতন মৌলিকত্বকে সামান্যতম ঘা দিতে সক্ষম হয় নি। দাম্পত্য-সমস্যার সঙ্গে দেশপ্রেম বা রাজনীতি জড়িয়ে গেলেও নিখিলেশ তাত্ত্বিকবোধে স্থিত থেকে গেছে।

'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহে' যে ত্রিকোণ প্রেম দেখা গেছে তার মধ্যে ঐক্য একটি ক্ষেত্রে, তা হলো ত্রিকোণদুটি রচিত হয়েছে দুই বন্ধু পত্নীকে নিয়ে। তবু ত্রিকোণ রচনার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়, শরৎচন্দ্রের জগৎ পরিবার একটু বাড়িয়ে বলা যায় তৎকালীন সমাজ; আর রবীন্দ্রনাথের

জগৎ ব্যাপকতর দেশকালধৃত ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে একটি দম্পতির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনজনিত ত্রিভুজে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে দেশসত্তার মিশ্রণ ঘটেছে। মূল সমস্যা অবশ্যই দাম্পত্যের কিন্তু তাকে নিপুণভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে সমকালের উত্তেজক-দেশপ্রেম, দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে ঘর-ভাসানোর খেলা। দেশ ও জাতির সংকট ও সমস্যা যখন সকল আগল ভেঙে গৃহের অন্তরতম কোণে এসে আছড়ে পড়ে তখন দুই সমস্যার ভেদ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এই বিস্তার 'গৃহদাহে' লভ্য নয়, শরৎচন্দ্রের মানসিকতা বা ইচ্ছাও তদনুযায়ী গঠিত হয় নি। সমস্যা দাম্পত্যের, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে সমকালের আচার-সংস্কার। সমাজ-শাসিত ধারণাসমূহ তা কালের গণ্ডিকে পেরিয়ে সমাজের গণ্ডিকে পেরিয়ে বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। সতীত্বের সমস্যা, ব্রাহ্ম-সমস্যা, গ্রামীণ জীবনের নিত্যদিনের গ্লানিলাগা সমস্যা আছে, কিন্তু প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলি দাম্পত্য-বৃত্তের চারদিকে ঘুরপাক খেয়েছে মাত্র, বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। দুই দাম্পত্য-সমস্যার মৌল পার্থক্য বস্তুত এখানেই। রবীন্দ্রনাথ তার নায়িকাকে দিয়ে যে পরীক্ষা করিয়েছেন, তাতে তার ব্যক্তিক জীবনের সংঘাত ঘরের দাম্পত্যে এবং বাইরের দেশপ্রেম তথা স্বদেশ চেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করে বারংবার সংকটের মধ্যে সংগ্রামের পাথেয় জোগাড় করে দিয়েছে। এই সংগ্রাম সন্দীপের আগমনের পর থেকে কাহিনীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিল, 'গৃহদাহে'র নায়িকা অচলার মধ্যে সংগ্রামের বিশ্বাসযোগ্য কোনো দলিল নেই। সে লাগাম ছাড়া বাঁধন হারা আগত স্রোতোমধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সুরেশের প্রাথমিক উন্মাদতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার জালে সে অনায়াসে বাধা পড়েছে, সে জাল ছিন্ন করবার বাসনা তার মধ্যে অটুট আছে এমন কোনো প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে নেই। তার এই সংগ্রামহীনতার সুযোগ বেশি করে এসেছে নির্বিকার ও উদ্যোগবিহীন প্রেমিক মহিমের জন্যে। মহিম কী প্রেমিক? প্রেমের অফুরন্ত সৌন্দর্য তার রাম-ধনু রঙের ছটা, তার আকর্ষণের তীব্রতম মদিরা উপভোগের সামগ্রী। প্রেমের সে-রহস্য-দ্যোতনা উপলব্ধির শক্তি বিধাতাপুরুষ তাকে দেন নি। অথচ 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ, যাকে man of idea বলে বিবৃত করেছেন গুণীজনেরা, রস বোদ্ধারা তার সেই উপলব্ধির শক্তি ছিল (কেউ কেউ idea-কেও উপন্যাসের নায়ক বলে মনে করেছেন, নিখিলেশ সেই idea-র বাহন)। নিখিলেশের প্রেম ছিল 'স্বতোৎ-সারিত-কিন্তু একান্ত সংযত'। নিখিলেশের প্রেমে কোনো জবরদস্তি নেই, যেমন মহিমে নেই, আবার প্রেমের স্বতোপ্রকাশ যা নিখিলেশের একান্ত নিজস্ব, তার নাগাল মহিম পায় নি। নিখিলেশ বিমলা সম্পর্কে বলেছে 'ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে'। এমন প্রেমে আকর্ষণ নেই নিখিলেশের। তবু বীরকে, প্রেমিককে নিজের রক্তে ভালে তিলক কেটে, দীর্ঘ কুন্তল দিয়ে ধৌত পদযুগল মুছিয়ে দিতে সাধ চির-কালের বীরপ্রেমী নায়িকাদের, মোহগ্রস্তের আকারে হলেও বিমলা তাই চেয়েছে। গভীর আদর্শনিষ্ঠা অন্তরে বহন করেও নিখিলেশের প্রেমিক সত্তা অটুট থেকে গেছে, তার প্রকৃষ্ট কারণ নিজেকে প্রকাশ না করেও সন্দীপের প্রতি সে ঈর্ষান্বিত হয়েছে। কাহিনীর মাঝামাঝি থেকে প্রায় শেষলগ্নে এসে নানান আলোচনা,

উত্তর প্রত্যুক্তির মধ্যে আহত অভিমনকে সে ঢেকে রাখতে পারে নি। এর মধ্য দিয়েই তার প্রেমিক সত্তা জেগে উঠেছে। তর্কে যার চিরকাল অরুচি, তাকে প্রেমের কারণেই তর্কে অবতীর্ণ হতে দেখতে পাওয়া যায়। এ বালাই মহিমের মধ্যে নেই। অসুস্থ অবস্থায় অচলার হাতে হাত রেখে যা সে বলেছে, তা অসুস্থ শরীরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এর পূর্বে কখনো কোনো কারণে তাকে তার হৃদয় খুলে অচলার সামনে অর্ঘ দিতে দেখা যায় নি। সে নিষ্ঠা বোঝে, কর্মকুশলতা বোঝে, বোঝে কর্তব্য—সে প্রেম বোঝে না, পারস্পরিক বিনিময়ের মর্মকথা তার বোধের বাইরে। সে বিবাহপূর্বের অচলাকে বোঝে নি। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে বোঝে নি, অকৃতজ্ঞ বন্ধুর হাতে নিগৃহীতা পত্নীর, সকল মর্মজ্বালা অবসান কল্পে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ বোঝে নি, পাণিগ্রহণের সমগ্রতার পারিপার্শ্ব অনুধাবন করতে পারে নি। সহস্রবর্ষের সাধনার ধনের সাধনার অর্থই তার কাছে অস্পষ্ট।

সুরেশের অস্পষ্টতাহীন শরীরী আকর্ষণ, আবেগ উজাড় করে দেবার মধ্যে জোর ও উপভোগের যে বাসনা তা অচলাকে চঞ্চল করে তুলেছে, কিরণময়ী ছাড়া আব কোনো নায়ক-নায়িকাকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এইরূপ ভোগকাতর করে বর্ণনা করা হয় নি। চঞ্চল অচলা অতৃপ্ত কামনাকে এই প্রথম স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছে, নিজের অন্তরস্থিত তৃপ্তিহীনতাকে প্রত্যক্ষগোচর করেছে এবং মনের নিজ্ঞান স্তর থেকে জাগ্রত হয়ে নিজেকে সমর্পণের তাগিদে অধীর হয়ে উঠেছে। এখানে বিমলার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সন্দীপকে দেখে, তার দেশপ্রেমের চাতুরী মধ্যে গুটিপোকার আকর্ষণকে নিজ মধ্যে অনুভব করেছে, মক্ষীরাণী ইত্যাদি শব্দের আমদানি করে তার ব্যূহজালের মধ্যে তীব্রতর করে আকর্ষণ করেছে সন্দীপ বিমলাকে, জালের মধ্যে সে ছটফট করেছে, আবার তীব্রতম মোহগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। বিমলাব কামনাকে সে ভেতর থেকে বাইরে টেনে এনেছে, সে উপলব্ধি করেছে, 'তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস টস করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্ত মাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে—একদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে? তোমাকে সাধু কথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন?' নিখিলেশের প্রেম প্রচার বিমুখ আপনাতে আপনি বিকশিত। সন্দীপের উত্তাপ কটাহের প্রেমের সামনে তাকে প্রাণহীন বলে বিমলার মনে হয়েছে, স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছে, বস্তুত মোহেই, 'এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর'। বিমলার মধ্যে একটা স্পষ্টতা ছিল যা তার ত্রিকোণ প্রেমের প্রতি অঙ্গে প্রস্ফুটিত। মেজোরাণী তাই দেখে উক্তি করেছে, '…রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল'। সকলের সম্মুখ দিয়েই প্রাচীনপন্থী বাড়ির অচলায়তন ভেঙে পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে সে এগিয়ে এসেছে, হোক্ মোহ, নিজের চাহিদাকে উপলব্ধি করার পর তার স্পষ্টোক্তি 'আমি চাই' সঙ্গত বলেই মনে হয়েছে। বিমলার প্রেমের যে প্রকাশ তাকে এক অর্থে বিদ্রোহী বলা যেতে পারে।

সে কোনো প্রবল স্রোতে বয়ে যায় নি, যদিচ সন্দীপের প্রেমের চাতুরীর শিকার সে হয়েছে, সন্দীপ এই চাতুরীতে বিশেষ দক্ষ, তার বাগ্মিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছে প্রেমের ছলাকলার কৌশল, কথার পর কথা সাজিয়ে সে শুধু দেশবাসীর হৃদয় জয় করে না, তার নারীলোলুপ মন তীব্র শেল হানে নারীর হৃদয়েও। কোন্ মুহূর্তে কোন্ কথাটি, কোন্ কাজটি, কোন্ আচরণটি করা দরকার তার আঙ্কিক হিসাব ধরেই সে এগোয়। দেশের মানুষকে নিজের দিকে টানবার মন্ত্রের সঙ্গে নারীসঙ্গকে নিজের কুক্ষিভূত করবার মন্ত্রটি তার জানা আছে। মক্ষীরাণীর চতুর্দিক ঘিরে মৌমাছির মতো গুঞ্জন, তার নারী মহিমাকে উত্তেজিত করে তার বন্দনা গানেও দক্ষতা দেখিয়েছে। শর সংযোগে এত আজুর্নিক যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে। কিন্তু মানুষের স্বভাব ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য। লোভ এমনি বস্তু সে সহজেই তার সীমাকে অতিক্রম করে যায়, সন্দীপ এককে পেয়ে দুইয়ের দিকে, দুইকে পেয়ে তার অতিক্রান্তটিকে পেতে চেয়েছে, সে লক্ষ্য করে নি, তার বাক্য থেকে আচরণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর মোহেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে, ঘটনার ক্রমঃ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুখোস খসে পড়ায় ভেতরকার আদিম মানুষটি প্রকাশ পেতে নিজের সত্য স্বরূপকে বুঝতে পেরেছে বিমলা, সন্দীপের সীমাবদ্ধতা, লোলুপতা, অর্থগৃধ্নতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে নিখিলেশের সঙ্গে তার পার্থক্যটি ধরতে পেরেছে। ফলে তার মোহভঙ্গ হয়েছে। তাই সে অকপটে বলেছে, 'হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। আমার কী হবে, আমার কপালে কী আছে'। নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানান আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে তার আত্ম-উন্মোচন ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত তার শুভবুদ্ধির জয় হয়েছে, নিখিলেশের কাছে ফেরার জন্য সে উদ্যত হয়েছে। এ সুযোগ অচলার ছিল না, তার জীবন বোধের গভীরতাও ছিল না। মোহমুক্তির সুযোগও তার ঘটে নি। বরং সুরেশের উক্তি তাকে সচেতন করে দেয়, 'এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উল্টো। তখন ভাবতুম, কি ক'রে, তোমাকে পাবো, এখন অহর্নিশি চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব।' সুরেশ মুক্তি দিলেই তার মুক্তি আসা সম্ভব নয়। মহিমকে সে-অর্থে অচলা জড়িয়ে থাকতে পারে নি পারে নি তেমনি করে সুরেশকেও, Idea-র বাহক হলেও ঘর থেকে বাইরের জগৎ দেখাতে উদ্যোগী, নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও সেই নিখিলেশের জগতে বিমলার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু 'তোমার হাত ধরে যত দূরে বল, যেতে পারব' বললেও অচলা মহিমের কাছ থেকে শেষ মুহূর্তেও সদর্থক উত্তর পায় নি, পাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই। তাই অচলার পক্ষে আত্মগ্লানি ছিন্ন করে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হয় নি। তার ভার দুর্বহ যেমন সুরেশের কাছে হয়ে পড়েছিল, তেমনি মহিমের সংকোচ ও সীমাবদ্ধতা তার ভার বহনের উপযোগী ছিল না। মহিম যে কথার উত্তর অচলাকে দিতে পারে নি, তা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল মৃণালের কাছে তাই মৃণালকে সে বলেছিল, '...অচলা আমাকে একটা আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারি নি, তোমার কাছে হয় ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।' তাই অচলার

মনোভঙ্গিকে ঠিক প্রত্যাবর্তন বলা যায় না, যা বিমলার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রযোজ্য, বিমলার পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয়। কোথাও লেখক বিমলার মনের পরিবর্তন যে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, আকস্মিক তার ইঙ্গিত দেন নি। বিভিন্ন কারণ-পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েই বিমলার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে।' এখানেই বিমলা চরিত্রের সম্পূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা, যা সামগ্রিকভাবে নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপ ত্রিকোণের সার্থকতা নিষ্পন্ন করে। সে অর্থে মহিম-অচলা-সুরেশ ত্রিকোণ আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে না।

সন্দীপের 'অপ্রতিরোধ্য পৌরুষের দিক' কখনো অস্বীকার করবার নয়, সুরেশের মধ্যে এই পৌরুষের দিকটি তেমন উজ্জ্বল নয়, যার জন্যে তার প্রতি পাঠক মাত্রই আকর্ষণ অনুভব করে। সুরেশের আচার-আচরণে আপাত যে বিরোধ, তার ব্যবহারে যে বৈপরীত্য তা থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা করা কষ্টসাধ্য। সন্দীপের পক্ষে এই অস্পষ্টতার সুযোগ কম। সন্দীপের ভোগবাদের সঙ্গে সুরেশের ভোগবাদের মিল থাকলেও কার্যধারার স্থূলতা সুরেশের ক্ষেত্রে বেশি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। দুটি উপন্যাস একজাতীয় দুর্বলতার শিকার, তাহলো নায়ক-গুচ্ছের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অসমতা। সন্দীপ ও নিখিলেশের ক্ষেত্রে যেমন, মহিম-সুরেশের ক্ষেত্রে তদ্রূপ। নিখিলেশের মহত্ত্ব লেখকের প্রকাশিতব্য বস্তু, মহিমের মহত্ত্ব ঘটনাও কাহিনীর সূত্রে নয়, লেখকের বিবৃতিতে। নিখিলেশের মধ্যে সদর্থক (Positive) ধ্যান ধারণা বিশ্বাসের বস্তু, তার idea, জীবন সম্পর্কে ধারণা, প্রতীকে গঠিত হয় নি, তার আচরণের অঙ্গীভূত হয়েছে। কিন্তু মহিমের ক্ষেত্রে সে জাতীয় অস্ত্যর্থক ভাব তার ক্রিয়া কলাপের মধ্য দিয়ে দেখা দেয় নি বলে তা বিশ্বাসের বস্তু হয়ে দেখা দেয় নি। এর ফলে বিমলাকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভুজটি স্পষ্ট, অচলাকে কেন্দ্র করে তা ততখানি স্পষ্ট নয়। মহিম বস্তুত পাথরের দেবতা, তাতে প্রাণসঞ্চার হয় নি, idea-বাহক হলেও নিখিলেশ সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর রীতি, প্রকরণ, ঘটনা প্রবাহ, মনস্তত্ত্ব সর্বদিক দিয়ে সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, যা শরৎচন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে। সন্দীপের আচরণ স্থূল হলেও কাহিনী স্থূল নয়, নাটকীয়তা, ট্র্যাজেডি সৃজন ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে তা উচ্চাঙ্গের হয়েছে, উপন্যাসের কাহিনী ও প্রকরণের দিক থেকে যেমন, তেমনি ত্রিকোণ প্রেমের সৃজনের দিক দিয়েও তা সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনীর অন্তিমে ছোটগল্পতুল্য যে ইঙ্গিত তা উপন্যাসের কায়া গঠনের দিক থেকে সার্থক হয়েছে এ কাহিনীর নাটকীয়তা ও আকস্মিকতার সঙ্গী হয়ে। 'গৃহদাহে'র কাহিনী ও সমাপ্তির দিক থেকে সে কথা বলা যায় না। কাহিনীর শুরুতে যে নাটকীয়তা ছিল, শেষাংশে মহিমের নিস্তেজ অস্তিত্বের মতো সমাপ্তিও নিস্তেজ এবং অর্থবহ নয়, অথচ এ জাতীয় কাহিনীর অর্থবহতা প্রার্থনীয় ছিল।

অন্য একটি তুলনা উভয় ত্রিকোণের ক্ষেত্রে মনে আসা স্বাভাবিক তা হলো উভয় উপন্যাসের দাম্পত্যের বিষয়ে। 'গৃহদাহ' কোনো দাম্পত্য উপহার দেয় নি সত্য অর্থে, আক্ষরিক অর্থে তার অস্তিত্ব আছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। উপন্যাসের প্রথম পর্বে নিটোল একটি দাম্পত্য-বৃত্ত আছে। বিমলাকে

নিয়ে নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে ত্রিকোণটি রচিত হয়েছে, তা নিখিলেশের স্বকৃত। বিমলার জবানীতে পাই, 'আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী ?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।...

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। এইখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।...'সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।'

ভালোবাসায় গভীরতার স্পর্শ না থাকলে এই পরীক্ষায় নিখিলেশের ইচ্ছে থাকত না। এ পরীক্ষা কেবল বিমলার ক্ষেত্রে নয়, তা সমানভাবে নিখিলেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দাম্পত্যের যথার্থ স্ফুরণ ঘটার ফলে ঘরের চৌহদ্দির মধ্য থেকে বাইরের বৃহত্তর জগতে নিখিলেশ তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। প্রেমের মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার বিষয়টি চিত্তাকর্ষক তো বটেই, তা শ্রদ্ধাবোধ ও উচ্চ চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঘরের সম্পূর্ণতা, বাইরের সম্পূর্ণতার সঙ্গে একাত্ম করে দেবার অভিলাষ নিখিলেশের মধ্যে প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। ঘরের স্বাদ পূর্ণ হয়েছিল বলেই তার বিস্তৃতির প্রসঙ্গ উঠেছিল। প্রেমের স্পর্ধা দেখবার সামর্থ্য তারই থাকে, যে নিজে প্রেমের গভীরতায় বিশ্বাসী।

'গৃহদাহ' উপন্যাস এখানে পিছু হটতে বাধ্য। এখানে প্রেমের স্মৃতি আছে, বর্তমান নেই, বিশ্বাস্য চিত্র নেই, পাঠকের চোখের সামনে 'গৃহ' ও প্রেমের হর্ম্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। গৃহের বাসনা একান্তভাবে নারীরই প্রত্যাশার বিষয়, কিন্তু কেদারবাবুর বাড়ি থেকে সুরেশের পশ্চিমী আবাসস্থলে কোনো থিতু হবার মানসিকতা অচলার মধ্যে লভ্য নয়। প্রেম তো ভাসমান কোনো পদার্থ নয়, রৌদ্রঝলসিত আপন তেজে ভাস্বর, 'গৃহদাহে' তা কথার বুদ্বুদে পরিণত হয়েছে। তাই মহিম কিংবা সুরেশের কারো ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রাসাদটি দীপ্যমান হয় না, এক-জাতীয় আকর্ষণ বোধ আছে, যা প্রেমের থেকে দীর্ঘ যোজন দূরবর্তী। তাই এখানকার গড়ে ওঠা ত্রিকোণ যাযাবরত্বে পরিণত হয়েছে, তার স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই, বিশ্বাসের ভূমি নেই। অচলাকে যে বেগানা হয়ে পথকেই আশ্রয় বলে গ্রহণ করতে হল তার কারণ সেখানে কোনো নিশ্চিত দাম্পত্যের নীড় গড়ে ওঠে নি। যে ত্রিকোণটি দৃশ্য বা পশ্য ক্রমোপরিণতিতে পূর্ণাবয়ব রূপ সৃষ্টি হয় না। ত্রিকোণটি শেষ পর্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

দুটি উপন্যাসে দুই বন্ধু পত্নীকে নিয়ে ত্রিকোণ দুটি গঠিত হয়েছে। দুটির দুই ভিন্ন জাতীয় আকর্ষণ আছে। শরৎচন্দ্র মহিমকে আকর্ষণীয় করে তোলেন নি সত্যকথা, কিন্তু সুরেশের আবেগতাড়িত বৈপরীত্য মিশ্রিত চরিত্র আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু তার ক্রিয়াকল্পের সামঞ্জস্যহীনতা অনুরাগ-বীতরাগ উভয়ই সৃষ্টি করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাস ব্যতিক্রমী শরীরী প্রকাশের চরিত্র সে—তবে লেখকের দ্বিধা স্পষ্ট-অস্পষ্টতার মধ্যরেখায় সে বিরাজ-মান। তবে প্রাণবন্ত বলে উপন্যাসের ত্রিকোণটিকে উত্তাল করে রেখেছে, তার

আচার-আচরণ গ্রহণযোগ্য হোক্ বা না-ই হোক্, কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্য যেমন আকর্ষণের বস্তু, তেমনি নিখিলেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সন্দীপের মোহজাল ছিন্ন করে বিমলার বেরিয়ে আসা, নিখিলেশের আপাত পরাজয়ের পর তার প্রেমের জয় এবং বিমলার আত্মোপলব্ধি উপন্যাসটিকে যেমন সাধারণত্বের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে, তেমনি শেষ মুহূর্তের উৎকণ্ঠা প্রথমাবধি একটু একটু করে রহস্য-উন্মোচনের সঙ্গে সামাঞ্জস্য বিধান করেছে। এর আকর্ষণকে হেয় করবার কোনো কারণ নেই। বরং উপন্যাসের নিজস্ব গঠন-পরিপাট্যে, বক্তব্য উপস্থাপিত-করণে তা সার্থক হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিগত দিক থেকেও তা 'গৃহদাহ' অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের। প্রেমের সূক্ষ্মতা, তার রহস্য, তার অজস্র তন্তুজাল মোহের আবরণের মধ্য থেকেও সার্থক। সুস্থ দাম্পত্য, তাতে গ্রহণলাগা মোহের আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে ফুটে ওঠা—প্রেমের ত্রিবিধ লক্ষণই উপন্যাস তথা ত্রিকোণের অন্তর্গত। লেখক কোনোটিকে ছোট করে দেখান নি। প্রেমের পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তার মধ্যে কাঁটা ও যন্ত্রণা যে আছে এবং তার পথ বেয়েই উত্তীর্ণ হতে হয় শুদ্ধতায় তাও রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে যায় নি। পরীক্ষাটি করতে চেয়েছিল নিখিলেশ, কিন্তু প্রেমের দায় ও দাহ উভয়ই নারীর নিজস্ব জগতের সামগ্রী, বিমলার মধ্য দিয়ে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। সব চেয়ে লক্ষণীয়, অচলার মতো মুখের ডৌল, সৌকুমার্য, স্থির-বুদ্ধির আভার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দেন নি, বিমলা জানে তার রূপের গৌরব নেই, তার গৌরব যে রূপের বাইরে নিখিলেশ তা অবগত আছে, সন্দীপের খুব বেশি সময় লাগেনি তা বুঝে উঠতে। রূপের অসামান্যতা নেই বলে তার পরীক্ষাও জটিল ও গূঢ়তা সঞ্চারী হয়েছে। তাই ত্রিকোণটি লীলারসে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত বলে মনে হয়। অচলার স্থির-নিশ্চিতির অভাব বিমলার মধ্যে নেই, দেশপ্রেমের উত্তেজনা খুব সামান্য উত্তেজনা নয়, রবীন্দ্রনাথ জানেন, সেই উত্তেজনার সঙ্গে সন্দীপের আকর্ষণ একত্র হয়েছিল বলে মোহের আড়ালে দেশপ্রেম খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সন্দীপের উত্তেজক দেশপ্রেমের পাশে বস্তুতান্ত্রিক ও মোহহীন স্বচ্ছ চোখের নিখিলেশের দেশপ্রেম রঙহীন বলে প্রতিভাত হয়েছিল বিমলার। নিশ্চিত প্রত্যয় যে নিখিলেশের দেশপ্রেমের মূল মোহমুক্ত চোখে বিমলা তার উপলব্ধি করে নি, কিন্তু এই মোহডোর ছিন্ন হতে খুব বেশি সময় লাগার প্রয়োজন হয় না, অন্তত বোধ যার গভীরতার সঙ্গী। বিমলা তাকে বুঝেছিল, তাই তার প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক। পরীক্ষা করিয়ে বস্তুজগতকে আরো প্রত্যক্ষ-ভাবে অবলোকন করেছিল নিখিলেশ, যে হাত অচলাকে মোক্ষম সময়ে বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার ছিল মহিমের, লেখকের বিবৃতি অনুযায়ী যে স্থিতধী, কর্তব্য পরায়ণ, সে সঙ্কোচে ও ঘৃণায় হাত সরিয়ে নিতে ব্যগ্র, সেখানে বাইরের জগতে মিলন পিয়াসী নিখিলেশ বিমলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল, রূপে না ভুলিয়ে ভালোবাসার ভোলানোর মন্ত্র তার হাতে ছিল বলেই। বস্তুত যুক্তির পারম্পর্য রক্ষার কারণে, বস্তু জগতকে তার প্রকৃতরূপ প্রদর্শনের জন্য 'ঘরে-বাইরে'

উপন্যাসে রচিত ত্রিকোণটি অধিকতর কাম্য বলেই মনে হয়েছে। তার বলয়টিও পূর্ণ হয়েছে, যে অসম্পূর্ণতা, যে সংলগ্নবিহীনতা 'গৃহদাহে' বর্তমান, তা থেকে 'ঘরে-বাইরে' সম্পূর্ণ মুক্ত। সেটিও 'ঘরে-বাইরে'র সার্থকতার মূলে নিহিত। দোলাচলচিত্ততা দুটি উপন্যাসেই কম বেশি আছে, কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে যে গভীরতা, যার মূর্তিমান বিগ্রহ বিমলা, তার পারম্পর্যযুক্ততা অচলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নি, ফলত ত্রিকোণ সম্পূর্ণতা লাভে বঞ্চিত হয়েছে। 'গৃহ' শব্দটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য, কিন্তু 'গৃহ' বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্যে সম্পূর্ণ কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেই। তার ত্রিকোণের মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা গৃহের আঙ্গিনার মধ্যেই। 'ঘরে-বাইরে'র সার্থকতার এটিও একটি কারণ বলে ধরে নেওয়া যায় অনায়াসে।

দশ

গৃহদাহে নীতিবোধ

আশ্চর্যের বিষয় এই যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার কালে তাঁর রচনা দুর্নীতিগ্রস্ত বলে একটি চলতি প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কোথায় এই দুর্নীতির উৎস তার মর্মভেদ কেউ করেন নি। বস্তুবাদী বলেও শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় ছিল, তার অন্তরালে তার আদর্শবাদী মনোভঙ্গি অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে, বিশেষত উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের ছবি অদৃশ্য থেকে গেছে, সেখানে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়েই। তথাপি আদর্শবাদই ছিল শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য, তিনি বাংলা উপন্যাসের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার, তিনি পেয়েছিলেন সকল দিক থেকে। যে নীতিগ্রস্ততা বঙ্কিমচন্দ্রে বর্তেছিল, বর্তেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও, শরৎচন্দ্র তারই অংশভাগী। শুধু তাই নয়, তাকে নিশ্চিতরূপ Puritan বলা যায়, এর পরিচয় সমগ্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়। তিনি নিজ-সম্পর্কে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন, 'আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নরনারীর মধ্যে ইহাও আছে জানি, চলেও জানি, দোষের বলিতেছি না, তবুও তেমন যেন পারিয়া উঠি না।' সমালোচক বলেছেন 'দেহকামনার চিত্রণে তাঁহাকে সংযমী বলিলে বোধ হয় কম বলা হয়, বরঞ্চ অতিরিক্ত শুচিতাগ্রস্ত বলিতেই ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি উদ্দাম প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কিন্তু সেই ক্ষতবিক্ষত কামনার হাহাকার শরৎ সাহিত্যে আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্র অথবা সন্দীপের ন্যায় প্রবৃত্তিময় পুরুষও শরৎ সাহিত্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। শরৎ সাহিত্যের একমাত্র দুর্দম প্রবৃত্তিময় পুরুষ বোধ হয় সুরেশ।' সুরেশের পরিচয় কিছু পাওয়া গেছে বটে, তবে তাঁর স্রষ্টার ইচ্ছা অন্যরূপ, তার উদ্দামতার প্রকাশ যার ওপর হওয়ার কথা, তার দোলাচলতা দেখানো হলেও সে কিরণময়ী নয়, সে রাজলক্ষ্মী জাতের। সুতরাং ক্রমাগত সুরেশকে উদ্দামতা থেকে সরে আসতে হয়, উত্তাপহীন শরীর তার কামনাতে পরিপূর্ণ কেন, কোনো অবস্থাতেই তৃপ্তিদানে সহায়ক হয় না। লেখকের ইচ্ছা অনুযায়ীই সুরেশের অসংযম রূপ পায় নি। কিন্তু মনে রাখা দরকার উচ্ছৃংখলতা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি সংযমের বাহুল্যও জীবনে নন্দিত নয়। কিরণময়ীর মতো সুরেশের অসংযম লেখকের বরদাস্ত না হতে পারে, কিন্তু কমলের ব্রহ্মচর্যের সংযমের আধিক্য বস্তুতই নীতিবোধের প্রতীক শরৎচন্দ্রকে মনে করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য'। আপাতবিরোধী উক্তিটির মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় যে নীতির প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করতে চান না। নীতি-ভ্রষ্টতা নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু সহজ-সাধারণ জীবন প্রবাহে চাপিয়ে দেওয়া নীতিবোধের যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় না। যা স্বাভাবিক তাকে প্রকাশ করাই

সাহিত্য সেবীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁর সমাজজীবন বোধ এবং হিন্দু-ধার্মিকতা সম্পর্কে একজাতীয় মোহ। 'নিষ্ঠাবান হিন্দু' নিয়ে 'গৃহদাহ' উপন্যাস সোচ্চার। এমন কী ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত কেদারবাবু মৃণালের হিন্দু-ধার্মিকতা দেখে পুতুল-পুজোর বন্দনায় মুখর হন, রামবাবুর হিন্দুত্ব নিয়ে আধিক্য কখনো কখনো পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, তাই শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে লেখা হয়, 'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেণ্টের সাহায্যে বিধবা বিবাহ বিধিবন্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেন নি।' নিজের নীতিবোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজ-সমস্যার সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে বলা সাজে, 'কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকদের ওপরে নাই'। তাই রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনে বঞ্চনা কিংবা অন্নদাদিদির ছিন্নভিন্ন জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর ওপর অন্নদাদিদির সকল দুর্ভাগ্যের মূল সনাতন হিন্দু নারীর স্বামী সম্পর্কে অটুট ধারণা। হিন্দু নৈতিকতা শরৎচন্দ্রের বাস্তববোধের বিনষ্টির মর্মমূলে দেখতে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে সংযুক্ত দেহ-সম্পর্কে শুচিবাই। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের মাঝখানে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বঙ্কু, সতীশ-সাবিত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যোজিত হয় না মধ্যে জেগে থাকে কোনো ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরোজিনীকে কাহিনীর মধ্যে না আনলে চলে না, কিরণময়ীকে শেষ পর্যন্ত উন্মাদদশা প্রাপ্ত হতে হয়, রমার স্থান নির্দিষ্ট হয় কাশীতে, বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে একত্রে। এ সকলের পেছনে একটি মাত্র কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তা শরৎচন্দ্রীয় নীতিগ্রস্ততা ছাড়া অন্যকিছু নয়। যা স্ব-ভাবজ তা সৃষ্টি হয় না শরৎচন্দ্রের লেখনীতে, বিস্ময় তো সেখানেই। মানুষকে দেখবার অভিজ্ঞতা তাঁর সকলের চেয়ে বেশি, বাস্তবতার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে জীবনে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে, প্রায় কোনো চরিত্রই স্বকপোলকল্পিত নয়, তাঁর 'পোড়া চোখ দুটি' দিয়ে দেখা, তবু তারা নীতির আব্রুর আড়ালেই রয়ে গেল চিরকাল। এ প্রশ্নেরও উত্তর বাস্তবতার মধ্যে নিহিত নয়। নীতির খোলস পেরিয়ে তিনি আসতে পারেন নি বলেই।

শরৎচন্দ্রের নৈতিকতার এই প্রেক্ষিতে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে আরোপিত নীতি-বোধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। সুরেশের মধ্যে রক্ত-মাংসের যে মানুষটি অংকনে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ দেখা যায়, সময়-অসময়ে একজাতীয় দ্বিধা এসে তার পূর্ণাঙ্গ চরিত্র অংকনে বাধা সৃষ্টি করে গেছে। তার শারীরবোধ খুব স্পষ্ট উপন্যাসের প্রথম দিকে, অচলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে কোনো আব্রু রাখে নি, স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেই অচলা তাকে মুগ্ধ করে, এই মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ শরীর-নৈকট্যের মধ্যদিয়ে ধরা পড়ে। 'দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশের যায় না। সে স্থান-কালের অতীত! তুমি ভূমিকম্প দেখেছ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—' বলে ঝুঁকে পড়ে অচলার ডান হাত ধরে টান দেয়। তবু এর পরবর্তী কোনো ঘটনা লেখকের প্রার্থিত নয়, তাই 'সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসা দগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা স্তব্ধ তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া

পড়িতে লাগিল'। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে দেখা যায় যে কিরণময়ী বলতে দ্বিধা করে নি, 'আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ-নরক ও-সব কিছুই মানিনে—ও-সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে, মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে'—সে-ও কেবলমাত্র 'নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল'। 'গৃহদাহ' উপন্যাস আকস্মিক আবেগে অচলার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুরেশ চুম্বন করল, অচলার তখন 'অপমানে···মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, ঠোঁটদুটি ঠিক তেমনি বিছার কামড়ের মত জ্বলিয়া উঠিল'। যে তাগিদে একদিন সুরেশকে সে কামনা করেছিল, সময়কাল উপস্থিত হলে শরীর-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেই সে আশ্বস্ত থেকেছে। 'মনোজগতে তার যে ইচ্ছা অনুরাগই বাসা বাঁধুক না কেন, বাস্তব জগতের ক্রিয়াকলাপে তার বিপরীত আচরণ লক্ষণীয় হয়। অচলার ক্ষেত্রে আর বেশি অগ্রসর হওয়া শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব না হলেও, সুরেশের ক্ষেত্রে তাঁর Puritan মনোভঙ্গি আশাভঙ্গ করে দেয়। দুর্দমতা সুরেশের শরীর মনের মজ্জায় মজ্জায় দেখতে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে ঘটনাসমূহের পরিণতি বিস্ময়কর বলে বোধ হয়। রামবাবুর উপস্থিতির রাত্রির পরিণতিও হতাশাব্যঞ্জক। শেষ মুহূর্তে সুরেশ সঙ্গী হতে অনুরোধের চেয়েও বিষয়টি বিস্ময় উদ্রেককারী।

এই উপন্যাসের সফলতার বহু সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, কাহিনীর ধার ছিল, ছিল রক্ত-মাংসের শরীরের স্বতোপ্রকাশ, মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনের আদর্শ পটভূমিকা ছিল, একটি বহুধা খণ্ডিত নারীর হৃদয় ছিল, চতুষ্পার্শ্বে সমাজের নিগূঢ় বন্ধন ছিল, ন্যায়-নীতির অসংখ্য বেড়াজাল ছিল, তবু 'ভরিল না চিত্ত'। কেন? সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে তার কারণ খুঁজতে হয়। মহিমের নিরাসক্তি, কেদারবাবুর অর্থলিপ্সু সঙ্কীর্ণমন, সুরেশের আবেগ ও দুর্মর প্রবৃত্তি, মৃণালের সর্বংসহা রূপ, অচলার সময়মতো সঠিক কাজ করার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা—উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে সত্য, নিশ্চিত পরিণতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় নি। সুরেশের প্রবৃত্তি তাকে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, স্থিতির নিশ্চিতি দেয় নি, অর্থের প্রাচুর্য ও প্রবল ভোগলিপ্সা তার কোমল প্রবৃত্তির মহত্ত্ব প্রকাশের প্রতিকূলে হয়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, কেন চরিত্রগুলি সাধারণ খাতে প্রবাহিত হয় নি, এই একজাতীয় জটিলতাই কী লেখকের অভীপ্সিত ছিল? নাহলে একের ব্যবহার ও আচরণে অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না কেন, নিষ্ক্রিয়, দুর্দম ও দোলাচল তিনটি মূল প্রবৃত্তির সংঘর্ষ উপন্যাসে আছে, কিন্তু তিনের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয় নি। অচলার মহিমের জন্য ভালোবাসা ছিল, ভালো কথা, সুরেশের প্রতি একধরনের আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল, তা-ও মানব-চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। তাতেও ক্ষতি ছিল না, দু' পুরুষের মধ্যে টানাপোড়েনে আর্থিক নিরাপত্তা অপেক্ষা ব্যক্তি নির্ভরতাকে সে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল, তা দিতেই পারে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজে ঘোর নিরাপত্তাহীনতা প্রচলিত রীতিনীতিতে পীড়িত অবস্থা মৃণাল সম্পর্কে অকারণ ঈর্ষার, সেই মানসিক উদ্ভ্রান্তির সময় মহিমের ব্যক্তি নিরপেক্ষতা এক বিচ্ছিন্ন মানসলোকে অচলাকে পাঠিয়ে দিল, তখনই সুরেশের আবির্ভাব, সুপ্ত বাসনা জাগত হল, বিচার-বিবেচনা

না করে মহিম থেকে সুরেশের দিকে সে আত্মসমর্পণের তাগিদ অনুভব করল, অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট হল সুরেশ, আরো পথ প্রশস্ত হল, গৃহদাহ হল। ফিরে এলো সুরেশের সঙ্গে কলকাতায়, কিছু সময়ের ব্যবধানে অসুস্থ মহিমকে নিয়ে সুরেশ এলে মোহভঙ্গ হল বলে মনে হল অচলার, মহিমকে সেবায় সনাতনী শরৎচন্দ্রীয় নারী জেগে উঠল, ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এলো মহিম, ডাক্তারের নির্দেশে পশ্চিমে হাওয়া বদলের জন্য অচলা উদ্যত, তখন একা মহিমে অচলার চলবে কেন? সুরেশকেও যাবার নিমন্ত্রণ জানালো, যে সুযোগ গৃহদাহ-কালে সুরেশ পায় নি, এখন তার সময় উপস্থিত, অসুস্থ বন্ধুকে ট্রেনের কামরায় রেখে নারীলুব্ধক সুরেশ অচলাকে নিয়ে এলো পশ্চিমের অন্য এক শহরে, সুরেশের আচরণে তাকে গালমন্দ করল অচলা, কিন্তু এল তারি সঙ্গে, অন্তরস্থিত বাসনার পূর্ণতার কথাটি বোধকরি তার মাথায় ছিল, কিন্তু কার্যকালে দৈহিক শুচিতা তাকে আকাঙ্ক্ষার বহুতর যোজন দূরে নিয়ে যায়। এর পেছনে সনাতন সতীত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাই মূল কারণ বলে অনুমিত হয়। বাসনা বা দাহ অচলার মধ্যে যত প্রবলই থাকুক না কেন, তার স্রষ্টার মনোজগতে শুচিগ্রস্ততার একটি বিশ্বাসবোধ অটুট ছিল, তা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে, যা স্বভাবজাত বাস্তব-বোধকে ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এই ক্ষেত্র থেকে লেখক সরে আসতে পারেন নি কথনোই, এক প্রাচীন নীতিবোধ এমন দৃঢ়ভাবে লেখকের মনোজগতে প্রোথিত, বহু বাস্তবদর্শন সত্ত্বেও তিনি সেখান থেকে একচুল সরে আসতে পারেন নি। বাস্তববোধের অর্থ নিশ্চয়ই পরিবেশগত বাস্তববাদের প্রয়োগ মাত্র নয়, বাস্তববাদিতা তখনই সাহিত্যে সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে যা বিশ্বাস্য, যা সঙ্গত ও স্বাভাবিক—সম্ভাব্যতার প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। উপন্যাসটি কিন্তু এরকম বহু সমস্যার বিনষ্টির মূলে, দেহ সম্পর্ক তো একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক, নিত্যদিন ওঠাবসার সূত্রে যে নৈকট্য তাতে তা বেমানান বলে বোধ হবার কোনো কারণ নেই। যাঁর ক্ষমতা ছিল বাঙালি-সমাজের অনেক অচলায়তনের গোঁড়ামি ভাঙার, উপন্যাসে তিনি দেহ বাতিকগ্রস্ততার শিকার হবেন, এ যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে, লেখক একে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন সুরেশের কিছু উৎকট নাটকীয় আচরণের সহায়তায়, তা শুধু বিসদৃশই ঠেকেছে। দুঃখের কারণ এই যে ভোগকাতর প্রাণচঞ্চল পুরুষ শরৎ সাহিত্যে বিশেষ নেই, সুরেশের মধ্যে অসংযমী আচরণ সত্ত্বেও তার দেখা মিলেছে, এর সদ্ব্যবহারে শরৎচন্দ্র আগ্রহী নন, হলে চরিত্রের সুষ্ঠু পরিণতি, এবং উপন্যাসের সম্পূর্ণতা দেখে প্রীত হবার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তব দর্শনের সঙ্গে নীতিবোধ-মুক্ততা আসক্তি-অনাসক্তির যুগ্মবেণী সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে অনাসক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন লেখক। তাই এতো সম্ভাবনা সৃষ্টির সুবিচারের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যায়।

সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে নীতিবোধ বিজড়িত হওয়ার সুবাদে চরিত্র সমূহের সহজভাবে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেছে, মহিমকে তার পশ্চাতমুখিতার

জন্যে এবং নিজসৃষ্ট একাকিত্বের জন্য নীতিবোধের কাছাকাছি পুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু কেদারবাবুর নীতির তো বালাই নেই, তবে একথা ঠিক তাঁর বিবাহিত কন্যা পরপুরুষের সঙ্গে স্বামীঘর ছেড়ে আসবে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সহজে তা মেনে নেওয়া স্বাভাবিক নয়, তাছাড়া সুরেশের অর্থটাকেই তিনি ভালোবাসেন, মানুষটিকে নয়। মহিম-অচলার গোল মূলত তিনিই পাকিয়েছেন, আর সুরেশ, নীতির বিপরীত মেরুতে তার বসবাস, অর্থ দিয়ে সে সব পেতে চায়, না পেলে অসহায় নারী বা পুরুষদের হীনবাক্যবাণে বিদ্ধ করতে তার বিবেকে বাধে না। বস্তুত বিবেকই তার বিদেশবিভুঁই। লাম্পট্য, বিবেকহীনতা সবই তার ব্যবহৃত হয়েছে অচলা নামক এক নারীর ওপর, নীতির সঙ্গে ঘর কন্না তার সাজে না, নারীর শরীরে সংযমের বর্ম আছে, তাতে সুরেশ প্রতিহত হয়েছে অহর্নিশ, তবু দুর্মর প্রবৃত্তি তো মরে না। সুযোগ তার ছিল কিন্তু তার তৃপ্তি-সাধনে সফলকাম হয় নি কেবলমাত্র অচলার সম্মতিহীনতার জন্যে নয়—কেননা প্রথম পরিচয়ের কালে অচলাকে কাছে আকর্ষণের জন্যই যদি সে সম্মতির অপেক্ষা না করে থাকে, তবে দীর্ঘ পরিচয়ের, সান্নিধ্যের পর তার সম্মতির প্রশ্ন ওঠে না। কাহিনীর প্রথম দিকে সুরেশের অসংযমী চরিত্রের পরিচয় দানটুকুর জন্যে লেখক ঘটনাটির অবতারণা করেছেন, তারপর গরম, অবেলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্নানাহার না করাকে কারণ বলে বর্ণিত করে তাকে লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। ধোপে অবশ্য কোনোটিই টেঁকে নি। তবু লেখকের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কাহিনীর সমাপ্তির দিকে অচলাকে সতীত্বের আবরণে ঢেকে রাখবার সকল প্রয়োগ কৌশলে তৎপর হয়েছেন লেখক। তা যে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার তাতে সন্দেহ থাকে না। তার ফলে সমস্ত এ জাতীয় ঘটনা বড়ো কৃত্রিম, বড়ো সাজানো বলে প্রতিভাত হয়। দুঃখ হয় এইজন্য যে 'গৃহদাহ' শুধু শরৎ-সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও তাৎপর্যময় উপন্যাস, নীতির আবরণ খুলে, বাস্তবের পক্ষে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ঘটনায় উপন্যাসটিকে আবৃত করলে, বাংলা উপন্যাস ও শরৎচন্দ্র উভয় সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠে বন্দনাগান করা সম্ভব হত, নীতিবোধের কাছে শিল্পীর আত্মসমর্পণ সে সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিলো।

উপসংহার

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে 'গৃহদাহ'-র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণভাবে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে একটি পরিচিত বিষয়। এই দুয়ের সংঘাত শিল্পীস্বভাবকে নানাভাবে আক্রমণ করেছে, প্রথম উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ করা শেষ উপন্যাস পর্যন্ত এর হাত থেকে তিনি মুক্তি পান নি। অথচ বাস্তববাদী বলে তাঁর খ্যাতি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান। যে তৃপ্তি বাঙালি পাঠককুলের বঙ্কিমচন্দ্রে মেলেনি, রবীন্দ্রনাথেও না সেই ঘরের কথা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনবোধের কথা, নিত্য দিনের গ্লানিলাগা সত্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। সমাজের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় যে মানুষেরা, যেখানে পূর্বের কোনো লেখকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে নি, শরৎচন্দ্র শুধু তাদের দেখেন নি, তাদের সমস্যার উৎসমুখ খুলে দিয়েছেন। সমস্যাগুলি পল্লীসমাজের। পল্লীরই সংখ্যাধিক্য ভারতবর্ষে, তাই পল্লীসমাজের সমস্যা তুলে ধরলে দেশের অধিকাংশ মানুষের সমস্যার কথা বলা হয়ে যায়। তবে মানব জীবনের বহু মৌল-সমস্যা আছে, যা স্থান-কাল নিরপেক্ষ, লেখকের দৃষ্টি সেখানে পড়তে বাধ্য। শরৎচন্দ্র এই দুই দিকের ব্যাখ্যায় আগ্রহী ছিলেন, নিছক বাসভূমির তখনকার সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সমস্যা এবং মানব মনের চিরকালীন সমস্যা—কোনোটিই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। যদি পল্লী সমাজের কথাই ধরা যায়, তাহলে প্রায় সকল প্রকারের সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে তাঁকে দেখা যায়, ছোট বড় কোনোটির প্রতিই তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। প্রত্যেক উপন্যাসেই নানান রূপের সমস্যা ব্যাখ্যায় তাঁকে তৎপর দেখা যায়। সমস্তই যেন তাঁর নখদর্পণে। শহুরে জীবনে যা চিৎপ্রকর্ষহীন বলে মনে হয়, গ্রাম্য-সমাজে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। গ্রামীণ মানুষ শরৎচন্দ্রের সেকথা জানা ছিল। লক্ষ্য করা যায় যে যাযাবর শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ কাহিনী গড়ে উঠেছে হুগলী সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে, তবে সমগ্র বঙ্গদেশের গ্রামীণ মানুষের সমস্যা সেখানে বিরাজিত। সুখের কথা এই যে, এখানেই লেখক নিজেকে সীমায়িত করে রাখেন নি। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে মানব মনের সমস্যাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্যা কোনো ভগ্নাংশের নয়, কোনো কালের একান্ত কথকতা নয়, তার প্রয়োজন অনুভব করেছেন তিনি, অকপটে অক্লেশে তাকে ব্যক্তও করেছেন। তাঁর মুন্সীয়ানা এখানেই। যে সমস্য 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সমস্যা তা থেকে পৃথক; 'চরিত্রহীনে'র সমস্যাও তা নয়, 'শেষপ্রশ্নে' যে প্রশ্নটি থমকে আছে, 'দত্তা'য় তা প্রাসঙ্গিক নয়, 'দেনা-পাওনা'র মধ্যবর্তী ভাবনার সঙ্গে 'গৃহদাহে'র জটিলতার কোনো সম্পর্ক নেই। এভাবে অসংখ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করলে তিনি পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত জটের পাশে মনস্তাত্ত্বিক বহু জটিলতর রূপকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। মনস্তত্ত্বেরও শ্রেণী বিভাগ করা যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' থেকে শেষ সমাপ্ত উপন্যাস 'বিপ্রদাস' পর্যন্ত জীবন পথের

উচ্চাবচ নানান তরঙ্গ ভঙ্গের চিত্র আমাদের স্তম্ভিত করে, কত রূপেই না মানব মন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাকে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে উপন্যাসগুলি শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তার মধ্যে 'চরিত্রহীন' এবং 'গৃহদাহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'কল্লোল' ও কল্লোলোত্তর উপন্যাসকারদের দিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল এই দুটি উপন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সামগ্রিকভাবে শরৎচন্দ্রকে পরবর্তীকালের উপন্যাসকারদের গতিনিয়ামকের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছেন, তা না দেখিয়ে যে মুষ্টিমেয় যুগান্তকারী এবং আধুনিক রীতি প্রকরণসমন্বিত বিষয়বস্তুর উদ্ভাবক ঔপন্যাসিকদের নাম করা যায় শরৎচন্দ্রকে পরবর্তীকালের সেইসমস্ত লেখকদের নিয়ামকরূপে চিহ্নিত করলে বোধ হয় যথার্থ বিচার হত। 'চরিত্রহীন' বাংলা উপন্যাসে শুধু আগন্তুক নয়, দলছুটও বটে। তবে তার থেকে উত্তরসূরীরা তাদের সাহিত্যের পাথেয় পেয়েছেন, শরৎ চন্দ্রের আবেগসর্বস্বতার পাশে 'বুদ্ধির সন্দীপ্তি'র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উক্তি করেন, 'চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধ হয় আট দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে'। 'কল্লোল' সমসাময়িক লেখক, পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ ত্রয়ীর অন্যতম, যথার্থ অর্থে বাংলা সাহিত্যের বস্তুবাদী লেখক এখান থেকে প্রেরণা পান যদি, গোড়ামি চূর্ণের বিশ্বাস স্থাপন করেন, তবে সে রচনাকে যথোচিত মর্যাদা দিতেই হয়। সংস্কার চূর্ণ-করা উপন্যাসের পাশাপাশি মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্বের উপন্যাস 'গৃহদাহ'কেও উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়। গুণযুক্ত উপন্যাসের যা প্রাপ্য তার অনেকানেক প্রবণতা 'গৃহদাহে' বর্তমান। নারী মনস্তত্ত্ব, নারীমনের প্রেম-বাসনা, গৃহ-বাসনা, তার ত্যাগ-তিতিক্ষা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু জট-বিস্তৃত মনোলোকের গভীরতা সর্বত্র বর্তমান নয়, তদুপরি এ-উপন্যাসের সমস্যা তথাকথিত শরৎচন্দ্রীয় নারীর সমস্যা নয়, অচলা শরৎচন্দ্রীয় নারীর গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। শুধু বিবাহিত রমণীর অন্যপুরুষে আসক্তি নয়, অন্য পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন চলবার বাসনা, দু'পুরুষে আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণতা তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। যে ইচ্ছা কোনো কোনো নারীর জীবনে সত্য, অথচ প্রকাশের সুযোগ বা সাহস নেই, সেই সুযোগ ও সাহস দুই-ই তৈরি করে নিয়েছে একজন নারী তার একক সামর্থ্যে। এ জাতীয় চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই ব্যতিক্রমী চরিত্র নিজের কাছেই অনেক সময় প্রহেলিকায় পরিণত হয়েছে। নিজের রহস্যে নিজেই চমকিত, কখনো বিস্মিত, তার ইচ্ছা বা অনুরাগ তার নিজের বোধ ও শক্তির অতীত, অন্য চরিত্রের পক্ষে বোঝা তো অসাধ্য। একে অনন্য বলেই অভিহিত করতে হয়, সেই চরিত্রের বিশিষ্টতা উল্লেখযোগ্য শরৎ-সাহিত্যে।

শুধু চরিত্র সৃষ্টি নয়, সমগ্র উপন্যাসটিই অভিনব। এর কাহিনী, মূল মনস্তত্ত্ব, নারী-স্বভাব, ঘটনার পরিবেশ, একের পর এক আছড়ে পড়া ঘটনার প্রবাহ সচকিত করে দেওয়ার বিষয়টি আগন্তুক। জোড় মেলানো যায় না একেও। নাটকীয়তা বা

আকস্মিকতার এতো চলে ফেরাও দেখা যায় নি ইতোপূর্বে। আকস্মিকতার ফলে উপন্যাসটি নাটকীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে। এর পরতে পরতে অপেক্ষা করে আছে বিস্ময়। তার ফলে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কী পূর্ব মুহূর্তে আঁচ করা যায় না পরমুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে। ব্যক্তি বা পরিবেশের প্রভাবে কেন্দ্রীভূত বিষয় নোতুন বাঁক নিয়েছে। স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো সমস্ত পরিবেশ, ফলত চরিত্রসমূহ পাক খেতে শুরু করে ঘটনার, পরিবেশের অভিঘাতে। খুব সূক্ষ্ম ও বিবেচনাপ্রসূত ছকের মাধ্যমে ঔপন্যাসিককে সৃজনকর্মে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর মেলবন্ধন ঘটেছে অদৃশ্য সুতোর টানে, ঘটনার আকস্মিকতার সঙ্গে পরস্পর সংযোজিত হয়েছে অনিবার্যভাবেই। এটিকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে ধরে নিতে হয় শরৎ-উপন্যাসের প্রেক্ষিতে।

বক্তব্য-বিষয় ও তার উপস্থাপনায় 'গৃহদাহ' আপন গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে, বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষে আসক্তি খুব পুরনো বিষয় সন্দেহ নেই। ইতোপূর্বে বাংলা উপন্যাসে তার দেখা পাওয়া গেছে। আবার, বন্ধুপত্নীকে ঘিরে ত্রিকোণ তা-ও কোনো অভিনব বিষয় নয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের চোখের সামনেই ছিল, ধীর ও দুর্দম প্রবৃত্তির দুই পুরুষও রবীন্দ্র দৃষ্টান্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বাক্-ব্যবহারে উভয়ের চরিত্রকে যেভাবে নগ্ন করে দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, তা সংযমের রাশে বাঁধা রবীন্দ্র-উপন্যাসে অনুপস্থিত। ভাবাবেশ প্রেমিকের যতই প্রবল হোক, এক অর্থ লোলুপতা ভিন্ন সাধারণ স্তরে তাকে চলে যেতে দেখা যায় নি। সন্দীপের সঙ্গে সুরেশের পার্থক্য এখানেই। বলা যেতে পারে দুই ঔপন্যাসিক-সত্তার পার্থক্যের ফলে তা ঘটেছে। বাংলা উপন্যাসের লালিত আবেগকে মস্তিষ্কের নৈকট্যে আনবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই আবেগসম্ভূত, 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও আবেগের বাহুল্য বর্তমান, তথাপি যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগে উপন্যাসটি আবেগ-মস্তিষ্কের সমন্বয়ে নোতুন ধরনের সংযোজন সন্দেহ নেই। এর দ্বিতীয় উদাহরণ শরৎ-উপন্যাসে নেই; মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো একাকী আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। উপন্যাসটির পরিণতি বিষয়ে যতই মতানৈক্য থাকুক, সমগ্র উপন্যাসের কায়াগঠনে দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচয় যে লেখক দিয়েছেন, তা সন্দেহের অতীত। 'গৃহদাহ' বিষয়টি ঘটনাসূত্রে এসেও প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত, লক্ষণীয় সেটাই। 'গৃহদাহে' বাস্তব পটভূমিকা থেকে অসুস্থতা আবার সমন্বিত গৃহের আস্বাদ দেয়, মহিমের মতো আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্বও অচলার কাছে জানাতে দ্বিধা করে না, ঘর আবার হবে, সে-ও সুস্থ হয়ে উঠবে, অসুখ তাকে নোতুন করে অচলাকে উপহার দিয়েছে, সুস্থতার জন্যে তারা পশ্চিমে যেত, মহিম সুস্থ হলে তারা ফিরেও আসত, শুভ-শেষ উপন্যাস ভিন্ন অন্য পরিণতি কাম্য ছিল না। কিন্তু অচলাকে শরৎচন্দ্র অন্য ধাতুতে গড়েছিলেন। সে সহজ-সরল উপন্যাসের ছক পাল্‌টে দিলে একটুমাত্র হৃদয়ধর্মের বেসাতি করে, সুরেশকে সে সুস্থ দেখছে না—এই কথাটুকু বলে। সমস্ত কাহিনী তথা উপন্যাস পরিবর্তিত হয়ে গেল, জব্বলপুরে যাত্রা ডিহরীতে এসে পৌঁছল, অসুস্থ মহিম রইলো সেবার বাইরে চলন্ত গাড়িতে, বেপথুগামী দুই নর-নারী,

উদ্ভ্রান্তি বিচিত্র পথগামী করে তুলল তাদের, ছিন্ন হল গৃহডোর, পুষ্পিত বক্ষে ঝড় বয়ে গেল, সুরেশ ভেবেছিল শরীর টানলে মন কাছে আসে, ঐশ্বর্যবিলাসে ভরপুর রাখলে ইচ্ছার পূর্ণতার অন্য আধারের দরকার হয় না, মূঢ়ের ভাবনা হতে পারে, কিন্তু তার বিনিময়ে উপন্যাসে যে জটিলতা ও বিচিত্রতা এসেছে তা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আশা অভাবনীয়। কিন্তু তা এসেছে, এবং এর প্রবর্তক শরৎচন্দ্র স্বয়ং, যত বিস্ময়কর হোক, সত্যতা অস্বীকারের উপায় নেই। ট্র্যাজিক যন্ত্রণার মর্মদাহ নিছক ভাবাবেগের শিকার হয়ে পড়েছিল এতকাল ধরে, 'দেবদাসে'র মতো অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস, মস্তিষ্ককে বিসর্জন দেওয়া হৃদয় ধর্মের দাসত্ব অভিজ্ঞতাদৃপ্ত, মানবিকতায় ঋদ্ধ লেখককে উন্নীত করতে সমর্থ হয় নি, সেই তুচ্ছতার পথ পেরিয়ে সূক্ষ্মতার রাজ্যে উপনীত হয়েছেন শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ'-এ, এর জন্য লেখক ও উপন্যাস উভয়ের কাছেই ঋণ থেকে যায়।

নর-নারীর জীবন ও তাদের আচরণের একটি সাধারণ ধারণা শরৎচন্দ্র চিরকাল বহন করে এসেছেন। তা সনাতন হিন্দুত্বের ছায়ায় আশ্রিত। পুরুষের উদাস্য, নারীর গৃহভাবনা, কেন্দ্রাভিগ পুরুষকে কেন্দ্রাতিগ করবার চেষ্টাতেই নারীরা সমগ্রজীবন কাটিয়ে দিয়েছে তাঁর উপন্যাসে, গৃহবাসনা তাদের প্রবল, এর জন্যে, পুরুষকে ভালোবাসার নিগড়ে বেঁধে রাখবার জন্যে প্রাণান্তিকর শ্রমের প্রয়াসী তারা নিজেদের কখনো পুরুষের সমান বলে ভাবতে পারে নি, পুরুষের দাক্ষিণ্যের জন্যে প্রাণপণ করেছে, নিজেদের পরিবারের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব বলে মনে করেছে। কিরণময়ীর-ও প্রেমের কাঙালপনা ছিল, উপেনের ভালোবাসাই তার একমাত্র প্রার্থিত, তা না পেয়ে তার প্রিয়জনকে নিয়ে পুতুলখেলায় মেতে আর কারো নয়, নিজের সর্বনাশের পথ তৈরি করেছে, প্রতিশোধের বাসনার অন্তরালে এবং জীবনের সুস্থতার কালটুকু পর্যন্ত সেই ভালোবাসার ভিক্ষুকের দশা তার ঘুচল না। অচলার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, কীভাবে মহিমের প্রতি ভালোবাসা তার জন্মেছিল সে সংবাদ উপন্যাসের পাতা থেকে পাওয়া যায় না, সুরেশের ব্যাধের জালে সে আটকা পড়েছে, কিন্তু তার আকর্ষণ শারীরী, মানসিক নয়, অথচ সে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারী, পরপুরুষের স্পর্শের কাতরতা যতই থাকুক, তার আলিঙ্গনের শেষ কিন্তু বিছার কামড়ের মতো জ্বলুনি। কিরণময়ী ঈশ্বর, ধর্ম না মেনে শরীর মানার কথা বলেছে, কিন্তু সমধর্মী শরীর তার আয়ত্তাধীন ছিল না, তাই বোধহয় তার তৃপ্তি সাধন ঘটেনি। পুরস্কার প্রাপ্য শরৎচন্দ্রের এখানে যে তিনি অচলার আকাঙ্ক্ষার কথা অকপটে বলতে পেরেছেন, নিশ্চিত নীড়ের সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে উত্তেজনা-উদ্দীপক অসংযমী প্রেমের দিকে ধাবিত হয়েছে। জীবনভোর দুই পুরুষের মধ্যে তার চলাফেরা তাকে স্থিতি দেয় নি, স্থিতি হয়তো একান্তভাবে তার কাম্যও ছিল না। নইলে একের আশ্রয়ে অপরের জন্যে কেমন-করা মন শেষ পর্যন্ত সে জিইয়ে রেখেছে কি করে। জীবানন্দের ফাঁকা বুলির পাশে সুরেশ সংযমকে সত্যিই দূরে সরিয়ে দিয়েছে, অচলাও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এই বিষয়টি উপন্যাসটিকে পৃথক ভার দেয়, তার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এর মধ্যদিয়ে, এ-উপন্যাসের জাত যে আলাদা তা স্পষ্ট করে চিনিয়ে দেয় বলে সমস্ত শরৎ-সাহিত্যের ধারায় আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকে 'গৃহদাহ'।

পরিশিষ্ট

ক. হিন্দু বিবাহ সংস্কার ও গৃহদাহ

শরৎচন্দ্র মুখ্যত যুগসন্ধির ভাবসংকটের শিল্পী। একদিকে পুরনো, রক্ষণশীল সনাতন সামাজিক আদর্শ তার ভালোমন্দ সবকিছু নিয়ে মনে এক নিগূঢ় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে নবজাগ্রত ব্যক্তিচেতনা, মানবিক স্বাতন্ত্র্য বোধ—যা আধুনিক যুগ-জীবনের মুখ্য লক্ষণ, তা-ও শরৎচন্দ্রের কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন থাকে নি। কিন্তু এই দ্বৈত প্রবণতা, শিল্পীমনের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তায় এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিবারের এত-দিনের প্রচলিত কাঠামোর মূল্যবোধ আধুনিক যুগের স্বাতন্ত্র্য-ধর্মের সংঘাতে বদলাতে শুরু করেছে—এর ছবি শরৎ সাহিত্যে বিরল নয়। বাঙালী হিন্দু সমাজের সনাতন প্রথাগুলি এতকাল যতই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হোক না কেন, আজকের পরিবর্তিত যুগের পটভূমিতে তাদের গুরুত্ব ও দৃঢ় বন্ধন শিথিল হয়েছে, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, শরৎচন্দ্র সৃষ্ট নারীচরিত্রে এবং তাদের প্রেমবোধে।

শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে তিনি সমাজের মাপকাঠিতে অলঙ্ঘ্যতা বা অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। নারীর বন্ধন-মুক্তি বা তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও তাঁর কাছে, হিন্দুর পুনর্বিবাহ ও স্বামী সংস্কারের প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। এমন কি 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধেও তিনি নারীকে কন্যা, স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী ইত্যাদি পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করেই ভাবেন, তার পুরুষ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিস্বরূপ নিয়ে ভাবেন না। যে প্রেম **'woman's whole existence'**, সেই প্রেমের গভীরতা ঐকান্তিকতা বা একনিষ্ঠতার মূল্যেই নারীর প্রকৃত সতীত্ব। সতীত্বের এই যে নিহিত তাৎপর্য শরৎচন্দ্র সেটিকেই গ্রহণ করেছেন। নারীত্বের পুরোনো মূল্যবোধ সম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলো নীট্‌শের ভাষায় "**Transvaluation of values**—দরের হেরফের,···যাহা অনাহূত ছিলো, তাহা গৌরবের আসন পাইয়াছে।"

হিন্দু সমাজের প্রচলিত বক্তব্য হলো এই যে সে সমাজজীবনে বিবাহ শৃঙ্খল রক্ষায় সহায়তা করবে। বিবাহ এক অর্থে নরনারীর সমাজ অনুমোদিত মিলন। এই বিবাহ প্রথায় প্রায়শই নারীর ভূমিকা গৌণ। দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সমাজমনস্কতা মোটামুটি গৃহীত হয়েছিলো বার্নাডশ'র রচনাদি পড়ে। তিনি এক-সময় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "নারীর স্বামী পরমপূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।" **'Marriage and Morals'** গ্রন্থে রাসেল বলেছিলেন—"**Thus the primary function of wife comes to be that of a lucrative domestic animals.**" এখানে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে বিবাহপ্রথা ও

দাম্পত্য সমস্যার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক সমস্যাটি মেলে কিনা তা জানা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্য কিছু উপন্যাস থেকে তাঁর হিন্দু বিবাহ সংস্কারের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচ্য। মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা অনুষ্ঠান নির্ভর, প্রচলিত বৈবাহিক সংস্কারের মধ্যে নারীর-ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবকাশ আছে কি নেই, একনিষ্ঠতা অথবা নিষ্ঠার অভাব সেই সম্পর্কে কি আবর্তের সৃষ্টি করে—এসব সমস্যার অবতারণা শরৎ সাহিত্যে নতুন নয়। 'পথের দাবী'তে সুমিত্রা অপূর্বকে বলেছিলো—"আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করেছিলেন, কিন্তু এই দেশে যে বিবাহের ব্যবস্থা (পুত্র কামনায় ভার্যা গ্রহণ), সে দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটোই হয়।...আপনি কি সত্যিই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে কোনো বাঙালী মেয়ে যে কোনো বাঙালী পুরুষকে ভালোবাসতে পারে?" 'শেষ প্রশ্ন'-এ কমল বলেছে—"একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" "সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা—আর বেশি কিছু নয়।"

কিন্তু পাশ্চাত্যের নারীগণ প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কে, বিশেষতঃ প্রেমিক নির্বাচনের সময়, যে স্বাধীনতা ভোগ করে—তার প্রেক্ষিতে এবং সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেয়সের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে নরনারীর প্রেম সম্পর্ক কতটা সার্বভৌম? একি পরম অর্থে অন্য নিরপেক্ষ? সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে? শরৎচন্দ্র আপন মনে এর উত্তর খুঁজেছেন এবং পেয়েছেনও—তাঁর সাহিত্যে এর প্রমাণ অপর্যাপ্ত। আমাদের আলোচ্য 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মৃণাল বলে—"স্বামী জিনিসটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য।"

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা মহিমের স্ত্রী। কিন্তু সুরেশের প্রতিও তার এক উদ্দাম আকর্ষণ রয়েছে। মহিম এবং সুরেশ এই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে দোলায়মান অচলার মন। এক দুর্যোগের রাত্রে সে সুরেশের কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তার শয্যাসঙ্গী হয়েছে—কিন্তু এত বিপর্যয়ের পরেও স্বামী মহিমের স্থানটি অচলার হৃদয়ে অবিনশ্বর ছিলো।

আজন্ম যে নাগরিক সমাজ সংস্কারের মধ্যে অচলা বড় হয়ে উঠেছে, তাতে বিলাসের প্রতি তার অনুরাগ ছিলো প্রবল। ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি কোনোটিরই বাধা ছিলো না। মহিমকে বিবাহ করার পর অচলা তার বিবাহিত জীবনের খুব সামান্যকটি দিনই মহিমের সংগে কাটিয়েছিলো। এবং সে দিনগুলি যে খুব প্রেমময় ছিলো উপন্যাসে তার কোনো আভাস নেই। গ্রাম সম্বন্ধে অচলার যে ধারণা ছিলো, সত্যিকারের গ্রামের চেহারা দেখে তার স্বপ্ন ভঙ্গই হয়েছে। এ ভাবে অচলার মন যখন একান্তই বিপর্যস্ত তখন ত্রাতার ভূমিকায় সেখানে উপস্থিত হয়েছে সুরেশ। এবং বিবাহিত জীবনের প্রায় বাকী

অংশটুকুতে অচলা এবং সুরেশ একত্রেই বসবাস করেছিলো। সুরেশকে বিবাহ করার অচলার কোনো বাধাই ছিলো না। বিয়ের মন্ত্রের মধ্যেই যে একজনের জীবন শেষ হয়ে যায় না—এই বিশ্বাস অচলা পোষণ করতো। স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণা যে ব্রাহ্ম সমাজের বৈশিষ্ট্য তাতে অচলা সুরেশকে নিয়ে পরবর্তীকালে হয়তো সুখী হতে পারতো—অচলা যে একথা একবারও ভাবে নি তা' বলা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্ম হয়েও অচলার মধ্যে এ ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কারটাই বড় হয়ে উঠেছিলো। মহিম যে তার স্বামী এ কথা অচলা ভুলতে পারে নি। স্বামী বর্তমানে সুরেশের সঙ্গে পালিয়ে এসে একত্রে বসবাস করাও সমাজ বিগর্হিত—কিন্তু অচলা সে সংস্কারটুকুও অতিক্রম করতে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে সে এ-ও অনুভব করেছে—"পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। শুধুমাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, ঐ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার জায়গা পাইবে সে কোথায়?" সামাজিক এই বিচারবোধ তথা হিন্দু বিবাহ সংস্কার অচলার মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিলো। অচলার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সংস্কার ভাঙার শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে পুনর্বিবাহ করতে পারলো না। শরৎচন্দ্র এখানেই হিন্দুনারীর মতো অচলাকে দিয়ে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে স্বীকার করিয়ে নিলেন।

'গৃহদাহে'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের হিন্দুত্বের সংস্কারই প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস দুটি আপাতদৃষ্টিতে দুই বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা। উভয় উপন্যাসের সাদৃশ্য এই যে, স্বামীরা নিজ নিজ পত্নীর প্রতি বিশেষ মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। তবে বিমলার প্রতি নিখিলেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করেছে নারীজাতির প্রতি তার এক ধরনের সামাজিক আদর্শবাদ। কিন্তু মহিমের অচলার প্রতি মনোভাবে এক দুর্জ্ঞেয় সহিষ্ণুতা ও নির্বিকারত্ব ছাড়া ভিন্ন কারণ দুর্লক্ষ্য। প্রাক বিবাহিত জীবন থেকেই মহিম ও অচলার প্রণয় সম্পর্ক স্পষ্ট। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশের সঙ্গে অচলার নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা সে স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ গ্রহণ করেছে। এর মূলে ব্রাহ্মিকা অচলাকে স্বাধীনতা দেবার প্রশ্ন ছিলো না। শরৎচন্দ্র কোথাও মহিমকে কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিভূ করে তোলেন নি যাতে অচলার প্রতি তার সহিষ্ণুতার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মহিমের অচলাকে ঘিরে এ পরীক্ষায় কোন আদর্শগত ভিত্তি নেই। ওটা তার স্বসৃষ্ট সমস্যা। এবং এর মূলে প্রথমে বাগদত্তা, পরে স্ত্রী এবং বন্ধুর প্রতি গভীর আস্থা ছাড়া আর কোনো বৃহত্তর প্রেরণা ছিলো না। অন্ততঃ লেখক এই বৃহদায়তন কাহিনীতে মহিমের কোন আর্থিক সংকট কিংবা আদর্শের উল্লেখ করেন নি। মহিমকে সমালোচকদের বহু কথিত আত্মভোলা, নির্বিকার, সর্বংসহ পুরুষ

ছাড়া ভিন্ন কোনো পরিচয়ে চিহ্নিত করা কঠিন। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক মহিম কি অচলার প্রেমের নিষ্ঠা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলো? সুরেশের দুর্বার আকর্ষণে অচলার সতীত্ব অকলঙ্কিত থাকে কিনা—সে কি এই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলো। পত্নী তথা প্রেমিকা সম্বন্ধে পুরুষের এই মনোভাব যুক্তিসহ সমস্যা বা পরীক্ষার অবতারণা করতে পারে না। যদি এটাই মহিমের পরীক্ষা হয় তবে সে তাতে বিফল হয়েছিলো। অচলা মহিমকে ভালোবেসেও সুরেশকে আত্মদান করে অনুতপ্ত। অচলার এই ফিরে আসা মহিমের পরীক্ষার জয় ঘোষণা করে না।

বিবাহের পর ব্রাহ্ম অচলার গ্রামের কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তবু সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা মহিমের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। বস্তুতঃ অচলাকে ব্রাহ্ম বললেও শরৎচন্দ্র অচলার জীবনে হিন্দু সংস্কারের কোনো অভাব দেখান নি। বরং ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য স্বাধীনতার নামে তার যে চিত্ত চাঞ্চল্য ছিলো তা যেন অস্বাভাবিক। বিপরীত চরিত্র হিন্দুনারী মৃণালকে আদর্শ করে চিত্রিত করে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মৃণালের হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠা দেখে কেদারবাবু বলেছেন—"আজও তো ঠাকুর দেবতা, মন্ত্রে তন্ত্রে কানাকড়ির বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু তবু যখন মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পাশুটে রঙের মটকার কাপড় খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আমার পৈতে নিয়ে অমনি করে কোশাকুশি নিয়ে বসে যাই।" শরৎচন্দ্র তাঁর বহু উপন্যাসে হিন্দু-বিবাহ সংস্কার, সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন—কিন্তু ব্রাহ্ম সংস্কারকে ছাড়তে পারেন নি। তবে রামবাবুর আচার সর্বস্বতাকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। তবু গৃহদাহ উপন্যাসে হিন্দুবিবাহ সংস্কার শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলতায় আত্মসমর্পণ করেছে।

শরৎচন্দ্র আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপন্থী আদৌ ছিলেন না, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিকৃতি উদ্ঘাটনে তিনি কোনোদিনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্লীন আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিলো—এ সবই সত্য, কিন্তু এ-ও বিশেষভাবে সত্য যে, তিনি "বাঙালী জীবন-বোধের শাশ্বত মূল্যের কোনো রূপান্তর করিতে চাহেন নাই।"

এখানেই তিনি যুগসন্ধির, যুগ সংকটের শিল্পী এখানে তাঁর শিল্পীসত্তার নিগূঢ় সঙ্কট। কারণ এখানেই তাঁর চিন্তাধারার স্ববিরোধের উৎস। এই সংকট তাঁর শিল্পীসত্তার অমোঘ অনিবার্য সঙ্কট। কারণ শরৎচন্দ্র মুখ্যত নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা বহুল পরিমাণে স্ববিরোধে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীলতার বিপরীত আকর্ষণ-বিকর্ষণে এই সম্প্রদায়ের চিত্ত আন্দোলিত। বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের সম-কালে এই শ্রেণীর জীবনে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে সংকট ও অস্থিরতা তীব্রতর হয়। তার ফলেই এই সম্প্রদায়ের এবং এর অন্যতম মুখ্য প্রতিভু শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এই দ্বিধা।

খ. প্রসঙ্গ গৃহদাহ : আনা কারেনিনা ও অন্যান্য

শরৎচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন বিদেশী সাহিত্য তাঁর বিশেষ পড়া নেই, তবে একসময় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে পত্র লিখেছিলেন, '…গত দশ বৎসর Physiology, Biology, Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি'। এই সঙ্গে স্মর্তব্য শরৎচন্দ্রের উক্তিটিতে না থাকলেও তাঁর রচনা, বিশেষত তাঁর জটিল মনস্তত্ত্বের উপন্যাসগুলিতে শ্রেষ্ঠ বিদেশী রচনাকারদের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বিশেষত 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রসঙ্গে টলস্টয়, বানার্ড শ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের প্রভাবের প্রশ্ন এসে যায়। ড. সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'গৃহদাহ'-এ অচলার মহিম ও সুরেশকে কেন্দ্র করে সংশয়ের বৃত্তে বার্নাড শ'র নাটকের কথা মনে পড়েছে, শ'এর নাটকের জনৈক নারীর প্রশ্নটি তিনি উল্লেখ করেছেন, **'Oh how silly the law is ! Why can't I marry them both…well, I love them both'**। তেমনি টলস্টয়ের আনা কারেনিনায় আনার জীবনের সংকট প্রসঙ্গে অনেকেরই 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার মানসিক জটিলতার কথা মনে পড়ে। সেরগেই সেরিব্রিয়ানির 'গৃহদাহ' : 'আনা কারেনিনার ছায়া' স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের ওপর টলস্টয়ের প্রভাবটি স্পষ্টরেখায় চিত্রিত। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে টলস্টয়ের যোগাযোগের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন।

লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) ভারতে একটি সুপরিচিত নাম। তলস্তয়-এর সঙ্গে এম কে গান্ধীর পত্র-সম্পর্ক এবং মহাত্মা কর্তৃক তাঁকে অন্যতম গুরু বলে সম্বোধনের ফলে অনেকের কাছে তিনি স্মরণীয় এবং শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন। ওই লেখকের দীর্ঘ জীবনের শেষ দুটি দশকে যে ক'জন ভারতীয়দের সঙ্গে পত্র-বিনিময় হয় তাঁদের মধ্যে গান্ধীজী-ই শেষ ব্যক্তি।

প্রথম যে ভারতীয় তলস্তয়-এর কাছে পত্র দেন তিনি সম্ভবত এক প্রবাসী বাঙালি। নাম অনেন্দ্রকুমার দত্ত। তিনি আঠারো-শ' ছিয়ানব্বই সালে ইউ এস এ থেকে বিবেকানন্দর বক্তৃতামালা (রাজযোগ) বইখানি তলস্তয়-এর কাছে পাঠান। তাতে এই রুশ লেখককে একজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ্ 'যাঁর ভাবনাসমূহ ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস' বলে উল্লেখ করেন। তলস্তয়-এর সঙ্গে পত্রালাপচারী ভারতীয়দের মধ্যে অন্তত আরও দুজন বাঙালির সন্ধান পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবদুল্লা আল মামুন সুরাবার্দি। এই তিন বাঙালির পত্রের উত্তরে অন্তত একটি করে পত্রোত্তর দিয়েছিলেন তলস্তয়। দুর্ভাগ্যবশত, এম কে গান্ধীর পত্রালাপ ছাড়া অন্যান্য ভারতীয়ের কাছে লেখা চিঠিপত্র এখন পর্যন্ত পুরো প্রকাশিত হয়নি।

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, গান্ধীজীকে সরাসরি তলস্তয়-এর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র রচনা যিনি করে দেন, তিনিও একজন প্রবাসী বাঙালি। উনিশ 'শ আট সালে তারকনাথ দাস (১৮৮৪-১৯৫৮) মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তলস্তয়-এর কাছে 'ফ্রি হিন্দুস্তান' ম্যাগাজিনের দুটি সংখ্যা পাঠান এবং সেই সূত্রে একাধিক পত্রও তাঁকে লেখেন। উনিশ-শ' আটের শেষের দিকে তলস্তয় সে চিঠির যে দীর্ঘ

উত্তর দেন তা ছিল প্রবন্ধ আকারে। এটি '‘লেটার টু এ হিন্দু’ নামে পরিচিত। তারকনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত এই ‘চিঠি’ পাঠ করার পরেই গান্ধীজী উনিশ-শ নয় সালে প্রথম লণ্ডন থেকে তলস্তয়কে পত্র দেন।

তলস্তয়-এর সঙ্গে ভারতীয়দের এই সরাসরি যোগাযোগটি লেখকের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে ঘটে যখন তিনি ধর্মীয় চিন্তানায়ক, নব্যবস্তুবাদী এবং অহিংসার প্রবক্তা হিসাবে বিশ্বখ্যাত। এবং সেই কারণেই ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে থাকত ধর্মীয়, দার্শনিক এবং নৈতিক বিষয়বস্তু। সাহিত্য বিষয়ে খুব কম কথাই সেই সব চিঠিতে থাকত।

কিন্তু স্বদেশবাসীর কাছে এবং অবশিষ্ট ইয়োরোপ ও সাধারণভাবে পশ্চিমের দৃষ্টিতে তলস্তয় প্রথমত এবং প্রধানত এক জন ঔপন্যাসিক—মহান সাহিত্যিক। আঠারো-শ’ আশির দশকের মাঝামাঝি অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার জগতে স্রষ্টা-লেখক তলস্তয় ব্যাপকভাবে পরিচিত হন। অল্পকালের মধ্যেই, আঠারো-শ’ উননব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা পত্রাবলীর একটিতে (ছিন্নপত্রাবলী, ১২ জুন, ১৮৮৯) তলস্তয়-এর ‘আনা কারেনিনা’-র উল্লেখ করছেন। এর একটি সুপরিচিত অংশ—“Anna Karenina” পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এরকম সব Sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি না।...”এর থেকে বোঝা যায় ‘আনা কারেনিনা’ সহ তলস্তয়-এর উপন্যাসগুলি আঠারো-শ’ আশির মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে পরিচিত ছিল।

সৌরিব্রিয়ানি জানিয়েছেন ভারতবর্ষে বাঙালিরাই সর্বপ্রথম তলস্তয়-এর লেখা বাংলাভাষায় (অবশ্যই ইংরেজি থেকে) অনুবাদ করেন। উনিশ-শ’ তিন সালে চণ্ডীচরণ সেন কলকাতা থেকে তলস্তয়-এর গল্পের বই ‘চল্লিশ বৎসর’ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ-শ’ সাত-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় কামিনী রায় অনূদিত তলস্তয়-এর আর এক গল্প—‘ধর্মপুত্র’। এম কে গান্ধী প্রথম তলস্তয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে। উনিশ-শ’ চল্লিশের দশকেই তলস্তয়-এর ‘আনা কারেনিনা’ (ইংরেজি থেকে) এবং ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পিস’ (সংক্ষেপিত!) বই দু’খানির বঙ্গানুবাদ বের হয়। এই কেবল উনিশ-শ’ তিরাশিতে মস্কো থেকে বাংলাভাষায় ‘আনা কারিনেনা’ প্রকাশিত হয়েছে। এটি রুশভাষা থেকে সরাসরি বঙ্গানুবাদ করেছেন ননী ভৌমিক। সন্দেহ নেই, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ইংরেজি ভাষায় তলস্তয়পড়েছিলেন।

সৌরিব্রিয়ানি শরৎচন্দ্রের ওপর তলস্তয়ের প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন যে উনিশ-শ’ আটাত্তরে মস্কোতে বিশ্ব সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত তলস্তয় সেমিনারে বিশিষ্ট ভারতীয় (গুজরাতি) কবি ও শিক্ষাব্রতী উমাশঙ্কর যোশী বলেন, ‘বাঙালি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ-শ’ কুড়ি সালে “গৃহদাহ” নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসে একটি নারী তাঁর স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য এক পুরুষের কাছে যায়।’ সৌরিব্রিয়ানি এই বিষয়ের ওপর মন্তব্য করে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে যে সময়টা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তখন বাঙালী নারীর এ ধরনের আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক।

আমাদের আলোচিতব্য দুটি উপন্যাস অর্থাৎ তলস্তয়-এর 'আনা কারেনিনা' এবং শরৎচন্দ্রর 'গৃহদাহ'র মধ্যে মিল-অমিল প্রশ্নটি আকর্ষণীয়। 'আনা কারেনিনা' নিছক এক 'প্রেমকাহিনী নয়, আবার নেহাত এক নারী তার স্বামীকে ছেড়ে অপর পুরুষের কাছে যাওয়ার এবং তার পরিণামের বর্ণনার কাহিনীও নয়। জর্মন লেখক টমাসমান বলেছিলেন "আনা কারেনিনা" আজ পর্যন্ত লেখা মহত্তম সামাজিক উপন্যাস।' নিশ্চিত বলা যায়, তলস্তয়-এর এই উপন্যাস সাহিত্য-কলার এক কালজয়ী কীর্তি তো বটেই, তা ছাড়া আঠারো-শ' সত্তরের দশকে রাশিয়ায় ইতিহাসের যে চরম সংকট-ময় অধ্যায় চলছিল, তখনকার রুশ জীবনধারার এক চলচ্ছবি এই উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বিধৃত। উপন্যাসটি বহুমাত্রিক। ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক এমনকি ধর্মীয় দিকও রয়েছে এর মধ্যে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক দিক থেকে আঠারো-শ' তিয়াত্তর থেকে সাতাত্তরের মধ্যে লেখা এবং আটাত্তর সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'আনা কারেনিনা'-য় আঠারো শ' ষাটের দশকে জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সংস্কার উদ্যোগের ফলে রাশিয়ার সমাজ যে পরি-বর্তনের মধ্য দিয়ে চলছিল তা (ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ, পল্লী অঞ্চলের নানাবিধ সংস্কার, আইনবিধির সংস্কার ইত্যাদি) দেখানো হয়েছে। এই সব সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে সাবেকি ধাঁচের রুশ সাম্রাজ্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ধারণা অনুযায়ী আধুনিক মানে উন্নীত করা। সংস্কার পর্বের এই পর্যায়টা সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর পক্ষেই কষ্টদায়ক হয়। ফলে বহুরকম উত্তেজনা আর দুর্বিপাকও ঘনিয়ে ওঠে। 'আনা কারেনিনা' প্রকাশিত হওয়ার তিনবছরের মাথায় একদল উগ্র সন্ত্রাসবাদী জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করে। এর ফলে রুশ সাম্রাজ্যকে কিছুটা মানবিক চেহারায় আনবার প্রয়াস স্তব্ধ হয়ে যায়। জারের এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু (হয়তো নিজেই এর জন্য দায়ী) যে অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করে, তেমনি বিষণ্ণ ছায়া-ছড়ানো আনা কারেনিনার নির্মম মৃত্যুতে।

'আনা কারেনিনা'র আরও কালজয়ী, আরও চিরন্তনী মাত্রা স্পর্শ করার অন্য কারণ, এটি হয়ে উঠেছে মানবিক সম্পর্কের এক মহৎ উপন্যাস। এ সম্পর্ক কেবল একজন স্বামী আর একজন স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেকার নয়, এটা হল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্ক ; এবং সম্ভবত, সবার উপরে এটি মানুষের অস্তিত্বের এক অর্থদ্যোতক উপন্যাস।

আনা কারেনিনায় প্রধান প্রেম কাহিনীটির সঙ্গে গড়ে উঠেছে আরও একাধিক প্রেমের ঘটনা, তার সংঘাতেই নির্মিত হয়েছে মূল কাহিনী। একথা বলা চলে যে, তলস্তয়ের আগে এবং পরেও সাহিত্যের মূল উপাদান বলতে একদিকে যেমন পুরুষ এবং নারীর সম্পর্ক অপর দিকে তেমনি সর্বজনীন মানবিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা যা প্রতিটি বিশেষ স্থান এবং কালে, একটি নির্দিষ্ট সমাজে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটায় তার চিত্রণ।

এখন 'আনা কারেনিনা'র ভিতরকার প্রেম কাহিনীগুলির মধ্যে যে ব্যাপার 'গৃহদাহ'-র উপর ছায়া ফেলেছে বলে মনে হয় তার প্রধান প্রধান দিকগুলি

আলোচনা করা যেতে পারে। শুরুতেই আমরা তলস্তয়-এর উপন্যাসে একটা 'ত্রিকোণ-প্রেম' দেখতে পাই। তরুণী প্রিন্সেস কিটি (ক্যাথেরিন) শেচরবাৎস্কি, তার দুই প্রেমার্থীঃ ভূস্বামী লেভিন এবং সামরিক অফিসার—ভ্রনস্কি। কিটি তাদের দুজনকেই ভালোবাসে। তবে সে বেশি আকৃষ্ট ভ্রনস্কির প্রতি। ভ্রনস্কি যথেষ্ট আকর্ষণীয় পুরুষ। লেভিন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। কিটি ভ্রনস্কির কাছ থেকে প্রস্তাবের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল ওই ভ্রনস্কি কিটিকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। তার মুগ্ধমনের আকর্ষণ আনা কারেনিনা নামে এমন এক নারীর প্রতি যার স্বামী এবং আট বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আনাও ভ্রনস্কির প্রেমে পড়ে, স্বামী-পুত্র ত্যাগ করে তার সঙ্গিনী হয়। লেভিন আর কিটি ফের মিলিত হয়, তাদের বিয়ে হয় এবং মোটামুটি সুখী দাম্পত্যজীবনে স্থিত হয়। ভ্রনস্কিকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করে আনা এবং কার্যত স্বামী-স্ত্রী রূপেই তারা একসঙ্গে কিছু-দিন বসবাস করে। কিন্তু এরকম সম্পর্ক সমাজে অনুমোদন পায় না বলে বেশিদিন তারা এভাবে একসঙ্গে থাকতে পারল না। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আনা এক চলন্ত ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

'গৃহদাহ'ও 'আনা কারেনিনা'র মতো বহুমাত্রিক উপন্যাস, নেহাত একটি প্রেমের কাহিনী নয়। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালি জীবনের এক বিশ্বাস-যোগ্য চলচ্ছবি, অবশ্যই তলস্তয়ের উপন্যাসের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে। ঐ সময় বঙ্গীয় সমাজ যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, 'গৃহদাহ'তে তাই চিত্রিত হয়েছে। সে সময়টায় টানা-পোড়েন চলছিল হিন্দু বনাম ব্রাহ্ম, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ বনাম আধুনিক নিরীশ্বরবাদ, নাগরিক বনাম গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যে। আবার অন্যদিক থেকে 'আনা কারেনিনা'র মতই 'গৃহদাহ' ও এক মানবিক সম্পর্কের মানুষের অবস্থার উপন্যাস, মানবিক আদর্শ যা কিনা মানুষের অস্তিত্বেরই মূল ভিত্তি তার সন্ধানের উপন্যাস।

তলস্তয়ের উপন্যাসের চরিত্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রের উৎস ও তাদের পরিবেশন সূত্রে সমালোচক যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয়। তিনি জানিয়েছেন যে, তলস্তয়-এর উপন্যাসের চরিত্রগুলির উৎস রুশ সমাজের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অভিজাত শ্রেণী। পটভূমি হিসাবে রয়েছে সাবেক ধাঁচের গ্রামীণ সমাজ। শরৎচন্দ্রর উপন্যাসেরও প্রধান কয়েকটি চরিত্র সমাজের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত অভিজাত শ্রেণীর। ঐতিহ্যবাহী সমাজের চরিত্রও কাহিনীতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাবেক আর আধুনিক, দুই সমাজেরই চরিত্রগত আপেক্ষিক মূল্যায়ন বর্ণিত ও প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাস দু'খানিতে। 'আনা কারেনিনা'র তুলনায় গৃহদাহে চরিত্রের সংখ্যা অনেক কম। সেজন্য 'গৃহদাহ' পাঠের সময় এর কোন কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করার সময় আনা কারেনিনার একাধিক চরিত্রের কথা মনে হয়। গঠন কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, 'আনা কারেনিনা'র দুটি ত্রিকোণ-প্রেম 'গৃহদাহ'-তে কমিয়ে এনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ত্রিকোণ-প্রেমে রাখা হয়েছে।

'গৃহদাহ'-র মূল নারী চরিত্র অচলা প্রথম দিকে অনেকটা তলস্তয়-এর কিটির মতো। কিটিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে অষ্টাদশীরূপে। অচলার কথাও বলা হয়েছে (৩য় পরিচ্ছেদ) তার বয়স 'আঠারোর কাছাকাছি'। কিটির মতো অচলারও দু'জন প্রেমার্থী। তাদের অন্যতম সুরেশ ভ্রনস্কির মতোঃ ধনী আকর্ষণীয়, আবেগপ্রবণ। অপর প্রেমাকাঙ্ক্ষী মহিমকে তুলনা করা চলে লেভিনের সঙ্গে। সে সংযত, আচরণে মার্জিত এবং বাড়ি পল্লীগ্রামে। অচলার অবস্থাটা অবশ্য কিটির চাইতে জটিল। কিটির সমস্যাটা কেবল দু'জনের মধ্যে কোন্ জনকে সে যথার্থই ভালোবাসে তা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত করা। আর অচলার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা শুধুমাত্র ভালোবাসার নয় প্রশ্নটা তার আহত অহংকার এবং আত্মমর্যাদারও। অচলা যখন বুঝতে পারে বাবা তাকে সুরেশের কাছে বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত তখন সে দ্রুত মহিমকে নির্বাচন করে। এটা আসলে সে তাকেই ভালোবাসতো বলে নয়, তার ভাবনা বিক্রি হয়ে যাওয়ার অপমান থেকে অন্তত মহিম তাকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু সিদ্ধান্তটা করে ফেলার পর সুরেশের প্রতি টানটা বাড়তে থাকে অচলার। তখন ঠিক কিটির মতো তার মনেও দুই প্রেমিকের টানা-পোড়েন। তবু কিটির মতো না করে অচলা লেভিনের বঙ্গীয় প্রতিচরিত্র মহিমের প্রতি তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। এবং তার সঙ্গে (শেষের দিকে কিটি আর লেভিন এর মতো) তার গ্রামে চলে যায়।

কিন্তু মহিম আর অচলার বিয়ের পর আবার শুরু হয় ত্রিকোণ-প্রেমের পালা। এবার ব্যাপারটা আনা, তার স্বামী (কারেনিন) এবং ভ্রনস্কির ত্রিকোণ-প্রেমের সঙ্গে মিলে যায়। সুরেশ এখানে ভ্রনস্কির ভূমিকায়। তলস্তয়-সৃষ্ট চরিত্রটির মতোই সে বিরতিহীনভাবে অচলার প্রতি প্রেম নিবেদন করে চলে এবং কিছুকাল পরে, উপন্যাসের প্রায় শেষের দিকে তাকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে সমর্থ হয়। অচলাও এভাবে আনা কারেনিনার পথ অনুসরণ করে। অবশ্য তলস্তয়-এর চাইতে শরৎচন্দ্র অনেক সহৃদয়। তাঁর নায়িকার তিনি মৃত্যু ঘটাননি। অচলার সঙ্গে বিয়ের পর মহিম হয়ে উঠল যেন লেভিন আর কারেনিনের মিশ্র প্রতিরূপ। শচীন্দ্রলাল ঘোষ তাঁর 'গৃহদাহ'-র ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধে মহিমকে বলেছেন মুখ্য চরিত্র, আত্মমগ্ন এবং নিরাসক্ত। কারেনিনের ক্ষেত্রেও এই বিশেষণগুলি প্রযোজ্য। আনার মতো অচলাও বুঝতে পারল যে, সে স্বামীকে ভালোবাসে না। এবং যখন তাঁদের গ্রামের বাড়ি পুড়ে গেল, সে চলে গেল কলকাতায় তার বাবার কাছে। তবু মহিমের অনেকটাই লেভিনের সঙ্গে অভিন্ন। তার কাজ (কারেনিনের মতো) ব্যুরোক্রাটের নয়; বরং লেভিনের মতো মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। শরৎচন্দ্র মূলত শহুরে মানুষ। যতটাই হক তলস্তয়-এর মত গ্রামজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর ছিল না। আর সেই কারণেই গ্রাম-জীবনের কাজকর্ম আমোদ-প্রমোদ-এর যতোটা বিস্তারিত বর্ণনা আমরা 'আনা কারেনিনা'-য় পাই, শরৎচন্দ্রর 'গৃহদাহ'-তে ততোটা পাই না। তবু আমরা জানতে পারি যে, 'মহিম প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের ক্ষেতখামার দেখিতে যাইত; ফিরিয়া আসিতে কোনদিন বা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।' উপন্যাসের একেবারে শেষে

ফের মহিম আর অচলার যে ভূমিকা দেখি, ঝগড়ার পরে তেমনি ভূমিকাতেই আমরা পাই লেভিন আর কিটিকে। ঘটনাগতিতে তারা তাদের পারস্পরিক ভালোবাসাকে পুনরাবিষ্কার (অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা) করে। এবং মহিমও তলস্তয়-এর উপন্যাসের শেষে লেভিনের মতো ধর্মের প্রকৃত অর্থে আত্মমগ্ন হয়।

কিন্তু প্রথমে অচলা আর সুরেশের ভূমিকা আনা আর ভ্রনস্কির মতো। তাহলেও এদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য হল, আনা প্রথমে ভ্রনস্কির সঙ্গিনী হয় এবং পরে নিজের স্বামীকে ছেড়ে আসে; অচলার ঘটনা এর বিপরীত: সে প্রথমে তার স্বামী ছেড়ে সুরেশের সঙ্গে আসে এবং অনেক পরেই তার সত্যিকারের সঙ্গিনী হয়। তবে পরিণতি একই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই নারীই তাদের সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর নায়িকার মৃত্যু ঘটাতে চাননি। কিন্তু মৃত্যুর ভাবনা আত্মহত্যার ইচ্ছা বারেবারেই তার মনে এসেছে। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দেখি অচলা তার বাবার বাড়ি এসে তাকে বলছে—'আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, তার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তাহলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর যারই অভাব থাক, ডুবে মরার মত জলের অভাব ছিল না।' পরে একদা যখন সে টের পায় যে, তার মধ্যে সুরেশের প্রতি একটা প্রণয়াসক্তি ধরা পড়ছে, সে তখন ভয় পেয়ে গিয়ে নিজেকেই নিজে বলতে লাগল,—'এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে।' তার পরে যখন অচলা সত্যিই সুরেশের সঙ্গে একটা রাত্রি বাস করে তখন লেখক (নাকি অচলা) বলছেন, 'সে সুরেশের শয্যায় গিয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল।' উপন্যাসের একেবারে শেষে, সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা মহিমকে বলছে,—'তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর! আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও।'

অচলার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে সুরেশের যে অনুভূতি সেটা কোনও কোনও সময় আনার সঙ্গে রোমান্সের সময়ে ভ্রনস্কির অনুভূতির সঙ্গে মিলে যায়। তলস্তয় বলছেন, ভ্রনস্কির 'মনের অবস্থা হল, একজন খুনি, যে দেহটি থেকে জীবন হরণ করেছে সে দিকে তাকিয়ে তার যা মনোভাব হয় ঠিক তেমনি।' (দ্বিতীয় অংশ, একাদশ পরিচ্ছেদ।) তেমনি সুরেশ অচলাকে অপহরণ করে এবং সে (অচলা) রেল কামরার মধ্যে টলে পড়ে যায়। তখন সুরেশ যেভাবে দাঁড়িয়ে রইল তার বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিচ্ছেন, 'নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূপাতিত পক্ষিণীর মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেমনি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন এক মরণাহত নারীর শেষমুহূর্তের সাক্ষ্য লইতে দাঁড়াইয়া রহিল।' পরে তাদের প্রেমের পর্ব যখন পূর্ণতায় পৌঁছয়, সুরেশ তখন ভ্রনস্কির মতো (বোধহয় তার চাইতেও অল্প সময়ে) এই ভালোবাসাটাকে একটা বোঝার মতো অনুভব করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আনাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে হতাশ ভ্রনস্কি নিপীড়িত ক্রীতদাস ভাইদের মুক্তির জন্য তখন রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের যে যুদ্ধ চলছিল তাতে যোগ দিতে চলে গেল। একইভাবে উপন্যাসের প্রথম দিকে অচলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সুরেশ প্লেগ মহামারীর সঙ্গে লড়াই করতে ফৈজাবাদে চলে যায়।

উপন্যাসের শেষে অচলাকে ভালোবাসা নিয়ে সুরেশের যখন মোহভঙ্গ ঘটে, ফের সে চলে যায় প্লেগের সঙ্গে লড়তে এবং মৃত্যুবরণ করে।

সুরেশের মৃত্যু, সমালোচকের মতে তুর্গেনিভের উপন্যাস ফাদার্স অ্যান্ড সন্স-এর বাজারভের মৃত্যুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেই উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র বাজারভ, সুরেশের মতোই একজন চিকিৎসক। টাইফিস নামক সংক্রামক রোগে মারা যাওয়া কৃষকের শবব্যবচ্ছেদের সময় অসতর্কতার ফলে সে নিজের আঙুলটা কেটে ফেলে। ঐ ক্ষত দিয়ে রোগ সংক্রমণের ফলে জীবনের সেরা সময়েই তার মৃত্যু হয়। সুরেশের মৃত্যুর কারণও ঐ ধরনের সংক্রমণ। সুরেশের নিজের কথায়ঃ 'দুপুরবেলা মামুদপুর থেকে একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে, তার মায়ের খুব অসুখ। তাকে অস্ত্র করতে গিয়েই নিজের এই বিপদ ঘটালুম। এমন অনেক ত করেছি, আমি সাবধানও কম নই, কিন্তু এবার দুর্ভাগ্য এমনি যে, এক্কার চাকায় বুড়ো আঙুলের পিছনটা ঘেঁষে গিয়েছিল, সেটা কেবল চোখে পড়ল হাতের রক্ত ধুতে গিয়ে।' অন্তত আরও একটা ব্যাপারে সুরেশের মিল আছে বাজারভের সঙ্গে, দু'জনেই ঘোর নিরীশ্বরবাদী, প্রচলিত সামাজিক বিধির সোচ্চার সমালোচক। সুরেশ এবং বাজারভের মৃত্যুবরণের মধ্যে যে রকম লক্ষণীয় মিল তাতে মনে হয় শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই রুশসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং 'আনা কারেনিনা'র সঙ্গে সাদৃশ্যের ব্যাপারে 'গৃহদাহ'কে আরও স্বাভাবিক রূপ দিতে পেরেছেন।

তলস্তয়-এর উপন্যাসে ভ্রনস্কি একবার নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আত্মহত্যার এরকম একটি বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে আমরা 'গৃহদাহ'-তেও পাই। অচলাকে অপহরণের পর সুরেশ যখন বুঝতে পারল কী সে করেছে, তখন সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে—'আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলি করতে হবে।' ট্রেন থেকে তারা ডিহরী নামে একটা স্টেশনে নেমে পড়ল। একটা সাবেক দিনের সরাইখানার সন্ধান পেয়ে তার মধ্যেই দুটি পৃথক কক্ষে দুজনে রাত কাটাল। সকালের দিকে অচলা সুরেশের ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ে দেখে, সে নি সাড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, মনে হল, লোকটি বেঁচে নেই। নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ভালোর জন্য হোক, আর খারাপের জন্যই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সে মৃত নয়, তবে গুরুতর অসুস্থ।

'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে (ভ্রনস্কির আত্মহত্যা চেষ্টার আগে) এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন ত্রি-কোণ প্রেমের তিন জুটিই তাদের কারো (যেমন আনার) মারাত্মক অসুখে মৃত্যুর আশঙ্কার মুখে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক একটা বোঝা-পড়া করে নেয়। 'গৃহদাহ'-তেও অন্তত তিনবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সুরেশের বাড়িতে অসুস্থ শয্যাশায়ী মহিমের প্রতি অচলার ভালোবাসা ফের জেগে ওঠে। সুরেশও সে সময় নিজেকে ওদের পারিবারিক বন্ধুর ভূমিকায় থেকে সন্তুষ্ট থাকে। আবার সুরেশ যখন ডিহরীতে দারুণভাবে অসুস্থ তখন অচলা তার সেই অপহরণকারীর সঙ্গে বাঁধা পড়ে। সব শেষে সুরেশ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তারা পরস্পরকেই ক্ষমা করে এবং মানসিক অভিঘাতের সেই প্রেক্ষাপটেই মহিম এবং অচলার ভবিষ্যৎ পুনর্মিলনের সূচনা করে।

'আনা কারেনিনা' এবং 'গৃহদাহ'-এ আরও একটা ব্যাপারে মিল আছে। দুটি উপন্যাসেই রেলওয়ের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। 'আনা

কারেনিনা'র আনা আর ভ্রনস্কির প্রথম সাক্ষাৎকার রেলওয়ে স্টেশনে। আবার আর এক স্টেশনে দারুণ তুষারপাতের মধ্যে ভ্রনস্কি প্রথম তার প্রেম নিবেদন করে আনার কাছে। এবং অবশ্যই সেও এক রেলস্টেশন যেখানে আনা জীবন থেকে চিরবিদায় নেয়। 'গৃহদাহ'তেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানেও দারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রেলস্টেশনে সুরেশ অচলাকে অপহরণ করে। দুটি উপন্যাসেই রেলপথ হয়ে উঠেছে যেন আধুনিক সভ্যতার প্রতীক যা চিরাচরিত মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এবং কখনো-সখনো মানুষকেই হত্যা করে।

'আনা কারেনিনা'র একাধিক প্রতিচরিত্র আমরা 'গৃহদাহ'-তে পাই। গ্রাম্য তরুণী মৃণালের বিয়ে হয় বয়সে তার তুলনায় অনেক বড় এক বৃদ্ধের সঙ্গে এবং অল্পদিনেই সে বিধবা হয়। মৃণাল যেন হিন্দু স্ত্রীর চিরাচরিত আদর্শের প্রতি-মূর্তি। সে পতিভক্তিপরায়ণা। 'আনা কারেনিনা'য় কিটির বড় বোন ডলির সঙ্গে মৃণালের কিছু মিল পাওয়া যায়। পতিসেবা ডলির আদর্শ। তার পারিবারিক জীবন যদিও সুখের নয়, তবু, ঠিক ঠিক স্বামীর প্রতি না হলেও সংসারের প্রতি সে অনুগতা। কিন্তু ডলির চাইতেও দুঃখী নারী মৃণালের কাঁধে অনেক বেশি আদর্শের বোঝা। মৃণাল যেন হিন্দু ঐতিহ্যের (শরৎচন্দ্র যেটা অনুভব করেছেন) মুখপাত্র। 'আনা কারেনিনা'য় নাগরিক বনাম গ্রামীণ, আধুনিক বনাম সাবেকি জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধগুলির সংঘাত এক বিশেষ আদর্শগত গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। 'গৃহদাহ'-তেও এটা পাওয়া যায়। অচলার বাবা, কলকাতাবাসী ব্রাহ্ম কেদারবাবু যখন তার জামাতার গ্রামে এলেন, তখনই তার বাঙালি কৃষকদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র লিখছেন : 'জন্মকাল হইতে তাঁহারা (কেদারবাবুরা) চিরদিন কলিকাতাবাসী। শহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লীগ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্বেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে —আত্মীয়-কুটুম্বও ধর্মান্তর-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব অধি-কাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছু না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন তাহাও বিচিত্র নয়। যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারাজীবন কাটাইয়া দেয়, শহরের মুখ দেখা যাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি একপ্রকার পশু বলিয়াই জানিতেন এবং সেই সমাজ-টাকেও ধন্যসমাজ বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য যখন তাহার তীক্ষ্ণ বিষদাঁত দুটো তাঁহার মর্মের মাঝখানে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন যতই এই সকল লেখাপড়া-বিহীন পল্লী-বাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন তাহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাঁহার ধর্ম, তাহার সভ্যতা, তাহার বিধি-বিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

"তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন, ইহারা লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া আছে। নীতির মোটা কথাগুলো ইহারা জানে। কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই, কারণ জগতের সকল ধর্মই যে মূলে এক, এবং তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায়, [illegible] জ্ঞান

তাঁহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষা কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লাও যে একই বস্তু এ সত্য তাহাদের অবিদিত নাই।

'তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বার বার বলিতে থাকে, ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশী জানি? কিসের জন্য ইহাদের সমাজ, ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গিয়াছি? আর, সে দূর এত বড় দূর যে, এই সব আপনজনের কাছে আজ একেবারে স্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি।'

সমগ্র অনুচ্ছেদটি 'আনা কারেনিনা'য় লেভিনের যে ভাবনা অথবা তলস্তয়-এর কোনও কোনও নিজস্ব নীতিমূলক রচনার সঙ্গে অভিন্ন।

অনেক বিখ্যাত সাহিত্যকর্মই কোনও না কোনও ভাবে অপর কোনও সাহিত্য-কর্মের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কখনও বা তুলনামূলকভাবে কম উল্লেখ্য সৃষ্টি থেকেও জন্ম নিয়েছে নতুন মহান সৃষ্টি, এটাই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস। 'আনা কারেনিনা'-র কাছে 'গৃহদাহ'-র এই ঋণের ঘটনা (আদৌ যদি এটা ঘটনা হয়) সত্ত্বেও একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই উপন্যাসের শিকড় বাংলার মাটিতে, বাংলার প্রকৃতিতে লালিত এবং লেখক শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যে এটি সমুজ্জ্বল। দুই উপন্যাসের মধ্যেকার সাদৃশ্য নিয়ে এই আলোচনার পর উভয়েরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র নারীর মৃত্যু ঘটাননি, ঘটিয়েছেন পুরুষের, এটা আকস্মিক কিছু নয়। মহিমের সঙ্গে ঝগড়ার সূত্রে একবার অচলা তাকে বলে,—'...আমি এটুকু বুঝেছি যে, আর সমস্ত ছেড়ে দিলেও শুধু পুরুষমানুষ বলেই এই শাস্তির বেশী ভার পুরুষের বহা উচিত।' শরৎচন্দ্র যেভাবে কাহিনীটি গড়ে তুলেছেন তাতে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আনা কারেনিনার তুলনায় অচলার কাঁধে অনেক কম দায় বর্তায়। তাছাড়া অচলার পরি-পরিস্থিতিটা সহজতর ছিল, কারণ আনার মতো তাকে ছেলেকেও ছেড়ে আসতে হয়নি।

ট্রেনে যাবার সময় সুরেশ অচলাকে প্রতারণা করে, অপহরণ করে (অবশ্য একাজ করতে অচলাই অজ্ঞান্তে সুরেশকে প্ররোচিত করে বলে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন।) তা সত্ত্বেও অচলা কিন্তু সুরেশের 'সঙ্গিনী' হয়নি। তার শেষ 'পতন' ঘটে উপন্যাসের শেষদিকে, (মোট চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ-এর) সাঁইত্রিশতম পরিচ্ছেদে। সুরেশ এবং অচলা তাদের নতুন বাড়িতে এক রাতে থাকার সময় রামবাবু নামে এক বৃদ্ধ হিন্দুও সেখানে ছিল বলে এটা ঘটল। রামবাবু ওদের স্বামী-স্ত্রী বলে মনে করত। অচলা তার প্রতি এই বৃদ্ধ হিন্দুর স্নেহকে খুব মূল্য দিত। এই স্নেহশীল বৃদ্ধের কাছে ধরা পড়ার লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাতে অচলা সে রাতে সুরেশের শয়ন-কক্ষে যায়। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য রিপুর তাড়নায় অচলা সুরেশের শোবার ঘরে যায়নি, সে গিয়েছিল নিজের মুখ বাঁচাতে। '...তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই লজ্জায় আঁকড়াইয়া রহিল।' অপর পক্ষে তলস্তয় এ-ব্যাপারে কোনও সংকোচ না রেখে দেখিয়েছেন, আনা দেহগত আকর্ষণে ভ্রনস্কির কাছে যায় এবং স্বেচ্ছায় তার শয্যাসঙ্গিনী হয়।

তলস্তয়-এর মতো তার প্রেমিক-প্রেমিকাদের দীর্ঘক্ষণ থাকতে দেননি শরৎচন্দ্র। অচলার 'পতন' ঘটে সাঁইত্রিশতম পরিচ্ছেদের শেষে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিকে অন্যান্য চরিত্র ও পটভূমি নিয়ে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। চল্লিশতম পরিচ্ছেদে (প্রায় একমাস পরে) ফের যখন অচলা আর সুরেশের প্রসঙ্গ ওঠে, দেখা যায়, সুরেশ তাদের

প্রেমের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবং পরের একটানা পরিচ্ছেদে প্রেমক্লান্ত সুরেশ প্লেগের সঙ্গে লড়তে এবং মৃত্যুবরণ করতে চলে যায়।

সুতরাং, অচলার 'পতন' ঘটে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তাই এই 'পতন' পরিণাম তাকে ভোগ করতে হয়নি। অচলার 'পতন' অন্য কোনও-ভাবে (আরও তলস্তয়ী ধরনে) উপস্থাপিত হলে উপন্যাসটি এবং তার প্রধান নারী চরিত্রটি উনিশ 'শ কুড়ি সালের বাঙালি পাঠকদের কাছে একদম গ্রহণীয় হোত না।

ঐতিহ্যবাহী (প্রাগাধুনিক) ভারতীয় সাহিত্যে পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা সহজেই অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে 'ভদ্র' মহিলাদের ক্ষেত্রে দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাস-ঘাতকতা অচিন্তনীয়, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যদিও নারীর যৌনচেতনা স্বীকৃত এবং পুরুষের যৌনচেতনার তুলনায় অনেক বেশি-প্রবল বলে গণ্য করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ভিক্টোরিয় নীতি-বিধান অনুযায়ী পুরুষের ইচ্ছেমতো যৌনসম্পর্ক স্থাপনের 'অধিকার' অনেকটা খণ্ডিত হয়। আর নারীর যৌনতা, এমনকি এর অস্তিত্বই আদৌ যেন অস্বীকৃত হল। শরৎচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর এই মানসিকতাকেই মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি-ফলিত করেছেন 'গৃহদাহ' উপন্যাসে।

'আনা কারেনিনা'-র নীতিবাদী তলস্তয় কখনই শিল্পী তলস্তয়-এর উপরে খবরদারি করতে পারেন নি। আদর্শ লিপি হিসাবে যে খ্রিস্টীয় বাণীটি তলস্তয় তার উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন তা হল,—'আমার প্রতিহিংসার মূল্য আমাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।' সাধারণত এই কথাটির যে ব্যাখ্যা-হয়ে থাকে তা হল, একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের কাজের চূড়ান্ত বিচার করতে পারেন। 'আনা কারেনিনা'র সর্বাধুনিক ইংরেজি অনুবাদে রোজমারি এডমণ্ডস তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, 'তলস্তয় কোন নীতি নির্দেশ করেননি। শিরোনামের তলায় এই প্রণিধানযোগ্য বাণীটি উৎকীর্ণ করে পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে তার তাৎপর্য অনুধাবনের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন মাত্র। এবং আমরা বিচার করি না, আমরা দেখি। আমাদের সামনে একটাই পথ—ক্ষমাশীলতা আর প্রেম।'

শরৎচন্দ্র কিন্তু 'গৃহদাহ'-তে অনেকটা নীতিবাদী। অনেক স্পষ্ট তাঁর নৈতিক বিচার। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, সে সম্পর্কে তাঁর মনোভাবও স্পষ্ট। আর তল-স্তয় অভিমত প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত, তিনি এ দায় অর্পণ করতে চান উচ্চতর অধিকারীর ওপর। 'গৃহদাহ'-তে শরৎচন্দ্র হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে সদাচরণের এক সন্দেহাতীত দৃঢ় ভিত্তির কথা বলেছেন। উপন্যাসের মৃণাল এই ঐতিহ্যের মুখপাত্র। তবে দুঃখে সুখে সকরুণ নির্বিকল্পভাবের এই প্রতিমূর্তি নারী যতোই প্রশংসনীয়, আকর্ষণীয় হোক, তার মূল্যবোধগুলি সনাতনী হিন্দু গোষ্ঠীর বাইরে সম্ভবত গৃহীত হবে না। আসলে 'আনা কারেনিনা' রচনার সময় রাশিয়ার যে অস্থির অবস্থা চলছিল, 'গৃহদাহ' রচনা সময় ভারতবর্ষের অবস্থা সে রকম ছিল না—তাই মৃণালের মধ্যে দিয়ে সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেয়তর রূপটি (শরৎচন্দ্রের মতে) প্রতিফলিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকারদের তুলনা আমাদের তুষ্ট করে। শ' বা টুর্গেনিভ কিংবা টলস্টয়কে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপন করা আনন্দদায়ক উদা-হরণ, অন্তত 'গৃহদাহ' এই সুযোগ এনে দিয়েছে, সে অর্থেও 'গৃহদাহ' বাংলা উপন্যাসে অনন্যতার দাবিদার। সৌরিয়ানির 'গৃহদাহ' ও আনা কারেনিনার তুলনা সেই স্নিগ্ধ ও সমর্থন করে।